দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

Contents

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

(বর্ধিত সংস্করণ)

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
(বর্ধিত সংস্করণ)

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার
১২৮, আদর্শ নগর, মসজিদুল ইকরাম সংলগ্ন, মধ্যবাড্ডা,ঢাকা -১২১২
ফোন: ৯৮৮১৫৩২, মোবা: ০১৯২৪০৭৬৩৬৫

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল ▫ মাওলানা আব্দুল মতিন ▫ প্রথম সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১ ▫ দশম প্রকাশ :
দ্বিতীয় (বর্ধিত) সংস্করণ : জুন ২০১৫ স্বত্ব: লেখক ▫ প্রকাশক: মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ▫ মাকতাবাতুল আযহার ▫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।
প্রচ্ছদ: বশির মিসবাহ   কম্পোজ: শিব্বীর আহমদ, তাহমীদুল মাওলা

মূল্য: ১৫০ টাকা

Contents

অর্পণ

মরহুম আব্বুর নামে –

যিনি জীবনে শত কষ্ট করেও আমাদের দীনী শিক্ষা লাভের পথকে মসৃণ রাখতে সর্বোত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মাধ্যমে বৈষয়িক কোন উপকার লাভ করার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমার ফারেগ হওয়ার পরের বছর - ৮৭ সালে - যখন তিনি শয্যাশায়ী তাঁর সামান্য সেবার মানসে শিক্ষকতায় যোগ দিলাম। বেতন থেকে সর্বপ্রথম পাঁচশত টাকা তুলে তাঁর নামে পাঠালাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে টাকা গিয়ে তাঁর লাশের মুখ দেখল বটে, তাঁর দেখা পায় নি।

তাঁরই মাগফিরাত কামনায় -

আব্দুল মতিন

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, একটু দেরিতে হলেও দলিলসহ নামাযের মাসায়েলের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। পাঠকদের অনেকদিনের প্রত্যাশা এবার পূরণ হবে বলে আশা করি। বিশেষ করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আসার পর থেকে বলতে গেলে অস্থির পাঠকদের সামলাতে হিমশিম খেতে হয় আমাদের। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে পাঠকদের তৃপ্ত করার মতো কাজটি আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাঁর জন্যেই সকল প্রশংসা। সকল কল্যাণকর কর্ম তো তাঁর ইশারায়ই সম্পাদিত হয়।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এ পুস্তকটির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। দীন সচেতন যে কেউ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তীব্রভাবে। সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার মতো সুন্দর সুন্দর কথার মোড়কে আমাদের সমাজের যে লা-মাযহাবী বন্ধুরা সরলমনা ঈমানদারদের বিভ্রান্ত করার মিশনে নেমেছেন, এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর তাদের সে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে সচেতন মহলে। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর থেকেই আমরা আরও দালিলিকভাবে এর দ্বিতীয় সংস্করণের আশায় ছিলাম। এর মধ্য দিয়েই কেটে যায় দীর্ঘ চার বছর। ইতিমধ্যে আবার আমাদের সে বন্ধুরা নিজেদের খুলে যাওয়া মুখোশকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে এবং আগের চেয়ে আরও জগন্য পন্থায় তারা নতুন নতুন বিভ্রান্তির জাল ফেলতে মরিয়া হয়ে পড়ে। এমনকি আমাদের এই বইটি নিয়েও তারা অভিনব পন্থায় জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। কোনো ধরনের চিন্তাভাবনা ছাড়াই, কেবলই তাদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, সহীহ হাদীসকেও তারা জাল বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে সাধারণ পাঠক ও দীনদার মুসলমান নতুন করে এক সংকটের মুখোমুখি হয়। আমাদের 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল'এর দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে তাদের সেই বিভ্রান্তি ও জালিয়াতির কিছুটা স্বরূপ উন্মোচনসহ। আশা করি, প্রথম সংস্করণের মতোই এই বর্ধিত সংস্করণটিও পাঠকদের চাহিদা মেটাবে।

মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করব কী বলে! এই বইটি প্রকাশের মাত্র তিন মাসের মাথায় এর প্রথম প্রকাশের সবগুলো কপি ফুরিয়ে যায়। যখন বইটি প্রকাশিত হয়, তখন মাকতাবাতুল আযহার বাংলা বই প্রকাশের পথে নতুন যাত্রা শুরু করেছে মাত্র। আর পরবর্তীতে আমরা বাংলাভাষী পাঠকদের যে ভালোবাসা পেয়েছি, দেশজুড়ে এবং দেশের গণ্ডি ছাড়িয়েও আমাদের যে সুনাম অর্জিত হয়েছে, তা বলা যায় এ বইটি থেকেই পাওয়া।

বইটির লেখক হযরত মাওলানা আব্দুল মতীন সাহেব একজন সুযোগ্য মুহাদ্দিস। হাদীসের পাঠদান আর গবেষণায় প্রাজ্ঞ ও বরেণ্য এ সাধক তাঁর বইটি প্রকাশের দায়িত্ব দিয়ে আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আল্লাহ দয়াময়ের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এ মনীষীকে সুস্থতাপূর্ণ নেক হায়াত দান করেন এবং সাধারণ মুসলমানদের তাঁর খেদমত থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দেন। আমীন॥

বিনীত

ওবায়দুল্লাহ

মধ্য বাড্ডা, ঢাকা

সূচি

Contents

Contents

Contents

Contents

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

দেশের বিভিন্ন স্থানে সফরে গিয়ে স্থানীয় আলেমগণের মুখে একটি অভিযোগ বরাবরই শুনতে পেয়েছি। আর তা হলো কিছু কিছু লা-মাযহাবী আলেম এই বলে ফেৎনা সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে যে, নামাযের কিছু কিছু মাসআলায় হানাফীদের কোন হাদীস বা কোন দলিল প্রমাণ নেই। সর্বশেষ গত ১৪/১/১১ ইং তারিখে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি প্রোগ্রামে গিয়ে একই অভিযোগ শুনতে পেলাম। নিয়ত করলাম ঢাকায় ফিরে এ বিষয়ে কলম ধরবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালার তৌফিকে নিয়ত অনুযায়ী কাজ শুরু করলাম। শিক্ষকতার ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু করে লিখতে লাগলাম। প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই লেখার কাজ সমাপ্ত হলো । সহজ-সরলভাবে উদ্ধৃতিসহ মূল হাদীস ও তার অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ হাদীসের মানও উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সনদ বা সূত্রের চুল-চেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন মনে করা হয়নি। তাদের পদক্ষেপ দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা রইলো। প্রবাদ আছে, দোস্ত বাকী তো মোলাকাত ভী বাকী - বন্ধু থাকলে সাক্ষাতও ঘটতে থাকবে।

দুটি বিষয় লিখে দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে দুজন তরুণ মেধাবী ও উদ্যমী আলেম মাওলানা তাহমীদুল মাওলা (বেতেরের মাসআলা) ও মাওলানা শিব্বীর আহমদ (জানাযার মাসআলা)। দুজনই আমার ছাত্র ও বর্তমানে সহকর্মী। আল্লাহ তায়ালা তাদের ইলমে আরো বরকত দান করুন।

গ্রন্থের শেষে আরো দুটি প্রবন্ধ যোগ করার প্রয়োজন অনুভব করেছি। একটি হলো, মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি। এটি লিখেছেন, উপমাহাদেশের খ্যাতিমান হাদীস গবেষক, বাংলাদেশের গর্ব, মারকাযুদ দাওয়া আল

ইসলামিয়ার হাদীস বিভাগের প্রধান হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক দামাত বারকাতুহুম। এটি সর্বপ্রথম মাসিক আল কাওছারে প্রকাশিত হয়েছিল। অপরটি উমরী কাযা আদায় সম্পর্কে। এটি লিখেছেন আমার স্নেহাষ্পদ মেধাবী ও উদ্যমী আলেম মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ, সহকারী সম্পাদক, মাসিক আলকাওছার। প্রবন্ধকারদ্বয়ের অনুমতিক্রমে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রবন্ধ দুটি এখানে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম জাযা দিন।

এখানে একটি কথা সকলকে স্পষ্ট বলে দিতে চাই যে, পূর্বসূরিগণ তথা সাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকে চলে আসা এ ধরণের বিরোধপূর্ণ মাসায়েল নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। উম্মত আজ হাজারো সমস্যার সম্মুখীন। কুফরী শক্তি একজোট হয়ে আজ উম্মতে মুহাম্মদীর উপর হিংস্র থাবা বিস্তার করছে। মুসলমানদের ঈমান আমল লুট করতে আজ হাজারো লুটেরা বাহিনী নিরলস অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিৎ একতাবদ্ধ হয়ে সেসব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা। সুতরাং আমাদের নীরবতার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন পানি ঘোলা না করেন, সে অনুরোধ রেখেই এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার ইতি টানছি।

আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করেন। আমীন।

আব্দুল মতিন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কিছু লোকের বাড়াবাড়ির ফলে আমাদের মহান পূর্বসূরিগণের একটি জামাতের গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এ জামাতটি হলো ফকীহ ও মুজতাহিদগণের জামাত। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ জামাতের গুরুত্ব ছিল প্রায় সর্বজন স্বীকৃত।

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের যে জিম্মাদারি নিজেই গ্রহন করেছেন, তার প্রেক্ষিতেই তিনি উম্মতের এক এক জামাতকে এক একটি দিক সংরক্ষণের কাজে লাগিয়েছেন। কাউকে দিয়ে ব্যকরণ, কাউকে দিয়ে বালাগাত বা অলংকারের দিক সংরক্ষণ করিয়েছেন। কাউকে দিয়ে কুরআনের পঠন রীতি, কিরাআত ও তাজবীদ সংরক্ষণের খেদমত নিয়েছেন। হিফজ করার তাওফীক দিয়ে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআন ও হাফেজে হাদীস সৃষ্টি করে কুরআন-সুন্নাহর শব্দ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। একই ধারাবাহিকতায় বিশাল এক জামাতকে এর অর্থ ও মর্ম নির্ণয়ন, উদঘাটন, শরীয়তের বিধিবিধান আহরণ ও আবিস্কারের কাজে লাগিয়ে দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ'র মর্ম সংরক্ষণ করেছেন। পরিভাষায় এঁদেরকেই বলা হয় মুজতাহিদ ও ফকীহ। এমন মহান জামাতের গুরুত্বকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে দীন ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি ও নির্ভুল অনুধাবন থেকে বঞ্চিত থাকারই নামান্তর।

প্রশ্ন হতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে বলেছেন। কোন ফকীহ বা মুজতাহিদের দারস্থ হতে বলেন নি। উত্তরে বলব, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ঐ হাদীসে আরবী ব্যকরণ, বালাগাত, অভিধান, হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি, হাদীসবিদগণের পরিভাষা, রিজাল শাস্ত্র বা হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনীমূলক গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে পড়ালেখার কথাও বলেন নি। এমনকি কোন তাফসিরবিদ ও হাদীসবিদের দ্বারস্থ হতেও বলেন নি। তাহলে কি এসব ছাড়াই কুরআন-সুন্নাহ বোঝা যাবে এবং তদনুযায়ী আমল করা সম্ভব হবে? যদি বলা হয়, এসবের প্রয়োজনীয়তা

বলার অপেক্ষা রাখে না, তাহলে বলব, মুজতাহিদ ইমামগণের প্রয়োজনীয়তা ও মুখাপেক্ষিতাও একইভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটি আয়াত বা হাদীসেই সবকিছু খুঁজতে চেষ্টা করা আমাদের একটি বড় দোষ। কুরআন-হাদীসের সবটুকু নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মুজতাহিদ ইমামগণের দ্বারস্থ হওয়ার আদেশও আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এখানে দুটি প্রমাণ তুলে ধরা হলো :

এক. একটি প্রমাণ হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. তার ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন গ্রন্থে (১/৮) 'ইসলামের ফকীহগণের ফযীলত ও মর্যাদা' শিরোনামে (فضل فقهاء الإسلام ومنزلتهم) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

القسم الثاني فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه أولو الأمر هم العلماء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء وهو الرواية الثانية عن أحمد. والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء

অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগ হলেন ইসলামের ফকীহবৃন্দ। ঘুরে ফিরে যাদের মতানুসারেই ফতোয়া দেওয়া হয়। যাদেরকে বিধিবিধান আহরণ ও নির্গতকরণের কাজে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে। তারা হালাল-হারামের নীতিমালা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে তারা ঠিক আকাশের তারকারাজির মতোই ছিলেন। যা দেখে অন্ধকারে দিশাহীনরা সঠিক পথের দিশা পায়। মানুষ পানাহারের যতটা না মুখাপেক্ষী, তার চেয়ে ঢেড় বেশি তাদের মুখাপেক্ষী ছিলেন ও আছেন। তাদের আনুগত্য মাতা-পিতার আনুগত্যের চেয়েও বড় ফরজ। এর প্রমাণ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার উলুল আমর'এর আনুগত্য করা। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিবাদ হয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের সমীপে পেশ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে থাক। এটাই সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বাধিক সুন্দর। (নিসা : ৫৯)

এক বর্ণনামতে ইবনে আব্বাস রা., জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা., হাসান বসরী, আবুল আলিয়া, আতা ইবনে আবূ রাবাহ, দাহহাক ও এক বর্ণনামতে মুজাহিদ বলেছেন, (উক্ত আয়াতে উল্লিখিত) 'উলুল আমর' হলেন আলেমগণ। ইমাম আহমাদের একটি মতও অনুরূপ। আবার আবু হুরায়রা রা., অপর বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রা., যায়দ ইবনে আসলাম, সুদ্দী ও মুকাতিল বলেছেন, উলুল আমর তারা, যারা নেতৃত্ব-কতৃত্বের অধিকারী। আহমাদের অপর একটি মতও অনুরূপ। সত্য কথা হলো, নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের কথাও কেবল তখনই মানা যাবে, যখন তারা ইলম ও দ্বীনী জ্ঞানের আলোকে আদেশ দেবেন। সুতরাং তাদের আনুগত্যও আলেমগণের আনুগত্যের অধীন। (দ্র. ১/৮)

দুই. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾

অর্থ, তাদের (মুসলিমদের) একটি গোত্র থেকে একদল লোক কেন (রাসূলের সঙ্গে) বের হয় না? যাতে তারা দীনের সঠিক বুঝ লাভ করতে

পারে এবং ফিরে এসে নিজ গোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করতে পারে। এতে তারাও হয়তো বেঁচে থাকতে পারবে। (তাওবা, ১২২)

এ আয়াতে কিছু লোককে দ্বীনের ফকীহ হতে বলা হয়েছে। নিজ গোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করতে ও দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের আলোকে পরিচালিত করতেও বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে গোত্রের লোকদেরকেও তাদের নির্দেশনা অনুসারে চলতে বলা হয়েছে। সুতরাং কিছু মানুষ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ সমঝ-বুঝ অর্জন করবে, আর কিছু মানুষ তাদের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে জীবন চালাবে– এটাই কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশনা।

একথা বহু হাদীস থেকেও বোঝা যায়, বুখারী শরীফে একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের পূর্বাভাষ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ এলেম তুলে নেবেন আলেমকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। অবশেষে যখন তিনি কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খ ও অজ্ঞদেরকেই অনুসৃত বানিয়ে নেবে। তারা জিজ্ঞাসিত হলে সঠিক এলেম ছাড়াই ফতোয়া দিয়ে বসবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে, অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে। (হা. ১০০)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কিছু মানুষ ফতোয়া দেন, আর কিছু মানুষ তার অনুসরণ করেন। ফতোয়া দানকারীগণ যদি যথানিয়ম অনুসরণ করে পর্যাপ্ত ও সঠিক উপায়ে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে ফতোয়া দিয়ে থাকেন, তবে তারা ও তাদের অনুসারীরা সঠিক পথেই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কিয়ামতের লক্ষণ জাহির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এমন অবস্থাই চলতে থাকবে। পক্ষান্তরে ফতোয়া দানকারীরা যদি এর বিপরীত করেন তবে নিজেরাও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে, সেই সঙ্গে অন্যদের বিচ্যুতিরও কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থাই বিরাজ করবে।

ফকীহগণের বৈশিষ্ট্যাবলী

ক. তারা কুরআন-সুন্নাহর কোনটি মানসুখ (রহিত), কোনটি নাসিখ (রহিতকারী) সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

খ. কোন বিধানটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে খাছ, আর কোনটি উম্মাহর সকল ব্যক্তির জন্য ব্যাপক, তাও তারা ভালভাবে জানতেন।

গ. কুরআন-সুন্নাহ'য় যেসব বিধান এসেছে, সেসবের অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করে সেসব কারণ আরো যেসব বিষয়ে বিদ্যমান, সেসবকেও একই বিধানের আওতাভুক্ত সাব্যস্ত করে তারা দ্বীন-ইসলামকে চলমান ও জীবন্ত ধর্মের রূপে দৃশ্যমান করেছেন। এতে করে হাজার হাজার নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান লাভ করা সহজ হয়েছে। এ মহান কাজটি না হলে দ্বীন-ইসলামকেও অন্যান্য ধর্মের মতো বন্ধ্যাত্ব বরণ করতে হতো।

ঘ. কুরআন-সুন্নাহ থেকে তারা যেমন শরীয়তের নীতিমালা আহরণ ও উদ্ধার করেছেন, তেমনি এক একটি আয়াত ও হাদীস থেকে বহু সমস্যার সমাধান বের করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ'র দালালত ও নির্দেশনা, ইকতিযা ও দাবী এবং ইশারা ও ইঙ্গিত থেকে তারা উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত বহু মাসাইলের সমাধান দিয়ে গেছেন।

ঙ. আয়াত ও হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। এটা আল্লাহ তায়ালারই নিজাম বা সুষ্ঠু পরিচালনা বৈ কি। কুরআন ও হাদীসের হাফেজগণকে দিয়ে তিনি যেমন শব্দ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ফকীহগণের মাধ্যমে মর্ম সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছেন। একথা মুহাদ্দিসীন বা হাদীসবিদগণও স্বীকার করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث অর্থাৎ ফকীহগণ এমনটাই বলেছেন। আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই সবিশেষ জ্ঞাত। (হা. ৯৯০)

এসব কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস অন্বেষণকারী মুহাদ্দিসকে উৎসাহিত করেছেন, কোন হাদীস শুনলে তা এমনভাবে প্রচার কর, যাতে হাদীসটি কোন ফকীহ'র হাতে এসে পৌঁছে। তিনি ইরশাদ করেছেন,

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ঔজ্জ্বল্য দান করুক, যে আমার কথা শুনল, অতঃপর তা স্মরণ রাখল ও পৌঁছে দিল। অনেক ব্যক্তি সমঝদারির কথা তার চেয়ে ফকীহ ও সমঝদার ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়, অনেক সমঝদারি কথার বাহক ফকীহ বা সমঝদার নয় । (আবু দাউদ, হা. ৩০৫৬)

এ হাদীস থেকে যেমন বোঝা গেল, সকল হাদীস বর্ণনাকারী সমঝদারির ক্ষেত্রে সমান নয়, তেমনি বোঝা গেল, সমঝদার ব্যক্তি ঐ হাদীস থেকে যা বুঝবেন অন্যদের উচিৎ হবে তার অনুসরণ করা।

আ'মাশ রহ.এর উক্তি থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। আবু সুলায়মান আ'মাশ ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ ছিলেন। ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বা হাদীসবিদও। বুখারী-মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি জবাব দিতে পারলেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইমাম আবু হানীফা। তিনি অনুমতি নিয়ে জবাব দিলেন। আ'মাশ রহ. বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায় পেয়েছ? আবু হানীফা রহ. বললেন, কেন, আপনিই তো অমুকের সূত্রে অমুক থেকে এ হাদীস আমাকে শুনিয়েছেন! এভাবে তিনি একাধিক সূত্রে আ'মাশের হাদীসগুলো এক মুহূর্তেই তার সামনে তুলে ধরেন। আ'মাশ তখন বললেন, أيها الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة অর্থাৎ ফকীহগণ! তোমরাই চিকিৎসক, আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা। (আবু নুআয়ম, মুসনাদ আবু হানীফা, ১/২২; আল কামিল, ৮/২৩৮)

ঔষধ বিক্রেতারা জানে না, কোন ঔষধ কি কাজে লাগে। এটা ডাক্তার ও চিকিৎসকই বলতে পারেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও তেমনি অনেকে হাদীসটির ধারক-বাহক হন বটে, কিন্তু উক্ত হাদীস থেকে মাসআলার সমাধান বের করা ফকীহগণেরই কাজ।

মুহাদ্দিসগণও ফকীহগণের কদর বুঝতেন

আ'মাশ রহ.এর উপরোক্ত উক্তিটি সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। এতে ফকীহগণের মর্যাদার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে। তার মতো অনেক

সেরা সেরা মুহাদ্দিস ফকীহগণের যথাযোগ্য কদর করতেন। নিম্নে তাদের কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো :

১. ইমাম মালেক বলেছেন, ما كنا نأخذ (أي الحديثَ) إلا من الفقهاء অর্থাৎ আমরা কেবল ফকীহগণের কাছ থেকেই হাদীস গ্রহণ করতাম। (কাজী ইয়ায, তারতীবুল মাদারিক, ১/১২৪)

২. আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী একজন শীর্ষ মুহাদ্দিস। বুখারী-মুসলিমের দাদা উস্তাদ। তিনি বলেছেন, ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها অর্থাৎ আমি যখনই নামায পড়ি তখনই শাফেয়ীর জন্য দুআ করি। (সিয়ারুয যাহাবী, ইমাম শাফেয়ীর জীবনী)

৩. ইমামুল জারহি ওয়াত তাদীল ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাফেজে হাদীস ছিলেন। তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দাদা উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলেছেন, أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ أربع سنين অর্থাৎ আমি চার বছর যাবৎ নামাযে (ইমাম) শাফেয়ীর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি। (প্রাগুক্ত)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ খুরায়বী ছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও বুখারী শরীফের রাবী। তিনি বলতেন,

يجب على أهل الإسلام أن يدعو الله لأبي حنيفة في صلاتهم وذكر حفظه عليهم السنن والفقه

মুসলমানদের কর্তব্য হলো নিজ নিজ নামাযে আল্লাহর নিকট আবু হানীফার জন্য দুআ করা। এ প্রসঙ্গে তিনি (খুরায়বী) মুসলমানদের জন্য তাঁর (আবু হানীফার) সুন্নাহ ও ফেকাহ সংরক্ষণের বিষয়টি তুলে ধরেন। (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৫৯)

৫. ইমাম আহমাদ বলেছেন, وإني لأدعو للشافعي منذ أربعين سنة في الصلاة অর্থাৎ আমি নামাযে চল্লিশ বছর যাবৎ শাফেয়ীর জন্য দুআ করি। (প্রাগুক্ত)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব ছিলেন ইমাম মালেকের বিশিষ্ট ছাত্র ও বড় উঁচু মানের মুহাদ্দিস। তিনি বলেছেন, الحديث مضلة إلا للعلماء ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস শরীফ বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (কাযী ইয়ায, তারতীবুল মাদারিক, ১/৯১)

তিনি আরো বলেছেন, لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت، فقيل له : كيف ذلك؟ قال : أكثرت من الحديث فحيرني فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان لي : خذ هذا ودع هذا. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে মালেক ও লায়ছ (ইবনে সাদ) এর দ্বারা রক্ষা না করতেন, তবে আমি বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি বেশী বেশী হাদীস সংগ্রহ করে (হাদীসের পরস্পর বিরোধিতার কারণে) বেদিশা হয়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে মালেক ও লায়ছের নিকট সেগুলো পেশ করলে তারা বললেন, এটি গ্রহণ কর, আর এটি বর্জন কর। (ইবনে ফারহুন, আদ দীবাজ, ১/৪১৬)

৭. মুহাম্মদ ইবনে ফাদল আল বাযযায বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি ও আহমাদ ইবনে হাম্বল একবার হজ্জে গিয়ে একই স্থানে অবস্থান করেছি। ফজরের নামাযান্তে আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের খোঁজে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার মজলিসে এবং আরো অন্যান্য মুহাদ্দিসের মজলিসে গেলাম। অবশেষে তাকে একজন আরবী যুবকের মজলিসে পেলাম। ভিড় ঠেলে আমি তার নিকট গিয়ে বসলাম, এবং বললাম, আপনি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার মজলিস ছেড়ে এখানে এসে বসেছেন! অথচ তার নিকট যুহরী, আমর ইবনে দীনার ও যিয়াদ ইবনে ইলাকাহ প্রমুখ এমন অসংখ্য তাবিঈর হাদীস রয়েছে, যাদের সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন। একথা শুনে আহমাদ বললেন, اسكت ، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة ، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي ، قلت : من هذا؟ قال : محمد بن إدريس

الشافعي. অর্থাৎ চুপ থাক, যদি উচ্চ সনদের কোন হাদীস তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে নিম্ন সনদে হলেও তুমি তা পেয়ে যাবে। এতে তোমার দ্বীন ও জ্ঞানবুদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু এই যুবকের জ্ঞানবুদ্ধি যদি তোমার হাতছাড়া হয়, তবে আমার আশংকা হয় কিয়ামত পর্যন্ত তা তোমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে এই কুরায়শী যুবকের চেয়ে বেশী সমঝদার আর কাউকে আমি পাই নি। আমি বললাম, ইনি কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী। (আল জারহু ওয়াত তাদীল, আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতিম, ৭/১১৩০)

৮. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. ছিলেন অনেক উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের দাদা উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলেছেন, الحديث مضلة إلا للفقهاء অর্থাৎ ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস শরীফ বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনুল হাজ্জ মালেকী, আল মাদখাল, ১/১২৮) তিনি আরো বলেছেন, التسليم للفقهاء سلامة في الدين অর্থাৎ ফকীহগণের হাতে নিজেকে ন্যাস্ত করাই দ্বীন কে নিরাপদ রাখার নামান্তর। (তারীখে বাগদাদ, ৭/৫৬১)

৯. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. ছিলেন অতি উঁচু মানের মুহাদ্দিস, বুযুর্গ ও মুজতাহিদ। তিনিও ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দাদা উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলেছেন, لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ান (ছাওরী) এর মাধ্যমে রক্ষা না করতেন তবে আমি অন্যান্য মানুষের (মুহাদ্দিসের) মতো হয়ে থাকতাম। (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৫৯)

১০. আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান ছিলেন ইমাম মালেক রহ.এর উস্তাদ ও হযরত আনাস রা.এর শিষ্য। তিনি বলেছেন, وأيم الله إن كنا لنلتقط السنة من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن অর্থাৎ আল্লাহর কসম, আমরা ফকীহ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের কাছ থেকে সুন্নাহ ও হাদীস সংগ্রহ করতাম এবং কুরআনের আয়াতসমূহ যেভাবে শেখা

হয় সেভাবে তা শিখতাম। (ইবনে আব্দুল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/৯৮)

১১. ইবনে আবুয যিনাদ বলেছেন, كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه وإن كان مخرجه من ثقة অর্থাৎ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ফকীহগণকে সমবেত করে সেসব সুন্নাহ ও ফায়সালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন যেগুলো অনুসারে আমল করা হতো। তিনি সেগুলো বহাল রাখতেন। আর যেগুলো অনুসারে মানুষ আমল করত না, সেগুলো বাদ দিতেন, যদিও তা বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে বর্ণিত হোক।

১২. ইমাম আহমাদের উস্তাদ শীর্ষ মুহাদ্দিস আবু আসিম আন নাবীল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বলেছেন, حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم ضحاك بن مخلد فقال لهم : ألا تتفقهون أو ليس فيكم فقيه؟ فجعل يذمهم فقالوا فينا رجل، فقال : من هو؟ فقالوا : الساعة يجيئ، فلما جاء أبي قالوا قد جاء فنظر إليه فقال له تقدم الخ অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণের একটি জামাত আবু আসিম দাহহাক ইবনে মাখলাদের মজলিসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, তোমরা ফেকাহ শিখ না কেন? তোমাদের মধ্যে কি কোন ফকীহ নেই? অতঃপর তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। তারা বললেন, আমাদের মধ্যে একজন আছেন। তিনি বললেন, কে? তারা বললেন, তিনি এখনই আসছেন। একটু পরে আমার পিতা (ইমাম আহমাদ) হাজির হলে তারা বললেন, তিনি এসে গেছেন। তিনি তাকে দেখে বললেন, সামনে চলে আস।...(ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক, ৫/২৯৭)

১৩. যুহায়র ইবনে মুআবিয়া একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তার সম্পর্কে শুআয়ব ইবনে হারব বলেছেন, শো’বা রহ.এর মতো বিশ জনের চেয়েও যুহায়র আমার দৃষ্টিতে বড় হাফেজে হাদীস। মুহাদ্দিস ইমাম আলী ইবনুল জাদ বলেছেন, আমরা যুহায়র ইবনে মুআবিয়ার মজলিসে ছিলাম, এমন সময় একজন লোক আসল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে

আসলেন? লোকটি বলল, আবু হানীফার কাছ থেকে। তখন যুহায়র বললেন, إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوما واحدا أنفع لك من مجيئك إليّ شهرا অর্থাৎ আমার নিকট এক মাস আসার চেয়ে আবু হানীফার নিকট একদিন যাওয়া তোমার জন্য অধিক লাভজনক। (ইবনে আব্দুল বার, আল ইনতিকা, পৃ. ২০৮)

১৪. হুমায়দী ছিলেন ইমাম বুখারীর উস্তাদ। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসটি তার সূত্রেই বর্ণিত। তিনি মুসনাদ নামক একটি হাদীসগ্রন্থের সংকলকও। বর্তমানে এটি মুদ্রিত। তিনি বলেছেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল আমাদের সঙ্গে মক্কা শরীফে অবস্থান করে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার মজলিসে হাজির হতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, এখানে একজন কুরায়শী ব্যক্তি আছেন যার বিশ্লেষণ ও জ্ঞানের পরিধি যথেষ্ট। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফেয়ী। পরে আমি তার মজলিসে গেলাম। অনেক মাসআলা নিয়ে কথা হলো। বের হওয়ার পর আহমাদ বললেন, কেমন পেলেন? আপনি কি চান না একজন কুরায়শী ব্যক্তির এমন জ্ঞান ও বিশ্লেষণ হোক? তার কথা আমার মনে রেখাপাত করল। আমি তার মজলিসে উপস্থিত হতে লাগলাম। একপর্যায়ে সবার চেয়ে অগ্রণী হয়ে গেলাম। আবু বকর ইবনে ইদরীস বলেন, فلم يزل يقدم مجلس الشافعي حتى كان يفوت مجلس سفيان بن عيينة وخرج مع الشافعي إلى مصر অর্থাৎ তিনি এত বেশী পরিমাণে শাফেয়ীর মজলিসে হাজির হতে লাগলেন যে, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নার মজলিসে উপস্থিত হওয়া প্রায় ছুটেই গিয়েছিল। অবশেষে তিনি শাফেয়ী রহ.এর সঙ্গে মিসর চলে গিয়েছিলেন। (ইবনে আবু হাতেম, আল জারহু ওয়াত তাদীল, ৭/১১৩০)

১৫. ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ ছিলেন ইমাম বুখারী ও মুসলিমের বিশিষ্ট উস্তাদ। তিনি বলেছেন, আমরা মক্কা শরীফে ছিলাম। শাফেয়ীও মক্কায় ছিলেন। সেসময় আহমাদ ইবনে হাম্বলও মক্কায় অবস্থান করছিলেন। একদিন আহমাদ আমাকে বললেন, এই ব্যক্তির– অর্থাৎ শাফেয়ীর– সাহচর্য অবলম্বন করুন। আমি বললাম, ما أصنع به سنه قريب

Contents

من سننا ، أترك ابن عيينة والمقرئ؟ قال : ويحك ، إن ذاك لا يفوت وذا يفوت فجالسته অর্থাৎ তাকে দিয়ে আমার কী হবে? তাঁর বয়স আর আমাদের বয়স প্রায় সমান। আমি কি ইবনে উয়ায়না ও মুকরি' (আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ)এর মজলিস ছেড়ে দেব? আহমাদ বললেন, আরে ওটা তো তোমার হাতছাড়া হবে না। আর এটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এরপর থেকে আমি তার সাহচর্য অবলম্বন করি। (প্রাগুক্ত)

এই ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ একসময় ইমাম শাফেয়ীর এতই ভক্ত হলেন যে, তিনি নিজেই বলেছেন, كتبت إلى أحمد بن حنبل وسألته أن يوجه إليّ من كتب الشافعي ما يدخل في حاجتي فوجه إليّ بكتاب الرسالة অর্থাৎ আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট পত্র লিখলাম এবং আরজ করলাম তিনি যেন শাফেয়ীর সেসব কিতাব আমার নিকট প্রেরণ করেন, যা দ্বারা আমার প্রয়োজন মিটে যায়। তিনি আমার নিকট আর-রিসালা কিতাবটি পাঠিয়েছিলেন। (প্রাগুক্ত)

ইসহাক ইবনে রাহুয়ার নিবাস ছিল আফগানিস্তানের পার্শ্ববর্তী মার্ভে। তিনি সেখানে এক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। যার প্রথম স্বামীর নিকট ইমাম শাফেয়ীর অনেক কিতাব ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ নারী সেগুলোর মালিক হয়েছিলেন। বলা হয়, কিতাবগুলোর আকর্ষণই ছিল ইসহাক রহ.এর উক্ত বিবাহের মূল কারণ। (মুকাদ্দিমা মাসাইলে আহমাদ ওয়া ইসহাক, ১/১৪২)

১৬. হিলাল ইবনে খাব্বাব বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, ما علامة هلاك الناس ؟ قال : إذا هلك فقهاءهم هلكوا অর্থাৎ মানুষের ধ্বংস হওয়ার আলামত কী? তিনি বললেন, যখন তাদের ফকীহগণ মৃত্যুবরণ করবে তখন তারাও বরবাদ হয়ে যাবে। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/১৫৪)

হাদীসের হাফেজগণও ফকীহগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন :

শুধু হাদীস জানা ফকীহগণের প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতা মেটাতে ও দূর করতে পারে না। এই কারণে বড় বড় হাফেজে হাদীসগণ শুধু ফকীহগণের কদরই করেন নি, তাদের কাছ থেকে ফিকহের ইলম অর্জন করেছেন, কিংবা তাদের রচিত বইপুস্তক গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন। কিংবা তাদের মতানুসারে ফতোয়া দিয়েছেন। এখানে কয়েকজন হাফেজে হাদীসের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

১. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বড় হাফেজে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দাদা-উস্তাদ এবং ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। তার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। তাঁর সম্পর্কে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, يفتي بقول أبي حنيفة তিনি আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। (কাযী সায়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবুহু, যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৪/ ১২২০; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১/২২৪; ইবনে আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৬৩/৭৬)

২. ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান বড় জবরদস্ত মুহাদ্দিস ও হাফেজে হাদীস। তিনিও ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দাদা-উস্তাদ, আহমাদ, ইবনে মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনীর ন্যায় হাদীসের সমুদ্রতুল্য মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ ছিলেন। তিনি নিজে বলেছেন, لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله আমরা আল্লাহর নিকট মিথ্যা বলব না, আমরা আবু হানীফার মতের চেয়ে উত্তম কোন মতের কথা শুনি নি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতই গ্রহন করেছি। (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৭৩; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৯/৩১২; ইবনে কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ১০/১১৪)

এই ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ সম্পর্কে তারই শিষ্য ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, كان يفتي أيضا بقول أبي حنيفة তিনিও আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। (যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ৪/১২২০)

৩. আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ছিলেন হাদীসের আরেক মহাসাগর। তিনি ইয়াহয়া ইবনে সাঈদের সহপাঠী এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিমের

দাদা-উস্তাদ ছিলেন। তার সম্পর্কে যাহাবী রহ. সিয়ার গ্রন্থে লিখেছেন, كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ فوضع له كتاب الرسالة ইমাম শাফেয়ী যখন যুবক ছিলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী তার নিকট এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, তিনি যেন তার জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে দেন, যে গ্রন্থে থাকবে কুরআনের মর্ম ও বিশ্লেষণ, হাদীসগ্রহণের নিয়মনীতি, ইজমা বা ঐকমত্যের (শরীয়তের দলিল হওয়ার) প্রমাণ ও নাসিখ (রহিতকারী) মানসূখ (রহিত) এর বিবরণ। তার সে আবেদনের প্রেক্ষিতেই তিনি আর রিসালা গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। (সিয়ার, ইমাম শাফেয়ীর জীবনী, ৮/৩৯৪) আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, ثم من بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي كان يذهب مذهبهم ويقتدي بطريقتهم আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী তাদের (মদীনার ফকীহগণের) মাযহাব অবলম্বন করতেন এবং তাদের পথ অনুসরণ করতেন। (ইলাল, পৃ. ৭২)

৪. সুফিয়ান ছাওরী ছিলেন প্রখ্যাত হাফেজে হাদীস ও হাদীসের সম্রাট। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ কাযী বলেছেন, سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة مني সুফিয়ান ছাওরী আমার চেয়ে বেশী আবু হানীফার অনুসারী ছিলেন। (ফাযাইলু আবী হানীফা, লি ইবনে আবুল আওয়াম, নং ১৬২; ইবনে আব্দুল বার, আল ইনতিকা, পৃ. ১৯৮) ওয়াকেদী বলেছেন, كان سفيان الثوري يسألني أن أجيئه بكتب أبي حنيفة لينظر فيها সুফিয়ান ছাওরী আমার নিকট আবেদন করতেন, আমি যেন আবু হানীফার কিতাবগুলো তার কাছে নিয়ে আসি, যাতে তিনি সেগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন। (ইবনে আবুল আওয়াম, ফাযাইল, নং ২৫৮) আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, سفيان الثوري كان يذهب ويفتي بفتواهم সুফিয়ান ছাওরী কুফার ফকীহগণের মাযহাব অনুসরণ করতেন এবং তাদের মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। (ইবনে আবু হাতিম, আল জারহু ওয়াত তাদীল, ১/৫৮)

খ্যাতনামা হাফেজে হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন, كان سفيان يأخذ الفقه عن علي بن مسهر من قول أبي حنيفة وأنه استعان به وبمذاكرته على كتابه هذا الذي سماه الجامع সুফিয়ান (ছাওরী) আবু হানীফার মতাশ্রিত ফিকাহ শিখতেন আলী ইবনে মুসহির (আবু হানীফার বিশিষ্ট শিষ্য ও প্রসিদ্ধ হাদীসবিদ) এর কাছ থেকে। তিনি তার এই গ্রন্থ– যার নাম দিয়েছেন তিনি আল জামে– রচনার সময় আলী ইবনে মুসহিরের ও তার সঙ্গে কৃত মৌখিক আলোচনার সাহায্য নিয়েছেন। (আল্লামা মাসউদ ইবনে শায়বা সিন্ধী, মুকাদ্দিমা কিতাবুত তালীম, তাহাবীকৃত আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবুহু এর বরাতে, ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস, পৃ. ১৮৪-১৮৫)

৫. ইমাম মালেক রহ. ছিলেন মদীনা শরীফের বিখ্যাত হাফেজে হাদীসগণের অন্যতম। ফিকহের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কও ছিল। মদীনাবাসীর আমলও ছিল তার চোখের সামনে। তার সম্পর্কে আব্দুল আযীয দারাওয়ার্দী বলেছেন, كان مالك ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها মালেক আবু হানীফার কিতাবগুলো দেখতেন এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হতেন। (ইবনে আবুল আওয়াম, ফাযাইলে আবী হানীফা, নং ৪৯৫)

৬. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না কুফার অতঃপর মক্কার শীর্ষ হাফেজে হাদীস ছিলেন। তার সম্পর্কে কাযী বিশর ইবনুল ওয়ালীদ বলেছেন, كنا نكون عند ابن عيينة ، فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة يقول : هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال بشر ، فيقول : أجب فيها ، فأجبت فيقول : التسليم للفقهاء سلامة في الدين. অর্থাৎ আমরা ইবনে উয়ায়না'র মজলিসে থাকতাম। কোন জটিল মাসআলা দেখা দিলে তিনি বলতেন, এখানে আবু হানীফার শিষ্য বা শিষ্যের শিষ্য কেউ আছে? বলা হতো বিশর আছে। বলতেন, এর সমাধান দাও। আমি সমাধান দিলে তিনি বলতেন, ফকীহগণের নিকট নিজেকে সমর্পন করাই দ্বীনকে নিরাপদ রাখার নামান্তর। (তারীখে বাগদাদ, ৭/৫৬১)

Contents

৭. ইমাম আহমাদ ছিলেন অন্যতম একজন হাফেজে হাদীস। তিনি ইমাম শাফেয়ী ও তার ফিকহের প্রতি এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি শুধু নিজেই নন, হুমায়দী, ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ ও ইবনে ওয়ারাহ প্রমুখ বড় বড় হাফেজে হাদীসকে ইমাম শাফেয়ীর পাগল বানিয়ে ছেড়েছেন। পেছনে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা গত হয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেছেন, إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام قرشي আমাকে যদি এমন কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে বিষয়ে কোন হাদীস আছে বলে আমি জানি না, তবে আমি শাফেয়ীর মতানুসারে ফতোয়া দিই। কেননা তিনি কুরায়শ বংশীয় ইমাম। (সিয়ার, ৮/৪১৪) ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ বলেন, قال لي أحمد بن حنبل : تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله فأقامني على الشافعي আমাকে আহমাদ ইবনে হাম্বল বললেন, চল, তোমাকে এমন এক লোক দেখাব, তোমার দুচোখ তার মতো কাউকে দেখে নি। এরপর তিনি আমাকে শাফেয়ীর নিকট হাজির করলেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়ায়ম, ৯/৯৭; বায়হাকী, আল মারিফা, নং ৩৭৭)

ইবনে ওয়ারাহ (ইমাম মুসলিমের উস্তাদ) বলেন, قدمت من مصر وأتيت أحمد بن حنبل فقال لي : كتبت كتب الشافعي؟ قلت : لا، قال فرطت ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي قال : فحملني ذلك على الرجوع إلى مصر فكتبتها

আমি মিসর থেকে আসলাম। আহমাদ ইবনে হাম্বলের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, তুমি কি শাফেয়ীর কিতাবগুলো লিখে এনেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি ত্রুটি করেছ। আমরা তো শাফেয়ীর নিকট বসার আগ পর্যন্ত জানতাম না, খাস কাকে বলে, 'আম কাকে বলে, হাদীসের নাসিখ কোনটি, মানসুখ কোনটি। ইবনে ওয়ারা বলেন, তার কথায় আমি পুনরায় মিসর গেলাম, এবং সেগুলো লিখে আনলাম। (যাহাবী, সিয়ার, ৮/৪০০)

৮. ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ ছিলেন ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ। তার সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে বসার পরই তার ভক্ত হন এবং তার ওফাতের পর বলা হয়, انكب على كتبه دراسة يستوعبها তার কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে থাকেন। (মুকাদ্দিমা মাসাইলে আহমাদ ওয়া ইসহাক, ১/১৪২) তিনি মার্ভের এক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন ইমাম শাফেয়ীর কিতাবগুলোর আকর্ষণেই। তদুপরি ইমাম আহমাদকে অনুরোধ করে তার মাধ্যমে ইমাম শাফেয়ীর আর রিসালা গ্রন্থটিও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কুহুস্তানী বলেন,

دخلت يوما على إسحاق فأذن لي وليس عنده أحد فوجدت كتب الشافعي حواليه فقلت : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، فقال لي : والله ما كنت أعلم أن محمد بن إدريس في هذه المحل الذي هو محله ولو علمت لم أفارقه

আমি একবার ইসহাক ইবনে রাহুয়ার নিকট গেলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলে ভেতরে গিয়ে দেখলাম, সেখানে কেউ নেই। দেখলাম, তার চতুর্দিকে ইমাম শাফেয়ীর কিতাবসমূহ। আমি বললাম, যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি, তার পরিবর্তে অন্য কাউকে গ্রেফতার করব– এর থেকে আল্লাহর পানাহ। (এটি সুরা ইউসুফের ৭৯ নং আয়াত, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, আপনি তো এগুলো রাখতে পারেন না। আপনি তো মুহাদ্দিস, আপনার সম্পদ তো হাদীসভাণ্ডার। অনুবাদক) তখন ইসহাক বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জানতাম না মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস (শাফেয়ী) এই মানে পৌঁছে গেছেন, যে মানে তিনি রয়েছেন। যদি জানতাম তবে তার থেকে পৃথক হতাম না। (মুকাদ্দিমা মাসাইলে আহমাদ ওয়া ইসহাক, ১/১৪২)

৯. হুমায়দী ছিলেন মক্কা শরীফের খ্যাতনামা হাফেজে হাদীসগণের অন্যতম। তিনি ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আহমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ইমাম শাফেয়ীর এমনই পাগল হলেন যে, ইমাম শাফেয়ী যখন শেষ জীবনে স্থায়ীভাবে মিসরে চলে যান, তখন তার সঙ্গে

হুমায়দীও চলে গিয়েছিলেন। তার আশা ছিল ইমাম শাফেয়ীর ওফাতের পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন, কিন্তু মিসরে ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট শিষ্য ইবনে আব্দুল হাকামের কারণে তা হয়ে ওঠে নি। (আজমী, মুকাদ্দিমা মুসনাদিল হুমায়দী) যাহাবী রহ. সিয়ারে লিখেছেন, وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي তিনি ইমাম শাফেয়ীর শীর্ষস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে গণ্য। (তাযকিরাতুল হুফফাজ, ২/৩)

১০. ইয়াহয়া ইবনে মাঈন ছিলেন প্রখ্যাত হাফেজে হাদীস। ইমাম আহমাদ ও আলী ইবনুল মাদীনীর সঙ্গে ছিল তার গভীর বন্ধুত্ব। তিনি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আহমাদ সম্পর্কে আবু জাফর বলেছেন, كان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل ইমাম আহমাদ ইয়াহয়া ইবনে মাঈনের সঙ্গে এমন বিনয় ও সম্মানের আচরণ করতেন, যা অন্য কারো সঙ্গে করতে আমি দেখি নি। (যাহাবী, সিয়ার, ৯/৫২২)

এই ইবনে মাঈন সম্পর্কে হাফেজ যাহাবী বলেছেন, كان أبو زكريا حنفيا في الفروع আবু যাকারিয়া (ইয়াহয়া ইবনে মাঈন) ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী ছিলেন। (সিয়ার, ৯/৩৫৯) একই মন্তব্য করেছেন তিনি তার তারীখুল ইসলাম গ্রন্থেও। (দ্র. ৫/৯৫৬)

ইবনে মাঈন বলেছেন, القراءة عندي قراءة حمزة والفقه فقه أبي حنيفة وعلى هذا أدركت الناس হামযার (সাত কারীর একজন) কিরাআতই হলো আমার দৃষ্টিতে কিরাআত, আর আবু হানীফার ফিকাহই হলো ফেকাহ। এ কথার উপরই আমি মানুষকে পেয়েছি। (কাযী সায়মারী, আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবুহু, ১/৮৭; ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ইমাম আবু হানীফার জীবনী)

ইবনে মাঈন যে আবু হানীফার ফিকাহ অনুসরণ করতেন সেটা তার নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও বোঝা যায়। তার শিষ্য ইবনে মুহরিয বলেছেন, سمعت يحيى يقول : ما قرأت خلف إمام قط جهر أو لم يجهر আমি

ইয়াহয়াকে বলতে শুনেছি যে, আমি কখনো ইমামের পেছনে কোরআন পড়ি নি, চাই তিনি সরবে কিরাআত পড়ুন বা নীরবে। (তারীখে ইবনে মাঈন বি রিওয়ায়াতি ইবনে মুহরিয, ১/১৫৬)

১১. হাফেজ আবু যুরআ রাযী ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। হাফেজ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে উমর রাযী বলেছেন, لم يكن في هذه الأمة أحفظ من أبي زرعة الرازي এই উম্মতের মধ্যে আবু যুরআ রাযীর চেয়ে বড় হাফেজে হাদীস ছিল না। তিনি আরো বলেছেন, وحفظ كتب أبي حنيفة في أربعين يوما فكان يسردها مثل الماء তিনি আবু হানীফার কিতাবগুলো চল্লিশ দিনে মুখস্থ করে ফেলেছেন। তিনি সেগুলো পানির মতো মুখস্থ বলে যেতেন। (মিযযী, তাহযীবুল কামাল)

যাহাবী সিয়ার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, قال أبو زرعة وقيل له اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال بل اختيار أحمد وإسحاق (٩/٤٥٢) আবু যুরআকে জিজ্ঞেস করা হলো, আহমাদ ও ইসহাকের মত আপনার কাছে বেশী পছন্দের নাকি শাফেয়ীর মত? তিনি বললেন, আহমাদ ও ইসহাকের মত। (৯/৪৫২)

১২. খতীব বাগদাদী স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেছেন, كان لنا جار من خيار الناس وكان من الحفاظ للحديث আমাদের একজন উত্তম প্রতিবেশী ছিলেন, তিনি হাদীসের হাফেজও ছিলেন। এই প্রতিবেশী তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। একবার তাদের মধ্যে একটু ঝগড়া হলো। ফলে লোকটি বলে ফেললেন, আজ রাতেই যদি তুমি আমার নিকট তালাক চাও, আর আমি তালাক না-ও দিই, তবুও তুমি তিন তালাক। তার স্ত্রীও বলে ফেললেন, আজ রাতে যদি আমি তালাক না চাই, তবে আমার সব গোলাম আজাদ (মুক্ত) ও আমার সব সম্পদ সদকা। এরপর রাতেই তারা আমার নিকট আসলেন। মহিলাটি বললেন, আমি এই বলে ফেলেছি। আর প্রতিবেশী বললেন, আমি এই বলে ফেলেছি। আমি বললাম, আমার কাছে এর কোন সমাধান নেই। চলুন এই শায়খের– অর্থাৎ আবু হানীফার– কাছে যাই। আশা করি তার কাছে

আমরা এর সমাধান পাব। লোকটি আবু হানীফার কিছু বিরূপ সমালোচনা করতেন এবং আবু হানীফার সেকথা জানাও ছিল। তিনি বললেন, আমার লজ্জা বোধ করে। আমি বললাম, আপনি তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তবুও তিনি যেতে চাইলেন না। অবশেষে আমি তাদেরকে নিয়ে ইবনে আবু লায়লা ও সুফিয়ানের নিকট গেলাম। তারা উভয়েই বললেন, এ বিষয়ে আমাদের নিকট কোন সমাধান নেই। পরে আমরা আবু হানীফার কাছেই গেলাম। এবং পুরো ঘটনা খুলে বললাম। আমি তাকে একথাও জানালাম যে, আমরা সুফিয়ান ও ইবনে আবু লায়লার নিকটও গিয়েছিলাম। তারা কোন জবাব দিতে পারেন নি। তিনি (লোকটিকে) বললেন, আপনার সমস্যার সমাধান দেওয়াই আমার কর্তব্য, যদিও আপনি আমার সঙ্গে দুশমনি করতেন। এরপর তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে বলেছেন? স্ত্রীকেও জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে বলেছেন? সবশুনে তিনি বললেন, আপনারা কি আল্লাহর ধরা থেকে নিষ্কৃতি চান এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচতে চান? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি (মহিলাকে) বললেন,

سليه أن يطلقك فقالت طلقني فقال للرجل قل لها أنت طالق ثلاثا إن شئت فقال لها ذلك فقال للمرأة قولي لا أشاء فقال : قد بررتما وخرجتما من طلبة الله لكما

আপনি স্বামীর নিকট তালাক চান। মহিলা বললেন, তুমি আমাকে তালাক দাও। অতঃপর তিনি স্বামীকে বললেন, আপনি বলুন, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে তিন তালাক। তিনি স্ত্রীকে তাই বললেন। তিনি (আবু হানীফা) মহিলাকে বললেন, আপনি বলুন, আমি চাই না। এরপর বললেন, আপনারা শপথ ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা পেলেন এবং আল্লাহর ধরা থেকেও বেঁচে গেলেন।

ওয়াকী রহ. বলেন, فكان الرجل بعد ذلك يدعو لأبي حنيفة في دبر الصلوات وأخبرني أن المرأة تدعو له كلما صلت এরপর থেকে এ ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আবু হানীফার জন্য দুআ করতেন এবং আমাকে

একথাও জানিয়েছেন যে, তার স্ত্রীও যখনই নামায পড়েন তাঁর জন্য দুআ করেন। (আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৯৪)

লক্ষ করুন, এই ব্যক্তি নিজেও হাদীসের হাফেজ ছিলেন। ওয়াকী ও সুফিয়ান ছাওরীও হাদীসের হাফেজ হওয়ার পাশাপাশি উচ্চ মানের ফকীহও ছিলেন। ইবনে আবু লায়লাও ছিলেন কুফার কাযী ও বিচারক। এতদসত্ত্বেও তারা কেউ উক্ত সমস্যার সমাধান দিতে পারেন নি।

ওয়াকীসহ এই বারজন খ্যাতনামা হাফেজে হাদীসের কেউ কোন ফকীহর শিষ্য হয়েছেন, কেউ তাদের রচিত গ্রন্থ সংগ্রহ করে মুখস্থ বা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। কেউ বা কোন ফকীহর মতানুসারে ফতোয়া দিয়েছেন। এছাড়া শত শত মুহাদ্দিস ও হাফেজে হাদীস যারা চার ইমামসহ অন্যান্য ফকীহগণের নিকট ফেকাহ শিখেছেন বা তাদের মাযহাব অবলম্বন করেছেন তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

যদি হাদীস জানা বা মুখস্থ থাকাই যথেষ্ট হতো, তবে এসব হাফেজে হাদীসের জন্য কেন তা যথেষ্ট হলো না? তাদের চেয়ে বড় কোন হাফেজে হাদীসের কথা কি আজ কল্পনা করা যায়?

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন যুগের সবচেয়ে বড় মুজতাহিদ ও ফকীহ

এই এগার নম্বর ঘটনা ও নয় নম্বরে উল্লেখিত ইবনে মাঈনের বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়, ইমাম আবু হানীফা ছিলেন তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় মুজতাহিদ ও ফকীহ। ইমাম শাফেয়ীর একথা তো খুবই প্রসিদ্ধ যে,

الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة

ফিকহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবারতুল্য।

অর্থাৎ পরিবারের লোকজন যেমন কর্তার মুখাপেক্ষী, তেমনি ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষ ইমাম আবু হানীফার মুখাপেক্ষী। ইমাম শাফেয়ী একথাও বলেছেন যে, من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة وكان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه ফিকহের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইবে, সেই আবু হানীফার মুখাপেক্ষী হবে। আবু হানীফাকে ফিকহের জ্ঞান বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল। (ওয়াফায়াতুল আ'য়ান)

প্রখ্যাত হাফেজে হাদীস ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন,

أدركت ألف رجل من الفقهاء وكتبت عن أكثرهم ما رأيت فيهم أفقه وألا أورع ولا أعلم من خمسة : أولهم أبو حنيفة

আমি এক হাজার ফকীহর দেখা পেয়েছি। এবং তাদের অধিকাংশের ইলম লিপিবদ্ধ করেছি। তাদের মধ্যে পাঁচজনের চেয়ে বড় ফকীহ পরহেযগার ও সহনশীল কাউকে পাই নি। তাদের প্রথম হলেন আবু হানীফা। (ইবনে আবুল আওয়াম, ফাযাইল, নং ৩৮)

অপর এক বর্ণনায় আছে, ইয়াযীদ ইবনে হারুনকে জিজ্ঞেস করা হলো, من أفقه من رأيت؟ قال أبو حنيفة আপনি যাদের পেয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ কে? তিনি বললেন, আবু হানীফা। (প্রাগুক্ত, নং ১০৯)

প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনে আইয়াশ বলেছেন, كان النعمان بن ثابت فهما من أفقه أهل زمانه নুমান ইবনে ছাবিত (আবু হানীফা) অত্যন্ত সমঝদার ও যুগের অন্যতম ফকীহ ছিলেন। (প্রাগুক্ত, নং ১০৩)

আবু আসিম আন নাবীল বলেছেন, أبو حنيفة عندي أفقه من سفيان আমার দৃষ্টিতে আবু হানীফা সুফিয়ানের চেয়ে বড় ফকীহ ছিলেন। (প্রাগুক্ত, নং ১০৯)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, إن كان لأحد من هذه الأمة أن يقول بالرأي فهو لأبي حنيفة এ উম্মতের কারো যদি মতামত দেয়ার অধিকার থাকে তবে তা আবু হানীফার রয়েছে। (প্রাগুক্ত, নং ১১৬)

আহমদ ইবনে হারব বলেছেন, كان أبو حنيفة في العلماء كالخليفة في الأمراء। আমীর-উমারাদের মধ্যে খলীফার যে মর্যাদা, আলেমগণের মধ্যে আবু হানীফারও তেমনি মর্যাদা। (প্রাগুক্ত, নং ১১৫)

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة হাদীসের মর্ম সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার চেয়ে বড় জ্ঞানী কাউকে আমি দেখি নি। (প্রাগুক্ত, নং ১২১)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, لا تقولوا رأي أبي حنيفة ولكن قولوا تفسير الحديث তোমরা বলো না আবু হানীফার মত, বরং বলো এটা হাদীসের মর্ম ও ব্যাখ্যা। (প্রাগুক্ত, নং ১৫০)

প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস ঈসা ইবনে ইউনুসও বলেছেন, والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه منه আল্লাহর কসম! আবু হানীফার চেয়ে উত্তম, তার চেয়ে বড় পরহেযগার ও তার চেয়ে বড় ফকীহ কাউকে আমি দেখি নি। (ইবনে আব্দুল বার, আল ইনতিকা, পৃ. ২১২)

ইমাম আবু হানীফাও হাফেজে হাদীস ছিলেন

একজন মুজতাহিদ ফকীহর জন্য অপরিহার্য হলো ন্যূনপক্ষে বিধিবিধান সংক্রান্ত হাদীস ও সুন্নাহর হাফেজ হওয়া। অন্যথায় তিনি সঠিক ফতোয়াও দিতে পারবেন না। সঠিক মাসাইল কুরআন-সুন্নাহ থেকে বের করতেও পারবেন না। ইমাম আবু হানীফাকে মুসলিম উম্মাহর শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ সবচেয়ে বড় ফকীহ আখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি অন্তত বিধানসম্বলিত সুন্নাহর হাফেজ ছিলেন। এ কারণেই হাফেজে হাদীসগণের জীবনীমূলক গ্রন্থগুলোতে ইমাম আবু হানীফার জীবনীও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হাফেজ যাহাবী তার তাযকিরাতুল হুফফাজ গ্রন্থে (১/১৬৮), হাফেজ ইবনে আব্দুল হাদী তার আল মুখতাসার ফী তাবাকাতি উলামাইল হাদীস গ্রন্থে (২/৯৭), হাফেজ ইবনে নাসেরুদ্দীন আত তিবয়ান গ্রন্থে (দ্র. আব্দুর রশীদ নুমানী, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস, পৃ. ৬০), ইমাম ও মুহাদ্দিস ইবনুল মিবরাদ হাম্বলী তার তাবাকাতুল হুফফাজ গ্রন্থে (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১) হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী তার তাবাকাতুল হুফফাজ গ্রন্থে (পৃ. ৮০) ও আল্লামা বাদাখশী তার

তারাজিমুল হুফফাজ গ্রন্থে। (দ্র. মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস,পৃ. ৬২, ৬৩)

উল্লেখ্য, এসব গ্রন্থকারের কেউই হানাফী ছিলেন না। তাই এমন সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই যে, ভক্তির আতিশয্যে তাঁরা এমনটি করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী। হাফেজ যাহাবী তার আল ইবার গ্রন্থে লিখেছেন, وكان من أذكياء بني آدم তিনি ছিলেন আদমসন্তানের মধ্যে বড় বড় মেধাবীদের একজন। (১/১১২)

এমন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী মানুষ সম্পর্কে যখন হাফেজ যাহাবী বলেন, طلب الحديث وأكثر منه في سنة ماءة وبعدها একশ হিজরী ও তার পরবর্তী সময়ে তিনি হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং অনেক হাদীস শিক্ষা করেছেন। (সিয়ার, ৬/৩৯৬) তখন তিনি কী পরিমাণ হাদীস আয়ত্ব করেছেন, তা সহজেই অনুমেয়। যাহাবী আরো লিখেছেন, وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك তিনি হাদীস শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং এজন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। (সিয়ার, ৬/৩৯২)

ইমাম আবু হানীফার সহপাঠী ছিলেন মিসআর ইবনে কিদাম। তিনি এত বড় হাদীসবিদ ছিলেন যে, শো'বা ও সুফিয়ানের মতো হাদীসসম্রাটের মধ্যে হাদীস বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে দুজনই বলতেন, اذهبا بنا إلى الميزان مسعر আমাদেরকে (হাদীসের) মানদণ্ড মিসআরের নিকট নিয়ে চল। (হাফেজ আবু মুহাম্মাদ রামাহুরমুযী, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল, পৃ. ১৩৯)

এই মিসআরই ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বলেছেন,

طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغَلَبَنا وأخذنا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون

আবু হানীফার সঙ্গে হাদীস শিক্ষা করলাম, সে আমাদের উপর অগ্রণী হয়ে গেল। যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতায় লাগলাম, সে আমাদের ছাড়িয়ে গেল।

তার সঙ্গে ফেকাহ শিক্ষা করলাম, এতে তোমরা তে দেখতেই পাচ্ছ সে কেমন বুৎপত্তি অর্জন করেছে। (যাহাবী, মানাকিবু আবী হানীফা, পৃ. ৪৩)

এমনিভাবে ওয়াকী সম্পর্কে ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا তিনি আবু হানীফা থেকে প্রচুর হাদীস শুনেছেন। (ইবনে আব্দুল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/১০৮২)

ইবনে আব্দুল বার আল ইনতিকা গ্রন্থে লিখেছেন, وروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة أحاديث كثيرة আবু হানীফা থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়দ বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (পৃ. ২০১)

যাহাবী বলেছেন, روى عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون তাঁর থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মানাকিব, পৃ. ২০)

হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস সালেহী বলেছেন,

إن الإمام أبا حنيفة من كبار حفاظ الحديث ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه فإنه أول من استنبطه من الأدلة

ইমাম আবু হানীফা একজন শীর্ষ হাফেযে হাদীস। তিনি যদি অধিক হারে হাদীস অর্জন না করতেন, তবে তাঁর পক্ষে ফিকহের মাসাইল আবিস্কার করা সম্ভব হতো না। কুরআন-সুন্নাহ থেকে তিনিই তো প্রথম (মাসাইল) আবিস্কার করেছেন। (উকুদুল জুমান, পৃ. ৩১৯)

মুহাদ্দিস ইসমাঈল আজলূনী লিখেছেন,

فهو رضي الله عنه حافظ حجة فقيه لم يكثر في الرواية لما شدد في شروط الرواية والتحمل وشروط القبول

তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস, প্রামাণ্য ব্যক্তিত্ব ও ফকীহ। তবে হাদীস অর্জন ও বর্ণনার শর্তাবলি ও হাদীস গ্রহণের শর্তাবলির ক্ষেত্রে তিনি কড়াকড়ি করেছেন। ফলে তিনি অধিক হারে হাদীস বর্ণনা করেন নি। (ইকদুল জাওহারিছ ছামীন, পৃ. ৬)

সকল ফকীহরই নির্ভরতা ছিল সহীহ হাদীসের উপর

প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ সকল মুজতাহিদ ফকীহই নির্ভর করেছেন সহীহ হাদীসের উপর। কারণ তাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কর্ম সঠিকভাবে ধরতে পারা। ফলে এ ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের বিকল্প ছিল না। ইমাম আবু হানীফা তাঁর মূলনীতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন,

أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه آخذ بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقبول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدّد رجالا فقوم قد احتجوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا.

আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুসারে আমল করি, যদি সেখানে পাই। অন্যথায় রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ ও তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করি, যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সূত্রে বিশ্বস্তদের হাতে হাতে ছড়িয়ে আছে। যদি কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও না পাই তবে সাহাবীগণের যার মত পছন্দ হয় গ্রহণ করি, যার মত পছন্দ হয় না গ্রহণ করি না। তবে তাঁদের মতের বাইরেও আমি যাই না। আর যখন ইবরাহীম নাখায়ী, শা'বী, হাসান, আতা, ইবনে সীরীন ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব– আরো অনেকের নাম বলেছেন– প্রমুখ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায়, তো তাঁরাও ইজতেহাদ করেছেন, আমিও তাদের মতো ইজতেহাদ করেছি। (আল ইনতিকা, পৃ. ২৬৪, ২৬৫)

সুফিয়ান ছাওরীও ইমাম আবু হানীফার নীতি সম্পর্কে অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেছেন,

يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدرك عليه علماء الكوفة

বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বর্ণনাকৃত যেসব হাদীস তাঁর নিকট সহীহ বলে প্রমাণিত হতো, তিনি সে অনুযায়ী আমল করতেন, আমল করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল অনুযায়ী এবং কুফর আলেমগণকে যেভাবে আমল করতে দেখেছেন, সে অনুযায়ী। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাসান ইবনে সালেহও বলেছেন,

كان النعمان بن ثابت فهما بعلمه متثبتا فيه ، إذا صح عنده الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدُه إلى غيره

নুমান ইবনে ছাবিত (আবু হানীফা) নিজের ইলম সম্পর্কে বোদ্ধা ছিলেন এবং এক্ষেত্রে খুব পাকা ও সুদৃঢ় ছিলেন। তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে তিনি সেটা ছেড়ে অন্য কিছু অবলম্বন করেন না। (ইবনে আবুল আওয়াম, ফাযাইলু আবী হানীফা, নং ১১৯)

হাফেজে হাদীস ঈসা ইবনে ইউনুস বলেছেন, كان النعمان بن ثابت شديد الاتباع لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم নুমান ইবনে ছাবিত (আবু হানীফা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস কঠিনভাবে অনুসরণ করতেন। (প্রাগুক্ত, নং ২৬৭)

একটি ধারণা ও তার খণ্ডন

কেউ কেউ মনে করেন, ইমাম ও ফকীহগণ যদি সকলেই সহীহ হাদীস মেনে চলতেন, তবে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা হত না। অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের মধ্যে মতভিন্নতা হয়েছে।

কিন্তু এমন মনে করাটা সঠিক নয়। এমন ভাসা ভাসা ধারণা কোন সাধারণ মানুষ করলে করতে পারে। কোন আলেমের জন্য, আসবাবে এখতেলাফ বা মতভিন্নতার কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির জন্য এমন ধারণা পোষণ করার সুযোগ নেই। ফকীহ ইমামগণ ও তাদের মতের অনুসারীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যুগে যুগে যারা মাযহাব অনুসরণ না করে সহীহ হাদীস অনুসরণের দাবী করেছেন, তাদের মধ্যেও অসংখ্য মতভিন্নতা দেখা

যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেবের রচিত ‘উম্মাহর ঐক্য পথ ও পন্থা’ পুস্তকটি ৭৪-৭৮ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে। এখানে মোটা মোটা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে :

ক. আলবানী সাহেব বলেছেন, জাহরী নামাযে মুকতাদী সুরা ফাতেহা পাঠ করবে না। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশের লা মাযহাবী ভাইয়েরা বলে থাকেন, জাহরী ও সিররী সব নামাযেই তা পড়তে হবে।

খ. আলবানী সাহেব বলেছেন, সেজদায় যেতে প্রথমে হাত পরে হাঁটু রাখা ফরজ। আসাদুল্লাহ গালিব বলেছেন, সুন্নত। শায়খ বিন বায ও শায়খ উছায়মীন বলেছেন, এমনটা করবে না, বরং সুন্নত হলো আগে হাঁটু রাখা, পরে হাত।

গ. ইমাম বুখারী বলেছেন, রুকু পেলে রাকাত পাওয়া ধর্তব্য হবে না। আমাদের অনেক লা মাযহাবী ভাইও অনুরূপ বলে থাকেন। অপরদিকে শায়খ বিন বায, শায়খ উছায়মীন, আলবানী প্রমুখ বলেছেন, রুকু পেলে রাকাত পাওয়া ধর্তব্য হবে।

ঘ. শাওকানী সাহেব বলেছেন, ইকামত জোড়া জোড়া শব্দে বলা উত্তম। মুবারকপুরী বলেছেন, বেজোড় শব্দে বলা উত্তম।

এ বিষয়গুলো এই গ্রন্থেই বরাত উল্লেখসহ বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

ঙ. শায়খ বিন বায বলেছেন, রুকু থেকে ওঠার পর পুনরায় হাত বাঁধবে। বাকর আবু যায়দ বলেছেন, পুনরায় হাত বাঁধবে না।

সহীহ হাদীস অনুসারে চলার দাবীদার এসব আলেমদের মধ্যে যদি দ্বিমত হতে পারে, তবে মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মধ্যেও দ্বিমত হওয়া স্বাভাবিক। যদিও তাদের প্রত্যেকেরই নীতি ছিল সহীহ হাদীস অনুসারে চলা।

কেউ কেউ বলে থাকেন, ইমামগণের ঐ নীতি ছিল সেই কথা ঠিক। কিন্তু সব সহীহ হাদীস তো তাদের নিকট নাও পৌঁছতে পারে। এমতাবস্থায় তাদের কোন একজনকে অনুসরণ করলে সহীহ হাদীস অনুসারে চলা নাও হয়ে উঠতে পারে। একথাটি একেবারে অমূলক নয়। তবে কোন হাদীসটি ইমামগণের নিকট পৌঁছেছে আর কোনটি পৌঁছে নি সেই ফয়সালা করবে কে? বিশেষ করে যে প্রসিদ্ধ মতভেদপূর্ণ মাসায়েলের

ক্ষেত্রে একথা বলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করা হয় সেসবগুলোতেই দেখা যায়, সহীহ হাদীসগুলো ইমামগণের নিকট পৌঁছেছে। তারা সেগুলো অনুযায়ী আমল করেছেন ও ফতোয়া দিয়েছেন অথবা সেগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করে বিপরীত সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আবু হানীফার কথাই ধরা যাক, বিরোধপূর্ণ প্রসিদ্ধ সব মাসায়েলের পক্ষে তার নিকট সহীহ হাদীস বিদ্যমান ছিল। আবার অন্যরা যেসব সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করেন এবং বলে থাকেন, এই হাদীসগুলো হয়তো তার নিকট পৌঁছে নি, সেগুলোও তার অজানা ছিল না। সেগুলোর অধিকাংশই তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। এর জন্য মুরতাযা হাসান যাবীদী কৃত 'উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা' কিতাবটি দেখা যেতে পারে। আবার এসব মাসায়েলের প্রায় সব কটিতেই তার সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছেন সুফিয়ান ছাওরী। তিরমিযী শরীফ দেখলেই এ তথ্য পাওয়া যাবে। সুফিয়ান তো ছিলেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস– হাদীসের সম্রাট ও মহাসাগর। তার ব্যাপারে তো এই সন্দেহ হওয়ার কথা নয় যে, ঐ সব সহীহ হাদীস তার নিকট পৌঁছে নি। সুতরাং দলিলপ্রমাণ ছাড়া এসব কথা বলে লাভ নেই।

হ্যাঁ, সামগ্রিক বিচারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হানাফী বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ– যাদেরকে আসহাবুত তারজীহ (অগ্রগণ্য আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ) বলা হয়– চিহ্নিত করেছেন যে, সেসব ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার নিকট সহীহ হাদীস পৌঁছে নি। ফলে কোথাও তাঁরা ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম কাযী আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতকে– যা সহীহ হাদীস অনুসারে হওয়া প্রমাণিত– অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন। কোথাও তাঁদের দুজনের কোন একজনের মতকে, কোথাও আবার ইমাম যুফার বা হাসান ইবনে যিয়াদের– এ দুজনও ছিলেন ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শিষ্য– মতকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে আজকে যাদের মাথায় এমন সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে, বহু পূর্বেই হানাফী মনীষীগণ তার গোড়া কেটে দিয়েছেন। ফলে এখন আর এমন সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। অন্যান্য মাযহাব সম্পর্কেও এই একই কথা।

সব সহীহ হাদীসই কি আমলযোগ্য?

প্রকাশ থাকে যে, 'সহীহ' একটি পারিভাষিক শব্দ। মুহাদ্দিসগণ এ শব্দটি বহু অর্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, যখন এটি যঈফের বিপরীত শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এরও রয়েছে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও অনেক শর্ত। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক আলেমও এর সংজ্ঞা ও শর্তের খবর রাখেন না। অথচ সাধারণ মানুষের মুখে একথা তুলে দেওয়া হয়েছে, সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করতে হবে।

কিন্তু এই শেষোক্ত সহীহ'র কথাই যদি ধরি, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সব সহীহ হাদীসই কি আমলযোগ্য? নাকি এর জন্য আরো কোন শর্ত রয়েছে? হ্যাঁ, শর্ত অবশ্যই রয়েছে। যেমন :

১. হাদীসের বিধানটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস না হতে হবে।

২. হাদীসটি মানসুখ বা রহিত না হতে হবে। এ দুটি শর্ত সর্বজনস্বীকৃত।

৩. হাদীসটি অনুসারে সাহাবা, তাবিঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণের আমল থাকতে হবে। আমল না থাকা রহিত হওয়ার আলামত।

ইমাম মালেক রহ. বলেছেন,

كان محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم على القضاء بالمدينة فكان إذا قضى القضاء مخالفا للحديث ورجع إلى منزله قال له أخوه عبد الله بن أبي بكر_ وكان رجلا صالحا_ أي أخي قضيت اليوم في كذا كذا بكذا وكذا؟ فيقول له محمد : نعم أي أخي، فيقول له عبد الله : فأين أنت أي أخي عن الحديث أن تقضي به؟ فيقول محمد : أيهات فأين العمل يعني ما اجتمع عليه من العمل بالمدينة والعمل المجتمع عليه عندهم أقوى من الحديث.

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আমর ইবনে হাযম (তাবিঈ) মদীনার কাযী বা বিচারক ছিলেন। তিনি যখন হাদীসের বিপরীত রায় দিতেন এবং ঘরে ফিরে আসতেন, তার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর–

তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন– তাঁকে বলতেন, ভাইয়া! আজকে আপনি এই এই বিষয়ে এই এই রায় দিয়েছেন, তাই না? তিনি বলতেন, হ্যাঁ, ভাইয়া। আব্দুল্লাহ বলতেন, হাদীস অনুসারে রায় দিলেন না কেন ভাইয়া? মুহাম্মদ তখন বলতেন, তাহলে আমল অর্থাৎ মদীনার সর্বসম্মত আমল কোথায় যাবে? সর্বসম্মত আমল ছিল তাদের নিকট হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী। (তাবাকাতে ইবনে সাদ, ১/২৮২)

ইমাম মালেক বলেছেন, والعمل أثبت من الأحاديث হাদীসের চেয়েও (মদীনায় চালু) আমল অধিক শক্তিশালী। (ইবনে আবু যায়দ আল কায়রাওয়ানী, আল জামে, পৃ. ১১৭)

প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন, السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث পূর্ব থেকে চলে আসা মদীনাবাসীদের আমল হাদীসের চেয়েও উত্তম। (প্রাগুক্ত)

মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তাব্বা ছিলেন ইমাম মালেকের শিষ্য এবং শীর্ষ হাফেজে হাদীস ও ফকীহ। ২২৪ হি. সনে তার ওফাত হয়। তিনি বলেছেন, كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যত হাদীস তোমার নিকট পৌঁছবে এবং তাঁর সাহাবীগণের কেউ তদনুযায়ী আমল করেছেন মর্মে কোন কথা তোমার নিকট পৌঁছবে না সে হাদীসগুলো ছেড়ে দাও। (আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ, ১/১৩২)

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী বলেছেন,

أما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به ، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به

ইমামগণ ও ফকীহ মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীস অনুসরণ করতেন, তা যেখানে পেতেন। তবে শর্ত ছিল হাদীসটি অনুসারে সাহাবীগণের ও

পরবর্তী আলেমগণের বা তাদের কোন এক জামাতের আমল থাকবে। পক্ষান্তরে যে হাদীস অনুসারে তাদের কেউ আমল করেন নি, সে হাদীস অনুসারে আমল করা ঠিক হবে না। কেননা এ অনুযায়ী আমল করা যাবে না– একথা জানেন বলেই তারা এটি ছেড়ে দিয়েছেন। (ফাযলু ইলমিস সালাম আলাল খালাফ, পৃ. ৯)

হাফেজ আবুল কাসেম আদ দারাকী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ৩৭৫ হি. সনে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর নিকট কোন মাসআলা আসলে দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর ফতোয়া দিতেন। অনেক সময় তার প্রদত্ত ফতোয়া ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানীফার মাযহাবের বিপক্ষে যেত। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অমুকের সূত্রে অমুক বর্ণনা করেছেন। আর ঐ দুই ইমামের মত গ্রহণ করার চেয়ে হাদীসটি গ্রহণ করাই তো শ্রেয়। হাফেজ যাহাবী তার একথার উপর মন্তব্য করে লিখেছেন,

قلت هذا جيد لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد فلا.

অর্থাৎ আমি বলব, এটা ভাল। তবে শর্ত হলো এই দুই ইমামের মতো আরো যেসব ইমাম রয়েছেন, তাদের কেউ না কেউ অনুরূপ বলবেন। যেমন, মালেক, সুফিয়ান ও আওযায়ী। আরেকটি শর্ত হলো, হাদীসটি প্রমাণিত হতে হবে,সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আরেকটি শর্ত হলো, আবু হানীফা ও শাফেয়ীর দলিলটি, যা উক্ত হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে, সহীহ হাদীস হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি এমন কোন সহীহ হাদীস গ্রহণ করল, যেটি মুজতাহিদ ইমামগণের কেউ গ্রহণ করেন নি তাহলে সেটা ঠিক হবে না। (যাহাবী, সিয়ার, ১৬/৪০৪)

হাফেজ ইবনুস সালাহও সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করার জন্য তদনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমামের আমল থাকার শর্ত আরোপ করেছেন। (দ্র. আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, ১/১১৮)

ইবনুস সালাহ'র এই বক্তব্য আলবানী সাহেবও তার সিফাতুস সালাহ গ্রন্থের টীকায় উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি, পৃ. ৩১। উক্ত টীকায় ইমাম সুবকির যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমার নিকট হাদীস অনুসরণ করাই উত্তম, সেটি তার ব্যক্তিগত মত। আমার নিকট– কথাটি তাই নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, মুজতাহিদ ইমামের আমল থাকার শর্ত এজন্যই আরেপ করা হয়েছে যে, উক্ত আমল নির্দেশ করে যে, হাদীসটি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারণ কোন হাদীস ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদি ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ধরে নিতে হবে সেখানে ভিন্ন কোন হাদীস ছিল, যা এটির তুলনায় অগ্রগণ্য।

إذا صح الحديث فهو مذهبي হাদীস যদি সহীহ হয় তবে সেটিই আমার মাযহাব– ইমামগণের একথার মর্ম :

কেউ কেউ আবার কোন কোন ইমাম থেকে বর্ণিত, إذا صح الحديث فهو مذهبي কথাটি দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে খুবই ব্যস্ত। একথাটি ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন বলে প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্রে কথাটি পাওয়া যায় নি। যদিও কোন কোন হানাফী আলেম এটি আবু হানীফার বক্তব্য বলে দাবী করেছেন। কথা যার থেকেই প্রমাণিত থাকুক, কথাটি সত্য, এটাই ইমামগণের মনের কথা ও প্রতিষ্ঠিত নীতি। কিন্তু ঘোলা পানিতে মাছ শিকারকারীদের মতলব খারাপ। তার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন,

ক. ঐ কথাটির এমন মর্মও হতে পারে, হাদীস সহীহ হলেই তার ওপর আমি আমার মত ও মাযহাবের ভিত্তি রাখি। এ হিসাবে যত মাসআলার তিনি বা তারা সমাধান দিয়েছেন, সহীহ হাদীস অনুসারেই দিয়েছেন। এ মর্ম গ্রহণ করলে মতলববাজদের মতলব পূরণ হয় না।

খ. যারা ঐ কথাটির এই মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সেটাই আমার মাযহাব বলে গণ্য হবে, তারাও এর সঙ্গে এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, যার কারণে মতলবওয়ালাদের মতলব সিদ্ধি হয় না। যেমন, ইমাম নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) বলেছেন,

وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها ، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به.

অর্থাৎ এ কথাটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি তার মাযহাবে ইজতেহাদের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তবে শর্ত হলো, শাফেয়ী রহ. হাদীসটি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন নি, বা তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি, এ ব্যাপারে তার প্রায় নিশ্চিত জ্ঞান থাকতে হবে। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন তিনি শাফেয়ীর সকল কিতাব, তার শিষ্যগণের কিতাব ও অনুরূপ আরো কিছু অধ্যয়ন করবেন। এটি একটি কঠিন শর্ত যা খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। (আল মাজমু, ১/১০৪)

হাফেজ আবু আমর ইবনুস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হি.) বলেছেন,

وليس هذا بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث

অর্থাৎ এ কাজ অত সহজ নয়। যে কোন ফকীহ এমনটি করতে পারেন না যে, তিনি নিজে যে হাদীসকে প্রামাণ্য জ্ঞান করবেন সে অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আমল করবেন। (আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, ১/১১৮)

হাফেজ আবু শামা রহ. বলেছেন,

ولا يتأتى النهوض بهذا إلا من عالم معلوم الاجتهاد وهو الذي خاطبه الشافعي بقوله : إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت ، وليس هذا لكل أحد الخ

এটা এমন আলেমের কাজ, যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সর্বজনবিদিত। এ ধরনের আলেমকেই শাফেয়ী বলেছিলেন, 'তোমরা যখন আমার মতের বিপরীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পাবে, তখন সেটি গ্রহণ করবে আর আমার মতটি ছেড়ে দেবে।' এটা সকলের জন্য নয়। (আছারুল হাদীস আশ শরীফ, পৃ. ৭০)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) বলেছেন,

إن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي ، أما إذا عرف أنه اطلع عليه وردّه أو تأوله بوجه من الوجوه فلا.

এই ওসিয়তটি মেনে চলার ক্ষেত্র হলো, যখন জানা যাবে শাফেয়ী উক্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি জানা যায়, তিনি তা জানতেন, কিন্তু গ্রহণ করেন নি কিংবা এর কোন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তখন ওসিয়তটি অনুসারে চলা যাবে না। (ফাতহুল বারী, হা. ৭৩৯)

ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী রহ. ইমাম শাফেয়ীর উক্ত কথাটির ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাই রচনা করে ফেলেছেন। সেখানে তিনি হাফেজ ইবনুস সালাহ ও ইমাম নববীর উল্লিখিত বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, هذا تبيين لصعوبة هذا المقام حتى لا يغترّ به كل أحد এই জটিল ক্ষেত্রের এটাই বিশ্লেষণ, যাতে কেউ উক্ত কথার দ্বারা ধোঁকায় না পড়ে। (আছারুল হাদীস আশ শরীফ, পৃ. ৬৮)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলেছেন,

ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها.

একথা কারো অজানা নয় যে, এটা একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য, যিনি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে ও তার মধ্যে কোনটি মানসুখ (রহিত) আর কোনটি মুহকাম (রহিত নয়) সে সম্পর্কে গভীর দৃষ্টির অধিকারী। (১/৬৮)

আল্লামা ইবনে আবেদীন তার ফতোয়া দানের মূলনীতি বিষয়ক 'শারহু উকুদি রাসমিল মুফতী' গ্রন্থেও উপরোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে তিনি আরো একটি শর্ত যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وأقول أيضا : ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب ، إذ لم يأذنوا في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب مما اتفق عليه أئمتنا ، لأن اجتهادهم أقوى من اجتهاده ، فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرجح مما رآه حتى لم يعملوا به.

অর্থাৎ আমি আরো বলছি, ঐ কথাটি এই শর্তে গ্রহণ করতে হবে যে, হাদীসটি যেন হানাফী মাযহাবের কোন একটি কওল বা মতের মোয়াফেক হয়। কেননা আমাদের ইমামগণ যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, সে বিষয়ে মাযহাবের বাইরে ইজতিহাদ করার কোন অনুমতি আলেমগণ দেন নি। কারণ তাদের ইজতিহাদ অবশ্যই ঐ ব্যক্তির ইজতিহাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। সুতরাং এটাই স্পষ্ট যে, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন কোন দলিলপ্রমাণ পেয়েছেন, যা ঐ ব্যক্তির প্রাপ্ত দলিলের চেয়ে মজবুত। ফলে তারা তদনুযায়ী আমল করেছেন। (দ্র. পৃ. ১১৮)

উল্লিখিত শর্তাবলির সারসংক্ষেপ হলো :

১. হাদীসটি ইমামগণের নিকট পৌঁছে নি– এ মর্মে নিশ্চিত জ্ঞান থাকতে হবে। এর জন্য ইমামগণের ও তাদের শিষ্যগণের রচিত গ্রন্থাবলি পরিপূর্ণ অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করতে হবে।

২. যে ব্যক্তি ইমামগণের মত ছেড়ে ঐ সহীহ হাদীস অনুসারে আমল করবেন তাকে মুজতাহিদ পর্যায়ের আলেম হতে হবে।

৩. হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ও তার বড় বড় শিষ্যগণের কারো মতের সঙ্গে হাদীসটি মিলতে হবে।

এসব শর্ত উপেক্ষা করে যে কেউ যদি তার নিজের বিচার-বিবেচনায় কোন সহীহ হাদীসকে কোন ইমামের মাযহাব আখ্যা দিতে যান, তাহলে ইমামগণের প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত মাযহাব মানুষের হাতের খেলনায় পরিণত হবে। একজন একটি সহীহ হাদীস পেয়ে বলবেন, এটাই ইমামগণের মাযহাব। আরেকজন এর বিপরীত আরেকটি সহীহ হাদীস পেয়ে বলবেন, এটাই ইমামগণের মাযহাব। একজন একটি হাদীসকে সহীহ মনে করে ইমামগণের মাযহাব আখ্যা দেবেন। অন্যজনের দৃষ্টিতে হাদীসটি সহীহ না হওয়ায় তিনি বলবেন, না, এটা ইমামগণের মাযহাব নয়। কারণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, অনেক হাদীসের সহীহ হওয়া না হওয়া নিয়ে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যেই দ্বিমত রয়েছে। এমনিভাবে একজন বললেন, এ সহীহ হাদীসই ইমামগণের মাযহাব। আরেকজন বলবেন, আরে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা তো ইমামগণের জানা ছিল। তারা তো এটাকে মানসুখ বা রহিত বলে বিশ্বাস করতেন। তাই এটা তাদের মাযহাব নয়। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের অবস্থা হবে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

একথাগুলো যে শুধু কল্পনাপ্রসূত ও যুক্তিনির্ভর তা নয়, অতীতে বাস্তবেই এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। তাও আবার এমন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা, যারা নিজ নিজ যুগের শীর্ষ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। কয়েকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো :

১. ইবনে আবুল জারুদ– যিনি ইমাম শাফেয়ীর শিষ্য ছিলেন– ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবুল ওয়ালীদ নিশাপুরী দুজনই একটি সহীহ হাদীস পেয়ে দাবী করলেন, এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। কিন্তু হাফেজ ইবনুস সালহ ও ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকী এসে বললেন, এই হাদীস যে সহীহ, ইমাম শাফেয়ী তা জানতেন। কিন্তু তিনি এটাকে মানসুখ বা রহিত মনে করতেন বিধায় এর উপর আমল করেন নি। সুতরাং এটা তার মাযহাব হতে পারে না। (দ্র. আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, ১/১১৮; আছারুল হাদীস আশ শরীফ, পৃ. ৬৮)

২. ইমাম আবু মুহাম্মদ আল জুআয়নী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। ইমাম বায়হাকীর সমসাময়িক ও মুজতাহিদ পর্যায়ের ফকীহ আলেম। তিনি একটি কিতাব প্রকাশ করতে চাইলেন, যেখানে ইমাম

শাফেয়ীর ঐ কথার সূত্র ধরে তাঁর জানামতে অনেক সহীহ হাদীস একত্রিত করলেন এবং দাবী করলেন, এগুলোই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। কিন্তু ইমাম বায়হাকীসহ অনেকে তার দাবী খণ্ডন করে প্রমাণ করেছেন, তিনি যেসব হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্যে অনেকগুলোই এমন রয়েছে যা সহীহ নয়। (দ্র. যাহাবী কৃত, মানাকিবু আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি'র টীকা, পৃ. ৬৩-৬৪)

৩. আবুল হাসান কারাজী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি একটি হাদীসকে সহীহ ভেবে দাবী করলেন, এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। ইমাম তাকিউদ্দীন সুবকীও বেশ কিছুদিন তার কথামত আমল করেছেন। পরে ইমাম সুবকীর ভুল ভাঙল। তিনি আবার পূর্বের আমলের দিকে ফিরে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত পূর্বের আমলের উপরই বহাল ছিলেন। (দ্র. আছারুল হাদীস, পৃ. ৬৮)

৪. আবু শামা আল মাকদিসী ছিলেন ইমাম নববীর উস্তাদ ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী একজন মুজতাহিদ আলেম। তিনি বুখারী শরীফের একটি হাদীস পেয়ে দাবী করলেন, এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব। কিন্তু ইমাম নববী ও তাকিউদ্দীন সুবকী তার দাবী নাকচ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, ইমাম নববী ইমাম শাফেয়ীর মতের পক্ষে বুখারী শরীফেরই অন্য একটি হাদীস ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস পেশ করলেন। (দ্র. আছারুল হাদীস, পৃ. ৭১, ৭২)

লক্ষ করুন, এত বড় বড় বিদ্যাসাগর ও শীর্ষ মুহাদ্দিসগণ যেখানে হোঁচট খেয়েছেন, সেখানে বর্তমানের লোকদের উপর কতটুকু ভরসা রাখা যায়! পূর্ববর্তীদের জ্ঞানভাণ্ডার তো বর্তমানকালের লোকদের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি সমৃদ্ধ ছিল।

যাই হোক, আলোচনা চলছিল ইমামগণের ঐ উক্তিটি নিয়ে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু মানুষ এটাকে হাতিয়ার বানিয়েছে মানুষকে ধোঁকায় ফেলার। তাদের ধোঁকার জাল ছিন্ন করাও 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' রচনার একটি উদ্দেশ্য। যে কয়টি মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণের ঐ উক্তি টেনে আনা হয় এবং মানুষকে ভুল বোঝানো হয়, তার প্রায় সবকটিই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে, প্রতিটি মাসআলাই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও সালাফে সালিহীনের আমল দ্বারা সমৃদ্ধ ও সুসংহত। আল

হামদু লিল্লাহ, এপ্রিল ২০১১ তে প্রকাশ পেয়ে এটি অল্পদিনের মধ্যেই পাঠকমহলে আশাতীত সাড়া জাগাতে পেরেছে। ইতিমধ্যে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেন পর্যন্ত অনেকের হাতেই এটি পৌঁছে গেছে। অনেকে টেলিফোন করে শুকরিয়াও জানিয়েছেন। বিদেশ থেকে কেউ কেউ ফোন করে বলেছেন, উৎসর্গটি পড়ে তারা কেঁদেছেন এবং মরহুম আব্বার জন্য দোয়াও করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এটি ছাপার আয়োজন চলছে।

ভূমিকায় বলেছিলাম, দোস্ত বাকি তো মোলাকাত ভী বাকি– বন্ধু থাকলে সাক্ষাৎও ঘটতে থাকবে। এর মধ্যে দু'একজন বন্ধু এগিয়ে এসেছেন। তাই আমাকেও একটু অগ্রসর হতে হলো। আর তাই এত বড় কলেবরের লেখা। এটি স্বতন্ত্র কোন পুস্তক নয়। দলিলসহ নামাযের মাসায়েল এরই বর্ধিত রূপ মাত্র। এতে একাধিক মাসআলায় কিছু দলিলপ্রমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমাদের দলিলগুলো সম্পর্কে করা আপত্তি-অভিযোগেরও জবাব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্ধুদের দলিল-প্রমাণের কিছু খবর নেওয়া হয়েছে। তাদের কিছু জালিয়াতিরও চিত্র এতে উঠে এসেছে।

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল দ্বিতীয়বার নজর দিয়ে কিছু সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। কিছু নতুন টীকা যোগ করা হয়েছে এবং পূর্বের টীকাগুলোতে কিছু কিছু তথ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরামর্শক্রমে এটির নাম রাখা হয়েছে দলিলসহ নামাযের মাসায়েল বর্ধিত সংস্করণ। এটির সংক্ষিপ্ত রূপটি এখন থেকে দলিলসহ নামাযের মাসায়েলরূপে প্রকাশিত হবে।

এবারের লেখাটির বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব এটি আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ও উপকারী অনেক পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা তার পরামর্শগুলো কাজে লাগিয়েছি। অনেকস্থানে তিনি সংশোধনীও দিয়েছেন। এর জন্য তার মূল্যবান ও ব্যস্ত সময়ের অনেকটা ব্যয় হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে যথাযোগ্য ও আরো বেশী জাযা দিন।

প্রুফ সংশোধনের কিছু কিছু খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন মাওলানা আব্দুল হাকীম ও এ বছরের তাকমীল জামাতের ছাত্র মারূফ, রাওয়াহা ও

মুরশিদ। কম্পিউটার কম্পোজে মাওলানা শিব্বীর আহমদের অসীম ধৈর্য, ঐকান্তিক ও নিরলস চেষ্টা না হলে এটি এত সহজে আলোর মুখ দেখত না। আল্লাহ তায়ালা সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মাকতাবাতুল আযহারের স্বত্বাধিকারী মাওলানা ওবায়দুল্লাহ এর প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে আমাদের জন্য অগ্রসর হওয়া কঠিন হতো। আল্লাহ তাকেও উত্তম জাযা দিন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

ক. বানান প্রসঙ্গে। আমাদের ও বন্ধুদের বানান ও প্রতিবর্ণায়ন রীতি এক নয়। ফলে একই শব্দ আমাদের ও তাদের ব্যবহারে দু'রকম এসেছে। পাঠককে এটা মনে রাখতে হবে। আবার কিছু শব্দের প্রতিবর্ণায়ন দুভাবেই হতে পারে। এমন শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের থেকেও দু'রকম প্রতিবর্ণায়ন ঘটে গেছে। বিভিন্ন সময় লেখার কারণেও এমনটি ঘটেছে।

খ. বরাত উল্লেখ প্রসঙ্গে। অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই জানেন যে, কিছু কিছু হাদীস গ্রন্থের হাদীসনম্বর বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্নরকম এসেছে। সাধারণত আমরা সরাসরি হাদীসগ্রন্থ দেখেই নম্বর উল্লেখ করেছি। কিন্তু কোথাও কোথাও কম্পিউটারে রক্ষিত 'শামেলা ৬০০০' থেকেও কিছু নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। কোন এক নম্বরে হাদীসটি খুঁজে না পেলে হতাশ না হয়ে অন্য সংস্করণের নম্বরে খুঁজে দেখতে পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল।

আব্দুল মতিন

৩০.৫.২০১৫

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ইকামতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

ইকামতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা সুন্নত

জোড় শব্দে ইকামত দেওয়ার দলিল

১. হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আবী লায়লা র. বলেন–

حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلاَلٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف(٢١٣١)

واخرجه الطحاوى ١/١٠٠-١٠٢ و ابن خزيمة فى صحيحه ٣٨٠ والبيهقى ١/٤٢٠ من طريق ابن ابى شيبة. قال ابن حزم الظاهرى : هذا اسناد فى غاية الصحة. وقال المارديني فى الجوهر النقى : رجاله على شرط الصحيح.

অর্থ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারী রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি যার পরনে ছিল সবুজ রং এর

চাদর ও লুঙ্গি, যেন দেয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন এবং ইকামতও দিলেন জোড়া জোড়া শব্দে। আর কিছুক্ষণ (মাঝখানে) বসে রইলেন। তিনি বলেন, পরে বিলাল রা. তা শুনলেন এবং তিনিও জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন এবং জোড়া জোড়া শব্দে ইকামত দিলেন। আর (আযান ও ইকামতের মাঝখানে) একটু বসলেন।

ইবনে আবী শায়বা র. আল মুসান্নাফ, হাদীস নং (২১৩১) তাহাবী. ১/৪২০ সহীহ ইবনে খুযাইমা হা.৩৮০ সুনানে কুবরা, বাইহাকী ১/৪২০

ইবনে হায্‌ম রহ. বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সর্বোচ্চ মানের সহীহ। আলাউদ্দীন মারদীনী র. বলেছেন–এটি সহীহ হাদীসের মানোত্তীর্ণ।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রা. থেকে বর্ণিত–

قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه و سلم شَفْعًا شَفْعًا في الأذان والإقامة. رواه الترمذى–١٩٤.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযান ও ইকামত ছিল জোড়া জোড়া শব্দে। তিরমিযী, হা.১৯৪

৩. আব্দুর রাহমান ইবনে আবী লায়লা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْفَعُ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ. رواه ابن ابى شيبة فى المصنف رقم ٢١٥١

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযি্‌যন আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারী রা. আযান ও ইকামত জোড়া জোড়া শব্দে দিতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং (২১৫১)

৪. ইবনে আবী লায়লা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً قَائِمًا عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، رواه ابن ابى شيبة فى المصنف رقم– ٢١٣٧ وابو داود رقم ٥٠٦ كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به.

অর্থ: আমাদের উস্তাদগণ (সাহাবীগণ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আনসার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতকাল যখন আমি ফিরে গেলাম এবং আপনার পেরেশানী দেখলাম, তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন লোক যেন মসজিদে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরিধানে ছিল সবুজ রং এর দুটি কাপড়। তিনি আযান দিলেন। পরে একটু বসলেন। অতঃপর আবার দাঁড়ালেন এবং আগের মতোই বললেন। শুধু এবার ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ বাড়িয়ে বললেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৩৭; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫০৬।

৫. আবু মাহযূরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اخرجه الترمذى رقم– ١٩٢ والطيالسى رقم ١٣٥٤ والدارمى ١١٩٦، ١١٩٧ والنسائى ٦٣٠

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের কালিমা ১৯ টি ও ইকামতের কালিমা ১৭ টি শিখিয়েছেন। তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২; আবূ দাউদ তায়ালিসী, হাদীস নং ১৩৫৪; দারিমী, হাদীস নং ১১৯৬, ১৯৯৭; নাসাঈ, হাদীস নং ৬৩০। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ ।

৬. আবূ মাহযূরা রা. বলেন–

عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَة سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الأَذَانُ : . . . . وَالإِقَامَةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.اخرجه ابن ابى

شيبة رقم- ٢١٣٢ وابو داود رقم ٥٠٢ كلاهما من طريق همام عن عامر الاحول. وفى طريق لابى داود وعلمنى الاقامة مرتين.رقم٥٠١

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের কালিমা শিখিয়েছেন ১৯ টি[১], আর ইকামতের কালিমা শিখিয়েছেন ১৭ টি। আযানের কালিমাগুলি হলো ..., আর ইকামতের কালিমাগুলি হলো– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হায়্যা আলাস্ সালাহ, হায়্যা আলাস্ সালাহ, হায়্যা আলাল্ ফালাহ, হায়্যা আলাল্ ফালাহ, কাদ্ কামাতিস্ সালাহ, কাদ্ কামাতিস্ সালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৩২; আবূদাউদ, হাদীস নং ৫০২। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফেও উদ্ধৃত হয়েছে। তবে সেখানে ইকামতের উল্লেখ আসে নি। আর আযানের কালিমাগুলোর মধ্যে শুরুতে আল্লাহু আকবার চারবারের স্থানে দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনাকারীর সংক্ষেপায়নের কারণে এমনটি ঘটেছে। (দ্র. মুসলিম শরীফ, হাদীস : ৩৭৯)

আবূ দাউদ শরীফের আরেকটি বর্ণনায় আছে- আবু মাহযূরা রা. বলেন, আমাকে ইকামতের কালিমা দু‘বার করে বলা শিখিয়েছেন। (হাদীস নং ৫০১)

৭. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. থেকে বর্ণিত আছে যে,

أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة.اخرجه عبد الرزاق ١/٤٦٢ والطحاوى ١/١٠٢ والدارقطنى ١/٢٤٢ كلهم عن معمر عن حماد عن

[১] উনিশটি কালিমার মধ্যে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ প্রথম দুবার দুবার করে একটু আস্তে বলে পুনরায় দুবার দুবার করে জোরে বলবে। এটাকে তারজী’ বলা হয়। একবার সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন আযান দিয়েছিলেন। আবু মাহযূরা রা. তার সঙ্গীদের সামনে ব্যঙ্গ করে ঐ আযান নকল করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে বলেছিলেন, কিভাবে আযান দিয়েছিলে বল। তিনি যেহেতু তখনও কাফির ছিলেন, তাই শাহাদাতের কালিমা দুটি আস্তে আস্তে বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, পুনরায় বল। তিনি পুনরায় বললেন। এভাবে আযানের কালিমা ১৯টি হয়ে গেছে। চারবার করে বলা যেহেতু তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল, তাই তিনি মক্কা শরীফে সেভাবেই আযান দিয়েছিলেন।

إبراهيم عنه.واخرجه عبد الرزاق ايضارقم– ١٧٩١ عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال كان أذانه وإقامته مرتين مرتين. قال المارديني فى الجوهر النقى:هذا سند جيد.

অর্থ: বিলাল রা. আযান (এর কালিমাগুলি) দু'বার করে বলতেন, ইকামতও দু'বার করে বলতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ১ খ, ৪৬২পৃ; তাহাবী, ১ খ, ১০২ পৃ;।

আব্দুর রায্যাক অন্য একটি সনদে আসওয়াদ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিলাল রা. আযান ও ইকামত দুবার দুবার করে বলতেন। (দ্র. ১/ ৪৬৩) আল্লামা মারদীনী র. বলেছেন–এটি একটি উত্তম সনদ।

৮. সুওয়ায়দ ইবনে গাফালা বলেন,

سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى اخرجه الطحاوى ١٠١/١

অর্থঃ আমি বিলাল রা. কে আযান ও ইকামত দুবার দুবার করে বলতে শুনেছি। তাহাবী, ১/১০১[১]

৯. হযরত আবূ জুহায়ফা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে,

ان بلالا كان يؤذن للنبى صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. اخرجه الطبرانى فى الكبير ١٩٢/٩ والدارقطنى ٢٤٢/١ وفى اسناده زياد بن عبد الله البكائى مختلف فيه واحتج به مسلم.

---

[১] কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এই বর্ণনাটি ও পূর্ববর্ণিত আসওয়াদের বর্ণনাটি সূত্রবিচ্ছিন্ন। কারণ, হযরত বিলাল রা. নবীজী স.এর ওফাতের পরপরই শামে চলে গেছেন। এদিকে আসওয়াদ ও সুওয়ায়দ নবীজীর জীবদ্দশায় মদীনা শরীফে আসেন নি। বোঝা গেল, তারা অন্য কারো সূত্রে এটা শুনেছেন। যেহেতু সেই সূত্রের উল্লেখ নেই, তাই এটি বিচ্ছিন্ন ও যঈফ। আমরা বলব, হযরত বিলাল রা. কখন শামে গেছেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। একটি মত এও রয়েছে যে, উমর রা. এর খিলাফতকাল শুরু হওয়ার কিছুদিন পর তিনি শামে চলে গিয়েছিলেন। (দ্র. ইবনে সাদ, আত তাবাকাত, ৭/২৭০; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ১/২৪৪) সুওয়ায়দের এ হাদীসও প্রমাণ করে, বিলাল রা. উমর রা.এর আমলেই গিয়েছিলেন। কেননা এতে বিলাল রা. থেকে সুওয়ায়দের সরাসরি শোনার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ হিসাবে এ দুটি বর্ণনার সূত্র বিচ্ছিন্ন নয়।

অর্থ: বিলাল রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আযান দিতেন জোড় শব্দে, ইকামতও দিতেন জোড় শব্দে। তাবারানী, ৯/১৯২ দারাকুতনী, ১/২৪২

১০. হাজান্না ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ ، وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ : أَلاَ جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لاَ أُمَّ لِلآخَرِ. اخرجه ابن ابى شيبة رقم– ٢١٤٩

অর্থ: আলী রা. বলতেন, আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করে বলতে হবে। তিনি একজন মুয়াযযিনকে একবার একবার করে ইকামত বলতে শুনলেন। এবং তাকে বললেন, দুবার করে বললে না কেন? হতভাগ্যের মা না থাক্। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৪৯।

১১. উবায়দ র. বলেন,

ان سلمة كان يثنى الاقامة . اخرجه الطحاوى ١/١٠٢

অর্থ: সালামা (ইবনুল আক্ওয়া) রা. ইকামতের শব্দগুলো দুবার করে বলতেন। তাহাবী, ১/১০২

১২. আবূ ইসহাক র. বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ.

اخرجه ابن ابى شيبة رقم– ٢١٥٤

অর্থ: হযরত আলী রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্উদ রা. দুজনের শিষ্যগণ আযান ও ইকামতের বাক্যগুলি দুবার দুবার করে বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৫৪।

১৩. মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত,

ذكر له الإقامة مرة مرة فقال هذا شيء قد استخفته الأمراء الإقامة مرتين مرتين.رواه عبد الرزاق فى المصنف رقم–١٧٩٣

অর্থ: তার নিকট ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলে তিনি বললেন, শাসকরা (বনি উমায়্যার) এটা হাল্কা

করেছে। ইকামতের শব্দগুলো হবে দুবার করে। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ১/৪৬৩; তাহাবী, ১/১০১

১৪. ইবরাহীম নাখায়ী রা. বলেন,

لاَ تَدَعْ أَنْ تُثَنِّيَ الإِقَامَةَ. اخرجه ابن ابى شيبة رقم– ٢١٥٣ والإمام محمد فى كتاب الحجة على اهل المدينة ص.٢٢

অর্থ: আযান ও ইকামতের শব্দগুলো দুবার দুবার করে বলতে ছাড়বে না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২১৫৩; ইমাম মুহাম্মাদ কৃত কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা, পৃ. ২২।

বেজোড় ইকামত সম্পর্কে আনাস রা. বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যা :

ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে পড়ার ব্যাপারে একটি মাত্র সহীহ হাদীস আছে বুখারী, মুসলিম সহ অনেক হাদীসের কিতাবে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস রা.। তিনি বলেছেন:

امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة

অর্থাৎ বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আযানের বাক্যগুলো জোড় বলতে, আর ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় বলতে। হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায়– ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলতে হবে।

আলেমগণ পূর্বের হাদীসগুলির কারণে এ হাদীসটির দুটি ব্যাখ্যা করেছেন:

এক. যারা এ হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ অনুসারে আমল করেন তারা সকলে শুরু ও শেষে আল্লাহু আকবার দুবার করেই বলেন। এতো জোড় সংখ্যা। ইমাম নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই সমস্যার সমাধানে বলেছেন, যেহেতু আল্লাহু আকবার দুবার বললেও এক নিঃশ্বাসে বলা হয় তাই এটাকে একবারের অর্থেই ধরা হবে। জোড় ধরা হবে না। হানাফী আলেমগণ বলেন, বোঝা গেল অন্যান্য বাক্যগুলোও যদি এক নিঃশ্বাসে পড়া হয় তবে দুবার করে পড়লেও একবারই ধরা হবে, জোড় ধরা হবে না। তাই তাঁরা বলেছেন, সুন্নাত হলো প্রথম চার বার আল্লাহু

আকবার এক নিঃশ্বাসে পড়বে। যাতে বিলাল রা. এর এ হাদীস অনুসারেও আমল হয়ে যায়।

দুই. এ হাদীসে যে একবার করে বলতে বলা হয়েছে, এটি পূর্বে ছিল। পরবর্তীকালে এ আদেশটি রহিত হয়ে গেছে। যার প্রমাণ পূর্ববর্তী হাদীসগুলো। ইমাম তাহাবী র. বলেছেন:

ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعلم أن ذلك هو ما أمر به.

অর্থাৎ পরবর্তীতে বিলাল রা. ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করেই বলতেন; যা বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বোঝা গেল তিনি পরে এই নিয়ম অনুসরণের জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন।

খোদ আল্লামা শাওকানী র. –যিনি নিজেও লা-মায্হাবী ছিলেন– আবূ মাহযূরা রা. এর হাদীসের ভিত্তিতে বিলাল রা. এর একবার বলার আমলকে মানসূখ বা রহিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নায়লুল আওতারে তিনি লিখেছেন-

وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح وبلال أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخا . وقد روى أبو الشيخ (أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثَمَّ مرتين مرتين وأقام مثل ذلك) إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها لما أسلفناه وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك .

অর্থাৎ একবার বলার আদেশ সম্বলিত বিলাল রা. এর হাদীসটির পরে হলো আবূ মাহযূরা রা. এর এ হাদীস। কারণ এটি মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। আবূ মাহযূরা রা. তো মক্কা বিজয় কালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবুশ্ শায়খ র. বর্ণনা করেছেন যে, বিলাল রা. মিনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করে বলেছেন।

এ আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করে বলার হাদীসগুলো প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার উপযুক্ত। আর একবার করে বলার হাদীসগুলো যদিও অধিক সনদে ও বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হওয়ার কারণে অধিক সহীহ, কিন্তু দুবার বলার হাদীসগুলোতে বাড়তি বিষয় রয়েছে, আর এগুলো পরবর্তী কালের বিধান সম্বলিত।এসব কারণে এগুলো অনুসারে আমল করাই উচিত।[১] নায়লুল আওতার ২/২২

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই। ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলা হবে না দুবার করে, এ নিয়ে ফকীহ ইমামগণের মধ্যেও দ্বিমত ছিল। কিন্তু ঝগড়া ছিল না। বরং ইমাম ইবনু আব্দিল বার র. উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, দাউদ যাহেরী ও ইবনে জারীর তাবারী র. প্রমুখ এ এখতেলাফকে মুবাহ এখতেলাফ আখ্যা দিয়েছেন, এবং বলেছেন যেভাবেই করুক জায়েয হবে। এমনকি লা-মাযহাবী আলেম তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার মুবারকপুরী সাহেবও লিখেছেন,

ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو القول الراجح المعمول عليه بل هو المتعين عندي.

---

[১] ইন্টারনেটে কোন কোন বন্ধু– সম্ভবত তিনি মুযাফফর বিন মুহসিনই হবেন– আমাদের এ মাসআলাটির উত্তর দিতে গিয়ে শাওকানী সাহেবের এ বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, 'প্রকৃতপক্ষে উক্ত উপস্থাপনাটি ইমাম শওকানীর (রহ) নিজস্ব কথা নয়। বরং আলেমদের মধ্যকার বিতর্কগুলো তুলে ধরার ধারাবাহিকতায় উক্ত আলোচনাটি এসেছে।'

এটা মন্তব্যকারীর স্পষ্ট জালিয়াতি। আমরা পুনরায় শওকানীর নায়লুল আওতার বের করে দেখেছি। তিনি শুধু এতটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হননি, বরং এ বক্তব্যের উপর উত্থাপিত সকল প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাবও প্রদান করেছেন হাদীসের আলোকে। মুযাফফর বিন মুহসিন আরবী ভাল বোঝেন না, সে কথা আমরা পরবর্তী অনেক মাসআলার পরিশিষ্টে তুলে ধরেছি। এখানে তিনি না বুঝেও এমন কথা লিখতে পারেন।

একবার করে বলা বা দুবার করে বলা উভয়টিই জায়েয বলে আহমাদ ও ইসহাক ইবনে রাহূয়াহ যে মত অবলম্বন করেছেন সেটিই অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য মত। এমনকি আমার দৃষ্টিতে সেটিই সুনিশ্চিত।

বেজোড় ইকামতের আরো কতিপয় হাদীস ও সেগুলোর মান :

১. ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদীস। এটি উদ্ধৃত করেছেন আবূ দাউদ, হা. ৫১০; নাসাঈ, হা. ৬২৮, ৬৬৮; ইবনে খুযায়মা, হা. ৩৭৪। এর একজন রাবী আবূ জাফর আল মুয়াযযিন এর নাম ও বংশ পরিচয় নিয়ে মুহাদ্দিসগণের প্রচণ্ড দ্বিমত রয়েছে। তার বিশ্বস্ততা নিয়েও রয়েছে দ্বিমত। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে আদী তার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নি। যারা তার বিশ্বস্ততার পক্ষে, তারাও তাকে উচ্চ মানসম্পন্ন রাবী মনে করতেন না। তাছাড়া ইবনে হিব্বান ও ইবনে হাজারের মতে তিনি ভুলেরও শিকার হতেন। এ হাদীসের আরেক রাবী আবুল মুছান্না মুসলিম ইবনুল মুছান্না। তার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান বলেছেন, ربما وهم في الشيء بعد الشيء على ابن عمر তিনি মাঝেমধ্যে ইবনে উমর রা.এর হাদীসে ভুল করতেন। সুতরাং এ হাদীসকে বড় জোর হাসান বলা যায়, সহীহ বলার সুযোগ নেই। কেউ কেউ তো যঈফও মনে করতেন।

২. আবু রাফে রা. বর্ণিত হাদীস। এটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ, হা. ৭৩২; দারাকুতনী, হা. ৯৩৪। এটি সকলের মতেই যঈফ। কারণ এর দুজন রাবী মা'মার ইবনে মুহাম্মাদ ও তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ মুহাদ্দিসগণের নিকট চরম দুর্বল।

৩. আম্মার ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীস। এটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে মাজাহ, হা. ৭৩১ ও তাবারানী মু'জামে কাবীরে, ৬/৩৯। এটিও সকলের মতে জঈফ। কারণ এতে দুজন যঈফ রাবী আছেন। এক. আব্দুর রহমান ইবনে সাদ, দুই. সাদ ইবনে আম্মার।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নামাযে কব্জির উপর হাত বেঁধে নাভির নীচে রাখা সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

নামাযে কব্জির উপর হাত বেঁধে নাভির নীচে রাখা সুন্নত

নামাযে বাম কব্জির উপর ডান হাত রেখে দু'আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরা সুন্নত। একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা এ আমল প্রমাণিত । চার মাযহাবের সকল ইমাম ও আলেম এটাকেই সুন্নত পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কনুই পর্যন্ত হাত রাখার পক্ষে কোন হাদীস নেই। পূর্বসূরিগণের কারো আমলও নেই। এমনিভাবে নাভির নীচে হাত রাখা সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. দুজনই এটাকে সুন্নত বলেছেন। ইমাম মালেক রহ. এর মত হলো, ফরজ নামাযে হাত ছেড়ে রাখা সুন্নত। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, বুকের নীচে হাত বাঁধা সুন্নত।

বুকের উপর হাত বাঁধাকে চার ইমামের কেউই সুন্নত বলেননি। কোন মুহাদ্দিস বুকের উপর হাত বেঁধেছেন এমন তথ্যও পাওয়া যায়নি। এমনকি কোন মুহাদ্দিস এ সম্পর্কে কোন শিরোনামও উল্লেখ করেন নি। এসম্পর্কে যে হাদীসটি পেশ করা হয় সেটি সহীহ নয়। এ আলোচনার শেষ দিকে সেটি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা আসছে। এখানে প্রথমত হাত বাঁধার পদ্ধতি সম্পর্কিত সহীহ হাদীসগুলো পেশ করা হচ্ছে। অতঃপর নাভির নীচে হাত রাখা সম্পর্কে হাদীসগুলো তুলে ধরা হচ্ছে।

হাত বাঁধার নিয়ম সম্পর্কিত হাদীস

১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. صحيح البخاري (٧٤٠)، موطا مالك برواية أبي مصعب الزهري (٤٢٦)، مسند أحمد (٢٢٨٤٩)، مستخرج أبي عوانة (١٥٩٧)، الطبراني في الكبير (٥٧٧٢)، البيهقي (٢٣٢٦)، البغوي في شرح السنة (٥٦٨)، الأوسط لابن المنذر (١٢٨٦).

অর্থ : মানুষকে এই আদেশ দেওয়া হতো যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৪০; মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ৪২৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২২৮৪৯; মুসতাখরাজে আবী আওয়ানা, হাদীস নং ১৫৯৭; তাবারানী ফিল কাবীর, হাদীস নং ৫৭৭২; বায়হাকী, হাদীস নং ২৩২৬; শারহুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৫৬৮; আওসাত লিইবনিল মুনযির, হাদীস নং ১২৮৬।

২. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَيْفَ يُصَلِّى فنظرت إليه فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ. أخرجه أبو داود (٧٢٧) والنسائي (٨٨٩) واللفظ له وأحمد ٤/٣١٨ وابن خزيمة (٤٨٠) وابن حبان (١٨٦٠) وابن الجارود في المنتقى (٢٠٨) والبيهقي في السنن (٢/٢٧) بإسناد صحيح.

অর্থ: আমি (মনে মনে) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তা আমি লক্ষ্য করবো। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত কান বরাবর তুললেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন।

আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭২৭; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ৮৮৯; মুসনাদে আহমদ ৪খ, ৩১৮পৃ; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৪৮০; ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৮৬০; আলমুনতাকা লিইবনিল জারূদ, হাদীস নং ২০৮ ও বায়হাকী ২খ. ২৭ পৃ.। এ হাদীসটি সহীহ।

ইবনে খুযায়মা র. উক্ত হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন,

باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد جميعا

অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহু সবগুলোর উপর রাখবে।

একইভাবে ইবনুল মুনযির রহ. তার আল আওসাত গ্রন্থে শিরোনাম দিয়েছেন,

ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا

অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠ কব্জি ও কব্জিসংলগ্ন বাহুর উপর রাখার আলোচনা।

وعند الدارمي ٢٨٣/١ بإسناد صحيح في حديث وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَرِيباً مِنَ الرُّصْغِ .

অর্থাৎ দারিমী র. এর এক বর্ণনায় সহীহ সনদে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাত বাম হাতের কব্জির কাছাকাছি রাখতে দেখেছি। সুনানে দারিমী, ১খ, ২৮৩পৃ।

আবূ দাউদ শরীফের আরেক বর্ণনায় আছে,

ثم أخذ شماله بيمينه

অর্থাৎ অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭২৬; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৮৮৫০; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১২৬৫; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ৪৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১৯৪৫; মুজামে কাবীর লিত তাবারানী, ২২/৩৩; সুনানে বায়হাকী, হাদীস ২৫১৬।

৩. হযরত হুলব আততাঈ রা. বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. أخرجه الترمذي (٢٥٢) وابن ماجه (٨٠٩) وابن أبي شيبة (٣٩٥٥) والدارقطني ٢٨٥/١ وقال الترمذي: حديث حسن.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরতেন। তিরমিযী শরীফ,

হাদীস নং ২৫২; তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান। ইবনে মাজা, হাদীস নং ৮০৯; ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৫৫।

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে, বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার বিবরণ দিতে গিয়ে ইয়াহইয়া র. ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখেছেন।

৪. হযরত ওয়াইল রা. বর্ণনা করেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. أخرجه النسائي رقم ٨٨٧ ، والدارقطني رقم ١١٠٤. وقال الألباني : صحيح الإسناد.

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন ডান হাত দিয়ে বাম হাত চেপে ধরতেন। নাসাঈ, হাদীস নং ৮৮৭, দারাকুতনী, হাদীস নং ১১০৪। আলবানী বলেছেন, সনদ সহীহ।

৫. হযরত শাদ্দাদ ইবনে শুরাহবীল রা. বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يده اليمنى على يده اليسرى قابضا عليها يعني في الصلاة . رواه البزار والطبراني .ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٢٥ وقال: وفيه عباس بن يونس ولم أجد من ذكره[1]

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত দিয়ে বাম হাত চেপে ধরে আছেন।

---

[1] قلت : عباس تصحيف وغلط وإنما هو عياش بن يونس كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري رقم ٢٥٩٣ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم رقم ٣٦٩٥ والإصابة رقم ٣٨٦٩ والاستيعاب رقم ١١٥٩ ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات رقم ١٤٧٢٢ ، أو هو عياش بن مؤنس كما في المعجم الكبير للطبراني رقم ٧١١١ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم رقم ٢١٣٨ ، ٢٢٥١ وقد ذكره ابن حبان أيضا في الثقات رقم ٤٧٩٥ والبخاري في التاريخ الكبير ٤٧/٧ والإمام مسلم في الكنى الأسماء ٣١٥٤ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/٧.

Contents

অর্থাৎ নামাযে। বাযযার ও তাবারানী এটি উদ্ধৃত করেছেন। (দ্র, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২খ, ২২৫ পৃ)

৬. জারীর আদ দাব্বী বলেন,

كان عليّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٦١) موصولا والبخاري تعليقا قبل حديث رقم ١١٩٨. كتاب العمل في الصلاة ، باب إستعانة اليد في الصلاة الخ ولفظ البخاري : ووضع عليّ كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحكَّ جلدا أو يصلح ثوبا.

অর্থ: আলী রা. যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাঁর ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখতেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬১; বুখারী শরীফ, ১১৯৮নং হাদীসের পূর্বে, বায়হাকী, হাদীস নং ২৩৩৩। এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

বুখারী শরীফে এটি এভাবে এসেছে, আলী রা. তার (ডান) হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রাখেন। তবে শরীর চুলকানো বা কাপড় ঠিক করার জন্য হলে ভিন্ন কথা। (অর্থাৎ তখন ডান হাত সরানোর প্রয়োজন পড়ত।)

এ হাদীসগুলোর কোন কোনটি থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন। আর কোন কোনটি থেকে বোঝা যায়, তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরতেন। কিন্তু বাম হাতের কোন জায়গা চেপে ধরতেন? অধিকাংশ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বাম হাতের কব্জি চেপে ধরতেন।

এসব হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চার মাযহাবের আলেমগণ সেই পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন যেভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আমল করে থাকেন।

ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন, ويضع بطن كفه الأيمن على رسغه فيكون الرسغ في وسط الكف অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। তাহলে কব্জি হাতের তালুর মাঝখানে থাকবে। (কিতাবুল আছার, হা. ১২০)

হালবী র. মুনয়াতুল মুসাল্লী এর ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

السنة أن يجمع بين الوضع والقبض جمعا بين ما ورد في الأحاديث المذكورة إذ في بعضها ذكر الأخذ وفي بعضها ذكر وضع اليد وفي البعض وضع اليد على الذراع فكيفية الجمع أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى ويحلق الإبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع وأنه أخذ شماله بيمينه اهـ

অর্থাৎ উল্লিখিত হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পর সাব্যস্ত হয় যে, হাত রাখা ও বাঁধা দুটির উপরই একসঙ্গে আমল করা সুন্নত। কারণ, কিছু হাদীসে চেপে ধরার কথা এসেছে। আর কিছু হাদীসে হাত রাখার কথা এসেছে। অপর কিছু হাদীসে বাহুর উপর হাত রাখার কথা এসেছে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি হলো, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা কব্জি চেপে ধরবে, আর বাকি তিন আঙ্গুল বাহুর উপর বিছিয়ে দিবে। তাহলে হাতের উপর হাত রাখা, বাহুর উপর হাত রাখা এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত (চেপে) ধরা, সবগুলোই হাসিল হবে।

লক্ষ্য করুন, হানাফী আলেমগণ কিভাবে হাদীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে সবগুলো অনুসারে আমল করতে বলেছেন! একেই বলে হাদীসের অনুসরণ!

উল্লেখ্য যে, আহলে হাদীস ভাইয়েরা যেভাবে বাহুর উপর বাহু রাখেন তাতে ওয়াইল রা., হুলব রা. ও শাদ্দাদ রা. প্রমুখ সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তিনটি অনুযায়ী কোন আমল হয় না। কারণ এ তিনটি হাদীসে ডান হাত দিয়ে বাম হাত চেপে ধরার কথা বলা হয়েছে।

ইমাম মালেক র. এর প্রসিদ্ধ মত হলো ফরজ নামাযে হাত বাঁধবে না, ছেড়ে রাখবে। সুন্নত ও নফল নামাযে হাত বাঁধবে। হাত বাঁধলে কিভাবে বাঁধবে? আল্লামা উব্বী মালেকী র. মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

واختار شيوخنا أن يقبض بكف اليمنى على رسغ اليسرى واختار بعضهم مع ذلك أن تكون السبابة والوسطى ممتدين على الذراع اهـ ٢/٢٧٨

অর্থাৎ আমাদের শায়েখগণ বলেছেন, ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। কেউ কেউ একথাও যোগ করেছেন, শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি যেন বাহুর উপর বিস্তৃত থাকে। (২খ, ২৭৮পৃ)

শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে ইমাম নববী র. তার 'আর রাওজাহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

السنة وضع اليمنى على اليسرى فيقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها ٣٣٩/١

অর্থাৎ সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর এভাবে রাখবে যে, ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার হাড় এবং কব্জি ও বাহুর অংশবিশেষ চেপে ধরবে। (২খ, ৩৩৯পৃ)

হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইবনে মানসূর হাম্বালী র. আররাওযুল মুরবি' গ্রন্থে লিখেছেন,

ثم يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته اهـ ١٦٥/١ وكذا في الإنصاف للمرداوي ٤٥/٢ والفروع لابن مفلح ٣٦١/١

অর্থাৎ অতঃপর বাম হাতের কব্জি ডান হাত দ্বারা চেপে ধরবে, এবং নাভির নীচে রাখবে। (১খ, ১৬৫পৃ); মারদাবী র. আল ইনসাফ গ্রন্থে (২/৪৫) ও ইবনে মুফলিহ র. আল ফুরু' গ্রন্থে (১/৩৬১) একই কথা বলেছেন।

ইবনে হাযম রহ. এর মত :

আল মুহাল্লা গ্রন্থে ইবনে হাযম জাহিরী লিখেছেন,

ويُستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة.

অর্থাৎ মুস্তাহাব হলো মুসল্লী নামাযে তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে। (মাসআলা নং ৪৪৮)

শায়খ সালেহ ইবনে ফাওযানের মত : আরব বিশ্বের খ্যাতিমান আলেম শায়খ সালেহ ইবনে ফাওযানও বলেছেন, السنة أن يقبض المصلي كفه اليسرى بيده اليمنى অর্থাৎ সুন্নত হলো ডান হাত দিয়ে বাম হাতে কব্জি চেপে ধরবে। (ফাতাওয়ায়ে সালিহ ইবনে ফাওযান)

লক্ষ করুন, পৃথিবীর অধিকাংশ আলেম-ওলামার মত কি, আর লা-মাযহাবী ভাইয়েরা কি করেন?

একটি ভুলব্যাখ্যা

যে হাদীসটির ভুল ব্যাখ্যা করে লা-মাযহাবী বন্ধুরা বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ডান হাত বিস্তার করে দেন সেটি এখানে ১নং দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীসটি সম্পর্কে বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন,

أبهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وصححه ابن خزيمة وغيره وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة. ٢/٢٧٥

অর্থাৎ বাম বাহুর কোন জায়গায় ডান হাত রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট। আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত ওয়াইল রা. এর হাদীসে বলা হয়েছে: অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন। ইবনে খুযায়মা র. প্রমুখ এটিকে সহীহ বলেছেন। সালাত অধ্যায়ের শেষ দিকে হযরত আলী রা. এর অনুরূপ আছার (আমল) এর উল্লেখ আসছে। (২খ, ২৭৫ পৃ)

একইভাবে শাওকানী সাহেবও নায়লুল আওতার গ্রন্থে বলেছেন,

قوله (على ذراعه اليسرى) أبهم هنا موضعه من الذراع وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا .

(وقال تحت الحديث الذي قبله:) والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبراني : (وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ) ٢/١٨٧

অর্থাৎ হাদীস শরীফে যে বলা হয়েছে 'বাম বাহুর উপরে', বাহুর কোন জায়গায় তা এখানে অস্পষ্ট। আহমদ ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত পূর্বের হাদীসটিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আহমদ ও আবূ দাউদ বর্ণিত পূর্বের হাদীসটি আলোচনা প্রসঙ্গে শাওকানী সাহেব বলেছেন, এর মর্ম হলো তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখেছেন। তাবারানী র. এর বর্ণনায় এসেছে: তিনি নামাযে তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর কব্জির কাছাকাছি রেখেছেন। (২খ. ১৮৭ পৃ)

লা-মাযহাবী ঘরানার শীর্ষ আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাঁর বুখারী শরীফের আরবী ভাষ্যগ্রন্থ আওনুল বারীতে বুখারীর হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

أي على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد (٢/٥٤٠)

অর্থাৎ বাম হাতের তালুর পিঠ ও কব্জির উপর রাখবে। (২/৫৪০)

শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায রহ.ও তাঁর ফাতাওয়ায় বলেছেন,

فيضع كف اليمنى على كف اليسرى অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রাখবে। তিনি বুখারী রহ. বর্ণিত হযরত সাহল ইবনে সাদ রা. এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন,

فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى , والمعنى على كفه والرسغ والساعد لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر فإذا وضع كفه على الرسغ والساعد فقد وضعت على الذراع ؛ لأن الساعد من الذراع , فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور

অর্থাৎ বোঝা গেল মুসল্লি দাঁড়ানো অবস্থায় তার ডান হাত বাম যেরার উপর রাখবে। তার মানে বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও কব্জি সংলগ্ন বাহুর উপর রাখবে। কেননা এতে করে এই হাদীস এবং হযরত ওয়াইল রা. এর বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। সে যখন ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও কব্জি সংলগ্ন বাহুতে রাখবে তখন যেরার উপর রেখেছে

বলেও বিবেচিত হবে। কারণ কব্জি সংলগ্ন বাহু (الساعد) তো যেরা বা বাহুরই অংশ। তাই মুসল্লি তার ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও কব্জি সংলগ্ন বাহুর উপর রাখবে। যেমনটি হযরত ওয়াইল রা.এর হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায, ১১/৩১)

আলবানী সাহেবও আসলু সিফাতিস সালাহ, তালখীসু সিফাতিস সালাহ (নং ৩৭) ও আহকামুল জানাইয (নং ৭৬) গ্রন্থত্রয়ে লিখেছেন,

وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখতেন।

এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হাদীসটির ভুল অর্থ বুঝে কনুই পর্যন্ত হাত বিস্তার করে থাকেন।

নাভির নীচে হাত রাখার দলিল

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه وإسناده صحيح. قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار : هذا سند جيد وقال الشيخ أبو الطيب السندي في شرحه على الترمذي : هذا حديث قوي من حيث السند وقال الشيخ عابد السندي في طوالع الأنوار: رجاله كلهم ثقات أثبات اهـ

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে দেখেছি। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৫৯। এর সনদ সহীহ।

হাফেজ কাসিম ইবনে কুতলূবুগা র., তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার আবুত্ তায়্যিব সিন্ধী র. ও আল্লামা আবেদ সিন্ধী র. প্রমুখ হাদীসটিকে

মজবুত ও শক্তিশালী বলেছেন। এর সনদ এরূপ: ইবনে আবী শায়বা র. বর্ণনা করেছেন ওয়াকী' থেকে, তিনি মূসা ইবনে উমায়ের থেকে, তিনি আলকামার সূত্রে হযরত ওয়াইল রা. থেকে। এই সনদে কোন দুর্বল রাবী নেই।

এ হাদীসটি সম্পর্কে কেউ কেউ শুধু এতটুকু আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, মুসান্নাফের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এটি বিদ্যমান নেই। কিন্তু এ আপত্তি হাদীসের অনেক কিতাবের ক্ষেত্রেই চলে। তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতি কিতাব দেখুন, এক পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু হাদীস পাওয়া যায়, যা অন্য পাণ্ডুলিপিতে নেই। তিরমিযী শরীফের মুবারকপুরী, আহমাদ শাকের ও শুআয়ব আরনাউতের তিন কপিতেই এ তারতম্য দেখা যায়। সুতরাং এটা কোন আপত্তি হতে পারে না। যারা নিজের চোখে হাদীসটি মুসান্নাফে দেখেছেন তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

২. হযরত আলী রা. বলেন,

السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. أخرجه أبو داود (في رواية ابن الأعرابي وابن داسة) ٧٥٦ وأحمد ١/١١٠ (٨٧٥) وابن أبي شيبة (٣٩٦٦) والدارقطني ١/٢٨٦ والضياء في المختارة ٢/٧٧٢ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. ولكن يشهد له الحديث السابق.

অর্থ: সুন্নত হলো তালু নামাযের সময় তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫৬; মুসনাদে আহমদ ১খ, ১১০ পৃ, হাদীস নং ৮৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬৬; দারাকুতনী, ১খ, ২৮৬পৃ; যিয়া ফিল মুখতারা, ২খ, ৭৭২পৃ।

এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক রয়েছেন। তিনি দুর্বল। তবে প্রথম হাদীসটি এর সমর্থন করছে।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. أخرجه أبو داود (٧٥٨) وفيه عبد الرحمن المذكور.

অর্থ: নামাযে হাতের তালু অপর তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে হবে। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫৮। এতেও পূর্বোক্ত আব্দুর রহমান রয়েছেন।

৪. হযরত আনাস রা. বলেছেন,

ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة. أخرجه ابن حزم في المحلى تعليقا ٣٠/٣

অর্থ: তিনটি বিষয় নবীস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। ইফতারে বিলম্ব না করা, সাহরী শেষ সময়ে খাওয়া, এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, ৩খ, ৩০পৃ। তিনি এর সনদ উল্লেখ করেন নি।

৫. হাজ্জাজ ইবনে হাসসান র. বলেন,

سمعت أبا مجلز أو سألته قال : قلت كيف يصنع قال : يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. (٣٩٦٣)

অর্থ: আমি আবূ মিজলায র. (বিশিষ্ট তাবেয়ী)কে বলতে শুনেছি, অথবা হাজ্জাজ বলেছেন, আমি আবূ মিজলায র.কে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে হাত বাঁধবে? তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬৩। এর সনদ সহীহ।

৫. ইবরাহীম নাখায়ী র. (যিনি তাবেয়ী ছিলেন) বলেন,

يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة . أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٦٠

অর্থ: নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬০ । এর সনদ হাসান।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই বলেছেন,

- تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع.

অর্থাৎ নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের নিকটতর। মাসাইলুল ইমাম আহমদ ওয়া ইসহাক, লি ইসহাক ইবনে মানসুর আলকাওসাজ, মৃত্যু ২৫১, নং ২১৪ ; ইবনুল মুনযির, আলআওসাত, ৩খ,২৪৩ পৃ.

বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস : একটু পর্যালোচনা

যেসব হাদীস দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধার প্রমাণ পেশ করা হয়, তার একটিও সহীহ নয়। নিম্নে পর্যালোচনাসহ হাদীসগুলো তুলে ধরা হলো।

১. হযরত ওয়াইল রা. বলেছেন,

صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন।

আলবানী সাহেব হাদীসটি সম্পর্কে সহীহ ইবনে খুযায়মার টীকায় মন্তব্য করেছেন:

إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له

অর্থাৎ 'এর সনদ দুর্বল। কেননা মুয়াম্মাল– তিনি ইসমাঈলের পুত্র– দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তবে সমার্থক অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি সহীহ। আর বুকের উপর হাত রাখার ক্ষেত্রে অনেক হাদীস রয়েছে, যা এর সমর্থন করে। সহীহ ইবনে খুযায়মা, ১/২৪৩ হাদীস নং ৪৭৯; আবুশ শায়খ, তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বিআসবাহান, ২/২৮৬; বায়হাকী ২/৩০, হাদীস নং ২৩৩৬।'

কিন্তু এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ–

ক. এর সনদে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল আছেন। তিনি সুফিয়ান ছাওরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। মুয়াম্মালকে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, আমি যাকে মুনকারুল হাদীস

বলবো, তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে না। তাছাড়া ইবনে সা'দ বলেছেন, ثقة كثير الغلط তিনি বিশ্বস্ত, তবে অনেক ভুল করতেন। আবূ যুরআ রাযী বলেছেন, في حديثه خطأ كثير তার হাদীসে অনেক ভুল; আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, صدوق كثير الخطأ يكتب حديثه তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ, তবে প্রচুর ভুল করতেন, তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যায়। (আল জারহু ওয়াত তাদীল, ৮/৩৭৪) দারাকুতনী বলেছেন, ثقة كثير الخطأ তিনি বিশ্বস্ত তবে অত্যধিক ভুলের শিকার। ইবনে মাঈন এক বর্ণনায় বলেছেন, সুফিয়ানের ক্ষেত্রে তিনি প্রমাণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত নন। (দ্র. তারীখে ইবনে মুহরিয, ১/১১৪) মুহাম্মদ ইবনে নসর বলেছেন, তিনি কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হলে ভেবে চিন্তে দেখতে হবে, কেননা তিনি প্রচুর ভুলের শিকার ছিলেন। (দ্র. তাহযীবুত তাহযীব) ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান আল ফাসাবী উল্লেখ করেছেন যে, সুলায়মান ইবনে হারব বলেছেন, وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه ويتخففوا من الرواية عنه فإنه منكر يروي المناكير عن ثقات شيوخنا وهذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن ضعاف لكنا نجعله له عذرا আলেমগণের উচিৎ, তার হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ও কম করে বর্ণনা করা। কারণ তিনি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করতেন আমাদের বিশ্বস্ত উস্তাদগণ থেকে। এটা খুবই অন্যায়। কারণ এসব আপত্তিকর বর্ণনা যদি দুর্বলদের থেকে হতো তবে আমরা তাকে মাযুর বিবেচনা করতাম। (আল মারিফা ওয়াত তারীখ, ৩/৫২) আস সাজী বলেছেন, صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ, তবে প্রচুর ভুলের শিকার, সেগুলোর পরিমাণ এত বেশী যে,উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। (তাহযীবুত তাহযীব)

ইবনে হাজার আসকালানীও ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, وكذلك مؤمل بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف অর্থাৎ একইভাবে

(সুফিয়ান) ছাওরী হতে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈলের বর্ণনায় দুর্বলতা আছে। (দ্র, ৯খ, ২৮৮পৃ, ৫১৭২ হাদীসের অধীনে)

তাছাড়া স্বয়ং আলবানী র.ও মুয়াম্মাল কর্তৃক বর্ণিত সহীহ ইবনে খুযায়মার দুটি হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাদীস দুটির নম্বর হলো ১১০৫ ও ১১৩৬।

খ. মুয়াম্মালের দুজন সঙ্গী মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরয়াবী (আলমুজামুল কাবীর তাবারানী ২২/৩৩) ও আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালিদ (মুসনাদে আহমদ ৪/৩১৮; নাসাঈ, হাদীস নং ৮৮৯) (দুজনই বিশ্বস্ত রাবী) সুফিয়ান রহ.থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় 'বুকের উপর' কথাটি নেই।

গ. আলবানী সাহেব আবুশ শায়খের উদ্ধৃতি তো দিয়েছেন। কিন্তু তার বর্ণনাটি পেশ করেন নি। অথচ উক্ত বর্ণনায় আছে, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على شماله عند صدره. অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের কাছে রাখলেন।

এ হাদীসের সনদেও মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল আছেন। তাহলে তার বর্ণনায় ইযতিরাব বা অসংগতি পাওয়া গেল। কখনও বলেছেন বুকের উপর, কখনও বুকের কাছে।

ঘ. এ হাদীসটি মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ সুফিয়ান সাওরী রহ. নিজেই নাভীর নীচে হাত বাঁধতেন।

মুয়াম্মালের সূত্র ছাড়া এ হাদীসের আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটি হলো:

عن محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أمه أم يحيي عن وائل بن حجر وفيه: ثم وضع يمينه على يساره على صدره. أخرجه الطبراني في الكبير ٤٢/٢٢ (١١٨) والبيهقي (٢٣٣٥)

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে হুজর তার চাচা সাঈদ ইবনে আব্দুল জাব্বার থেকে, তিনি তার পিতা আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল থেকে, তিনি তার মাতার সুত্রে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখলেন। (তাবারানী, মুজামে কাবীর, ২২/৪২ হাদীস ১১৮; বায়হাকী, হাদীস ২৩৩৫)

এ সুত্রটিও দুর্বল। তার কারণ:

ক. মুহাম্মদ ইবনে হুজর দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী র. বলেছেন, فيه نظر অর্থাৎ তার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। (তারীখে কাবীর, নং ১৬৪) আবু আহমদ আল হাকেম বলেছেন, ليس بالقوي عندهم অর্থাৎ তিনি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। (লিসান, ৭/৫৮) আর ইবনে হিব্বান তার আলমাজরূহীন (সমালোচিত রাবী চরিত) গ্রন্থে বলেছেন,

يروي عن عمه سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عبد الجبار عن أبيه وائل بن حجر بنسخة منكرة منها أشياء لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وليست من حديث وائل بن حجر ومنها أشياء من حديث وائل بن حجر مختصرة جاء بها على التقصي وأفرط فيها ومنها أشياء موضوعة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجوز الاحتجاج به

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ ইবনে হুজর তার চাচা সাঈদ ইবনে আব্দুল জাব্বার থেকে, তিনি তার পিতা আব্দুল জাব্বার থেকে, তিনি তার পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে– এই সূত্রে বর্ণিত আপত্তিকর একটি হাদীসের কপি থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। এর মধ্যে কিছু হাদীস এমন আছে, যার মূল তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তা ওয়াইল রা. কর্তৃক বর্ণিত নয়। আর কিছু হাদীস এমন আছে, যা হযরত ওয়াইল রা. থেকে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে

হুজর তাতে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিস্তারিতরূপে পেশ করেছেন। আবার কিছু হাদীস আছে সম্পূর্ণ জাল। সেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। তাকে (মুহাম্মদ ইবনে হুজরকে) প্রমাণস্বরূপ পেশ করা ঠিক হবে না।'

উকায়লী ও ইবনে আদীও তার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মন্তব্য উল্লেখ করে সমর্থন করেছেন। যাহাবী মীযান ও মুগনী উভয় গ্রন্থে বলেছেন, له مناكير অর্থাৎ তার কিছু কিছু আপত্তিকর বর্ণনা রয়েছে। আর আল মুকতানা ফী সারদিল কুনা গ্রন্থে তিনি বলেছেন لَيِّن অর্থাৎ দুর্বল। হায়সামী বলেছেন, وهو ضعيف অর্থাৎ তিনি দুর্বল। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ১১৭৮ ও ১৬০০৪)

মুহাম্মদ ইবনে হুজরের চাচা সাঈদ ইবনে আব্দুল জাব্বারও সমালোচিত রাবী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন, فيه نظر অর্থাৎ তার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। ইবনে মাঈন বলেছেন, لم يكن بثقة অর্থাৎ তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন না।

খ. সাঈদ ইবনে আব্দুল জাব্বারের তিনজন সঙ্গী আছেন। এক. মুহাম্মদ ইবনে জুহাদা (মুসলিম, নং ৪০১), দুই. আবু ইসহাক আস সাবিঈ (আহমদ, ৪/৩১৮) তিন. আলমাসউদী (আহমদ, নং ১৮৮৫২; তাবারানী, ২২/৩২-৩৩)। কিন্তু তাদের কারো বর্ণনাতেও বুকের উপর কথাটি নেই।

সুতরাং এটি যে মুহাম্মদ ইবনে হুজরের ভুল বর্ণনা সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া বাযযার র. তার মুসনাদে একই সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে বুকের উপর কথাটির পরিবর্তে আছে– عند صدره অর্থাৎ বুকের কাছে। (দ্র, বাযযার, ৪৪৮৮)। সনদের দুর্বলতার পাশাপাশি এটা মতনের ইযতিরাবও বটে।

বোঝা গেল, হাদীসটির কোন সনদই সহীহ নয়। সুতরাং 'তবে সমার্থক অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি সহীহ' আলবানী সাহেবের একথাও সঠিক নয়। এর সমর্থক বর্ণনাগুলোও দুর্বল, যেমনটি সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।

২. তাউসের বর্ণনাটি আবূ দাউদ (৭৫৯) শরীফে আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। অতঃপর উভয় হাত বুকের উপর বাঁধতেন।

এটি মুরসাল। আর মুরসাল (সূত্র বিচ্ছিন্ন)কে তারা প্রামাণ্য মনে করেন না। তদুপরি এতে সুলায়মান ইবনে মূসা নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে বুখারী র. বলেছেন, عنده مناكير তার কিছু আপত্তিকর বর্ণনা আছে। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, ليس بالقوي في الحديث তিনি হাদীসে মজবুত নন। (দ্র, যাহাবীর আল কাশিফ)

আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, مطعون عليه সমালোচিত ও অভিযুক্ত রাবী। আস সাজী রহ. বলেছেন, عنده مناكير তার কিছু আপত্তিকর বর্ণনা আছে। হাকেম আবু আহমদ বলেছেন, في حديثه بعض المناكير তার হাদীসে কিছু কিছু আপত্তিকর বিষয় আছে। আবু হাতেম রাযী বলেছেন, محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ মানের, তবে তার হাদীসে কিছু কিছু ইযতিরাব বা অসঙ্গতি রয়েছে। ইবনুল জারূদ তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায়, তার দৃষ্টিতেও তিনি দুর্বল ছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাকরীব গ্রন্থে লিখেছেন, صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ, ফকীহ, তার হাদীসে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তার হাদীস ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

এখন বলুন, এ ধরনের বর্ণনাকারীর হাদীস সহীহ হয় কীভাবে? স্বয়ং আলবানী সাহেব তার সম্পর্কে আসলু সিফাতিস সালাহ গ্রন্থে (২/৫২৮) লিখেছেন, صدوق في حديثه بعض لين সাদূক, তার হাদীসে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আর ইরওয়া গ্রন্থে (৬/২৪৬) একটি হাদীস সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

إن الحديث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا أن سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه فقد قال الذهبي في الضعفاء : صدوق (ثم قال بعد ذكر قول البخاري والحافظ في التقريب) وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد وأما الصحة فهي بعيدة عنه.

অর্থাৎ 'এ হাদীসটির রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত, মুসলিমের রাবী। তবে সুলায়মান ইবনে মূসা ফিকহে উচ্চ মানসম্পন্ন ব্যক্তি হলেও যাহাবী তার সম্পর্কে স্বীয় যুআফা গ্রন্থে বলেছেন, সাদূক।

এরপর আলবানী সাহেব ইমাম বুখারী ও তাকরীব গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার এর মন্তব্য উল্লেখপূর্বক বলেছেন, এ হিসাবে হাদীসটি হাসান স্তরের সনদ বিশিষ্ট। এটি কোনভাবেই সহীহ হতে পারে না।'

সারকথা, অনেক মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে সুলায়মানের দুর্বলতার কারণে হাদীসটি দুর্বল। হ্যাঁ, কিছু কিছু আলেমের দৃষ্টিতে এটি বড়জোর হাসান মানসম্পন্ন, সহীহ নয়। তৎসঙ্গে মুরসাল হওয়াও একটি সমস্যা। সালাফ বা পূর্বসূরিগণের আমল এ অনুযায়ী না থাকা আরো বড় সমস্যা। আরেকটি সমস্যা হলো, সুলায়মান ইবনে মূসা মুদাল্লিস রাবী। যেমনটি বলেছেন ইবনে হিব্বান তার মাশাহীরু উলামাইল আমসার গ্রন্থে। ইবনে হাজার আসকালানীও তাকে মুদাল্লিস রাবীদের তালিকামূলক গ্রন্থ তা'রীফু আহলিত তাকদীস বি মারাতিবিল মাওসূফীনা বিত তাদলীসে উল্লেখ করেছেন। আর স্বীকৃত কথা যে, মুদাল্লিস রাবী যদি عن (হতে বা থেকে) শব্দ যোগে বর্ণনা করেন, তবে সেটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বলে বিবেচিত হয় না। এ হিসাবে সুলায়মান ও তাউসের মাঝে আরেকটি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে হাদীসটি হাসান হওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি হাদীস বায়হাকীতে আছে। হাদীসটি এমন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قَالَ : وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّحْرِ.

অর্থাৎ আল্লাহর বাণী : فصل لربك وانحر সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে গলার কাছে রাখা।

এ হাদীসের সনদে রাওহ্ ইবনুল মুসায়্যাব আছে, তিনি চরম দুর্বল রাবী। ইবনে হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত লোকদের নামে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা বৈধ হবে না। ইবনে আদী বলেছেন, أحاديثه غير محفوظة তার হাদীস সঠিক নয়। (দ্র, তাহযীবুত তাহযীব)

তাছাড়া এতে ইয়াহইয়া ইবনে আবু তালিব আছেন। তিনি বিতর্কিত বর্ণনাকারী। হাদীসটি দুর্বল হওয়ার আরেকটি কারণ হলো– একই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা। এসব দুর্বলতার কারণেই শাওকানী সাহেব লা-মাযহাবী হওয়া সত্ত্বেও তার তাফসীর ফাতহুল কাদীরে আলী রা. ও ইবনে আব্বাস রা.এর কোন হাদীসই উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করেন নি। হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. আলী রা.এর ব্যাখ্যাটি উল্লেখপূর্বক বলেছেন, ولا يصح এটি সহীহ নয়। এ মর্মে আরো কিছু ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেছেন– وكل هذه الأقوال غريبة جدا والصحيح القول الأول এসব বক্তব্য অত্যন্ত অপরিচিত ও অভিনব। প্রথম ব্যাখ্যাটিই সহীহ ও সঠিক। আর প্রথম ব্যাখ্যাটি তিনি এভাবে পেশ করেছেন–

قال ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن: يعني بذلك نحر البُدْن ونحوها. وكذا قال قتادة، ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك، والربيع، وعطاء الخراساني، والحكم، وإسماعيل بن أبي خالد، وغير واحد من السلف.

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রা. আতা, মুজাহিদ, ইকরিমা, ও হাসান (বসরী) বলেছেন, আয়াতের মর্ম হলো, উট বা অন্য পশু কুরবানী করা। একই কথা বলেছেন কাতাদা মুহাম্মদ ইবনে কাব আলকুরাজী, দাহহাক, আর রাবী', আতা আলখুরাসানী, হাকাম, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ ও অনেক পূর্বসূরি। (দ্র. সূরা কাওছার এর তাফসীর)

আয়াতটির উক্ত সহীহ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন আরবের বিখ্যাত আলেম লা-মাযহাবী ঘরানার লোক বাক্‌র আবু যায়দ। তিনিও হযরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত গলার নিকট হাত বাঁধার হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এবং হযরত আলী রা. কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সম্পর্কে ইবনে কাছীর রহ.এর পূর্বোক্ত মন্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। (দ্র. মাজমূআ রাসাইল, লা-জাদীদা ফী আহকামিস সালাত, পৃ. ১২, ১৫)

শুধু তাই নয়, লা-মাযহাবী বন্ধুদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কুরআনের উর্দু অনুবাদ যা সৌদি সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও আয়াতটির অর্থ লেখা হয়েছে اور قربانی کر এবং কুরবানী কর। এমনিভাবে ড. মুজিবুর রহমান, সদস্য বাংলাদেশ জামইয়তে আহলে হাদীস, তাঁর বাংলা কুরআন তরজমায় এর অর্থ লিখেছেন, এবং কুরবানী কর।

হযরত আলী রা. ও ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস দুটি সহীহ হলে এসব লা-মাযহাবী আলেম আয়াতটির এমন অনুবাদ করলেন কিভাবে?

৪. হযরত আলী রা. এর একটি হাদীস বুখারী র. এর তারীখে কাবীরে আছে। হাদীসটি হলো :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَسْطِ سَاعِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ. (رقم:٢٩١١)

উকবা ইবনে জাবয়ান হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, فصل لربك وانحر (আয়াতের ইনহার শব্দের অর্থ হলো) ডান হাত বাম হাতের বাহুর মাঝ বরাবর রেখে বুকের উপর রাখা। (দ্র. নং ২৯১১)

তিনটি কারণে এ হাদীসটিও সহীহ নয় :

এক, হযরত আলী রা. থেকে যিনি এটি বর্ণনা করেছেন, তার নাম নিয়ে বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যুহায়র (عقبة بن ظهير), হাম্মাদ ইবনে সালামা তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যাবয়ান (عقبة بن ظبيان), আর আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী র. বলেছেন, উকবা ইবনে

সাহবান(عقبة بن صهبان)। আবার উকবা থেকে এটি কে বর্ণনা করেছেন তা নিয়েও এযতেরাব আছে। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ বলেছেন আসিম আল জাহদারীর নাম। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেছেন আসিমের পিতার নাম। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটাকে সনদের এযতেরাব বলা হয়, যা হাদীস দুর্বল প্রমাণিত হওয়ার অন্যতম কারণ। দ্র, ইলালে দারাকুতনী, ৪খ, ৯৯পৃ; আল জারহু ওয়াত তা'দীল লি ইবনে আবী হাতিম, ৬খ, ৩১৩পৃ।

দুই, হযরত আলী রা. থেকে এ হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী হাতেম আল জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা আছে, 'বুকের উপর' (على الصدر) কথাটি নেই। একইভাবে ইবনে আবী শায়বাও মুসান্নাফে এটি উল্লেখ করেছেন, সেখানেও বুকের উপর কথাটি নেই। দ্র, হাদীস নং ৩৯৬২।

তিন, ইমাম বুখারী র. তার আত তারীখুল কাবীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে সমর্থন করেননি, বরং সেটি উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وقال قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة من أصحاب علي عن علي رض : وضعها على الكرسوع. ٦/٤٣٧

অর্থাৎ কুতায়বা র. হুমায়দ ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে আবুল জা'দ থেকে, তিনি আসিম জাহদারীর সূত্রে হযরত আলী রা. এর ছাত্র উকবা থেকে, তিনি হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার হাত কব্জির উপর রাখলেন। (দ্র, ৬খ, ৪৩৭পৃ)

এতে বোঝা যায়, তিনি এই দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে সঠিক মনে করেছেন। এতে করে এই বর্ণনাটিও হানাফী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের দলিলরূপে গণ্য হবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আলী রা.এর আমলটি এই দ্বিতীয় বর্ণনারই সমর্থক।

৫. হযরত হুলব রা. থেকে বর্ণিত—

... وَرَأَيْتُهُ ، قَالَ ، يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَ يَحْيَى : الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ.

অর্থাৎ আর আমি তাঁকে (নবী সা.কে) দেখলাম, এটি বুকের উপর রাখতে। ইয়াহইয়া (ইবনে সাঈদ আল কাত্তান) এর বিবরণ দিয়েছেন– ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর।

হাদীসটি মুসনাদে আহমদে (২২৩১৩) আছে। সুফিয়ান থেকে শধু ইয়াহয়াই বুকের উপর হাত বাঁধার কথাটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদে ওয়াকী র., দারাকুতনীতে ওয়াকী ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীও বায়হাকীতে (৩৬১০) আল হুসাইন ইবনে হাফস তিনজন সুফিয়ান থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে সুফিয়ানের সঙ্গী আবুল আহওয়াস ও মুসনাদে আহমদে ৫/২২৬ (নং ২২৩১৬) শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ উস্তাদ 'সিমাক' থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনাতেও বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। সুতরাং এটি শায বা দলবিচ্ছিন্ন বর্ণনা, যা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষভাবে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর বর্ণনাটি এজন্য অগ্রগণ্য হওয়ার উপযুক্ত যে, ইমাম আহমদ বলেছেন, كان يحب أن يحدث باللفظ অর্থাৎ তিনি উস্তাদের মূল শব্দে বর্ণনা করা পছন্দ করতেন। আর আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, هو أثبت من يحيي بن سعيد وأتقن من وكيع وكان يعرض حديثه على الثورى অর্থাৎ তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের তুলনায় সুদৃঢ়, ওয়াকীর চেয়ে মজবুত। তিনি সুফিয়ান ছাওরীর হাদীসগুলো তাঁর সামনে পেশ করে শোনাতেন।

তাছাড়া সুফিয়ান ছাওরী রহ. যদি এটি এভাবে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তার আমলও এ অনুযায়ী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আমল হলো নাভীর নীচে হাত বাঁধা। (দ্র. আত তামহীদ, ২০/৭৫) বোঝা গেল, তিনি হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেন নি।

আল্লামা নিমাবী র. আছারুস সুনান গ্রন্থে লিখেছেন,

ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه فيناسبه قوله: وصف يحي اليمنى على اليسرى فوق المفصل ويوافقه سائر الروايات

অর্থাৎ আমার মনে হয়, অনুলেখকের ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে। সঠিক হবে على صدره (বুকের উপর) এর স্থলে على هذه (এই হাতের উপর)। (এ হিসেবে হাদীসটির অর্থ দাঁড়ায়- এই হাতটি এই হাতের উপর রেখেছেন– লেখক)। এতে এটি পরের কথার সঙ্গেও মিলে যায়। কারণ পরে বলা হয়েছে, ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে দেখিয়েছেন। আর এটি তখন অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথেও সংগতিপূর্ণ হয়। (দ্র, পৃ ৮৭)

উল্লেখ্য যে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এ বর্ণনাটি তার শিষ্যদের মধ্যে শুধু ইমাম আহমদই উদ্ধৃত করেছেন। এতে যদি বুকের উপর হাত রাখার কথা থাকত, তাহলে ইমাম আহমদ এটাকে মাকরুহ বলতেন না। অথচ হাদীসটি শোনার পর তিনি ঐ মাকরুহ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। তার প্রমাণ, ইমাম আবু দাউদ জন্ম লাভ করেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের মৃত্যুর পর। আর তিনি ইমাম আহমদ থেকে নিজের শোনা মাসায়েলের যে সংকলন তৈরি করেছেন, তাতে উল্লেখ রয়েছে– وسمعته سئل عن وضعه فقال فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة فلا بأس وسمعته يقول يكره أن يكون يعني وضع اليدين عند الصدر অর্থাৎ আমি শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হাত কোথায় রাখা হবে? তিনি বললেন, নাভির সামান্য উপরে। নাভির নীচে রাখলেও কোন অসুবিধা নেই। আমি তাকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, এভাবে অর্থাৎ বুকের কাছে হাত রাখা মাকরুহ।

স্বয়ং লা-মাযহাবী বন্ধুরাও এ হাদীসের উপর আমল করেন না। কারণ এর শেষাংশে বলা হয়েছে– অতঃপর ইয়াহয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখেন। এই ইয়াহয়া হলেন ইবনে সাঈদ আল কাত্তান। তিনি হাদীসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে বুঝিয়ে দিয়েছেন, হাত কিভাবে বাঁধতে হয়।

ইমাম তিরমিযীর যুগ পর্যন্ত বুকে হাত বাঁধার প্রচলন ছিল না

ইমাম তিরমিযী র. হযরত হুলব রা. এর হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন,

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم

অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের আমল ছিল এ হাদীস অনুযায়ী। তাঁরা মনে করতেন, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করতেন নাভির উপরে রাখবে, আর কেউ কেউ মনে করতেন নাভির নীচে রাখবে। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটিরই অবকাশ আছে।

লক্ষ করুন, সাহাবী, তাবেয়ী ও তিরমিযী র.এর যুগ পর্যন্ত আলেমগণকে তিনি দুভাগ করেছেন। এক ভাগের মত ছিল নাভির নীচে হাত বাঁধা, আরেক ভাগের মত ছিল নাভির উপরে হাত বাঁধা। বুকের উপর হাত বাঁধার আমল কোথায়? একইভাবে ইবনুল মুনযির র.ও তাঁর আল আওসাত গ্রন্থে উপরোক্ত দুই ধরনের আমল ও মতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

বুকের উপর হাত বাঁধা যে পূর্বসূরিগণের আমল ছিল না তা আলবানী সাহেবের নিম্নোক্ত কথা থেকেও স্পষ্ট হয়। ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق ابن راهويه فقد ذكر المروزي في (المسائل): (كان إسحاق يوتر بنا . . . ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين).(٧١/٢)

অর্থাৎ এই সহীহ সুন্নতটির উপর আমল করে সর্বাধিক ধন্য হয়েছিলেন ইমাম ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই। মারওয়াযী তার মাসাইলে উল্লেখ করেছেন, ইসহাক র. আমাদেরকে নিয়ে বেতের পড়তেন। ......

আর কুনুতে হাত তুলতেন। রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। এবং উভয় হাত বুকের উপর বা বুকের নীচে রাখতেন। (ইরওয়া, ২/৭১)

এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পূর্বসূরিগণের মধ্যে তিনি শুধু ইসহাক র.কেই এর উপর আমলকারী পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, এই মারওয়াযী হলেন ইসহাক ইবনে মানসুর আল কাওসাজ। তারই রচিত 'মাসাইলুল ইমাম আহমদ ওয়া ইসহাক' গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত অংশটুকু সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন আলবানী সাহেব। (দ্র. আলমাসাইল, নং ৩৫৪৬, ৩৫৪৭)

মারওয়াযীর এই গ্রন্থের বরাতেই আমরা ইসহাক র.এর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী ও বিনয়ের নিকটতর।[১] তার এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি নাভির নীচেই হাত বাঁধতেন। এ কারণে মাসাইলে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক গ্রন্থটির টীকাকার বলেছেন, 'আলবানীর উদ্ধৃত কথাটির অর্থ এই নয় যে, ইসহাক র. নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতেন। বরং এর অর্থ হলো, তিনি দোয়ায়ে কুনুত পড়ার সময় যে হাত ওঠাতেন তা বুক বরাবর বা বুকের নীচ পর্যন্ত ওঠাতেন।' (দ্র. ৩৫৪৭ নং এর টীকা)

---

[১] শুধু ইসহাক ইবনে মানসূর আল কাওসাজ (মৃত্যু ২৫১ হি.)ই নন, ইবনুল মুনযির (মৃত্যু ৩১৯ হি.) তার আল আওসাত গ্রন্থে, ইবনে আব্দুল বার (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) তার আত তামহীদ গ্রন্থে, ইমাম নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) তার মুসলিম শরীফের ভাষ্যে, জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ রায়মী (মৃত্যু ৭৯২ হি.) তার আল মাআনিল বাদীআ গ্রন্থে (১/১৩৬) ও শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হি.) তার নায়লুল আওতার গ্রন্থে (২/১৮৯) ইসহাকের রহ.এর মাযহাব হিসাবে নাভীর নীচে হাত বাঁধার কথাই উল্লেখ করেছেন। আধুনিক কালে আরবের বড় হাদীস গবেষক ড. মাহের ইয়াসীন আল ফাহল তার 'আছারু ইখতিলাফিল মুতূন ওয়াল আসানীদ ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা' নামক গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন, نسبه الألباني لإسحاق بن راهويه ولا يصح عنه অর্থাৎ আলবানী সাহেব বুকের উপর হাত বাঁধাকে ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ'র আমল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এটা তার থেকে প্রমাণিত নয়। এরপর ড. মাহের বুকের উপর হাত বাঁধার প্রবক্তা হিসাবে আমীর ইয়ামানী (মৃত্যু ১১৮২ হি.) শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হি.) মুবারকপুরী (মৃত্যু ১৩৫৩ হি.) ও আযীমাবাদী (মৃত্যু ১৩২৯ হি.) এই চারজনের কথা উল্লেখ করেছেন। এঁরা সকলেই লা-মাযহাবী ছিলেন। এঁদের পূর্বে এ মতের পক্ষে কোন আলেমের নাম পাওয়া যায় নি। (দ্র. ২/১৮, শামেলা ৬০০০ ভার্সন)

এ ব্যাখ্যাটি এজন্যও জরুরী যে, এতে দু'টি বক্তব্যের মধ্যে সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধিত হয়। একটি হাদীসে এই ব্যাখ্যার সমর্থনও পাওয়া গেছে। হাদীসটি ইবনে আবূ শায়বা রহ. তার মুসান্নাফে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটিতে হযরত আবূ হুরায়রা রা. তাকবীরে তাহরীমার সময় মানুষের হাত তোলার বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

منكم من يقول هكذا ورفع سفيان (بن عيينة) يديه حتى تجاوز بهما رأسه ومنكم من يقول هكذا ووضع يديه عند بطنه ومنكم من يقول هكذا يعني حذو منكبيه (رقم ٢٤٢٢)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ এমন করে, সুফিয়ান (ইবনে উয়ায়না) হাত তুলে মাথার উপর নিয়ে গিয়ে দেখালেন। আর কেউ এমন করে, সুফিয়ান পেট পর্যন্ত হাত তুললেন, আর কেউ এমন করে অর্থাৎ কাঁধ পর্যন্ত হাত তোলে। (হা. ২৪২২) এখানে وضع يديه عند بطنه পেট বরাবর হাত তোলার কথা বলা হয়েছে। হাত বাঁধার কথা বলা হয়নি। তেমনি ইসহাক রহ. সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين এর অর্থ হবে, তিনি কুনুতের সময় উভয় হাত বুক বরাবর বা বুকের নীচ পর্যন্ত ওঠাতেন।

তাছাড়া ঐ উদ্ধৃতিতে 'বুকের উপর রাখতেন' শুধু এতটুকু বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, বুকের উপর বা নীচে রাখতেন। নীচে রাখলে তো আলবানী সাহেবের মতলব প্রমাণিত হয় না।

এটাও কম আশ্চর্যের নয় যে, আলবানী সাহেব ইসহাক র.এর ঐ স্পষ্ট বক্তব্যটি উল্লেখ না করে কুনুতে হাত বাঁধার– যা আসলে হাত তোলার– একটি অস্পষ্ট বক্তব্যের উদ্ধৃতি টেনেছেন।

উল্লেখ্য, হাত বাঁধার যে সহীহ নিয়ম পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, সে নিয়মে হাত বাঁধলে বুকের উপর রাখা প্রায় অসম্ভব।

আরেকটি কথা, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা যেভাবে হাত বাঁধেন, তাতে বুকের উপরে বাঁধা হয় না, হয় বুকের নীচে। আমি তাদের একজনকে বিষয়টি বলেছিলাম। তিনি আমার সামনে হাত বেঁধে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। শেষে বললেন, এটাতো কখনোই চিন্তা করিনি। আমি

বললাম, এবার চিন্তা করুন। হাদীস বলবেন বুকের উপর হাত বাঁধার, আর আমল করবেন বুকের নীচে হাত বাঁধার, তা হয় না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

এ মাসআলায় আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধু মুযাফফর বিন মুহসিন তার লেখা 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছা:)এর ছালাত' নামক বইটিতে যেসব দলিলপ্রমাণ পেশ করেছেন, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

১. বুকের উপর হাত বাঁধার ছহীহ হাদীছসমূহ শিরোনামে লেখক এক নম্বরে হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আমরাও এটি প্রথম নম্বরে উল্লেখ করেছি। উক্ত হাদীসে আছে, মানুষকে এই আদেশ দেওয়া হতো যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে।

এ হাদীসটি বুকে হাত বাঁধার দলিল হলো কী করে, তা এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। হাজার বছর যাবৎ বুখারী শরীফের অসংখ্য ভাষ্যকার তাদের একটি ভাষ্যগ্রন্থেও এ ইঙ্গিত দেননি যে, এ হাদীস থেকে বুকের উপর হাত বাঁধা প্রমাণিত হয়। আবার মহান পূর্বসূরিগণের মধ্যে বুকে হাত বাঁধার আমল না থাকাও প্রমাণ করে যে, তারাও এ হাদীসটির অনুরূপ মর্ম বোঝেন নি। তাহলে লা-মাযহাবী বন্ধুরা এটা কোত্থেকে পেলেন?

তাছাড়া উক্ত হাদীসে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখতে বলা হয়েছে, ডান হাতের বাহু বাম হাতের বাহুর উপর রাখতে বলা হয় নি। বাম হাতের বাহুর বিপরীতে ডান হাত বলায় স্পষ্টত বুঝে আসে, এখানে কব্জি পর্যন্ত ডান হাতকে বোঝানো হয়েছে। আর এর ব্যাখ্যা এসেছে হযরত ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটিতে।

২. এরপর লেখক ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, অতঃপর তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন। এরপর লেখক বলেছেন, উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছা:) ডান হাতটি পুরো বাম হাতের উপর রাখতেন। এমতাবস্থায় হাত নাভির নীচে

যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এইভাবে হাত রেখে নাভীর নীচে স্থাপন করতে চাইলে মাজা বাঁকা করে নাভির নীচে হাত নিয়ে যেতে হবে, যা উচিত নয়।

আফসোস! হাদীসটি নিয়ে লেখক একটিবারও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন নি। এটি কিভাবে প্রমাণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত পুরো বাম হাতের উপর রাখতেন। এ হাদীসটি দিয়েই তো বুখারী শরীফের ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হযরত সাহল রা.এর হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহল রা. বর্ণিত হাদীসে যে যেরা' বা বাহুর কথা বলা হয়েছে, সেখানে পুরো বাহু বোঝানো হয় নি, বরং বাহুর অংশবিশেষকে বোঝানো হয়েছে।[১] শাওকানী সাহেবও একই কথা বলেছেন। তাহলে লেখক বলবেন কি, এই তিনজনের বক্তব্যের মর্ম কি? সউদী আরবের প্রথম ও প্রধান মুফতী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রহ. যে ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের কব্জি চেপে ধরাকে (قبض رسغ اليد اليسرى بكف اليد اليمنى) সুন্নত সাব্যস্ত করেছেন (দ্র. ফাতাওয়া, ২/২০৭) তারই বা অর্থ কী?

বুখারী শরীফে হযরত আলী রা. সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, তিনি তার ডান হাতের তালু বাম হাতের কব্জির উপর রেখেছেন, এ হাদীসে কী বোঝানো হয়েছে? এমনিভাবে সুনানে দারিমীতে উদ্ধৃত ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটিতে যে বলা হয়েছে, قريبا من الرسغ কব্জির কাছাকাছি (হাত

---

[১] জনৈক বন্ধু, খুব সম্ভব তিনি আমাদের এই বন্ধুটিই হবেন, আমার এই বইয়ের প্রথম দুটি মাসআলার জবাব নেটে ছেড়েছেন। সেখানে তিনি এই দাবি করেছেন, নামাযের ভেতরের বিষয় সম্পর্কে যত হাদীসে হাত কথাটি এসেছে, সব জায়গায়ই পুরো হাত বোঝানো হয়েছে। কব্জি পর্যন্ত হাত বোঝানো হয় নি। এই বন্ধুটি হয়তো ভেবেছেন, নেটের পাঠক হলো সাধারণ শিক্ষিত যুবক শ্রেণি। তাদের পক্ষে এ দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তাই দাবিটি সহজে মার্কেট পেয়ে যাবে।

মনে রাখবেন, এমন দাবিও এক ধরনের হাদীসবিকৃতি। যেসব হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সা. রুকুর সময় হাঁটুতে হাত রাখতেন, সেজদার সময় মাটিতে হাত রাখতেন, এবং তাশাহহুদের সময় ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন, সেসব হাদীসে কি কব্জি পর্যন্তই হাতকে বোঝানো হয় নি? তবে কি সেজদার সময় কনুই পর্যন্ত হাত মাটিতে রাখবে?

রেখেছেন), উক্ত হাদীসেরই বা মর্ম কী? তাবেয়ী আবু মিজলাযের যে আছারটি গত হয়েছে সেটিরই বা মর্ম কী?

সেই সঙ্গে ইবনে খুযায়মা রহ. তার সহীহ গ্রন্থে ও ইবনুল মুনযির রহ. তার আল-আওসাত গ্রন্থে ওয়াইল রা. বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটির উপর যে অনুচ্ছেদ শিরোনাম উল্লেখ করেছেন, এবং ৯৭ নং পৃষ্ঠায় আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায রহ. এর উল্লিখিত ফতোয়ায় আলোচ্য হাদীসটির যে মর্ম তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে তাঁরাই বা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৩. এরপর লেখক তাউস (তাবেঈ) বর্ণিত মুরসাল বা সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যেখানে তাউস রহ. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাত বুকের উপর বাঁধতেন।

হাদীসটি সম্পর্কে লেখক মুযাফফর বিন মুহসিনের মন্তব্য হলো, উক্ত হাদীছকে অনেকে নিজস্ব গোঁড়ামী ও ব্যক্তিত্বের বলে যঈফ বলে প্রত্যাখ্যান করতে চান। মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যের তোয়াক্কা করেন না। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ বলে পরিচয় দিতে চান। অথচ আলবানী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, আবু দাউদ তাউছ থেকে এই হাদীছ ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি অন্যের দাবি খণ্ডন করে বলেন,

وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل لأنه صحيح السند إلى المرسل وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه آنفا فكان حجة عند الجميع.

অর্থাৎ এ হাদীসটি মুরসাল হলেও তা সকল আলেমের দৃষ্টিতে প্রামাণ্য। যদিও মুরসাল হাদীস সম্পর্কে তাদের মতভিন্নতা রয়েছে, কেননা মুরসিল বা সূত্রবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনাকারী (তাউস) পর্যন্ত এর সনদ সহীহ। আবার এ মর্মে অবিচ্ছিন্নসূত্রে অনেক বর্ণনা এসেছে। যার প্রতি আমরা একটু পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি। সুতরাং এটি সকলের দৃষ্টিতে প্রামাণ্য।

এ হলো আলবানী সাহেবের বক্তব্যের সঠিক অনুবাদ, যদিও তার বক্তব্যটি আপত্তিকর। কিন্তু আমাদের মুযাফফর ভাই লম্ফঝম্পে খুব দক্ষ

হলেও উসূলে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি ও আরবী ভাষা সম্পর্কে একেবারে আনাড়ী হওয়ার দরুন এ বক্তব্যের যে অনুবাদ করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর ও লজ্জাজনক। তিনি লিখেছেন, তাউস যদিও মুরসাল রাবী তবু তিনি সকল মুহাদ্দিছের নিকট দলীলযোগ্য। কারণ তিনি মুরসাল হলেও সনদের জন্য ছহীহ। তাছাড়াও এই হাদীছ মারফূ হিসাবে অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি আমি এই মাত্রই উল্লেখ করলাম। অতএব তা সকল মুহাদ্দিছের নিকট দলীলযোগ্য।

আসলে লেখকের এইটুকু জ্ঞানও নেই যে, মুরসাল বলা হয় সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীসকে আর মুরসিল হলো সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীসের বর্ণনাকারী। আর এ কারণেই আরবী উদ্ধৃতিটুকুতে যের যবর লাগাতেও তিনি ভুল করেছেন। তাছাড়া وهو সর্বনামটি দ্বারা হাদীসটিকে বোঝানো হয়েছে। অথচ তিনি এটা দ্বারা তাউসকে বুঝিয়েছেন। আর এ কারণেই সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যটির ভুল অনুবাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার তো বুঝেই আসে না, এত অল্প পুঁজি আর চালান নিয়ে এরা কিভাবে কিতাব লেখার সাহস করে?

যাহোক, মূল কথায় আসি। এ হাদীসটি মুরসাল। আর মুরসাল হাদীসকে লা-মাযহাবী বন্ধুরা প্রামাণ্য মনে করেন না। তার প্রমাণ, মহিলাদের নামাযের ভিন্নতা বিষয়ে হানাফীরা আবু দাউদ বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস ও সেই সঙ্গে সালাফ বা মহান পূর্বসূরি সাহাবা তাবিঈন ও আইম্মায়ে মুহজতাহিদীনের ফাতাওয়া দলিলরূপে পেশ করলে তারা মুরসাল বলে সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেদেরকে সালাফী বলে দাবি করলেও সালাফের ফাতাওয়া তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। সুতরাং এ মুরসাল হাদীসটিকে– যার উপর সালাফের কারো আমলও নেই– সহীহ ও প্রামাণ্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালানোর অর্থ কি?

পেছনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর লেখক হযরত ওয়াইল বর্ণিত বুকের উপর হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। পেছনে এর দুর্বলতার অনেক কারণ আমরা সবিস্তারে তুলে ধরেছি।

৪. এরপর লেখক হুলব আত তাঈ রা. বর্ণিত হাদীসটি তুলে ধরেছেন। পেছনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর প্রতি অভিযোগ

মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, কিন্তু কোন কোন মনীষী দুই ধরনের আমলের প্রতি শিথিলতা প্রকাশ করেছেন। এরপর লেখক ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। পূর্বে আমরা তা তুলে ধরেছি। লেখক বলেছেন, ইবনু কুদামাও অনুরূপ বলেছেন। এরপর পর্যালোচনা শিরোনামে লেখক আরো বলেছেন, উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) বুকের উপর হাত রেখে ছালাত আদায় করেছেন। সুতরাং অন্য কারো আমল ও কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। তবে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) যেমন অন্যের ব্যক্তিগত আমলের কথা বর্ণনা করেছেন, তেমনি ইবনু কুদামাও কেবল হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। যা পাঠকের সামনে পরিস্কার।

লেখকের এ দাবি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযীর সাধারণ রীতি হলো, প্রতিটি অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীস অনুসারে সাহাবা তাবিঈন, তাবে তাবিঈন ও আয়েম্মায়ে দীনের মধ্যে কারা আমল করেন তা তুলে ধরা। তাই ব্যক্তিগত আমলের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। লেখক কি বলতে চান, তাদের ব্যক্তিগত আমল হাদীস ও সুন্নাহ মোতাবেক ছিল না?

সালাফ বা পূর্বসূরিগণের কারো আমল যে বুকে হাত বাঁধা ছিল না, সে কথা যে কেবল ইমাম তিরমিযী ও ইবনে কুদামার আলোচনা থেকে পরিস্কার হয় তা নয়, ইখতিলাফুল আইম্মা গ্রন্থে ইমাম তাহাবী (মৃত্যু ৩২১ হিজরি) ও আল আওসাত গ্রন্থে ইমাম ইবনুল মুনযির (মৃত্যু ৩১৯ হিজরি)– এ দুজনের আলোচনা থেকেও তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এমনিভাবে ইবনে হাযম জাহিরী (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরি) তার আল মুহাল্লা গ্রন্থে বুকের উপর হাত বাঁধার ইশারা পর্যন্ত করেন নি। কারো আমল এমন ছিল সেকথাও বলেন নি। ইবনে আব্দুল বারও (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) তার তামহীদ গ্রন্থে (২০/৭৫) নাভীর নীচে ও উপরে হাত বাঁধার আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধার আমলের কথা উল্লেখ করেন নি। একইভাবে ইমাম বাগাবী (মৃত্যু ৫১৬ হিজরি) তার শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে সাহাবা ও তাবিঈনের আমল তুলে ধরেছেন। কিন্তু বুকে হাত বাঁধার আমল সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। ইবনে হুবায়রা শায়বানী (মৃত্যু ৫৬০ হি) তার ইখতিলাফুল আইম্মাতিল উলামা গ্রন্থে পূর্বসূরি আলেম ও

ইমামগণের মতামত ও আমল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধার আমলের প্রতি ইঙ্গিতও করেন নি। শুধু নাভীর নীচে ও উপরে হাত বাঁধার আমলের কথা তুলে ধরেছেন। (দ্র, ১/১০৭) আল্লামা জামালুদ্দীন আর রায়মী (মৃত্যু ৭৯২ হি) তার আল মাআনিল বাদীআহ ফী ইখতিলাফি আহলিশ শারীআহ গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পাশাপাশি শিয়া যায়দিয়া ও শিয়া ইমামিয়া (১২ ইমামের মতবাদে বিশ্বাসী) দের ফতোয়া ও আমলও তুলে ধরেছেন। কিন্তু হাত বাঁধার মাসআলায় নাভীর নীচে ও উপরের আমল ও ফতোয়ার কথা উল্লেখ করলেও বুকের উপর হাত বাঁধার আমলের কথা উল্লেখ করেন নি। (দ্র, ১/১৩৬) এই বিগত শতকে লা-মাযহাবী ঘরানার শীর্ষ আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত্যু ১৩০৭ হি) শাওকানীর আদ দুরারুল বাহিয়্যাহ গ্রন্থের ভাষ্য আর রাওযাতুন নাদিয়্যাহ গ্রন্থে (১/৯৭-৯৮) লিখেছেন, ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان لأن كلا منهما مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ নাভীর নীচে ও উপরে হাত বাঁধা দুটিই সমান। কেননা দুটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এরপর তিনি তাদের কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম তিরমিযীর বক্তব্য ও ইবনুল হুমামের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধার কোন কথাই উল্লেখ করেন নি।

হানাফীদের দলিল ও লেখকের মন্তব্য

লেখক নাভীর নীচে হাত বাঁধার ছয়টি দলিল উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আলী রা. ও আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস দুটির সনদ দুর্বল। আমরাও এই দুর্বলতার কথা তুলে ধরেছি। তবে আমরা এ দুটি সাক্ষী বর্ণনারূপে তুলে ধরেছি। লা-মাযহাবী বন্ধুদের রীতি অনুসরণ করলে এ দুটিকেও সহীহ বলা যেত। বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে ওয়াইল বর্ণিত হাদীসটির সনদ দুর্বল। এর দুর্বলতার কথা আলবানী সাহেবসহ লা-মাযহাবী বন্ধুরাও মেনে নিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও এর সমর্থনে সহীহ হাদীস আছে দাবি করে আলবানী সাহেব এটিকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। সে

হিসাবে উক্ত বর্ণনাদুটির সমর্থনেও যেহেতু সহীহ হাদীস রয়েছে। তাই একই রীতিতে এ দুটিকেও সহীহ বলা যায়। তৃতীয় হাদীসটি হযরত আনাস বর্ণিত ও ইবনে হাযমের আল মুহাল্লা গ্রন্থে উদ্ধৃত। এটি সম্পর্কে লেখক বলেছেন, বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। মুহাদ্দিস যাকারিয়া বিন গোলাম কাদের বলেন, এই শব্দে কেউ কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, আমি এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে অবগত নই।

আমাদের বক্তব্য হলো, ইবনে হাযম তো আপনাদের ঘরানার লোক। তিনিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস উদ্ধৃত করেন?! যাকারিয়া বিন গোলাম কাদের মুহাদ্দিস নন, প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিও নন। তবে তার যে আরবী বক্তব্য লেখক টীকায় উল্লেখ করেছেন তাতে আবারও প্রমাণিত হলো, লেখক আরবী ভাল বোঝেন না। যাকারিয়া সাহেব বলেছেন, তিনি (ইবনে হাযম) এর কোন সনদ উল্লেখ করেন নি। বরং মুআল্লাক (সূত্রবিহীন)রূপে উদ্ধৃত করেছেন। একথা তো ঠিক আছে। কিন্তু এতে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হওয়া অনিবার্য হয় না। মুবারকপুরী সাহেবও এর সনদ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি। এটাও কোন দলিল নয়। হাদীসটির সনদের আংশিক তুলে ধরেছেন বায়হাকী তার খিলাফিয়াত গ্রন্থে। তিনি বলেছেন,

وروى سعيد بن زربي عن ثابت عن أنس قال : من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخيرالسحور ووضعك يمينك على شمالك في الصلاة تحت السرة. تفرد به ابن زربي وليس بقوي (مختصر الخلافيات ٢/٣٤)

অর্থাৎ সাঈদ ইবনে যারবী এটি বর্ণনা করেছেন ছাবিত রহ.এর সূত্রে আনাস রা. থেকে। তিনি বলেছেন, নবীচরিত্রের মধ্যে রয়েছে ইফতার সময় হলেই করা, সেহরি বিলম্বে খাওয়া ও নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে রাখা। ইবনে যারবী একাকী এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মজবুত নন।

সুতরাং এটাকে যঈফ বলা যেতে পারে। ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলা কোনভাবেই উচিত নয়।

চার নম্বরে লেখক হযরত ওয়াইল রা. বর্ণিত নাভীর নীচে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। নাভীর নীচে কথাটুকু হাদীসে নেই। সুতরাং এই অংশটুকু জাল করা হয়েছে। অতঃপর লেখক তার এই দাবির পক্ষে শায়খ হায়াত সিন্ধির বক্তব্য তুলে ধরেছেন। হায়াত সিন্ধি দাবী করেছেন, তিনি মুসান্নাফের কোন পাণ্ডুলিপিতে এ অংশটুকু পান নি।

কিন্তু হায়াত সিন্ধি হাদীসটি পাননি বলে এটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হয়ে যাবে– এটা কেমন কথা? যারা পেয়েছেন বলে বলেছেন, তারা কি মিথ্যা বলেছেন? হায়াত সিন্ধির ইন্তেকাল হয় ১১৬৩ হি. সালে। তারই সমসাময়িক ছিলেন মুহাম্মদ কায়েম সিন্ধি (মৃত্যু ১১৫৭ হি.)। তিনি শেষ জীবন হিজায তথা মক্কা-মদীনাতেই কাটিয়েছেন এবং সেখানেই হাদীস শরীফের অধ্যাপনার খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি তার ফাওয়ুল কিরাম গ্রন্থে লিখেছেন,

بأن القول بكون هذه الزيادة غلطا مع جزم الشيخ الحافظ قاسم بعزوها إلى المصنف ومشاهدتي إياها في نسخة ووجودها في نسخة في خزانة الشيخ عبد القادر المفتي في الحديث والأثر لا يليق بالإنصاف. قال : ورأيته بعيني في نسخة صحيحة عليها الأمارات المصححة. (آثار السنن، ص ٩٠)

অর্থাৎ হাদীসের হাফেয শায়খ কাসেম (ইবনে কুতলুবুগা) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এ অংশটুকু মুসান্নাফে আছে। আমি নিজেও একটি পাণ্ডুলিপিতে তা দেখেছি। এটি শায়খ মুফতী আব্দুল কাদের সাহেবের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেও বিদ্যমান আছে। এত কিছুর পরও এটাকে ভুল বলা ইনসাফের কথা হতে পারে না। আমি তো নিজ চোখে বিশুদ্ধ একটি পাণ্ডুলিপিতে এঅংশটুকু দেখেছি। (আছারুস সুনান, পৃ. ৯০)

একইভাবে মুহাম্মদ হাশেম সিন্ধি (মৃত্যু ১১৭৪ হি.,) তার তারসীউদ দুররাহ আলা দিরহামিস সুররাহ গ্রন্থে তিনটি পাণ্ডুলিপিতে হাদীসটি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১. আল্লামা হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলূবুগার পাণ্ডুলিপি, ২. মক্কা শরীফের মুফতী আল্লামা আব্দুল কাদের ইবনে আবু বকর আস সিদ্দিকীর নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। ৩. আল্লামা

মুহাম্মদ আকরাম সিন্ধির (মৃত্যু ১১৩০ হি.) নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি। দ্বিতীয় দুটি পাণ্ডুলিপি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন বলেও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫)

এমনিভাবে এটি আল্লামা মুহাম্মদ আবেদ সিন্ধির (মৃত্যু ১২৫৭ হি.) নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ছিল ও আছে। আল্লামা মুরতাযা হাসান যাবীদীর (মৃত্যু ১২০৫ হি.) নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতেও এটি ছিল ও আছে। বর্তমানে এই পাণ্ডুলিপিটি তিউনিসে আছে। এর একটি ফটোকপি মদীনা ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই দুটি পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পাদনাপূর্বক মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার যে সংস্করণ তৈরি করেছেন, যা ছাব্বিশ খণ্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ৩৯৫৯ নম্বরে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে উক্ত দুটি পাণ্ডুলিপির যে যে পৃষ্ঠায় হাদীসটি উদ্ধৃত রয়েছে তার ফটোও তুলে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ৭ নং দলিলে তাবেঈ আবু মিজলায রহ.এর বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন, উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর সনদ বিচ্ছিন্ন।

লেখক এখানে আরবী মাকতূ শব্দটির অর্থ করেছেন 'সনদ বিচ্ছিন্ন'। একথাও প্রমাণ করে তিনি উসূলে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ! মাকতূ শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলো, তাবিঈর বক্তব্য বা আমল। এ বর্ণনাটির সনদ মজবুত এবং এটি কোন সহীহ হাদীসের বিরোধী নয়। সুতরাং অন্যান্য সহীহ বর্ণনার সমর্থক হিসাবে এটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

এরপর ৯ নং দলিল উল্লেখ করে তাহকীক শিরোনামে লেখক বলেছেন, ইমাম আহমদ (রহঃ) নাভীর নীচে হাত বাঁধার বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক যঈফ। সুতরাং উক্ত বর্ণনার দিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ইমাম নববী ও আলবানী গ্রহণ করেন নি। ইমাম আহমদ সম্পর্কে নাভীর নীচে ও উপরে দুই ধরনের কথা এসেছে। মূলত তা সন্দেহযুক্ত। যেমনটি দাবি

করেছেন কাযী আবু ইয়ালা আল ফার্র। সুতরাং তার পক্ষ থেকে বুকের উপর হাত বাঁধাই প্রমাণিত হয়। যাকে ইমাম আবু দাউদ ছহীহ বলেছেন।'

লেখক এখানে অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। বরং তদনুযায়ী আমল করেছেন এবং ফতোয়াও দিয়েছেন। হ্যাঁ, আব্দুর রহমানকে তিনি যঈফ বলেছেন। তিনি তো বলেন নি– এ ক্ষেত্রে আর কোন বর্ণনা নেই। রাবীকে যঈফ বলা আর তার বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা এক জিনিস নয়। এক্ষেত্রে যদি আর কোন বর্ণনা না-ও থাকত, তথাপি রাবীকে যঈফ বলার কারণে তার বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা প্রমাণিত হতো না।

দেখুন, একটি হাদীসে আছে, মুচি ও হাজ্জাম (যে শিংগা লাগায়) ছাড়া অন্য সকল মানুষ (বংশগতভাবে) সমান। এ হাদীসকে ইমাম আহমদ যঈফ বলেছেন। কিন্তু তার ছাত্র মুহান্না বলেছেন, তাঁকে (আহমদকে) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এ হাদীসকে যঈফ বলেন, আবার এটি গ্রহণও করেন? উত্তরে তিনি বলেন, إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه আমরা এর সনদকে যঈফ বলি, কিন্তু আমল তো এর উপরই। (নুকাতুয যারকাশী. ২/৩১৩)

আর আলোচ্য মাসআলায় তো আব্দুর রহমানের বর্ণনা ছাড়াও আরো সহীহ হাদীস, তাবিঈগণের আমল ও ফাতাওয়া বিদ্যমান আছে।

লেখক বলেছেন, 'ইমাম নববী এটা গ্রহণ করেন নি।' ভাল কথা, কিন্তু তিনি তো বুকের উপর হাত বাঁধাকেও গ্রহণ করেন নি। ইমাম নববী তার শারহুল মুহাযযাবে বলেছেন, ويجعلهما تحت صدره وفوق سرته وهذا هو الصحيح المنصوص উভয় হাত নাভীর উপরে বুকের নীচে রাখবে। এটাই সঠিক ও (ইমাম শাফেয়ী রহ.এর) স্পষ্ট বক্তব্য।

লেখক বলেছেন, ইমাম আহমদ সম্পর্কে নাভীর নীচে ও উপরে দুই ধরনের কথা এসেছে। মূলত তা সন্দেহযুক্ত। যেমনটি দাবি করেছেন কাযী আবু ইয়ালা আল ফার্র।

লেখক এখানে ফাররাকে ফার্র বানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি কাযী আবু ইয়ালা আল ফাররার উপর মিথ্যারোপ করেছেন। কারণ কাযী সাহেব কোথাও এমন দাবি করেন নি। লেখক তার গ্রন্থের টীকায় কাযী সাহেবের আল মাসাইলুল ফিকহিয়্যাহ গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করেছেন। অথচ উক্ত গ্রন্থে কাযী সাহেব কত স্পষ্ট বলেছেন,

واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد : أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة. وروى أبو جحيفة عن علي عليه السلام . قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة.

ونقل عبد الله قال رأيت أبي إذا صلى وضع يمينه على شماله فوق السرة، وهذا يحتمل أن يكون ظناً من الراوي أنها كانت على السرة، ويحتمل أن يكون سهواً من أحمد في ذلك.

অর্থাৎ হাত কোথায় বাঁধা হবে তা নিয়ে (হাম্বলী মাযহাবে) দুরকম বর্ণনা রয়েছে। (ইমাম আহমদ) থেকে ফাদল ইবনে যিয়াদের বর্ণনা হলো, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নীচে রাখবে। এ বর্ণনাটিই খিরাকী রহ. পছন্দ করেছেন। এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। এরপর তিনি আবু হুরায়রা রা. ও আলী রা.এর বর্ণনাদুটি উল্লেখ করে বলেন, আর আব্দুল্লাহ (ইবনে আহমদ) উল্লেখ করেছেন, আমি আব্বুকে দেখেছি, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর উপরে রাখতে। এটা (অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণনাটা) হতে পারে বর্ণনাকারীর ধারণায় নাভীর উপরে ছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, আহমদ রহ. অসতর্কতাবশত এমনটি করেছেন। (আল মাসাইলুল ফিকহিয়্যাহ, ১/৩২)

এ হলো কাযী আবু ইয়ালার পূর্ণ বক্তব্য। তিনি হাম্বলী মাযহাবের বড় আলেম ছিলেন। নাভীর নীচে হাত বাঁধার বর্ণনাটিকে তিনি অগ্রগণ্য ও

বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়ে নাভীর উপরে হাত বাঁধার বর্ণনাটির একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেয়েছেন। অথচ লেখক মুযাফফর বিন মুহসিন তার বরাত দিয়ে পাঠককে কত বড় ধোঁকায় ফেলতে চেয়েছেন!

পরিশেষে লেখক বলেছেন, সুতরাং তার পক্ষ থেকে বুকের উপর হাত বাঁধাই প্রমাণিত হয়, যাকে ইমাম আবু দাউদ সহীহ বলেছেন।

লেখক এখানে ইমাম আবু দাউদের উপরও মিথ্যারোপ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসকে সহীহ বলেন নি। বরং হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর কোন মন্তব্য না করে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। নিরবতা অবলম্বন আর সহীহ বলা এক কথা নয়।

যেসব হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাউদ নিরবতা অবলম্বন করেছেন সেগুলোর মধ্যে সহীহ হাসান ও যঈফ সব ধরনের হাদীসই রয়েছে। লেখকের জানা না থাকলে আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনুস সালাহ গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর মন্তব্য এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে (ইমাম আবু দাউদের জীবনী আলোচনায়) হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবীর বক্তব্য পড়ে দেখতে পারেন।

যদি কথার কথা ধরেও নিই, ইমাম আবু দাউদ বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসকে ছহীহ বলেছেন, তবে সেটা ইমাম আহমদের মাযহাব হওয়া প্রমাণিত হবে কী করে? দুটি বিষয়ের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লেখক কোত্থেকে আবিষ্কার করলেন?

যদি বলেন, ইমাম আবু দাউদ তার শিষ্য তো তাই। তাহলে বলব, বড় আশ্চর্য কথা, শিষ্যরা হাদীসকে সহীহ বলবেন, আর তার দ্বারা ইমামগণের মাযহাব প্রমাণিত হবে! এ দুটি কথার মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক হলো কী করে! যদি বলেন, ঐ যে ইমামগণ থেকে একটি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে– إذا صح الحديث فهو مذهبي হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব– তাহলে বলব, ভূমিকায় এ উক্তিটির মর্ম ও শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখান থেকে এর উত্তর জেনে নিন।

আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আহমদ স্পষ্ট বলেছেন, বুকের উপর হাত বাঁধা মাকরূহ। তার এ কথা স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ স্বীয় মাসাইল সংকলনে উল্লেখ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের আরেক শীর্ষ আলেম ইবনে

মুফলিহ তার আল ফুরু গ্রন্থে লিখেছেন, ويكره وضعها على صدره نص عليه বুকের উপর হাত রাখা মাকরুহ। আহমদ রহ. একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ ইমাম আহমদ থেকে এ ফতোয়া উল্লেখ করেছেন যে, فوق السرة قليلا وإن كان تحت السرة فلا بأس به হাত নাভীর সামান্য উপরে রাখবে, নাভীর নীচে রাখলেও কোন অসুবিধা নেই। (দ্র. মাসাইলে আহমদ, লি আবী দাউদ, ১/৪৮) আহমদ রহ.এর আরেক শীর্ষ শিষ্য ইসহাক ইবনে মানসুর আল কাওসাজও তার উস্তাদের মত উল্লেখ করেছেন যে, নাভীর উপরে বা নীচে হাত রাখবে। ইমাম আহমদের আরেকজন অন্যতম শিষ্য ফাদল ইবনে যিয়াদ উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমদের মত হলো নাভীর নীচে রাখা। এতসব মজবুত প্রমাণাদি থাকার পরও মুযাফফর বিন মুহসিন ইমাম আহমদের মাযহাব হিসাবে তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন বুকের উপর হাত বাঁধা। কিন্তু লেখককে মনে রাখতে হবে, গায়ের জোরে বলা ও কলমের জোরে লেখার দিন ফুরিয়ে গেছে।

ছানা কোনটি পড়া উত্তম?

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

ছানা কোনটি পড়া উত্তম?

হাদীস শরীফে একাধিক ছানার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম আহমাদ র. দুজনেরই মত হলো, নামাযে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার পর এভাবে ছানা পড়া উত্তম:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

এমতের পক্ষে প্রমাণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, وسبح بحمد ربك حين تقوم অর্থ: যখন তুমি দাঁড়িয়ে যাবে, তখন তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (সূরা তূর, ৪৮)

দাহহাক র. বলেছেন, উক্ত আয়াতের মর্ম হলো নামাযে এই ছানা পাঠ করা:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর ৪খ. ১৮২পৃ.।

ইমাম তিরমিযী র. লিখেছেন, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم অর্থাৎ তাবেয়ীন ও অন্যান্য আলেমগণের অধিকাংশের আমল হলো- এই ছানা পাঠ করা।

২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أخرجه النسائي(٨٩٩،٩٠٠) والترمذي (٢٤٢) وأبو داود (٧٧٥) وابن ماجه(٨٠٤)، كلهم من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عنه.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় বলতেন,

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ৮৯৯,৯০০; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪২; আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৭৫; ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং ৮০৪। হাদীসটি সহীহ।

৩. হযরত আয়েশা রা. বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عنها، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه قاله الترمذي (٢٤٣) وأخرجه أبو داود من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عنها(٧٧٦)

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৪৩; আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৭৬। আবূ দাউদের সনদ বা সূত্রকে আল্লামা আহমাদ শাকের র. তিরমিযী শরীফের টীকায় সহীহ বলেছেন।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

كان رسول الله يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك وكان عمر يعلمنا ويقول كان رسول الله يقوله. أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٢٦) فيه علي بن عباس وهو ضعيف، قال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, আমরা যখন নামায শুরু করি, তখন যেন বলি,

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.ও এমনটি করতেন। তিনি আমাদেরকে শেখাতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এভাবে বলতেন। তাবারানী, আল-আওসাত, হাদীস নং ১০২৬।

এর সনদে আলী ইবনে আব্বাস আছে। তিনি দুর্বল। ইবনে আদী বলেছেন, দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদীস লেখা বা সংগ্রহ করা যায়।

৫. হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন,

عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٠٣٩) والدارقطني : ١٠/٣٠٠، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. ٢/٢٢٨[١]

---

[١] قال الراقم: وفيه عائذ بن شريح، قال أبو حاتم: في حديثه ضعف، لكن أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٧٣٥) والدارقطني في سننه (١/٣٠٠، رقم ١٢) من طريق أبي يعلى قال حدثنا الحسين بن الأسود (وهو الحسين بن عليّ بن الأسود العجلي الكوفي من رجال أبي داود والترمذي) حدثني محمد بن الصلت نا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس نحوه، والحسين شيخ أبي حاتم لقيه وسمع منه وقال فيه: صدوق وروى عنه بقيّ بن مخلد أيضا وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ، وروى له في صحيحه (رقم ٣٤٥١) وروى له أبو داود والترمذي وأما ابن عدي والأزدي فأفرطا فيه حيث قال الأول: يسرق الحديث وأحاديثه لا يتابع عليه، وقال الثاني: ضعيف جدا يتكلمون في حديثه.

أما تهمة ابن عدي إياه بسرقة الحديث فلم أجد له أصلا في كلام من تقدمه وأما استدلاله عليه بما استدل به فليس بصريح فيه، ولذا لم يقبله المتأخرون. فقد قال ابن

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন الله أكبر বলতেন তখন উভয় কান বরাবর হাত উঠাতেন। আর বলতেন,

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

তাবারানী, আল-আওসাত, হাদীস নং ৩০৩৯। হায়ছামী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগণকে বিশ্বস্ত বলা হয়েছে।

তবে এতে আইয ইবনে শুরাইহ নামে একজন রাবী আছেন। আবু হাতেম রাযী তার সম্পর্কে বলেছেন, তার হাদীসে কিছু দুর্বলতা আছে। কিন্তু এর আরেকটি সনদ বা সুত্র আছে আবু ইয়ালা'র মুসনাদে (৩৭৩৫)

الجوزي في التحقيق: هذا إسناد كلهم ثقات، وقال مغلطاي: رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقال الدارقطني نفسه: فيما نقل عنه والزيلعي في نصب الراية ٣٢١/١ والعيني في شرح سنن أبي داود ٣٩١/٣: هذا إسناد كلهم ثقات.

وأما قول ابن عدي: لا يتابع عليه، فيكفي لبطلانه رواية ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى في مسنده ومعجمه والبزار في مسنده وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن بطة في الإبانة الكبرى جملة من أحاديثه التي توبع عليها، فمن شاء فليراجع إليه وبه يبطل قول الأزدي. ولذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق يخطئ كثيرا.

وللحديث طريقين آخرين عند الطبراني في كتاب الدعاء (رقم ٥٠٥، ٥٠٦) وفي إسناد الأول منهما عائذ بن شريح وفيه ضعف ما والثاني صحيح أو حسن على الأقل وإسناده هكذا: حدثنا محمود بن محمد الواسطي حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حميد الطويل عن أنس نحوه .

ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات، قال محقق كتاب الدعاء سعيد بن محمد حسن البخاري: وإسناده حسن. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر.

ও দারাকুতনীতে (১/৩০০)। এর একজন বর্ণনাকারী হুসাইন ইবনে আসওয়াদ সম্পর্কে কিছু বিতর্ক রয়েছে। তবে তার বিশ্বস্ত হওয়াই অগ্রগণ্য। এর অপর একটি সনদ বা সুত্র আছে তাবারানীর আদদুআ গ্রন্থে। ঐ সনদ সহীহ বা কমপক্ষে হাসান।

৬. আবদা র. থেকে বর্ণিত:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. أخرجه مسلم(٣٩٩) باب حُجَّةِ مَنْ قَالَ لاَ يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ. ورواه الدارقطني وفيه: يسمعنا ذلك ويعلمنا، ٣٠١/١

অর্থ: হযরত উমর রা. এই কালিমাগুলো উচ্চস্বরে পড়তেন

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ و تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৩৯৯

দারাকুতনীও এটি উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে একথাও আছে, তিনি আমাদেরকে শোনাতেন এবং শেখাতেন। (১ খ, ৩০১ পৃ.)

قال الشافعي رحمها الله في رسالة أصول الفقه حول تشهد عمر رض: فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلّم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم (رقم ٧٤٠)

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী তার উসূলুল ফিকহ গ্রন্থে উমর রা. এর তাশাহহুদ সম্পর্কে বলেছেন, 'আমরা মনে করি হযরত উমর রা. সাহাবীগণের সামনে মিম্বরে বসে মানুষকে কেবল তাই শিখিয়েছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। (নং ৭৪০) ইমাম শাফেয়ীর একথাটি হুবহু এই ছানার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

ইমাম মাজদুদ্দীন ইবনে তায়মিয়া র. তাঁর মুনতাকাল আখবার গ্রন্থে লিখেছেন,

وجهر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه وهذا يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم غالبا

অর্থাৎ হযরত উমর রা. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে কখনও কখনও মানুষকে শেখাবার জন্য উচ্চস্বরে এই ছানা পাঠ করতেন। অথচ সুন্নত হলো ছানা অনুচ্চস্বরে পড়া। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, নামাযে এই ছানা পড়াই উত্তম। এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই ছানা পাঠ করতেন। (২খ, ২১২পৃ)

হযরত উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে এই ছানা পড়া বর্ণিত হওয়ার কারণে এটি ‘ইসতিফতাহে উমর’ বা উমর রা. এর ছানা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, نحن نذهب إلى استفتاح عمر অর্থাৎ আমরা উমর রা. এর ইসতিফতাহ বা ছানা পাঠকেই অবলম্বন করি। (দ্র. মাসাইলে আহমদ লি আবু দাউদ; মাসাইলে আহমদ লি আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ, নং ২৭০)

৭. ইবনে জুরায়জ র. বলেছেন,

حدثني من أصدق عن أبي بكر ، وعن عمر ،وعن عثمان ، وعن ابن مسعود : أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

অর্থ: আবু বকর রা. উমর রা. উছমান রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যাকে আমি সত্যবাদী মনে করি ।তাঁরা যখন নামায শুরু করতেন, তখন পড়তেন:

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২৫৫৮, তাবারানী, আল-কাবীর, হাদীস নং ৯১৯৮।

শাওকানী র. নায়লুল আওতার গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম সাঈদ ইবনে মানসূর র. তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবু বকর সিদ্দীক রা.ও এই ছানা পড়তেন। দারাকুতনী র. হযরত উছমান রা. সম্পর্কে এবং ইবনুল মুনযির র. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। (দ্র, ২খ, ২১১পৃ)

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম র. 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এই ছানা পাঠ করা উত্তম হওয়ার দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেটিও দেখতে পারেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মুকতাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

মুকতাদী সূরা ফাতেহা পড়বে না

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইমামের পেছনে মুকতাদী সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়বে না। এর প্রমাণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো –

জাহরী নামাযে ফাতেহা না পড়ার দলিল :

১.আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "

অর্থ: আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয় ।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য তাফসীরে তাবারী (৯খ. ১০৩পৃ.) ও তাফসীরে ইবনে কাসীরে (২খ. ২৮পৃ.) এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " يعني في الصلاة المفروضة.

অর্থ : যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয় অর্থাৎ ফরজ নামাযে।

হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর মতও তাই। তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে–

صلى ابن مسعود، فسمع أناسا يقرءون مع الامام، فلما انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا ؟ أما آن لكم أن تعقلوا ؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসঊদ রা. নামায পড়ছিলেন, তখন কতিপয় লোককে ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়তে শুনলেন। নামায শেষে তিনি বললেন – তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি, তোমাদের কি

বোঝার সময় হয় নি? যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। (৯ খ. ১০৩ পৃ.)

যায়দ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া র. বলেছেন–

كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

অর্থাৎ তাঁরা (সাহাবীগণ) ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন, তখন অবতীর্ণ হয়

{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন–

أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة

অর্থাৎ এবিষয়ে সকলেই একমত যে, উক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (মাসাইলে আহমদ লি আবী দাউদ, পৃ. ৪৮)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. লিখেছেন,

في قول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} . مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأنه يستمع له وينصت. التمهيد ١١/٣٠-٣١

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার এ বাণী {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} দ্বারা সকল আলেমের ঐকমত্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো ফরজ নামায, এতে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, ইমাম যখন নামাযে জোরে কেরাত পড়বেন তখন মুকতাদীরা কিছুই পড়বে না, বরং কান পেতে শুনবে ও চুপ থাকবে।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ . قِيلَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ حَالَ جَهْرِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ يَسْمَعُ لَا بِالْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ . وَقِيلَ : بَلْ يَجُوزُ الْأَمْرَانِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ . وَيُرْوَى هَذَا عَنْ الأوزاعي وَأَهْلِ الشَّامِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : بَلْ الْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ . وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } قَالَ أَحْمَد : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ .

অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলেমগণের তিনটি মত রয়েছে। এক, কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়বেন আর মুকতাদী তা শুনবে তখন সে কোন কেরাতই পড়তে পারবে না। সূরা ফাতেহাও না, অন্য কোন সূরাও না। পূর্বসুরী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। ইমাম মালেক র., ইমাম আহমাদ র. ও ইমাম আবূ হানীফা র. প্রমুখের মাযহাবও তাই। আর ইমাম শাফেয়ী র. এর দুটি মতের একটিও অনুরূপ। অতঃপর অন্য দুটি মত উল্লেখ করার পর ইবনে তায়মিয়া র. আরও বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

{ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }

অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবন কর এবং নীরব থাক। তাহলে তোমাদের প্রতিও করুণা করা হবে। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন, আয়াতটি সকলের মতে নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

২. হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. বলেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أوّل ذكر أحدكم التشهد. أخرجه مسلم (٤٠٤) في باب

التشهد في الصلاة، وأحمد في المسند ٤/٤١٥ (١٩٩٦١)، وأبو داود (٩٧٣) وابن ماجه (٨٤٧) واللفظ له. كلهم من طريق سليمان التيمي عن قتادہ عن يونس بن جبير (أبي غَلَّاب) عن حَطّان بن عبد الله الرقَّاشي عنه. وليس سليمان متفردا فيه بل تابعه عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عند الدارقطني والبيهقي، وأبو عبيدة مجّاعة بن الزبير العتابي الأزدي أحد الثقات عند أبي عوانة. وقال مسلم – لما سأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر عن تفرد سليمان–: تريد أحفظ من سليمان؟

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম কুরআন পড়বে, তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। আর বৈঠকের সময় তাশাহহুদ-ই প্রথম পড়তে হবে।

মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪০৪; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৯৭৩; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৮৪৭; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ, ৪১৫ পৃ, হাদীস নং ১৯৯৬১।

ইমাম আহমদ, (দ্র. তামহীদ ১১/৩৪), ইমাম মুসলিম, ইবনুল মুনযির (দ্র. আল আওসাত, ৩/১০৫), ইমাম ইবনে জারীর তাবারী র. (দ্র. তাফসীরে তাবারী, ৯/১০৩) ও ইবনে হাযম জাহেরী (দ্র. আল মুহাল্লা, ২/২৭০) প্রমুখ এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে তায়মিয়াও তার মাজমুউল ফাতাওয়ায় ইমাম মুসলিমের সহীহ বলাকে সমর্থন করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, এটি সহীহ হাদীস। (দ্র. ২/২৪২)

কেউ কেউ মনে করেন, কাতাদার শিষ্যদের মধ্যে সুলায়মান তায়মী একাই হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। কাতাদার অন্যান্য শিষ্যদের বর্ণনায় একথাগুলো নেই। এর জবাব দুভাবে দেওয়া যায়। এক. ইমাম মুসলিম যেভাবে জবাব দিয়েছেন। তার এক ছাত্র হাদীসটি বর্ণনায় সুলায়মানের নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন তুললে তিনি বলেন, 'তুমি কি সুলায়মানের চেয়ে বড় হাফেজে হাদীস চাও?' অর্থাৎ সুলায়মান একজন শীর্ষ হাফেজে হাদীস। তার নিঃসঙ্গ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না হলে আর কার বর্ণনা গ্রহণযোগ্যতা পাবে? তার চেয়ে বড় হাফেজে হাদীস পাওয়া তো দুস্কর।

দুই. সুলায়মান নিঃসঙ্গ নন। দারাকুতনী ও বায়হাকীর বর্ণনায় সাঈদ ইবনে আবূ আরূবা ও উমর ইবনে আমের– দুজনই কাতাদা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১] এমনিভাবে আবূ আওয়ানার বর্ণনায় আবূ উবায়দা মুজ্জাআ ইবনুয যুবায়র[২] (দ্র. ১৮/২০) কাতাদা থেকে সুলায়মানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনজন সঙ্গী থাকতে সুলায়মানকে নিঃসঙ্গ ভাবা ঠিক নয়।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة من طريق أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْه. وتابع أبا خالد

---

[১]দ্র. সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ১২৪৯ ও সুনানে বায়হাকী, হাদীস ২৮৯০। এই সূত্রে সাঈদ ও উমরের শাগরেদ নূহ আল বাসরী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, وليس بالقوي তিনি মজবুত নন। অথচ সালেম হলেন মুসলিম শরীফের রাবী। ইমাম মুসলিম সাঈদ ও উমর ইবনে আমের থেকে সালেমের একাধিক বর্ণনা প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। আবু যুরআ রাযী, ইবনে কানে', ইবনে হিব্বান, আস সাজী ও ইবনে শাহীনের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। আহমাদ বলেছেন, ما أرى به بأسا قد كتبت عنه আমি তার মধ্যে সমস্যার কিছু দেখি না। তার থেকে আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। যাহাবী তাকে সাদূক (দ্র. সিয়ার) সালিহুল হাদীস (দ্র. মুগনী) ও হাসানুল হাদীস (দ্র. ফীমান তুকুল্লিমা ফীহ...) বলেছেন। এজন্য মুগলতাঈ বলেছেন, ورواه البزار عن محمد بن يحي القطعي عن سالم وهو سند صحيح على شرط مسلم বাযযার এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া কুতায়ীর সূত্রে সালেম থেকে, এই সূত্রটি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ।

[২] দ্র. মুসতাখরাজ আবু আওয়ান, হাদীস ১৬৯৮। মুজ্জাআহ ও তার শিষ্য আব্দুল্লাহ ইবনে রুশায়দকে ইবনে হিব্বান ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, مستقيم الحديث সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। সামআনীও একই কথা বলেছেন। মুজ্জাআহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন, لم يكن به بأس তার ব্যাপারে অসুবিধার কিছু ছিল না।

محمد بن سعد الأشهلي أحد الثقات عند النسائي (٩٢٣) والدارقطني ٣٢٧/١ وتابعه أيضا محمد بن ميسر الصاغاني عند أحمد ٣٧٦/٢. وقد تعقب المنذري في تهذيب سنن أبي داود (٥٧٥) إعلال أبي داود بكلام طويل حاصله تصحيح هذه الزيادة والرد على من ضعّفه كأبي داود والدارقطني وإن مسلما صححها من حديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম নিয়োগ করার উদ্দেশ্য তাকে অনুসরণ করা । সুতরাং সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। আর যখন কুরআন পড়বে, তখন তোমরা নীরব থাকবে। যখন সে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে।

আবূ দাউদ, হাদীস নং ৬০৪; নাসাঈ, হাদীস নং ৯২২-৯২৩; ইবনে মাজা, হাদীস নং ৮৪৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৮২০; মুসনাদে আহমদ, ২খ, ৩৭৬ পৃ; দারাকুতনী, ১খ, ৩২৭পৃ।

ইমাম মুসলিম র. বলেছেন, هو عندي صحيح আমার দৃষ্টিতে এটি সহীহ। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪০৪।

ইমাম আবু দাউদের ধারণায় এ হাদীসে 'যখন কেরাআত পড়া হয় তখন চুপ থাকবে' কথাটি আবূ খালেদ আহমার একাই বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি এটাকে আবূ খালেদের ভুল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু নাসাঈ শরীফের বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ নাহশালীও একই উস্তাদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটাকে আবূ খালেদের ভুল বলা ঠিক নয়। আবূ খালেদ ও নাহশালী দুজন তো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। তারা দুজন ছাড়াও মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবনে মুয়াছ্ছার একই উস্তাদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি যঈফ।

উল্লেখ্য, এই হাদীসটির শুরুতে বলা হয়েছে, إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ইমাম নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো তাকে অনুসরণ করা। এ বাক্যটি বুখারী

শরীফে হযরত আয়েশা রা. (হাদীস নং ৬৮৮) ও হযরত আনাস রা. (হাদীস নং ৩৭৮) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ বাক্যটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুকতাদী নীরব থাকবে। কেননা কুরআন পাঠকালে অনুসরণ কিভাবে করা হবে সে প্রসঙ্গে সূরা কিয়ামায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) অর্থাৎ আমি যখন পাঠ করি আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এই 'অনুসরণ' শব্দটির ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে: استمع له وأنصت (হাদীস নং ৫) অর্থাৎ কুরআন পাঠকালে অনুসরণ করার অর্থ হলো কান পেতে শোনা এবং নীরব থাকা। সুতরাং কুরআন পড়ার সময় ইমামকে অনুসরণ করার অর্থও হবে তাই। এতটুকু কথা থেকে বিষয়টি বোঝা গেলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো স্পষ্ট করে এই দুই ও তিন নং হাদীসে বলে দিয়েছেন, ইমাম যখন কুরআন পড়বে তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতেহা পড়া ফরজ হতো তবে তিনি এখানেই স্পষ্ট করে বলে দিতেন– ইমাম যখন কুরআন পড়বে, তখন তোমরাও পড়ো। কিন্তু এ কথা তো এ হাদীসের কোন সূত্রেই আসে নি।

স্মর্তব্য, হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত এই হাদীসটির উপর ইমাম নাসায়ী র. অনুচ্ছেদ শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে : باب تأويل قوله عز و جل {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }

অর্থ: অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী -যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। এই অনুচ্ছেদে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন এটি মূলত: উক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা। হাদীসটিতে যে কথা বোঝানো হয়েছে, আয়াতটিতেও তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নামাযে ইমামের কুরআন পড়ার সময় মুকতাদীকে চুপ থাকতে হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

..... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِذَا قَالَ الْقَارِئُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ . فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». أخرجه مسلم في باب التسميع والتأمين (٤١٠) من طريق قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عن يَعْقُوبَ– يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْه. وقريب منه ما رواه البخاري بلفظ إذا أمن القاري فأمنوا فإن الملائكة تؤمن (٦٤٠٢) وأخرجه ابن ماجه في باب الجهر بآمين من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنه نحو رواية مسلم (٨٥٢)

অর্থ: কুরআন পাঠকারী (অর্থাৎ ইমাম) যখন বলে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ এবং যারা তার পেছনে, তারা (মুকতাদীরা) বলে আমীন, যার আমীন বলা আসমান বাসী (ফেরেশতা) দের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪১০।

ইমাম বুখারী র.ও স্বীয় সহীহ গ্রন্থে (হাদীস নং ৬৪০২) হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন- কুরআন পাঠকারী যখন আমীন বলবে, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকে। ইমাম ইবনে মাজা র.ও হাদীসটি মুসলিম শরীফের অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্র, হাদীস নং ৮৫১-৮৫২)

মুসলিম শরীফের হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, জামাতের নামায সম্পর্কেই এ হাদীসটি বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ইমামকেই কারী অর্থাৎ কুরআন পাঠকারী বলে অভিহিত করেছেন। বোঝা গেল, নামাযে কুরআন পাঠ করা ইমামেরই কর্তব্য। যদি ইমাম ও মুকতাদী সবার জন্য কুরআন পাঠের বিধান থাকতো তবে শুধু ইমামকে এ বিশেষণে উল্লেখ করা হতো না।

উল্লেখ্য যে, ফজর মাগরিব ও এশা– এই তিন নামাযে ইমামকে স্বরবে কিরাআত পড়তে হয়। স্বরবে কিরাআতের উদ্দেশ্যই তো হলো,

ইমাম পড়বেন, আর অন্যরা শুনবেন। এখন যদি মুকতাদিকেও কিরাআত পড়তে হয়, তবে ইমামের স্বরব কিরাআতের কোন অর্থ হয় না। শ্রবণকারী না থাকলে ইমাম জোরে কিরাআত পড়বেন কেন, লাউডস্পিকার বা মাইকই বা ব্যবহার করবেন কেন?

৫. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

.... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري (٧٨٢)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলবে, তোমরা তখন আমীন বলো। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতা আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৮২

এই হাদীস থেকেও বোঝা যায়, মুকতাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না। কারণ, এক, মুকতাদী সূরা ফাতেহা পাঠে ব্যস্ত থাকলে ইমাম কখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়ছেন তা খেয়াল রাখা সম্ভব হবে না। ফলে যথাসময়ে আমীন বলাও হয়ে উঠবে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে মুকতাদীকে ইমামের غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলার প্রতি খেয়াল রাখতে বলবেন, অপরদিকে সূরা ফাতেহা পাঠের আদেশ দিয়ে তাকে ব্যস্ত করে রাখবেন, এমনটা হতে পারে না। দুই, যে মুকতাদী নামায শুরুর কিছুক্ষণ পর এসে শরীক হল, সে যদি সূরা ফাতেহা পাঠ শুরু করে দেয়, আর ইতিমধ্যেই ইমাম غير المغضوب عليهم ولا الضالين বলে ফেলেন, তবে সেই মুকতাদী কি করবে? যদি সে তার পড়াই চালু রাখে তাহলে ইমামের সঙ্গে তার আমীন বলা হলো না। অথচ এ হাদীসে তাকে ইমামের সঙ্গে আমীন বলতে বলা হয়েছে। আর যদি সে তার পড়া বন্ধ করে দিয়ে ইমামের সঙ্গে আমীন বলে, এরপর অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে তবে তার আমীন 'মোহর' হবে না। অথচ আবূ দাউদ শরীফের হাদীসে (হাদীস নং ৯৩৮) বলা হয়েছে আমীন মোহরের ন্যায়

(مثل الطابع على الصحيفة)। জানা কথা, সিলমোহর শেষেই হয়ে থাকে। তাছাড়া আমীন শব্দটি কুরআনের আয়াত নয়। তাই সূরা ফাতেহার মাঝখানে আমীন বলার অর্থ - কুরআন নয় এমন কিছুকে কুরআনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া।

এসব কারণে অনেক মুহাদ্দিস এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মুকতাদি ফাতেহা পড়বে না। ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. তাঁর তামহীদ গ্রন্থে বলেছেন,

وفي هذا الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن يؤمن كل واحد منهم بعد فراغه من قراءته لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أن يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يكادوا يسمعون فراغه من قراءة فاتحة الكتاب فكيف يؤمرون بالتأمين عند قول الإمام { ولا الضالين } ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ذلك هذا ما لا يصح

অর্থাৎ এই হাদীসে একথার নির্দেশ রয়েছে যে, ইমাম যদি স্বশব্দে কেরাত পড়ে থাকেন তবে মুকতাদি তার পেছনে কেরাত পড়বে না। সূরা ফাতেহাও না, অন্য কোন সূরাও না। কারণ তাদের উপর যদি কেরাত পড়া আবশ্যক হতো, তাহলে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হতো, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ফাতেহা পাঠ শেষে আমীন বলে। কেননা যে ব্যক্তিই সূরা ফাতেহা পাঠ করে তার জন্যই সুন্নত হলো সেটি পাঠ সমাপ্ত করে আমীন বলা। আর একথাও সকলের জানা যে, মুকতাদি যদি ইমামের পেছনে সূরা পাঠে ব্যস্ত থাকে তবে তার পক্ষে ইমামের ফাতেহা পাঠ কখন শেষ হলো সেদিকে খেয়াল রাখা খুবই দুস্কর। এমতাবস্থায় তাকে ইমাম সাহেবের ولا الضالين বলার সময় আমীন বলার নির্দেশ দেওয়া হবে, আবার ইমামের পাঠ থেকে অন্যমনস্ক থাকারও নির্দেশ দেওয়া হবে তা হতে পারে না। (তামহীদ, সুমাই এর ৩ নং হাদীস)

একইভাবে হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন,

ولما كان المأموم مأموراً بالإنصات لقراءة الإمام ، مأموراً بالتأمين على دعائه عند فراغ الفاتحة ؛ لم يكن عليهِ قراءة ؛ لأنه قد أنصت للقراءة ، وأمن على الدعاء ، فكأنه دعا ؛ كما قال كثير من السلف في قول الله تعالى لموسى وهارون : قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا قالوا : كان موسى يدعو وهارون يؤمن ، فسماهما داعيين. ٤/٢٢٧

অর্থাৎ মুকতাদিকে যখন ইমামের কেরাত মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলা হলো এবং ইমামের ফাতেহা পাঠ শেষে তার দোয়ার উপর আমীন বলতে নির্দেশ দেওয়া হলো, এতে প্রমাণিত হলো যে, মুকতাদির উপর কেরাত পড়ার দায়িত্ব নেই। কেননা সে যখন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলো এবং তার দোয়ার উপর আমীন বললো, তখন ধরে নিতে হবে যে, সে নিজেও দোয়া করলো। যেমন পূর্বসূরিগণের অনেকেই বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যে মূসা ও হারূন আলাইহিমাস সালামকে বলেছেন– তোমাদের দু'জনের দোয়াই কবুল করা হলো, তাঁরা বলেছেন, আসলে মূসা আ.ই দোয়া করেছিলেন, আর হারূন আ. আমীন আমীন বলেছিলেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা দুজনকেই দোয়াকারী আখ্যা দিয়েছেন। (৪/২২৭)

৬. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

.... أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم من أحد ؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله قال: فقال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك.

أخرجه مالك في الموطا صـ ٢٩ والترمذي (٣١٢) وقال حديث حسن و أبو

داود (٨٢٦) والنسائي (٩١٩) وابن ماجه (٨٤٨-٨٤٩) وأحمد في مسنده ٢٨٤/٢

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন, যে নামাযে তিনি উচ্চস্বরে কেরাত পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ কি একটু পূর্বে আমার সঙ্গে কুরআন পড়েছে? তখন একজন বললেন, হ্যাঁ, আমি পড়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাইতো বলছি আমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে টানাটানি হচ্ছে কেন? লোকেরা যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনলেন, সেদিন থেকে সেসব নামাযে কুরআন পড়া ছেড়ে দিলেন, যেসব নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন।

মুয়াত্তা মালেক, পৃ,২৯; তিরমিযী, হাদীস নং ৩১২, তিনি এটিকে হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ, হাদীস নং ৮২৬; নাসায়ী, হাদীস নং ৯১৯; মুসনাদে আহমদ, ৪খ, ২৮৪পৃ; ইবনে মাজা, হাদীস নং ৮৪৮, ৮৪৯।

উল্লেখ্য, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কুরআন পড়ছিলেন, তাতেই তাঁর কেরাতে সমস্যা হচ্ছিল। হযরত শায়খুল হিন্দ র. বলেছেন, 'অনুচ্চস্বরে কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে তো আরো বেশী সমস্যা হওয়ার কথা।' তাই যেসব নামাযে ইমাম অনুচ্চস্বরে কেরাত পড়েন সেসব নামাযেও যে মুক্তাদীর কেরাত পড়া উচিত নয়, সেটা এ হাদীসেরই দাবী।

সিররী নামাযে ফাতেহা না পড়ার দলিল

১. হযরত জাবির রা. বলেছেন,

.....عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل من كان له إمام فقراءته له قراءة. أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٢٣) قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبي الزبير عنه. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد بن حميد في مسنده قال : ثنا أبو نعيم ثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عنه مرفوعا.

قال البوصري[১] : إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده قال: أنا إسحاق الأزرق نا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا. قال البوصري: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الإمام محمد في الموطا (ص٩٨) عن أبي حنيفة نا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر مرفوعا. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد عن أسود بن عامر — وهو ثقة — عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا (رقم ١٤٦٤٣) وهو إسناد صحيح أيضا. وأخرجه ابن ماجه كذلك وفي إسناده جابر الجعفي (٨٥٠)

অর্থ: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ইমাম আছে, তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত বলে গণ্য হবে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৮২৩। এ সনদটি সহীহ।

মুসনাদে আব্‌দ ইবনে হুমায়দে ভিন্ন সনদে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। বূসিরী র. বলেছেন, এটি ইমাম মুসলিম এর শর্ত মোতাবেক সহীহ।

---

[১] বুসিরী রহ. এভাবেই মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে সনদটি উল্লেখ করেছেন এবং হাসান ইবনে সালেহের পর ‘আন আবিয যুবায়র’ এর ‘আন’ শব্দের উপর صح শব্দটি লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সনদটি এভাবেই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ভুলের কোন অবকাশ নেই। আর এ কারণেই তিনি এই সনদকে ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ বলেছেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় মিযযী রহ. তুহফাতুল আশরাফ গ্রন্থে (২৬৭৫) বলেছেন, ورواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر رض অর্থাৎ আবু নুআয়মের বর্ণনায় হাসান ইবনে সালিহ আবুয যুবায়ের থেকে, তিনি হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়দ এখন পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নি। এর একটি মুনতাখাব (সংক্ষেপিত সংস্করণ) মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে সংক্ষিপ্তকারী সম্ভবত ইবনে মাজার সনদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হাসান ও আবুয যুবায়রের মাঝে জাবির জু’ফিকে উল্লেখ করেছেন। (দ্র. হাদীস ১০৫০) এটি তার ভুল। এ ভুলটির কারণে অনেকেই ধোকায় পড়েছেন।

আহমদ ইবনে মানী’ অন্য একটি সনদে তার মুসনাদ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বূসিরী বলেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ। (দ্র, শায়খ মুহাম্মদ আওওয়ামা কৃত মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার টীকা)

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, পৃ ৯৮; মুসনাদে আহমদ, ৩খ, ৩৩৯পৃ; (এ সনদ দুটিও সহীহ)। ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ৮৫০। এতে জাবের জু’ফী রয়েছে।

এ হাদীসে মুলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে, মুকতাদীর জন্য আলাদা করে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং ইমামের কেরাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা সূরা ফাতেহা হলো আল্লাহর দরবারে হেদায়াতের আবেদন। সকলের পক্ষ থেকে আবেদন একজনই পেশ করে। ইমামকেই সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রুকু, সেজদা, তাকবীর ও তাসবীহ হলো উক্ত দরবারের আদব। এজন্য এগুলো সকলকে পালন করতে হয়।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ».

أخرجه أبو داود عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عنه(٨٩٣) وأخرجه نحوه عبد الرزاق عن شيخ من الأنصار . ٢٨١/٢

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা সেজদায় থাকাবস্থায় যদি তোমরা নামাযে শরীক হও তবে তোমরাও সেজদা করবে। সেটাকে কিছু গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকু পেল সে নামায (অর্থাৎ ঐ রাকাত) পেল। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ২/২৮১।

এ হাদীস থেকেও বোঝা গেল, মুকতাদীর ফাতেহা পড়ার প্রয়োজন নেই । ইমামের সঙ্গে রুকু পেলেই তার রাকাত পূর্ণ হবে।

৩. হযরত আবূ বাকরা রা. বলেছেন,

انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. أخرجه البخاري (رقم ٧٨٣) وفي رواية البخاري في كتاب القراءة له، والطبراني: فقال: أيكم صاحب هذا النفس قال خشيت أن تفوتني الركعة معك.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে থাকাবস্থায় তিনি এসে পৌঁছলেন, এবং কাতারে যাওয়ার পূর্বেই রুকুতে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ব্যাপারটি জানালে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এমনটি আর করো না। বুখারী শরীফ, হাদীস নং৭৮৩।

ইমাম বুখারী কিতাবুল কিরাআতে ও তাবারানী (দ্র, ফাতহুল বারী) একথাও উল্লেখ করেছেন যে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এমন কে করেছ? তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমার এ রাকাতটি ছুটে যাওয়ার আশংকা করেছিলাম (তাই আমি এমনটি করেছি)।

এ হাদীসটি থেকে বোঝা গেল, রুকু পেলেই মুকতাদীর রাকাত পূর্ণ হয়, এবং সূরা ফাতেহা পড়া মুকতাদীর জন্য ফরজ নয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকরা রা.কে পুনরায় নামায পড়তে বলতেন।

ইমাম বায়হাকী হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রা. থেকেও আবূ বাকরা রা.এর অনুরূপ ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেছেন,

وفي ذلك دليل على إدراك الركعة ولولا ذلك لما تكلفوه

অর্থাৎ এ থেকে প্রতীয়মান হয়, রুকু পেলেই রাকাত পাওয়া হয়। অন্যথায় তারা এমন তড়িঘড়ি করতেন না। সুনানে বায়হাকী, ২খ, ৯০পৃ।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রা. ও হযরত ইবনে উমর রা. উভয় থেকে এই ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে -

الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة وإن وجدهم سجودا سجد معهم ، ولم يعتد بذلك .

অর্থাৎ নামাযে আগত ব্যক্তি যদি দেখে, জামাত রুকু অবস্থায় রয়েছে, তবে তাকবীর দিয়ে নামাযে শরীক হবে। এতে করে সে রাকাতটি পেয়ে যাবে। কিন্তু তাদেরকে সেজদা অবস্থায় পেলে সেজদা করবে বটে, তবে সেটাকে রাকাতরূপে গণ্য করবে না। (দ্র, ২খ, ২৭৮ পৃ)

আব্দুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নাফে (২খ, ২৮১পৃ) ইবনুল মুনযির তার আওসাত গ্রন্থে (২০২৫) ও ইমাম তাবারানী আলমুজামুল কাবীরে (৯৩৫১) হযরত আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা.এর এই ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন,

من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি রুকু পেল না সে যেন সেজদা করেই সেটাকে রাকাত গণ্য না করে। হায়ছামী র. বলেছেন, رجاله موثقون এর বর্ণনাকারীগণকে বিশ্বস্ত বলা হয়েছে। দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, (২৪০২)

উক্ত দুটি গ্রন্থে ও তাহাবী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে,

وعن زيد بن وهب قال دخلت أنا وابن مسعود المسجد والامام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ الامام قمت أقضى فقال قد أدركته . أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات (٢٤٠٤) وعبد الرزاق في المصنف (٣٣٨١) وشرح معاني الآثار (٢٣٢٢) والطبراني في المعجم الكبير (٩٣٥٤)

অর্থাৎ যায়দ ইবনে ওয়াহব র. বলেন, আমি ও ইবনে মাসউদ রা. মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইমাম তখন রুকুতে ছিলেন। আমরা রুকু করে হেঁটে হেঁটে কাতারে পৌঁছলাম। ইমাম নামায শেষ করলে আমি রাকাতটি পড়বার জন্য দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি তো রাকাত পেয়ে গেছ। হায়ছামী বলেন, এর বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩৩৮১); মু'জামে কাবীর (৯৩৫৪); তাহাবী (২৩২২)

বুখারী শরীফের পূর্বোক্ত হাদীস ও সাহাবীগণের এসব ফতোয়ার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ আলেম এই মত পোষণ করতেন যে, যে ব্যক্তি রুকু পেল সে রাকাত পেয়ে গেল।

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী র. তাঁর ফাতহুল বারী নামক বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة . وهذا قول جمهور العلماء ، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء . وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام ، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه . وقد روي هذا عن عليٍ وابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة – في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاق المديني ، عن المقبري ، عنه . وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن أبي هريرة ، أنه قال : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة . وهو قول عامة علماء الأمصار .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকু করতে পারল সে ঐ রাকাত পেয়ে গেল, যদিও ইমামের সঙ্গে তার কিয়াম (দাঁড়ানো) ও ফাতেহা পাঠ ছুটে গেল। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত । ইমাম ইসহাক র. (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) প্রমুখ এটাকে আলেমগণের ইজমা বা ঐকমত্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু তালিব এর বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদ র. বলেছেন যে, এ ব্যাপারে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই। অথচ তাঁর অবগতি ছিল ব্যাপক, ইলমের ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা ও পরহেজগারী ছিল চরম পর্যায়ের। এ মতই পোষণ করতেন হযরত আলী রা., ইবনে মাসউদ রা., ইবনে উমর রা., যায়দ ইবনে ছাবিত রা. ও এক বর্ণনানুসারে হযরত আবূ হুরায়রা রা. । আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক আল মাদীনী র. সাঈদ আল মাকবূরী'র সুত্রে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (দ্র. ৪খ. ২৩০ পৃ.)

রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয় উম্মতের এই সর্বসম্মত মত দ্বারাই ইমাম আহমদ প্রমাণ করেছেন যে, মুকতাদির উপর কেরাত পড়া ফরজ নয়। তার পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, فإن صلى خلف الإمام ولم يقرأ بشيء অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি মুকতাদি হয় এবং কোরআনের কোন অংশই না পড়ে? তিনি উত্তরে বললেন,

يجزيه وذلك أنه لو أدرك الإمام وهو راكع فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإمام أن الركعة تجزئه وإن لم يقرا (رقم ٢٧٨)

অর্থাৎ তার নামায হয়ে যাবে। কেননা যদি সে ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে তার সঙ্গে রুকু করে তবে কেরাত না পড়লেও যে তার নামায হয়ে যাবে তাতে কারো দ্বিমত আছে বলে জানা যায় না। (নং ২৭৮)

মাওলানা শামসুল হক আজীমাবাদী (তিনি লা-মাযহাবী আলেম ছিলেন) আবূ দাউদ শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ আওনুল মাবূদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা শাওকানী র. এই মত পোষণ করতেন যে, রুকু পেলে মুকতাদীর রাকাত পাওয়া হয় না। কিন্তু 'ফাতহুর রাব্বানী ফী ফাতাওয়াশ শাওকানী' গ্রন্থে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (দ্র, আওনুল মাবূদ, ৩খ, ১১০পৃ)।

মোট কথা, বুখারী শরীফের হাদীস, সাহাবীগণের ফতোয়া ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের উল্লিখিত মত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফাতেহা পাঠ করা মুকতাদীর জন্য অপরিহার্য নয়। অন্যথায় রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয়নি বলে ফতোয়া দেওয়া হতো।

৪. আতা ইবনে ইয়াসার র. বলেছেন,

أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ . أخرجه مسلم (٥٧٧) في باب سجود التلاوة. والنسائي في باب ترك السجود في النجم. (٩٦٠)

অর্থ: তিনি ইমামের সঙ্গে কুরআন পড়া সম্পর্কে যায়দ ইবনে ছাবিত রা.কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, কোন নামাযেই ইমামের

সঙ্গে কোন কিছু পড়বে না। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৫৭৭, নাসাঈ শরীফ (৯৬০), আবু আওয়ানা (১৯৫১), বায়হাকী (২৯১১)।

৫. নাফে র. থেকে বর্ণিত:

.... أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. موطا مالك صـ ٢٩

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রা.কে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, ইমামের পেছনে কুরআন পড়া যাবে কিনা? তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পেছনে নামায পড়ে তখন ইমামের পড়াই তার জন্য যথেষ্ট হয়। আর যখন একাকী পড়ে, তখন যেন নিজেই কেরাত পড়ে। নাফে বলেন, ইবনে উমর রা. ইমামের পেছনে কুরআন পড়তেন না। (মুয়াত্তা মালেক, পৃ২৯, (৪৩), আব্দুর রাযযাক (২৮১৪), মুসনাদে ইবনুল জাদ (১১৫০), তাহাবী (১৩১২, ১৩১৭) দারাকুতনী (১৫০৩), বায়হাকী (২৯০১, ২৯০৩)।

৬.হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর ফতোয়া:

عن أبي وائل : جاء رجل إلى عبد الله فقال: اقرأ خلف الإمام؟ فقال له عبد الله إن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام

আবু ওয়াইল রহ. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি ইমামের পেছনে কেরাত পড়বো? তিনি বললেন, নামাযে খুবই মগ্নতা আছে। কেরাত পড়ার জন্য ইমামই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (৩৭৮০), মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৮০৩), তাহাবী (১৩০৭), তাবারানী কৃত আল আওসাত (৪০৪৯), মুজামে কাবীর (৯৩১১)

৭. হযরত জাবির রা. বলেছেন,

من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. أخرجه الترمذي (٣١٣) وقال هذا حديث حسن صحيح ومالك في الموطا صـ ٢٨

অর্থ: যে ব্যক্তি নামাযের কোন রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়ল না, সে যেন নামাযই পড়ল না। তবে যদি সে ইমামের পেছনে নামায পড়ে। (তাহলে তার ব্যাপার ভিন্ন।) তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৩; তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। মুয়াত্তা মালেক, পৃ ২৮, নং ৩৮; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৭৪৫) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (৩৬২১), আল কিরাআতু খালফাল ইমাম লিল বুখারী (১৭৪), নাসাঈ কুবরা (২৮৯৯), শারহু মুশকিলিল আছার (১৩০১), বায়হাকী (১২৪২), মারিফাতুস সুনান ওয়াল আছার (৩২০৩) আল কিরাআতু খালফাল ইমাম লিল বায়হাকী (৩৫৮)

এ হাদীসে জাবির রা. স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, সূরা ফাতেহা পড়া ইমাম বা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য আবশ্যক। মুক্তাদীর জন্য সেটা আবশ্যক নয়। এ কথা দ্বারা তিনি যেন উবাদা ইবনুস সামেত রা. কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিলেন, যে হাদীসে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না, তার নামাযই হয় না। হযরত জাবির রা. বুঝিয়ে দিলেন, এ বিধানটি মুক্তাদির জন্য নয়। ইমাম বা একা নামায আদায়কারীর জন্য। আবূ দাউদ শরীফে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না র. থেকেও অনুরূপ কথা উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রা. কর্তৃক বর্ণিত ঐ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ দাউদ র. বলেন, قال سفيان : لمن يصلي وحده অর্থাৎ সুফিয়ান র. বলেছেন, একা নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে এই হাদীস। (দ্র, হাদীস নং ৮২২) ইমাম তিরমিযী র. ইমাম আহমাদ থেকেও একই কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

واما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده

অর্থাৎ আহমাদ র. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না এটা তখন, যখন কেউ একা নামায পড়ে। ইমাম আহমাদ র. এক্ষেত্রে জাবির রা. এর উল্লিখিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন,

فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার 'যে সূরা ফাতেহা পড়েনি তার নামায হয়নি' এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটা তার ক্ষেত্রে যে একা নামায আদায় করে।

ইমাম তিরমিযীও হযরত উবাদা রা. এর হাদীসটিকে মুকতাদীর বিধান বলে মনে করতেন না। এই কারণে 'কিরাআত খালফাল ইমাম' বা মুকতাদীর জন্য কেরাত পড়া অনুচ্ছেদে হাদীসটি উল্লেখ না করে তিনি এর ঊনচল্লিশ অনুচ্ছেদ পূর্বে ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب অনুচ্ছেদে নামাযে ফাতেহার কি গুরুত্ব সেটা বোঝাবার জন্য উল্লেখ করেছেন।

এখন বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত জাবির রা. ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদের উস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ, এবং ইমাম তিরমিযী বলছেন, এ হাদীসটি মুকতাদীর জন্য নয়। আর আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা বলেন, এটা মুকতাদীর জন্যও। আমরা কার কথা মানবো?

তাছাড়া অধিকাংশ ইমাম ও আলেম যারা ইমামের পেছনে মুকতাদীর কুরআন পড়া জরুরী মনে করতেন না, তাদেরও তো একই মত। ইমাম আহমাদ র. কত জোর দিয়ে বলেছেন,

ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق

وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة . المغني لابن قدامة (٣٣٠/١)

অর্থাৎ ইমাম যখন উচ্চস্বরে কেরাত পড়ে, তখন তার পেছনে মুকতাদী যদি কেরাত না পড়ে তবে মুকতাদীর নামায হবে না– এমন কথা আহলে ইসলামের কাউকে আমরা বলতে শুনিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, ও তাবেয়ীগণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে ইমাম মালেক, ইরাকবাসীদের মধ্যে সুফিয়ান ছাওরী, শামবাসীদের মধ্যে ইমাম আওযায়ী, ও মিসরবাসীদের মধ্যে লায়ছ ইবনে সা'দ, এঁদের কেউই একথা বলেননি - ইমাম যখন কুরআন পড়বে, তখন পেছনে মুকতাদী যদি না পড়ে তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। (ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, ১খ, ৩৩০পৃ)

হায় আফসোস! ইমাম আহমদ র. যা জীবনেও শুনেননি, কোন আলেম যে বিষয়ে মত দেননি, সে বিষয়ের দিকে এখন মুসলমানদেরকে জোরেশোরে ডাকা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, এছাড়া নামাযই হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ১ :

রুকু পেলেই রাকাত পাওয়া হয়– এ সম্পর্কে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. (মৃত্যু ৭৯৫ হিজরী) তাঁর বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে লিখেন–

وقد أجاب البخاري في كتاب القراءة عن حديث أبي بكرة بجوابين : أحدهما : أنه ليس فيه تصريح بأنه اعتد بتلك الركعة . والثاني : أن النبي نهاه عن العود إلى ما فعله .

فأما الأول ، فظاهر البطلان ، ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف إلا لإدراك الركعة ، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف من الصحابة ومن بعدهم إنما أمر به لإدراك الركعة ، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكلية ، ولذلك لم يقل منهم أحد : أن من ادركه ساجداً

فإنه يسجد حيث أدركته السجدة ، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل الصف ، ولو كان الركوع دون الصف للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتد به من الصلاة ، لم يكن فرق بين الركوع والسجود في ذلك .

وهذا أمر يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصف ، فقول القائل : لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات ، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء ، والانفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم .

فقد أنكر ابن مسعود على من خالف في ذلك ، واتفق الصحابة على موافقته ، ولم يخالف منهم أحدٌ ، إلا ما روي عن أبي هريرة ، وقد روي عنه من وجه أصح منه أنه يعتد بتلك الركعة .

واما الثاني ، فإنما نهى النبي أبا بكرة عن الإسراع إلى الصلاة ، كما قال : لا تأتوها وأنتم تسعون ، كذلك قاله الشافعي وغيره من الأئمة ،

وسيأتي الكلام على ذلك فيما بعد – إن شاء الله تعالى . وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ ، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم ، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء ، واتبع فيه شيخه ابن المديني ، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث ، وإنما كان بارعا في العلل والأسانيد.

وقد روي عن النبي ، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، من حديث أبي هريرة ، وله طرق متعددة عنه . ومن حديث معاذ وعبد الرحمن بن الأزهر وغيرهم . وقد ذكرناها مستوفاة في كتاب شرح الترمذي.(٤/٢٣٢-٢٣٣)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কিতাবুল কিরাআতে হযরত আবু বাকরা রা. বর্ণিত হাদীসটির দুটি জবাব দিয়েছেন:

এক. উক্ত রাকাতকে গণ্য করা হয়েছে এমন কথা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয় নি।

দুই. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এমন কাজ দ্বিতীয়বার করতে বারণ করেছেন।

প্রথম জবাবটির অসারতা খুবই স্পষ্ট। কাতারের পেছনে আবু বাকরা রা.এর রুকু করাটা রাকাত পাওয়ার লোভেই ছিল। অন্য যেসব সাহাবী বা তাদের পরবর্তীগণ কাতারের পেছনেই রুকু করে নিতে বলেছেন তাঁরাও রাকাত ধরতে পারবেন কেবল এ উদ্দেশ্যেই তা বলেছেন। এতে করে যদি রাকাতই ধর্তব্য না হলো, তবে এত কষ্ট করে লাভ কী? এজন্যই তো এমন কথা কেউ বলেন নি যে, ইমাম সেজদায় গেলে মুকতাদিও কাতারের পেছনে সেজদা করবে, অতঃপর ইমাম উঠে দাঁড়ালে কাতারে গিয়ে শামিল হবে। কাতারের পেছনে রুকু করার উদ্দেশ্য যদি ইমামকে দ্রুত অনুসরণ করাই হতো এবং এতে রাকাত পাওয়ার ব্যাপার না থাকত তবে তো রুকু ও সেজদার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকার কথা ছিল না।

কাতারের পেছনে রুকু করা সম্পর্কিত হাদীস ও আছারগুলো থেকে যে কেউ এটা বুঝতে পারবে। সুতরাং ঐ রাকাতকে গণ্য করার কথা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন নি এমন উক্তি বাড়াবাড়ি ও সুস্পষ্ট বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি বৈ নয়। আলেম-শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং তাঁদের দৃষ্টিতে যা আপত্তিকর এমন বিষয় নিয়ে একলা চলো নীতিই এমন উক্তি করার দুঃসাহস যোগাতে পারে।

এ বিষয়টিতে ভিন্নমত অবলম্বনকারীর উপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। আর সাহাবীগণ সকলে তাঁর সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছিলেন। একমাত্র আবু হুরায়রা রা. থেকেই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বর্ণনা রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. থেকেও তুলনামূলক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনিও ঐ রাকাতকে গণ্য করতেন।

এমনি ভাবে দ্বিতীয় জবাবটিও ঠিক নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং তাঁকে দৌড়ে আসতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, তোমরা নামাযে দৌড়ে এসো না। ইমাম শাফেয়ী রহ. সহ

অন্যান্য ইমামগণ হাদীসটির এ অর্থই বুঝেছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

আসলে কুফার ফকীহগণ যে বলেছেন, যে কোন ব্যক্তির নামায ফাতেহা ছাড়া সহীহ হয়ে যাবে, এ মতের উপর প্রচণ্ড আপত্তিই বুখারীকে ঐ ফতোয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের বিরোধিতায় অতি বাড়াবাড়িই তাঁকে ঐ বিচ্ছিন্ন মত ও পথ অবলম্বনে প্ররোচিত করেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি তার উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ.কে অনুসরণ করেছেন। অথচ ইবনুল মাদীনী রহ. হাদীস বিশারদ ফকীহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন হাদীসের ইলাল ও সনদ সম্পর্কে সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একাধিক সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকু পেল সে রাকাতটি পেল। হযরত মুআয রা. ও আব্দুর রহমান ইবনে আযহার রা. প্রমুখ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছি। (৪/২৩২, ২৩৩)

ইবনে রজব আরো বলেন–

وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام ، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة ، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام ، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني أن الذين قالوا بإدراك الركعة بإدراك الركوع من الصحابة كانوا ممن لا يوجب القراءة خلف الإمام ، فأما من رأى وجوب القراءة خلف الإمام ، فإنه قال : لا يدرك الركعة بذلك ، كأبي هريرة ، فإنه قال : للمأموم : اقرأ بها في نفسك . وقال : لا تدرك الركعة بإدراك الركوع .(وفي نسختنا : لا تعتد به حتى تدرك الإمام قائما) وخرَّج البخاري في كتاب القراءة من طريق ابن إسحاق أخبرني الأعرج ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن تركع .

ثم ذكر أنه رأى ابن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق ، ثم أخذ يضعِّف عبد الرحمن بن إسحاق المديني الذي روى عن المقبري ، عن أبي هريرة خلاف رواية ابن إسحاق ، ووهَّن أمره جداً .

وقد وافقه على قوله هذا ، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة ، قليل من المتأخرين من أهل الحديث ، منهم : ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم وصَّنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مُصنفاً .

وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم .

ثم قال ابن رجب بعد أن أورد روايات الجمهور: والمروي عن أبي هريرة قد اختلف عنه فيه ، وليس عبد الرحمن بن إسحاق المديني عند العلماء بدون ابن إسحاق ، بل الأمر بالعكس ؛ ولهذا ضَّعف ابن عبد البر وغيره رواية ابن إسحاق ، ولم يثبتوها ، وجعلوا رواية عبد الرحمن مقدمة على روايته.

قال ابن عبد البر في المروي عن أبي هريرة : في إسناده نظر . قال : ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال به . وقد روي معناه عن أشهب .

وعبد الرحمن بن إسحاق هذا يقال له : عباد . وثَّقه ابن معين . وقال أحمد : صالح الحديث . وقال ابن المديني : هو عندنا صالح وسط - : نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة ، وأنه قال في محمد بن إسحاق كذلك : إنه صالح وسط . وهذا تصريح منه بالتسوية بينهما .

ونقل الميموني ، عن يحيى بن معين ، أنه قال في محمد بن إسحاق : ضعيف . وفي عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عن الزهري : ليس به بأس . فصرح بتقديمه على ابن إسحاق .

وقال النسائي : ليس به بأس . وقال أبو داود : محمد بن إسحاق قدري معتزلي ، وعبد الرحمن بن إسحاق قدري ، إلا أنه ثقة .

وهذا تصريح من أبي داود بتقديمه على ابن إسحاق، فإنه وثقه دون ابن إسحاق ، ولهذا خرَّج مسلم في صحيحه لعبد الرحمن بن إسحاق ولم يخّرج لمحمد بن إسحاق إلا متابعة.

وأيضاً ؛ فأبو هريرة لم يقل : إن من أدرك الركوع فاتته الركعة ؛ لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما يقوله هؤلاء ، إنما قال : لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع ، فعلل بفوات لحوق القيام مع الإمام .

وهذا يقتضي أنه لوكبر قبل أن يركع الإمام ، ولم يتمكن من القراءة فركع معه كان مدركاً للركعة ، وهذا لا يقوله هؤلاء ، فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به . وقد روي عن أبي سعيد وعائشة : لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن .

هذا – إن صح – محمول على من قدر على ذلك وتمكن منه . (٤/٢٣٠-٢٣٢)

অর্থাৎ কারো কারো মতে ইমামের সঙ্গে রুকু পেলেও রাকাত পাওয়া হবে না। কারণ ইমামের সঙ্গে তার কেয়াম (দাঁড়ানো) ও ফাতেহা পাঠ ছুটে গেছে। বুখারী রহ. তার আল কিরাআতু খালফাল ইমাম গ্রন্থে এ মতটিই অবলম্বন করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি তাঁর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. এর এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবীগণের মধ্যে যারা ইমামের পেছনে ফাতেহা পাঠ আবশ্যক মনে করতেন না, তারাই এই ফতোয়া দিতেন যে, রুকু পেলেই রাকাত পাওয়া হবে। পক্ষান্তরে যারা ফাতেহা পাঠ আবশ্যক মনে করতেন তারা বলেছেন, শুধু রুকু পেলেই রাকাত পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না। যেমন আবু হুরায়রা রা., তিনি

মুকতাদিকে বলেছেন, তুমি চুপে চুপে পাঠ করো। অপরদিকে তিনি বলেছেন, রুকু পাওয়া গেলেই রাকাত পাওয়া ধর্তব্য হবে না। বুখারী রহ. উক্ত গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের সূত্রে আ'রাজ রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রা. কে বলতে শুনেছি যে, রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামকে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার রাকাত পাওয়া বিবেচিত হবে না।

এরপর বুখারী রহ. উল্লেখ করেছেন, তিনি আলী ইবনুল মাদীনী রহ.কে দেখেছেন, তিনি ইবনে ইসহাকের হাদীসকে প্রামাণ্য জ্ঞান করতেন। এর পর তিনি (বুখারী রহ.) আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আল মাদীনীকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এই আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাকই (সাঈদ) আল-মাকবুরীর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে ইবনে ইসহাকের বিপরীত বর্ণনা পেশ করেছেন। এই আব্দুর রহমানকে তিনি চরম যঈফ আখ্যা দিয়েছেন।

রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয় না– বুখারী রহ.এর এই মতের সঙ্গে একমত হয়েছেন পরবর্তীকালের স্বল্প সংখ্যক হাদীসবিদ। তাদের মধ্যে ইবনে খুযায়মাসহ আসহাবে জাওয়াহের আছেন। ইবনে খুযায়মার একজন শিষ্য আবু বকর আস সিবগী এ বিষয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

এটা আলেম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মত এবং তাদের বিরোধী পথ বৈ নয়।

অতঃপর ইবনে রজব রহ. রুকু পেলে রাকাত পাওয়ার হাদীসগুলো উল্লেখপূর্বক বলেন,

এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে দু'রকম বর্ণনা এসেছে। আর আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক মাদীনী রহ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের তুলনায় নিম্নমানের নন। বরং ব্যাপার এর বিপরীত। এ কারণেই ইবনে আব্দুল বার প্রমুখ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই বরং দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আব্দুর রহমানের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, আবু হুরায়রা রা. থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যে বর্ণনাটি পেশ করেছেন, তাতে আপত্তি রয়েছে। বিভিন্ন শহরের আলেম ওলামার কেউই ঐ ফতোয়া গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আশহাব রহ. থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। আব্দুর রহমান

ইবনে ইসহাককে ইবনে মাঈন বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, তিনি صالح الحديث সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী।

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক দু'জন সম্পর্কেই বলেছেন, صالح وسط মধ্যম মানের বর্ণনাকারী ছিলেন। এতে বোঝা যায়, দু'জনই তার দৃষ্টিতে সমমানের ছিলেন।

মায়মূনীর বর্ণনামতে, ইয়াহয়া ইবনে মাঈন রহ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাককে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন, আর আব্দুর রহমান সম্পর্কে বলেছেন, ليس به بأس তার মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই। এতে বোঝা যায়, আব্দুর রহমান তার দৃষ্টিতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের তুলনায় ভাল ছিলেন। ইমাম নাসায়ীও অনুরূপ (ليس به بأس) মন্তব্য করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, ইবনে ইসহাক কাদরীয়া ও মুতাযেলা দলভুক্ত ছিলেন। আর আব্দুর রহমান সম্পর্কে বলেছেন, কাদরীয়া হলেও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। এতে বোঝা যায়, আব্দুর রহমান তাঁর দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য ছিলেন, কারণ তিনি আব্দুর রহমানকে বিশ্বস্ত বলেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে তা বলেন নি। এসব কারণেই ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে আব্দুর রহমানের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা শুধু মুতাবায়া বা অন্যদের বর্ণনার সমর্থকরূপে উদ্ধৃত করেছেন।

তাছাড়া আবু হুরায়রা রা. তো এ বর্ণনায় একথা বলেননি, যে ব্যক্তি রুকু পেল সে যেহেতু ফাতেহা পড়তে পারে নি, তাই তার রাকাত পাওয়া ধর্তব্য হবে না, যেমনটি এরা বলে থাকেন। তিনি বরং বলেছেন– ইমাম রুকু করার পূর্বে দাঁড়ানো থাকাবস্থায় যতক্ষণ তুমি তাকে ধরতে না পারবে ততক্ষণ তোমার রাকাত পাওয়া হবে না। বোঝা গেল, দাঁড়ানো অবস্থায় না পাওয়াকে তিনি রাকাত না পাওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ কথার দাবি হলো, মুকতাদি যদি ইমামের রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই তাকবির বলে, কিন্তু ফাতেহা পড়ার সুযোগ না পায় তবে ইমামের সঙ্গে রুকু করলে সে উক্ত রাকাত পেয়ে যাবে। অথচ এরা একথা বলেন না। সুতরাং

পরিস্কার হয়ে গেল যে, এদের কথা নব-উদ্ভাবিত। সালাফ বা পূর্বসূরিদের কেউই এ ধরনের কথা বলেন নি। আবু সাঈদ রা.ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, ফাতেহা না পড়ে রুকু করবে না। এ কথা যদি সহীহ হয় তবে তা তাদের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে ফাতেহা পড়ার সুযোগ পেল। (৪/২৩০-২৩২)

অধম লেখকের আরজ এই যে, এ দুটি হাদীস সহীহ নয়। কারণ দুটির সনদেই আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ কাতিবুল লায়ছ রয়েছেন। তিনি বিতর্কিত রাবী। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মিযানুল ইতেদাল। তাছাড়া এ দুটিতে মুকতাদির কথা স্পষ্ট বলা হয় নি। সূরা ফাতেহার গুরুত্ব বিবেচনা করে হয়তো তারা একাকী নামায আদায়কারীকে বলেছেন, ফাতেহা না পড়ে রুকু করো না।

আরেকটি কথা, ইবনে রজব রহ. এখানে ইবনে খুযায়মা রহ.কে ইমাম বুখারীর মতের সমর্থক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ ইবনে খুযায়মা রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা.এর এ হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইমাম সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে নামাযের কোন রুকু পেল সে ঐ রাকাত পেয়ে গেল। (১৫৯৫) হাদীসটির উপর তিনি এই শিরোনাম দিয়েছেন–

باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل

অর্থাৎ অনুচ্ছেদ: ইমাম যদি আগে রুকুতে চলে যান, তবে মুক্তাদি কখন রুকু করলে রাকাতটি পেয়েছে বলে গণ্য হবে সেই সময়ের বর্ণনা।

এর পর তিনি আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা সেজদায় থাকাবস্থায় যদি তোমরা আস, তবে সেজদায় অংশগ্রহণ করো, তবে সেটাকে হিসাবে ধরো না। কারণ যে ব্যক্তি রুকু পেল সে রাকাত পেল। (১৬২২) এই হাদীসটির উপর তিনি শিরোনাম দিয়েছেন– باب إدراك المأموم الإمام ساجدا و الأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها অর্থাৎ অনুচ্ছেদ: মুক্তাদি কর্তৃক ইমামকে সেজদা অবস্থায় পাওয়া এবং সেজদার সময় তার প্রতি ইমামকে অনুসরণের ও সেজদাকে

হিসাবে গণ্য না করার নির্দেশ, কারণ সেজদা তখনই ধর্তব্য হবে, যখন ইতিপূর্বে রুকু ধরা সম্ভব হবে।

রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয় মর্মে
আরব বিশ্বের আলেম-উলামার ফতোয়া :

শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায রহ. বলেছেন:

والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه متى أدرك الركوع فقد أدرك الركعة , وتسقط عنه قراءة الفاتحة على القول بوجوبها على المأموم لحديث أبي بكرة الثقفي الثابت في صحيح البخاري

অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতই সঠিক যে, মুক্তাদি রুকু পেলেই রাকাতটি পেয়ে যাবে, এবং তার থেকে ফাতেহা পাঠ রহিত হয়ে যাবে। এটা তাদের মতের ভিত্তিতে যারা মুক্তাদির উপর ফাতেহা পাঠ আবশ্যক মনে করেন। রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয় এ মতটির দলিল হলো আবু বাকরা রা.এর হাদীস, যেটি বুখারী রহ. তাঁর সহীহতে উদ্ধৃত করেছেন। (মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায)

শায়খ উছায়মীন রহ.:

তার ফতোয়া তো ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম-এ বিধৃত হয়েছে। এর বাংলা অনুবাদও হয়েছে। দেখুন ফাতওয়া নম্বর ২৩৬। সেখানেও তিনি উপরের মতটিই সমর্থন করেছেন।

শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযান:

আরবের আরেকজন প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযান। তিনি বলেছেন:

من جاء والإمام في الركوع ، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يركع مع الإمام ، ويكون مدركًا للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة ؛

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন সময় আসল যখন ইমাম রুকুতে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে এবং ইমামের সঙ্গে রুকুতে শরিক হবে। এতে

করে সে ঐ রাকাতটি পেয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাকে আর ফাতেহা পড়তে হবে না। কেননা ফাতেহা পড়ার স্থান তার ছুটে গেছে। (মাজমুউ ফাতাওয়া সালিহ ইবনে ফাওযান)

ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দাইমা

সৌদি আবরের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেম ও মুফতীগণের একটি স্থায়ী বোর্ড আছে। এর নাম 'আল-লাজনাতুদ দাইমা'। এ বোর্ডের ফাতওয়া হলো:

إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبي بكرة... ... ولما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم: « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة »

الرئيس : إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي

عضو : عبد الله بن غديان

عضو : عبد الله بن منيع

অর্থাৎ মুক্তাদি যদি দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে এরপর রুকু করে এবং ইমাম রুকু অবস্থায় পায় তবে তার ঐ রাকাতটি হয়ে যাবে। এর দলিল আবু বাকরা রা. বর্ণিত হাদীস... ... ও আবু দাউদ শরীফে উদ্ধৃত রাসূল সা. এর বাণী: যে ব্যক্তি রুকু পেল সে রাকাতটি পেয়ে গেল।

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আলে শায়খ, প্রধান

আব্দুর রাযযাক আফীফী, সহকারী প্রধান

আব্দুল্লাহ ইবনে গাদায়ান, সদস্য

আব্দুল্লাহ ইবনে মানী', সদস্য

(দ্র. ফতওয়া নং ৯৩)

আলবানী সাহেবও স্পষ্ট বলেছেন, রুকু পেলেই রাকআত পাওয়া হবে। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, হাদীস ৪৯৬; আসসিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস ২২৯।

একটি নতুন বিভ্রান্তি:

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবাগী সাহেব 'রুকু পেলে রাকাত হবে না' প্রমাণস্বরূপ ২৯টি দলিল' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেখানে তিন চারটি দলিলকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ২৯টি বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তিন-চারটি দলিল– যা প্রকৃতপক্ষে দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়– ছাড়া বাকি সবই লা-মাযহাবী আলেমদের বক্তব্য। লেখক ও তার পুস্তিকার কথাও আমরা উল্লেখ করতাম না। যদি না শুরুতে মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসার মুদীর ও শাইখুল হাদীস মাও. মোস্তাফা কাসেমী ও মুহাদ্দিস মাও. বেলাল হোসেন রহমানীর অভিমত ও সত্যায়ন না থাকত।

পুস্তিকাটির ১১ ও ২৮ নং পৃষ্ঠায় আবু বাকরা রা. এর হাদীসটি (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, নবীজী নাকি তাকে বলেছেন, واقض ما فات বা واقض ما سبقك অর্থাৎ তোমার যেটা ছুটে গেছে ওটা পড়ে নাও। হাদীসের এ অংশটুকু উদ্ধৃত করে পুস্তিকাটির ২৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, আবু বাকরা রা. এর হাদীস নিয়ে আর কোন ইখতেলাফ নেই। এই হাদীস থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে, ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে রাকাত হয় না। ঐ রাকাত পরে পড়ে নিতে হয়। নতুবা তার নামায হয় না।

উল্লেখ্য, হাদীসের উক্ত অংশটুকু ইমাম বুখারীর 'জুযউল কিরাত' ও তাবারানীর মুজামে কাবীরে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এর পূর্বে একটি বাক্য আছে যা ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। পুরো কথাটি এমন: صل ما أدركت واقض ما سبقك অর্থাৎ যতটুকু পাও পড়ে নাও, আর যা ছুটে যায় তা পরে পড়ে নাও। অর্থাৎ নবীজী সা. হযরত আবু বাকরা রা.কে বলেছেন, দৌড়ে আসার দরকার নেই। কাতারে পৌঁছার পূর্বেও রুকু করার প্রয়োজন নেই। বরং তুমি ধীরস্থিরে আসবে এবং ইমামের সঙ্গে যতটুকু পাবে পড়ে নেবে, আর যতটুকু ছুটে যাবে তা ইমাম সালাম ফেরানোর পর পড়ে নেবে। বলাবাহুল্য, আরবী ভাষা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও যার আছে, সেই হাদীসটির এই মর্ম সহজেই বুঝতে পারবে। এ কারণেই আমাদের জানামতে কোন লা-মাযহাবী আলেম এ হাদীসকে নিজেদের দলিলরূপে উল্লেখ করেন নি। কিন্তু কালাবাগী সাহেব এই বাক্যটির প্রথম অংশ বাদ

দিয়ে শেষাংশটি এমনভাবে পেশ করেছেন যাতে সাধারণ পাঠক তার ধোঁকা বুঝতে না পারে। কালাবাগী সাহেব যে মর্ম বর্ণনা করেছেন যদি তা-ই সহি হতো, তবে পুরো বাক্যটির মর্ম দাঁড়াত– তুমি যতটুকু (ইমামের সঙ্গে) পেয়েছ তা পড়ে নাও, আর যা ছুটে গেছে সেটাও পড়ে নাও। তার মানে রাসূল সা. আবু বাকরা রা.কে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমার সঙ্গে যতটুকু নামায পেয়েছ তাও পুনরায় পড়, আর যা ছুটে গেছে সেটাও পড়!!

এ তো গেল যদি ঐ বর্ণনাটিকে সহীহ ধরা হয়। কিন্তু এ বর্ণনাটি আদৌ সহীহ নয়। এ বর্ণনাটির দু'জন রাবীই দুর্বল। একজন হলেন, মুহাম্মদ ইবনে মিরদাস আবু আব্দুল্লাহ আলবাসরী। তাকে আবু হাতেম রাযী রহ. মাজহুল (অজ্ঞাত) বলেছেন। মিযানুল ইতিদাল গ্রন্থে বলা হয়েছে, روى عن خارجة خبرا باطلا তিনি খারিজা থেকে একটি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। লিসানুল মিযান গ্রন্থেও তাকে মাজহুল (অজ্ঞাত) বলা হয়েছে। দ্বিতীয় জন হলেন, ইবনে মিরদাসের উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ঈসা আল খাররায। আল কাশিফ গ্রন্থে যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, ضعفوه মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইবনে হাজার বলেছেন, যয়ীফ বা দুর্বল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ২ :

এ মাসআলায়ও মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর ছালাত' গ্রন্থে অনেক ভুল ও অসত্য তথ্য পেশ করেছেন। সকলের অবগতির জন্য সেগুলো তুলে ধরা হলো।

১. তিনি সুরা ফাতিহা না পড়ার প্রথম দলিল হিসাবে আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিতে আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা জেহরি ছালাতে সালাম ফিরিয়ে বললেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ কি ক্বিরাআত পড়ল? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি পড়েছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না। উক্ত কথা শুনার পর লোকেরা জেহরী ছালাত সমূহে ক্বিরাআত পড়া হতে বিরত থাকল।

এ হলো মুযাফফর সাহেবের অনুবাদ। এখানে তিনি একটি বাক্যের অনুবাদে মারাত্মক ভুল করেছেন। বাক্যটি হলো, قال إني أقول ما لي أنازع القرآن। এর সঠিক অনুবাদ হবে– তিনি বললেন, আমি (মনে মনে) বলছি, কুরআন পাঠে আমার সঙ্গে টানাটানি হচ্ছে কেন? অর্থাৎ আমি কুরআন পাঠ করতে চাচ্ছি অথচ কুরআন যেন পঠিত হতে চাচ্ছে না। উল্লেখ্য, এখানে مالي প্রশ্নবাচক, আর أنازع শব্দটি কর্মবাচ্য। القرآن হলো তার দ্বিতীয় মাফউল বা কর্ম। (দ্র. মাজমাউল বিহার, نزع শব্দে)

অথচ মুযাফফর সাহেব এ বাক্যটির অনুবাদ করেছেন এইভাবে, <u>তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করতে চাই না।</u>

হাদীসটি উল্লেখ করার পর মুযাফফর সাহেব মন্তব্য করেছেন, <u>হাদীছটি যঈফ</u>।

কিন্তু তার এ দাবী সঠিক নয়। বরং এ হাদীসটি সহীহ। এর বিশুদ্ধতা নিয়ে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের কারো কোন দ্বিমত নেই। দ্বিমত রয়েছে শেষ বাক্যটি (অর্থাৎ উক্ত কথা শোনার পর লোকেরা ... বিরত থাকেন) নিয়ে। শেষ বাক্যটি কী আবু হুরায়রা রা.এর বক্তব্য, নাকি ইমাম যুহরীর? হাদীসটি যঈফ বললে পাঠক পুরো হাদীসটিকেই যঈফ মনে করে ভুল করতে পারেন। শেষ বাক্যটি সম্পর্কে ইমাম বুখারী, যুহলী, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী ও খতীব বাগদাদী প্রমুখের মত হলো, এটা ইমাম যুহরীর বক্তব্য, আবু হুরায়রা রা.এর বক্তব্য নয়। এর পেছনে তাঁদের যুক্তি হলো, এক বর্ণনায় মা'মার বলেছেন, ... قال الزهري فانتهى যুহরী বলেছেন, লোকেরা ... কিরাআত পড়া বন্ধ করে দিল। একইভাবে ইমাম আওযাঈর বর্ণনায়ও এসেছে, যুহরী বলেছেন, মুসলিমরা এ ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণ করল। জেহরী নামাযে তারা আর কিরাআত পড়ত না।

কিন্তু যারা মনে করেন এটি আবু হুরায়রা রা. এরই বক্তব্য, তাদের যুক্তিগুলোও কম ধারালো নয়। যুক্তিগুলো নিম্নরূপ :

ক. আবু দাউদ শরীফে আছে,

وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ.

ইবনুস সারহ (আহমদ ইবনে আমর) তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন, মা'মার যুহরীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, লোকেরা ... বন্ধ করে দিল। (হাদীস নং ৮২৬)

খ. ইমাম যুহরীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শিষ্য হলেন ইমাম মালেক রহ.। তিনি তার মুয়াত্তা গ্রন্থে এ হাদীসটির উপর অনুচ্ছেদ শিরোনাম দিয়েছেন ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه যে নামাযে ইমাম স্বরবে কিরাআত পাঠ করে সেই নামাযে মুক্তাদির কিরাআত না পড়া। এরপর ইমাম মালেক বলেছেন, الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة

অর্থাৎ আমাদের সিদ্ধান্ত হলো যেসব নামাযে ইমাম আস্তে কিরাআত পড়ে সেসব নামাযে মুক্তাদি কিরাআত পড়বে। আর যেসব নামাযে ইমাম স্বরবে কিরাআত পড়ে সেসব নামাযে মুক্তাদি কিরাআত পড়বে না।

এরপর ইমাম মালেক তার অনুচ্ছেদ শিরোনাম ও সিদ্ধান্তের পক্ষে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি ঐ বক্তব্যটি আবু হুরায়রা রা.এর বক্তব্য বলেই মনে করতেন।

গ. ইমাম নাসাঈ রহ. হাদীসটির উপর এই অনুচ্ছেদ শিরোনাম উল্লেখ করেছেন– ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه যেসব নামাযে ইমাম জোরে কিরাআত পড়ে সেসব নামাযে মুক্তাদির কিরাআত পাঠ না করা।

বোঝা যায়, তিনিও ঐ বাক্যটি হযরত আবু হুরায়রা রা.এর বলেই মনে করতেন।

ঘ. আবু হুরায়রা রা. এর ফতোয়াও ছিল জেহরি নামাযে মুক্তাদির কিরাআত না পড়া। ইবনুল মুনযির রহ. তার আল আওসাত গ্রন্থে স্বীয় সনদে আবু হুরায়রা রা. ও আয়েশা রা. উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

তাঁরা বলেছেন, (১৩১৩) اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به যে নামাযে আস্তে কিরাআত পড়া হয় সেই নামাযে তুমি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়। (নং ১৩১৩)

ইমাম বায়হাকীও তার সুনানে কুবরায় স্বীয় সনদে ঐ দুই সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

انهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر

তাঁরা দুজনই ইমামের পেছনে সেই নামাযে কিরাআত পড়তে বলতেন যে নামাযে ইমাম স্বরবে কিরাআত পাঠ করে না। (হা. নং ২৯৫০)

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, আবু হুরায়রা রা. এ মতটি ঐ দিনের ঘটনা থেকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর মাযহাবই বলে দিচ্ছে, ঐ বক্তব্যটি তারই।

ঙ. কোন কোন বর্ণনায় এটি মা'মার (যুহরীর শিষ্য) এর বক্তব্য হিসাবেও উদ্ধৃত হয়েছে। তাই বলে কি বলতে হবে এটা মা'মারেরই বক্তব্য, ইমাম যুহরীর নয়?

হাফেয ইবনুল কায়্যিম তার তাহযীবে মুখতাসার-ই-আবু দাউদ গ্রন্থে এ কথাটি সুন্দর করে বলেছেন,

وأي تناف بين الأمرين بل كلاهما صواب قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قال هؤلاء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود (عن مسدد) فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول الزهري

অর্থাৎ দুটি বক্তব্যের মধ্যে কী বৈপরীত্ব? দুটিই তো সঠিক হতে পারে। কথাটি আবু হুরায়রা রা.ও বলেছেন, যেমনটি মামার বর্ণনা করেছেন। আবার যুহরীও বলেছেন, যেমনটি তারা বলেছেন। একইভাবে মামারও বলেছেন, যেমনটি (মুসাদ্দাদের সূত্রে) আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন। মামারের বক্তব্য হওয়াটা যদি যুহরীর বক্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়, তবে যুহরীর বক্তব্য হওয়াটা হযরত আবু হুরায়রার বক্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে কেন?

মুসনাদে আহমাদের টীকায় আল্লামা আহমদ শাকের ও ইবনুল কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ ওয়া জুহুদুহু ফী খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়া উলূমিহা গ্রন্থে ড. জামাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল কায়্যিমের এই বক্তব্য পছন্দ ও সমর্থন করেছেন।

যদি ঐ বাক্যটি ইমাম যুহরীর বলেও ধরে নেয়া হয়, তাতেও সমস্যার কিছু থাকে না। ইমাম যুহরী অনেক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন, তাই এ ধরনের উক্তি তিনি হয়তো কোন সাহাবীর কাছ থেকে শুনেই বলে থাকবেন। অথবা কোন শীর্ষ তাবেঈ থেকে শুনে বলেছেন। মুযাফফর বিন মুহসিন ঐ বাক্যটি সম্পর্কে বলেছেন, 'এ অংশটি যুহরীর পক্ষ থেকে সংযোজিত এবং মারাত্মক ভুল।'

এ মারাত্মক ভুলের কথা তিনি কোথায় পেলেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। প্রথমত এটা 'যুহরীর পক্ষ থেকে সংযোজিত' নিশ্চিত করে এমন কথা বলাও মুশকিল। দ্বিতীয়ত এটা মেনে নিলেও এখানে ভুলেরই কিছু নেই, মারাত্মক ভুল তো দূরের কথা।

আলোচ্য হাদীসের এই শেষ বাক্যটি যুহরীর উক্তি বলে ধরে নিলেও তা হাদীসটির প্রথম অংশ দ্বারা সমর্থিত। কারণ কোন কোন সাহাবীর কিরাআত পাঠ সম্পর্কে রাসূল সা. যখন বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন তখন সাহাবীগণের পক্ষে কি আর পুনরায় এমন কাজ করা কল্পনা করা যায়? সুতরাং যুহরী যা বলেছেন তা হাদীসটির প্রথমাংশেরই দাবি। এতে তার ভুলই বা কী ঘটল? আর মারাত্মক ভুলই বা কী হলো?

২. এরপর লেখক দ্বিতীয় দলিল হিসাবে আবু হুরায়রা রা.কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীস পেশ করেছেন। প্রথম হাদীসটির ন্যায় এখানেও আছে : إني أقول مالي أنازع القرآن । তিনি এর তরজমা করেছেন, 'কুরআনের সাথে আমার ঝগড়া করা উচিত নয়।' এ তরজমা মারাত্মক ভুল। পেছনে এর শুদ্ধ তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪র্থ নম্বরে লেখক আনাস রা. বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا

লেখকের ভাষায় এর অনুবাদ– '<u>যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করবে তার মুখে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে</u>।'

এ হলো লেখকের হাদীস বোঝার অবস্থা। যে ব্যক্তি হাদীসের তরজমাই বোঝে না তার পক্ষে এত লম্ফঝম্ফ কি শোভা পায়?

হাদীসটির সঠিক অনুবাদ হলো, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়বে তার মুখ আগুনে ভরে যাক।

এরপর লেখক বলেছেন, ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এরপর তিনি ইবনে তাহের পাট্টানীর বরাত দিয়ে এর একজন রাবী মায়মূনকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমাদের জানামতে কোন যোগ্য হানাফী আলেম এটিকে দলিল হিসাবে পেশ করেন নি। এ যেন জোর করে হানাফীদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া যে, নাও এটিও তোমাদের দলীল, যা জাল ও মিথ্যা।

৫ম নম্বরে লেখক হযরত উমর রা. এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে তার মুখে যদি পাথর হতো!

এর অনুবাদেও লেখক ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার ইচ্ছা করে ঐ ব্যক্তির মুখে পাথর মারতে, যে ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পাঠ করে। (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা./২৮০৬)

এ হাদীসটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো— উক্ত বর্ণনা মুনকার, ছহীহ নয়। কারণ নিম্নের হাদীসটি তার প্রমাণ— عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَالَ : اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْتُ أَنَا. قُلْتُ : وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ : وَإِنْ جَهَرْتُ

একদা ইয়াযীদ ইবনু শারীক উমর রা.কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হোন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করি। (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হা./৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ, হা/৯৯২ এর আলোচনা দ্রঃ)

এ হলো লেখকের পুরো বক্তব্য। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. উক্ত বর্ণনা মুনকার, সহীহ নয় বলে লেখক টীকায় ৮৬৫ নম্বর দিয়ে লিখেছেন, আততামহীদ ১১/৫০ পৃ: فمنقطع لا يصح ولا نقله ثقة (এটি সূত্রবিচ্ছিন্ন, সহীহ নয়, কোন বিশ্বস্ত লোক এটি বর্ণনা করেন নি।) এতে যে কোন পাঠক মনে করতে পারেন, ইবনে আব্দুল বার তামহীদ গ্রন্থে উমর রা.এর হাদীসটি সম্পর্কেই এই মন্তব্য করেছেন। অথচ ব্যাপার তা নয়। তিনি বরং স্পষ্টভাবে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.এর হাদীস ও বক্তব্য সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন। তবে লেখক কেন এমন প্রতারণার আশ্রয় নিলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

দুই. তিনি বলেছেন, "ছহীহ নয়, নিম্নের হাদীসটি তার প্রমাণ।" আর নিম্নের ঐ হাদীসটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, সনদ ছহীহ। কিন্তু তার এ মন্তব্য তো তাকলীদ বৈ নয়। হাকেম, দারাকুতনী ও বায়হাকী প্রমুখের মত এমনটাই। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এটি সহীহ হওয়া মুশকিল। কারণ জাওয়াব আত তায়মী নামে এর একজন রাবী আছেন। ইবনে নুমায়র তার সম্পর্কে বলেছেন, ضعيف الحديث তিনি যঈফুল হাদীস ছিলেন। বায়হাকী এখানে তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়ে তার এ হাদীসকে সহীহ বললেও ১০৮২৪ নম্বর হাদীসের পরে তিনি বলেছেন, جواب التيمي غير قوي জাওয়াব আত তায়মী মজবুত রাবী নন। যাহাবী তার সিয়ার গ্রন্থে বলেন, وليس بالقوي في الحديث হাদীসে তিনি মজবুত ছিলেন না। আবুল আরবও তাকে যঈফ রাবীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া এ হাদীসটি একই সনদে বায়হাকীর কিতাবুল কিরাআতে উদ্ধৃত হয়েছে। (হা/১৮৭), সেখানে একথাও আছে যে, উমর রা. বলেছেন, واقرأ فاتحة الكتاب وشيئا তুমি সূরা ফাতিহা ও সেই সঙ্গে আরো কিছু পাঠ কর।

অথচ লা-মাযহাবী বন্ধুরা জাহরী নামাযে এই আরো কিছু পড়ার পক্ষপাতী নন। আর এ কারণেই উমর রা.এর এ হাদীসটির অনুবাদে খুব

কৌশলে বলা হয়েছে– তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। অথচ 'শুধু' কথাটি তার বক্তব্যে নেই।

সারকথা, এ বর্ণনাটি সহীহ না হলে এর দ্বারা প্রথম বর্ণনাটিকে নাকচ করে দেওয়ার কোন যুক্তি থাকে না। বিশেষত এ কারণেও যে, এর পক্ষে আরো কিছু বর্ণনার সমর্থন রয়েছে। যেমন, ক. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় সহীহ সনদে নাফি' ও আনাস ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেছেন, تكفيك قراءة الإمام ইমামের কিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। (হা. ৩৭৮৪)

খ. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে আছে, মূসা ইবনে উকবা বলেছেন, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام রাসূল সা., আবু বকর, উমর ও উসমান রা. ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠ থেকে নিষেধ করতেন। (হা, ২৮১০) এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ আছেন, তিনি যঈফ।

গ. উক্ত গ্রন্থেই আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়ায়না থেকে, তিনি আবু ইসহাক শায়বানী থেকে, তিনি জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রা. দৃঢ়ভাবে বলেছেন, তোমরা ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠ কোরো না। (হা/২৮০৪)

৫. ষষ্ঠ দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, عن ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا

লেখকের ভাষায় এর অনুবাদ হলো, ইবনু মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করতে আমার ইচ্ছা করে।

লেখকের এ অনুবাদও ভুল। সঠিক অনুবাদ হবে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে তার মুখ যদি মাটিতে ভরে যেত।

বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো, বর্ণনাটি যঈফ, ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল। এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু এ বর্ণনাটি সকলের মতে যঈফ নয়। কারণ মুরসাল হাদীস ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ ও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। শর্ত হলো, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হবে এবং বিশ্বস্ত লোকদের থেকে বর্ণনা করাই তার রীতি হবে। (দ্র. মুকাদ্দামায়ে তামহীদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ ও আল ফুসূল ফিল উসূল)

এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক উদ্ধৃত করেছেন দাউদ ইবনে কায়স থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আজলান থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ রা. থেকে। এই ইবনে আজলান ও দাউদ উভয়ে বিশ্বস্ত। তবে ইবনে মাসউদ রা.এর সঙ্গে ইবনে আজলানের সাক্ষাৎ ঘটে নি। তিনি নিশ্চয়ই অন্য কারো কাছ থেকে এটি শুনেছেন। এজন্যই এটাকে সূত্রবিচ্ছিন্ন বলা হয়। মুরসাল শব্দটি এখানে মুনকাতে' (সূত্র বিচ্ছিন্ন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাহাবী শরীফে এর ভিন্ন একটি সনদ রয়েছে, যার সূত্র অবিচ্ছিন্ন। ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন আবু বাকরা থেকে, তিনি আবু দাউদ (ইবরাহীম ইবনে দাউদ বুরুল্লুসী) থেকে, তিনি হুদায়জ ইবনে মুআবিয়া থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আলকামা'র সূত্রে ইবনে মাসউদ রা. থেকে।

এ সনদে শুধু হুদায়জ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে তাকে যঈফ বলেছেন। তবে ইমাম আহমদ বলেছেন, আমি তার সম্পর্কে শুধু ভালই জানি। আবু হাতিম রাযীও বলেছেন, محله الصدق তিনি সত্যনিষ্ঠ পর্যায়ের ছিলেন। ইবনে আদী বলেছেন, আমার মতে তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই।

তাছাড়া ইবনে মাসউদ রা. থেকে এ মর্মে অবিচ্ছিন্ন একাধিক সূত্রে সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকতে লেখক কেন এ মুরসাল বা সূত্রবিচ্ছিন্ন হাদীসটি এনে এর উপর মন্তব্য করে চলে যাচ্ছেন তাও বোধগম্য নয়। তিনি কি এ ধারণাই দিতে চাচ্ছেন যে, এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ থেকে আর কোন সহীহ হাদীস নেই? এ হলে তো পাঠককে ধোঁকা দেওয়া হবে।

এখানে শুধু একটি বর্ণনা তুলে ধরছি।

عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحمن اقرأ خلف الإمام؟ فقال له عبد الله : إن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام.

আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠ করব? তিনি বললেন, নামাযে গভীর ধ্যান ও মনোযোগ দিতে হয়। ওটার জন্য ইমামই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। (ইবনে আবু শায়বা, হা. ৩৮০১; আব্দুর রাযযাক, হা. ২৮০৩; মুয়াত্তা মুহাম্মদ, পৃ. ৯৯)

৬. ৭ম দলিল হিসাবে লেখক সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো, সা'দ রা. বলেন, وددت إن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে তার মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার হতো। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হা. ৩৭৮২)

এ হাদীসের অনুবাদেও লেখক ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমার ইচ্ছা হয় তার মুখে আগুনের অঙ্গার ছুড়ে মারতে।

হাদীসটির উপর লেখক মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। ইমাম বুখারী বলেন, এর সনদে ইবনু নাজ্জার নামে অপরিচিত রাবী আছে।

ইবনু নাজ্জার কথাটি লেখকের ভুল। সঠিক হবে ইবনে বিজাদ বা ইবনে নিজাদ। দুভাবেই এ নামটি বলা সহীহ। ইমাম বুখারী রহ. যে তাকে অপরিচিত বলেছেন সে কথায় হয়তো তিনি অটল ছিলেন না। কারণ তিনি তার আত তারীখুল কাবীর গ্রন্থে ইবনে বিজাদের নাম মুহাম্মদ ইবনে বিজাদ উল্লেখ করে তার জীবনীতে এমন তথ্য পেশ করেছেন যার দ্বারা তিনি যে মাজহুল বা অপরিচিত ছিলেন তার কোন আভাস পাওয়া যায় না। বুখারী রহ. লিখেছেন, মা'ন ইবনে ঈসা তার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, এবং তিনি তার ফুফু আইশা বিনতে সা'দ থেকে হাদীস শুনেছেন। ইবনে আবু হাতিমও তার আল জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে অনুরূপ তথ্য পেশ করেছেন। তিনিও তার সম্পর্কে অপরিচিত হওয়ার কোন ইংগিত দেন নি। আর ইবনে হিব্বান তো তার আছ ছিকাত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে স্পষ্ট জানান দিয়েছেন, মুহাম্মদ ইবনে বিজাদ বিশ্বস্ত ছিলেন। এ দিকে হাকেম

আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী তার মারিফাতু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন, وولد سعد بن أبي وقاص إلى سنة خمسين ومأتين فيهم فقهاء وأئمة وثقات وحفاظ اهـ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.এর বংশধরদের মাঝে দুইশত পঞ্চাশ হিজরী পর্যন্ত ফকীহ, ইমাম, বিশ্বস্ত ও হাফেজে হাদীস ছিলেন। (পৃ. ৫১)

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, ইবনে বিজাদ অপরিচিত ছিলেন না। সুতরাং তার এ বর্ণনাটিকে যঈফ বলার সুযোগ কোথায়?

৭. ৮ম দলিলরূপে লেখক উল্লেখ করেছেন, : عن علقمة بن قيس قال لأن أعض على جمرة أحب إليّ من أن أقرأ خلف الإمام

আলকামা বিন কায়েস বলেন, আমার নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার কামড়ে ধরা অধিক উত্তম, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার চেয়ে। আসওয়াদ থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে।

এরপর লেখক মন্তব্য করেছেন, এর সনদ যঈফ ও ত্রুটিপূর্ণ। বুকাইর ইবনু আমের নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে।

এখানে তিনটি কথা। এক. বুকাইর ইবনে আমেরের কারণে লেখক এ বর্ণনাটিকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বুকাইর সকলের মতে যঈফ ছিলেন না। ইবনে সা'দ তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। ইজলী তার সম্পর্কে বলেছেন, لا بأس به তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। ইমাম আহমদ এক বর্ণনামতে তাকে যঈফ আখ্যা দিলেও অন্য বর্ণনায় বলেছেন, صالح الحديث ليس به بأس তিনি সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন, তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। ইবনে আদী বলেছেন, لم أجد له متنا منكرا আমি তার কোন আপত্তিকর হাদীস পাইনি। ইবনে মাঈন, আবু যুরআ ও একটি বর্ণনামতে ইমাম আহমদ তাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এ ধরনের বর্ণনাকারীর হাদীসকে ঢালাওভাবে যঈফ বলে দেওয়া ন্যায় ও ইনসাফের কথা হতে পারে না।

দুই. আলকামা'র এ বর্ণনাটিকে যদি যঈফ ধরে নেওয়াও হয় তথাপি একথা প্রমাণিত হবে না যে, আলকামা এমন কথা বলেন নি। কারণ এ

মর্মে তার থেকে ভিন্ন সনদে আরো বর্ণনা রয়েছে। যেমন, কিতাবুল আছারে ইমাম মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহীম নাখায়ীর সূত্রে আলকামা থেকে, এভাবে আব্দুর রাযযাক রহ. তার মুসান্নাফে মা'মার থেকে, তিনি আবু ইসহাকের সূত্রে আলাকামা'র অনুরূপ মর্মের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

তিন. লেখক বলেছেন, আসওয়াদ থেকেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে। কিন্তু এটি সহীহ না যঈফ সে প্রসঙ্গ তিনি উল্লেখ করেন নি। অথচ মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় উদ্ধৃত এ বর্ণনাটির সকল রাবী বিশ্বস্ত, বুখারী মুসলিমের রাবী।

৮. ৯ম দলিলরূপে লেখক উল্লেখ করেছেন,

قال حماد : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه سكرا.

লেখকের অনুবাদ হলো, হাম্মাদ বলেন, আমার ইচ্ছা হয় ঐ ব্যক্তির মুখে মদ নিক্ষেপ করি যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে।

এখানেও লেখক নিক্ষেপ করার ভুল অর্থ করেছেন। সঠিক অর্থ হবে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে তার মুখ যদি মাদকে পূর্ণ হতো।

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো, যঈফ। ইমাম বুখারী বলেন, এ সমস্ত বর্ণনা যাদের নামে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হয় নি।

লেখক এখানে না বুঝেই ইমাম বুখারী রহ.এর বক্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। বুখারী রহ. হাম্মাদের বর্ণনাটি সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেন নি। বরং যায়দ ইবনে ছাবিত রা.এর একটি মারফূ বর্ণনা সম্পর্কে মন্তব্যটি করেছেন। সামনে ১১ নং দলিলে মাওকূফরূপে লেখক এটি উল্লেখ করেছেন।

৯. ১০ম দলিল হিসাবে লেখক উল্লেখ করেছেন,

عن محمد بن عجلان قال قال علي رض : من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة

আলী রা. বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিরাআত পাঠ করে সে (ইসলামের) ফিতরাতের উপর নেই। (সঠিক অনুবাদ হবে, স্বাভাবিক নিয়মের উপর নেই।)

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো, বর্ণনাটি ছহীহ নয়। ইমাম বুখারী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। কারণ মুখতার অপরিচিত। সে তার পিতা থেকে শুনেছে কি না তা জানা যায় না। ইবনু হিব্বান তাকে বাতিল বলেছেন।

বড়ই আশ্চর্য, লেখক এখানে ভিন্ন একটি সূত্র সম্পর্কে করা ইমাম বুখারী ও ইবনে হিব্বানের মন্তব্য দুটি ইবনে আজলানের সূত্রে উদ্ধৃত বর্ণনাটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। অথচ মুহাম্মদ ইবনে আজলানের সূত্রে মুখতার নামে কোন রাবী নেই, তার পিতারও উল্লেখ নেই। ইবনে আজলান থেকে এটি বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবনে কায়স, আর দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক। (দ্র. মুসান্নাফ, হাদীস ২৮০৬)

এর আরেকটি সূত্র আছে মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায় (হা. ৩৮০২)। ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান আল আসবাহানী থেকে, তিনি ইবনে আবু লায়লার সূত্রে হযরত আলী রা. থেকে। এতেও মুখতার নামের কেউ নেই। এর আরো দুটি সূত্র আছে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে। (হা. ২৮০১, ২৮০৪) সেখানেও মুখতার নামের কেউ নেই। আসলে ইমাম বুখারীর মন্তব্যটি যে সূত্র সম্পর্কে, সেখানে মুখতার নামক রাবী আছেন। আর লেখক গড়ে সব সূত্র সম্পর্কেই ঐ মন্তব্যটি জুড়ে দিয়েছেন।

এরপর লেখক জ্ঞাতব্য শিরোনামে লিখেছেন, উক্ত বর্ণনাগুলো ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিরুদ্ধে পেশ করা হয়। যদিও তাতে সূরা ফাতিহার কথা নেই। জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহার পরের সাধারণ ক্বিরাআত পড়ার কথা বলা হয়েছে।

লেখক তার এ দাবির পক্ষে হাদীসের কোন দলিল পেশ করতে পারেন নি। টীকায় শুধু ইমাম বুখারীর মতটি উল্লেখ করে দিয়েছেন। ইমাম বুখারীর মত দিয়েই যদি ঐ দাবি প্রমাণিত হয়, তবে ইমাম আবু হানীফার মত দিয়ে ভিন্ন মতটি প্রমাণিত হবে না কেন?

১০. ১১ তম দলিলরূপে লেখক বলেছেন,

عن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له

যায়েদ বিন ছাবিত বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিছু পড়বে তার ছালাত হবে না।

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য হলো, বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। এর সনদে আহমদ ইবনু আলী ইবনু সালমান মারূযী নামে একজন রাবী আছে। সে হাদীস জাল করত। ইবনু হিব্বান বলেন, এই হাদীছের কোন ভিত্তি নেই।

আসলে লেখকের উচিৎ ছিল লেখার পূর্বে কোন বক্তব্য বোঝার ন্যূনতম যোগ্যতাটুকু অর্জন করা, শাস্ত্রীয় বিষয়ের কথা আর বললাম না। যে তিনটি হাদীস গ্রন্থের বরাত তিনি টীকায় উল্লেখ করেছেন, তার কোনটিতেই ঐ আহমদ ইবনে আলী নেই। তিনটি গ্রন্থে এর সনদ বা সূত্র নিম্নরূপ :

হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রা. থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁরই নাতি মূসা ইবনে সা'দ, (তাকে মূসা ইবনে সাঈদও বলা হয়), তার থেকে বর্ণনা করেছেন উমর বা আমর ইবনে মুহাম্মদ, তার থেকে বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবনে কায়স (তিনি হলেন দাউদ ইবনে সা'দ ইবনে কায়স), ও ওয়াকী। দাউদ থেকে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম মুহাম্মদ (পৃ. ১০২) ও আব্দুর রাযযাক (হা. ২৮০২)। আর ওয়াকী থেকে উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবু শায়বা (হা. ৩৮০৯)।

এ হাদীসটি দুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ক. মাওকূফ বা যায়দ রা.এর বক্তব্যরূপে। এটিই উপরের তিনটি হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

খ. মারফূ বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে। এ বর্ণনাটি মারফূ হওয়া প্রমাণিত নয়। এর সনদেই ঐ আহমাদ ইবনে আলী নামক হাদীস জালকারী রাবী আছে। আর এ মারফূ হাদীসটি সম্পর্কেই আলবানী সাহেব জাল বলে মন্তব্য করেছেন। লেখক এখানে হাদীস উল্লেখ করেছেন মাওকূফটি, বরাতও দিয়েছেন মাওকূফ বর্ণনার। আর এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন মারফূ বর্ণনার আলোচনা। মাওকূফ বর্ণনাটির রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। একথা আলবানী সাহেবও স্বীকার

করেছেন। (যঈফা, হাদীস ১১) তবে তিনি শুধু বায়হাকীর কিতাবুল কিরাআতের উপর নির্ভর করার কারণে একটু জটিলতায় পড়েছেন।

১১. ১২ তম দলিলরূপে লেখক উদ্ধৃত করেছেন হযরত জাবের রা.এর হাদীস। হাদীসটি নিম্নরূপ :

عن جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি এক রাকআত ছালাত আদায় করল (সঠিক অনুবাদ হবে, যে ব্যক্তি নামাজের কোন একটি রাকাত আদায় করল) অথচ সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার ছালাত হবে না। তবে ইমামের পিছনে থাকলে হবে।

এ বর্ণনা সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেন, বর্ণনাটি যঈফ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এটা বাতিল বর্ণনা। মালেক থেকে বর্ণিত হয় নি। মূলত 'তবে ইমামের পিছনে থাকলে হবে' এ অংশটুকু ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া বর্ণনাটি মাওকূফ।

এখানেও লেখক পূর্বের দলিলটির মতো একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ বর্ণনাটিও মারফূ ও মাওকূফ দুভাবেই আছে। দারাকুতনীর মন্তব্যটি মারফূ বর্ণনা সম্পর্কে। লেখক মাওকূফ বর্ণনাটি উল্লেখ করে এর সঙ্গে দারাকুতনীর মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন।

মাওকূফ বর্ণনাটির সনদ সহীহ, এ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। ইমাম তিরমিযী স্পষ্টভাবে এটিকে সহীহ বলেছেন। মুয়াত্তা মালেকেও অত্যন্ত মজবুত সনদে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ বর্ণনাটির কারণেই ইমাম মালেক সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না ও ইমাম আহমাদ প্রমুখ অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ বলেছেন, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া জরুরী নয়।

মারফূ বর্ণনাটি খিলাঈ রাহ. উদ্ধৃত করেছেন তার আল ফাওয়াইদ গ্রন্থে। এর সনদও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এর সনদে শুধু একজন রাবী আছেন, যাকে নিয়ে বিতর্ক আছে। তিনি হলেন ইয়াহয়া ইবনে সালাম। আবু যুরআ রাযী তার সম্পর্কে বলেছেন, لا بأس به ربما وهم তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই, তবে মাঝে মধ্যে তিনি ভুল করে বসেন। আবু হাতেম

রাযী বলেছেন, صدوق তিনি সত্যনিষ্ঠ। ইবনে হিব্বান তাকে ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তবে তিনিও বলেছেন, ربما أخطأ মাঝেমধ্যে তিনি ভুলের শিকার হন। ইবনুল জাযরী বলেছেন, كان ثقة ثبتا ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة اللغة তিনি বিশ্বস্ত ও সুদৃঢ় ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহ ও আরবীভাষা সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। আবুল আরাব তাবাকাত গ্রন্থে লিখেছেন, وكان من الحفاظ ومن خير خلق الله তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস ও উৎকৃষ্টতম মানুষ। হাফেজ যাহাবী তাকে সিয়ার গ্রন্থে আল ইমামুল আল্লামা উপাধি যোগে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তার এ বর্ণনা কেউ উদ্ধৃত করলে প্রতারণা হবে কেন?

১২. ১৩ তম দলিলটি লেখক এভাবে উল্লেখ করেছেন,

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামের কিরাআতই তোমার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আস্তে পড়ুন আর জোরে পড়ুন।

এটি সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি যঈফ। এর মধ্যে আছেম নামে একজন রাবী আছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়।

কিন্তু আসেম সম্পর্কে দারাকুতনীর মন্তব্যই শেষ কথা নয়। মা'ন ইবনে ঈসা ও মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না দুজন দারাকুতনীর বহুপূর্বে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। একারণে ইবনে হাজার তার তাকরীব গ্রন্থে তাকে যঈফ আখ্যা না দিয়ে বলেছেন, صدوق يهم তিনি সত্যনিষ্ঠ, কখনো সখনো ভুল করে বসেন।

এরপর লেখক বলেছেন, এ বর্ণনাগুলো কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয় নি। বর্ণিত হয়েছে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায়, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও তাহাবী প্রভৃতি গ্রন্থে।

Contents

হ্যাঁ, এতক্ষণে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। এসব হাদীসগ্রন্থ নির্ভরযোগ্য নয় তার প্রমাণ কি? তবে কি লা-মাযহাবী বিরোধী হাদীস উদ্ধৃত হওয়ায় এগুলো অনির্ভরযোগ্য হয়ে গেল? ইবনে আবূ শায়বা তো বুখারী-মুসলিমের উস্তাদ, তার সূত্রে তারা অনেক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এমনিভাবে আব্দুর রাযযাক বুখারী-মুসলিমের দাদা উস্তাদ, তার সূত্রেও তারা অনেক হাদীস এনেছেন। তাহলে তাদের কিতাব অনির্ভরযোগ্য হলো কিরূপে?

ইমাম তাহাবীর কিতাবটিই বা কিভাবে অনির্ভরযোগ্য হয়ে গেল? লেখকের যদি নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভর কিতাবের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড জানা না থাকে, তবে তার উচিৎ ছিল এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আর যদি জানা থাকে, তবে জেনেবুঝে কলমের ভুল ব্যবহার থেকে বিরত থাকা উচিৎ ছিল।

তাছাড়া প্রথম দলিলটি লেখক নিজেই আবু দাউদ ও তিরমিযীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। জাবের রা.এর বর্ণনাটিও তিরমিযী, মুয়াত্তা মালেক প্রভৃতি কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। যায়দ ইবনে ছাবিত রা.এর একটি বর্ণনাও মুসলিম শরীফের বরাতে আমাদের এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে উমর রা.এর বর্ণনাও সহীহ সূত্রে মুয়াত্তা মালেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাহলে লেখকের এ ঢালাও মন্তব্যের মতলব কি?

এরপর লেখক আরো লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক মন্তব্য করেন, আমি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করি এবং অন্য মানুষেরাও করে। কিন্তু কুফাবাসী করে না।

এখানে লেখক সত্য গোপন করেছেন। ইবনুল মুবারকের মন্তব্যটি ইমাম তিরমিযী روي عن ابن المبارك (ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত আছে) শব্দ দ্বারা পেশ করেছেন। ইবনুল মুবারক পর্যন্ত এর কোন সনদ তিনি উল্লেখ করেন নি। একই শব্দ দিয়ে ইমাম তিরমিযী যখন ২০ রাকাত তারাবীহ সম্পর্কে বলেছেন, روي عن عمر وعلي উমর ও আলী রা. থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে, তখন এই লা-মাযহাবী বন্ধুটি তারাবীহর রাকআত সংখ্যা পুস্তিকায় খুব জোর দিয়ে দাবী করেছেন, এটা তাদের থেকে দুর্বলভাবে প্রমাণিত। আর তিরমিযী এই দুর্বলতার প্রতি رُوِي শব্দ দিয়ে

ইংগিত করেছেন। (পৃ. ৫৭) সেই একই শব্দ এখানে এসে নিজের মতলবের বেলায় সবল হয়ে গেল কিভাবে তা আমাদের বোধগম্যের বাইরে। এর চেয়ে বড় কথা হলো, ইবনুল মুবারকের মন্তব্যটির শেষের একটি বাক্য ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করলেও এই লেখক গোপন করে গেছেন। কারণ বাক্যটি তার মতের উপর কুঠারাঘাত করে। ঐ বাক্যে ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة অর্থ : আমি মনে করি, যে ব্যক্তি কেরাআত পড়বে না তার নামায জায়েয ও সঠিক হবে। তাছাড়া ইবনুল মুবারকের মত হলো, জাহরী নামাযে মুকতাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না। সিররী নামাযে করবে। (তাও করা ফরজ-ওয়াজিব নয়, না করলেও নামায হয়ে যাবে।) দেখুন, আবু নাসর মারওয়াযী কৃত ইখতিলাফুল ফুকাহা, নং ২২।

এবার দেখুন, ইবনুল মুবারকের মত নিয়ে লা-মাযহাবীদের খুশি হওয়ার কী আছে?

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার ছহীহ হাদীছসমূহ শিরোনামে লেখক তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসগুলো সম্পর্কে লেখকের দাবীর কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

১. উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার নামায হয় না।

এর উপর ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেন, প্রত্যেক সালাতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য ক্বিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব। মুক্বীম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, জেহরী ছালাতে হোক বা সির্রী ছালাতে হোক।

এ হলো লেখকের দলিল। অর্থাৎ এ হাদীসটি মুক্তাদী সম্পর্কেও কি না, সে কথার দলিলরূপে তিনি ইমাম বুখারীর মতামত উল্লেখ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এ হাদীসের মর্ম সম্পর্কে কী বলেন, সেটা লেখক বিবেচনায় আনেন নি। অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণ কী বলেন, তারও কোন উল্লেখ তিনি করেন নি।

বড়ই আফসোস, রাসূল সা. এর সাহাবী হযরত জাবের রা. বলেছেন, এ হাদীস মুক্তাদী সম্পর্কে নয়। ইমাম বুখারী বলেছেন, মুক্তাদী সম্পর্কেও। লেখক সাহাবীর কথা বাদ দিয়ে ইমাম বুখারীর কথা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ তিনজনই হযরত জাবের রা.এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বলেছেন, মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। লেখক এটা বিভ্রান্তিকর বলে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এরপর এদিক সেদিকের নানা কথা বলে পরিশেষে লিখেছেন, 'এজন্য ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য প্রায় সকল মুহাদ্দিছ জামাআতে পড়ার পক্ষেই উক্ত হাদীছ পেশ করেছেন।'

এ দাবী লেখকের মিথ্যাচার বৈ নয়। তিনি নিজেও তা জানেন। এজন্য প্রায় সকল মুহাদ্দিছ বললেও টীকায় বরাত দিয়েছেন শুধু ইবনে মাজা'র।

ইমাম তিরমিযী তো মুক্তাদির কিরাআত পড়ার অনুচ্ছেদ থেকে ৪৮/৪৯ অনুচ্ছেদ পূর্বে এই হাদীসটি উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন এই হাদীসের সঙ্গে মুক্তাদির দূরতম সম্পর্কও নেই।

যদি ধরেও নিই, এই হাদীসে মুক্তাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তথাপি রাসূল সা. যেহেতু বলেছেন ইমামের পড়াই মুক্তাদির পড়া বলে বিবেচিত হবে, তাই মুক্তাদি চুপ থাকলেও ধরা হবে সেও পড়েছে। আলবানী সাহেবের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি গ্রন্থের (বঙ্গানুবাদ) টীকায় লা-মাযহাবী বন্ধুরা কত সুন্দর লিখেছেন, 'অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ইমামের সরবে কিরাআত কালে মুক্তাদীর পাঠ না করে চুপ থেকে শুনার নির্দেশ ও সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া ছলাত হয় না এর মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বরং দু'হাদীছের মর্ম একই। কারণ একাগ্রতার সাথে চুপ থেকে শুনলেই মনে মনে পড়া হয়ে যায়। (সম্পাদক) (পৃ. ৮৪)

২. ২য় নম্বরে লেখক মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. নবী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন ছালাত আদায় করল, অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এ কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন। তখন আবু হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পেছনে থাকি? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি চুপে চুপে পড়।

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে তিনটি কথা।

এক. اقرأ بها في نفسك বাক্যটির অর্থ যেমন 'তুমি চুপে চুপে পড়' হয়, তেমনি 'তুমি মনে মনে পড়'ও হয়। ইবনে আব্দুল বার রহ. এই দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটি মুখে পড়ার স্পষ্ট প্রমাণ হয় না।

দুই. এটি হযরত আবু হুরায়রা রা.এর নিজস্ব মত ও ইজতিহাদ। তার প্রমাণ, এরপর তিনি এমন কথা সরাসরি রাসূল সা. থেকে বর্ণনা না করে একটি হাদীসে কুদসী উল্লেখ করেছেন, যেখানে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি সূরা ফাতিহাকে আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে দুভাগে ভাগ করেছি। (আলহাদীস)

সুতরাং আবু হুরায়রা রা.এর মতটি দলিল হতে পারলে ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও জাবের রা. প্রমুখের ফাতিহা না পড়ার মত দলিল হতে পারবে না কেন?

তিন. এটি সিররী নামায সম্পর্কে। কারণ জাহরী নামায সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. নিজেই বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপত্তির কারণে সাহাবীগণ কিরাআত পড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে এমন একটি ফতোয়াও উদ্ধৃত রয়েছে। ১৫২ নং পৃষ্ঠায় এসব তুলে ধরা হয়েছে।

দুই নং হাদীসটি উল্লেখ করার পর লেখক বলেন, উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-মুক্তাদি সকলেই সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহা শুধু ইমামের জন্য নয়। কারণ আল্লাহর বান্দা শুধু ইমাম নন, মুক্তাদিও আল্লাহর বান্দা।

কিন্তু মুক্তাদিও যে আল্লাহর বান্দা এমন মোটা কথা ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ কেউ বুঝলেন না, হযরত জাবের রা. ও অন্যান্য সাহাবীগণও বুঝতে পারলেন না– এমন কথা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? ইমামের পড়াই যখন মুক্তাদির পড়া বলে গণ্য হয়, তখন ইমাম-মুক্তাদি সকল আল্লাহর বান্দাই কি পড়ার মধ্যে শরিক হচ্ছে না?

৩. ৩য় নম্বরে লেখক আবু দাউদের বরাতে রিফাআ ইবনে রাফে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূল সা. নামাযে ত্রুটিকারী জনৈক ব্যক্তিকে বলেছেন, যখন তুমি কেবলামুখী হবে তখন

তাকবীর দিবে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আরো কিছু অংশ পাঠ করবে। (হা. ৮৫৯)

পাঠক এ কথা জেনে অবশ্যই আশ্চর্য হবেন যে, এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বুখারী (হা. নং ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭), ইমাম মুসলিম (হা. নং ৩৯৭), ইমাম তিরমিযী (হা. ৩০২, ৩০৩), আবু দাউদ (হা. নং ৮৫৬-৮৬১), নাসাঈ (হা. ৮৮৪) ও ইবনে মাজাহ (হা. ১০৬০) প্রমুখ। তন্মধ্যে শুধু আবু দাউদের ৮৫৯ নং বর্ণনায় এসেছে, 'অতঃপর তুমি সূরা ফাতিহা পড়বে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আরো কিছু অংশ পাঠ করবে।' এছাড়া সকল বর্ণনায় এসেছে, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن অতঃপর তুমি কুরআনের যে অংশই সহজ লাগে পাঠ কর।

হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবে বহুসূত্রে বর্ণিত এই বাণীটি পরিহার করে লেখক আবু দাউদের একটি মাত্র বর্ণনাকে নিজের মতলব হাসিলের জন্যই এখানে উদ্ধৃত করেছেন। আবু দাউদের এ বর্ণনাটিকে আলবানী সাহেব হাসান বলেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে অন্য সকল সহীহ বর্ণনার বিরোধী হওয়ার কারণে এটি শায বা দলবিচ্ছিন্ন বর্ণনা।

খুব সম্ভব এই লেখকই ইন্টারনেটে আমাদের ইকামত সম্পর্কিত মাসআলার জবাব দিতে গিয়ে নসীহত করেছেন বুখারী-মুসলিমের হাদীস থাকতে অন্য হাদীস গ্রহণ না করতে। অথচ সেখানে পেশকৃত আমাদের হাদীসগুলো সহীহসূত্রে বর্ণিত। আর এখানে তিনি বুখারী-মুসলিমের হাদীস বাদ দিয়ে শায একটি বর্ণনাকে গ্রহণ করলেন। তাহলে কি নসীহতটি একান্ত আমাদের জন্য?

আসল কথা কি, বুখারী-মুসলিমের বর্ণনাটি গ্রহণ করলে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যে ফরজ বলে তারা বলে থাকেন সে কথা আর প্রমাণিত থাকে না। সে কারণেই হাদীসটির প্রসিদ্ধ এ বাক্যটি বাদ দিয়ে শুধু আবু দাউদের বরাতে উদ্ধৃত বাক্যটি দলিলরূপে পেশ করা হয়েছে।

তাছাড়া এ হাদীসে মুক্তাদির কোন প্রসঙ্গ নেই। এখানে রাসূল সা. একজন বেদুইন সাহাবীকে নামায শেখাচ্ছিলেন, যিনি তাঁর সামনে নামায পড়ছিলেন এবং বারবার ভুল করছিলেন। সুতরাং এ হাদীসে মুক্তাদির প্রসঙ্গ টেনে আনার কোন অর্থ হয় না।

আরো কয়েকটি হাদীস সম্পর্কে :

১. হযরত জাবের রা.এর হাদীস :

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইমামের পেছনে জোহর ও আসরে প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করতাম, আর শেষ দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম। (ইবনে মাজাহ, হা. নং ৮৪৩)

এ হাদীসটি দিয়ে দলিল দেওয়া হয় যে, সিররী নামাযে সূরা ফাতিহা তো পড়া যাবেই, সেই সঙ্গে মুক্তাদি অন্য সূরাও পড়তে পারবে।

কিন্তু দলিল দেওয়ার পূর্বে হাদীসটিকে সহীহ প্রমাণিত করতে হবে। সনদের বিচারে কেউ কেউ সহীহও বলেছেন। কিন্তু এতে 'ইমামের পেছনে' (خلف الإمام) কথাটি সহীহ নয়। অর্থাৎ এটি মুক্তাদি সম্পর্কে নয়। একাকী নামায আদায়কারী সম্পর্কে। একটু বিস্তারিত বললে বিষয়টি এভাবে বলা যায়, এ হাদীসটি হযরত জাবের রা. থেকে তিনজন তাবিঈ বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম, যুহরী ও ইয়াযীদ আল ফাকীর। উবায়দুল্লাহর বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন আবুদর রাযযাক (২৬৬১, ২৬৬২), তাহাবী (১২৪৮, ১২৪৯) ও ইবনুল মুনযির (আল আওসাত-১৩৩২)। এই বর্ণনার কোথাও 'ইমামের পেছনে' কথাটি নেই।

ইমাম যুহরীর বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন আব্দুর রাযযাক (২৬৫৬)। এ বর্ণনায়ও 'ইমামের পেছনে' কথাটি নেই।

ইয়াযীদ আল ফাকীর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দুজন– মিসআর ও শো'বা। মিসআর থেকে এটি বর্ণনা করেছন ওয়াকী, ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, ইসমাঈল ইবনে আমর বাজালী, বুকায়র ইবনে বাক্কার ও মুআবিয়া ইবনে হিশাম– এই পাঁচ জন। ওয়াকীর বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবু শায়বা (৩৭৪৯)। কাত্তানের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাহাবী (১২৫১) ও বায়হাকী, সুনানে কুবরায় (২৪৭৬) ও জুযুউল কিরাআতে (৪৭)। ইসমাঈলের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন আবু নুআইম হিলয়া গ্রন্থে (৭/২৬৯)। বুকায়র ইবনে বাক্কারের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন বায়হাকী জুযউল কিরাআতে (৩৫৯)। আর মুআবিয়া ইবনে হিশামের বর্ণনাটিও উদ্ধৃত করেছেন বায়হাকী তার জুযউল কিরাআতে (৪৮)। এসব বর্ণনার কোনটিতেই 'ইমামের পেছনে' কথাটি নেই।

বাকি রইল শোবার বর্ণনাটি। এটি শুধু ইমাম ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত করেছেন। এতে 'ইমামের পেছনে' কথাটি এসেছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটি একটি ভুল বর্ণনা। তবে এ ভুলের দায় শোবার উপর পড়বে না। পড়বে তার শিষ্য সাঈদ ইবনে আমেরের উপর। তিনি বিশ্বস্ত হলেও কিছু কিছু ভুলত্রুটির শিকার হতেন। আবু হাতেম রাযী বলেছেন,

كان رجلا صالحا وكان في حديثه بعض الغلط وهو صدوق

তিনি নেক মানুষ ছিলেন, তার হাদীসে কিছু কিছু ত্রুটি ছিল। তবে তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।

এই সাঈদ ইবনে আমের অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন শো'বা থেকে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনে সুহায়ব রহ.এর সূত্রে আনাস রা. থেকে। হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করেছেন,

لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ

সাঈদ ইবনে আমের ছাড়া শো'বা থেকে অন্য কেউ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না। এ হাদীসটি সঠিক নয়। (তিরমিযী শরীফ, হা. ৬৯৪)

সুতরাং 'ইমামের পেছনে' কথাটিও সাঈদ ইবনে আমেরের ভুল। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ কথাটি উল্লেখ করেন নি। এ কারণটি ছাড়াও আরো এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় এটি একটি ভুল বর্ণনা। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো−

ক. সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবের রা. বলেছেন, ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না। তবে ইমামের পেছনে হলে সেকথা ভিন্ন। (অর্থাৎ তার নামায হয়ে যায়।)

খ. হযরত জাবের রা. নিজেও যে ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়তেন না, এমনকি অন্যকেও পড়তে নিষেধ করতেন, সহীহ সনদে বর্ণিত বহু হাদীসে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন,

১. আব্দুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নাফে (হা. ২৮১৮) দাউদ ইবনে কায়সের সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি

ইমামের পেছনে জোহর ও আসরে কিছু পড়েন? তিনি বললেন, না। সনদটি সহীহ।

২. ইবনে আবু শায়বা স্বীয় মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন ওয়াকী থেকে, তিনি দাহহাক ইবনে উছমানের সূত্রে উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি জাবের রা. থেকে, তিনি বলেন, ইমামের পেছনে পড়বে না। (হা. ৩৭৮৬) সনদটি সহীহ।

৩. তাহাবী শরীফে আছে, ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে ওয়াহাব থেকে, তিনি হায়ওয়াহ ইবনে শুরায়হ থেকে, তিনি বাক্‌র ইবনে আমর থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম থেকে, তিনি ইবনে উমর, যায়দ ইবনে ছাবিত ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (এই তিন সাহাবী)কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, তুমি কোন নামাযেই ইমামের পেছনে পড়বে না। (হা. ১৩১২) সনদটি সহীহ।

গ. হাফেজ ইবনে হাজার দিরায়াহ গ্রন্থে বলেছেন,

وإنما يثبت ذلك عن ابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي رض

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা প্রমাণিত রয়েছে ইবনে উমর, জাবের, যায়দ ইবনে ছাবিত ও ইবনে মাসউদ রা. থেকে। এছাড়া সাদ, উমর, ইবনে আব্বাস ও আলী রা. থেকেও তেমনটা বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত আনাস রা.এর হাদীস:

রাসূল সা. তার সাহাবীগণকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তখন কি তোমরা তোমাদের নামাযে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়? তারা চুপ রইলেন। তিনি উক্ত কথা তিনবার বললেন। তখন তাদের একজন বা একাধিকজন বললেন, হ্যাঁ, আমরা এমনটি করি। তিনি বললেন, এমন করো না। তোমরা নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করো। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৮৪১; মুসনাদে আবু ইয়ালা, ২৮০৫)

এ হাদীসটির একজন রাবী হলেন আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ.। তার থেকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর আর রাক্কী এটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ ইবনে যায়দ, হাম্মাদ ইবনে সালামা ও আব্দুল

ওয়ারিছ ইবনে সাঈদ এটি মুরসাল বা সূত্রবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু আইয়ুব সাখতিয়ানীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শিষ্য হলেন হাম্মাদ ইবনে যায়দ, আবার তার সমর্থন করেছেন আরো দু'জন, তাই তার বর্ণনাই সঠিক বলে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে এ কারণেও যে, উবায়দুল্লাহ বিশ্বস্ত হলেও ইবনে যায়দের সমপর্যায়ের নন। আবার ইবনে সাদ ও হাফেজ ইবনে হাজারের মতে তিনি মাঝেমধ্যে ভুল করে বসতেন। আর মুরসাল বর্ণনা লা-মাযহাবী বন্ধুদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য নয়।

তাছাড়া হতে পারে এ হাদীসে মনে মনে পড়তে বলা হয়েছে, মুখে উচ্চারণ করে নয়। যদিও লেখক বাক্যটির অনুবাদে বলেছেন, 'নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে', কিন্তু এটি এর একমাত্র তরজমা নয়। শায়খ আলবানীর সিফাতুস সালাত গ্রন্থের অনুবাদেও বলা হয়েছে, মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। (দ্র. ৮৪ পৃষ্ঠার টীকা।)

৩. যায়দ ইবনে ছাবিত রা.এর হাদীস

এটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইমামের সঙ্গে কোন নামাযেই কিরাআত নেই।

এ হাদীসটি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, তাছাড়া যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) থেকে যে আছার বর্ণিত হয়েছে, সেখান থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিরাআত বলতে সূরা ফাতিহা নয়। যেমন ইমাম নববী বলেছেন। যায়েদের কথাই প্রমাণ বহন করে যে, সেটা সূরা ফাতিহার পরের সূরা যা জেহরী ছালাতে পড়া হয়।

কিন্তু কিভাবে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় লেখক তা পরিস্কার করে বলেন নি। ইমাম নববীর কথা এনেছেন তাও ভুল তরজমা করে। টীকায় আরবী উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে– ان قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية

অর্থাৎ যায়দ রা.এর বক্তব্য ধর্তব্য হবে জাহরী নামাযে সূরা ফাতিহার পরের সূরা পাঠ করার ক্ষেত্রে।

এ 'ধর্তব্য হবে' (محمول) কে মুযাফফর সাহেব 'প্রমাণ বহন করে' বলে তরজমা করেছেন। এতেও বোঝা যায়, তিনি আরবী ভাষায় কেমন পাকা!

ইমাম নববী ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি তার ইমামের মতের সমর্থনে এমন ব্যাখ্যা দিতেই পারেন। তাঁর পূর্বে একই মাযহাবের অনুসারী ইমাম বায়হাকী আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা হলো– وهو محمول على الجهر بالقراءة مع الإمام এটি ধর্তব্য হবে ইমামের সঙ্গে জোরে জোরে পাঠ করার ক্ষেত্রে।

এ ব্যাখ্যাটিকে আলবানী সাহেব প্রচণ্ডভাবে রদ করেছেন সিলসিলা যঈফা গ্রন্থে (২/৪২১)। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শাফেঈ মাযহাব অনুসারীদের এহেন অস্থিরতাই প্রমাণ করে এর একটিও ঠিক নয়।

তাছাড়া রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হবে কি না, এ মাসআলায় ইমাম বুখারী তার জুযউল কিরাআতে বলেছেন,

إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمر والذين لم يروا القراءة خلف الإمام (٧/١)

যায়দ ইবনে ছাবিত, ইবনে উমর রা. ও অন্যান্য যারা ইমামের পেছনে কিরাআত (সূরা ফাতেহা) পড়ার পক্ষপাতী নন, তারাই (রাকাআত পাওয়াকে) সঠিক আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী উক্ত গ্রন্থে আলী ইবনুল মাদীনী রহ.এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে,

إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে যারা ইমামের পেছনে কিরাআত (সূরা ফাতেহা) পড়ার মত পোষণ করেন তারাই রুকু পাওয়াকে সঠিক বলে মত দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে মাসউদ, যায়দ ইবনে ছাবিত, ও ইবনে উমর রা.। (নং ৯৫)

একটু ভেবে দেখুন, এই 'কিরাআত' বলে তারা কোন কিরাআত বুঝিয়েছেন? সূরা ফাতিহা পাঠ করা নয় কি?

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.এর হাদীস :

তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে সরবে কিরাআত পড়তেন। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার কুরআন পাঠে জট সৃষ্টি করলে। (আবু ইয়ালা, ৫৩৯৭; জুযউল বুখারী, ১৫৪)

আলবানী সাহেব এ হাদীসটির সনদকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন, এবং এর দ্বারা সিররী নামাযে মুক্তাদির কিরাআত পাঠ বৈধ হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছেন।

কিন্তু এটিকে সহীহ বা হাসান বলা মুশকিল। কারণ এর সনদের গোড়ার দিকে রয়েছেন ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক। তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন তার পাঁচজন শিষ্য।

১. আবু আহমাদ যুবায়রী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আসাদী (ইবনে আবু শায়বা, ৩৭৭৮; মুসনাদে আহমদ, ৪৩০৯; মুসনাদে বাযযার, ২০৭৮; মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৫০০৬; জুযউল বায়হাকী, ৩৬৮)।

২. হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদ (মুসনাদে সাররাজ, ১৮৯)।

৩. বুকায়র ইবনে বাক্কার (জুযউল বায়হাকী, ৩৬৫)।

৪. হাসান ইবনে কুতায়বা (প্রাগুক্ত)।

এই চারজনের কারো বর্ণনাতেই সরবে পড়ার কথা নেই।

৫. নাদর ইবনে শুমাইল।

তার থেকে চারজন বর্ণনাকারীর একজন অর্থাৎ খাল্লাদ ইবনে আসলামের (বাযযার, ২০৭৯) বর্ণনায়ও 'সরবে' কথাটি নেই। বাকি তিনজনের বর্ণনায় ঐ শব্দটি এসেছে। সুতরাং এটা শায বা দলবিচ্ছিন্ন বর্ণনা, যা সহীহ হতে পারে না। আর ঐ শব্দটি না হলে হাদীসটির মর্ম দাঁড়াবে নীরবে কিরাআত পড়তেও রাসূল সা. অপছন্দ করেছেন।

৫. আলী রা.এর হাদীস :

মুক্তাদির কিরাআত পড়ার পক্ষে হযরত আলী রা.এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে (২৬৫৬), মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বায় (৩৭৪৭, ৩৭৭৪), জুযউল বুখারী (পৃ. ৫) ও সুনানে

দারাকুতনীতে (১/৩২২)। এটির সনদ সহীহ। তবে বক্তব্যটি বিভিন্ন শব্দে এসেছে। কোথাও বলা হয়েছে ইমাম ও মুক্তাদি জোহর ও আসরে প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। আর শেষ দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়বে। আরেক বর্ণনায় এসেছে, জোহর ও আসরে ইমামের পেছনে প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ কর। তবে আব্দুর রাযযাক রহ. স্বীয় মুসান্নাফে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন– আলী রা. জোহর ও আসরে প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তেন। আর শেষ দু'রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। এখানে ইমামের পেছনে কথাটি নেই। আব্দুর রাযযাক এটি উদ্ধৃত করেছেন নামাযে কিরাআত কিভাবে হবে– এই অনুচ্ছেদে।

এ তিনটি বর্ণনার সনদ বা সূত্র উপরের দিকে এক। অর্থাৎ ইমাম যুহরী বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি আলী রা. থেকে বা আলী রা. সম্পর্কে। ১ম বর্ণনাটি আব্দুল আলা তার চাচার সূত্রে যুহরী থেকে করেছেন। আব্দুল আলা থেকে নিয়েছেন ইবনে আবু শায়বা (হা. ৩৭৪৭)। ২য় বর্ণনাটি করেছেন আব্দুল আলা স্বীয় উস্তাদ মামার রহ.এর সূত্রে ইমাম যুহরী থেকে। আব্দুল আলা থেকে নিয়েছেন ইবনে আবু শায়বা (হা. ৩৭৭৪)। আর ৩য় বর্ণনাটি করেছেন আব্দুর রাযযাক স্বীয় উস্তাদ মামার রহ. এর সূত্রে যুহরী থেকে (হা. ২৬৫৬)।

সূত্রের বিচারে আব্দুর রাযযাকের বর্ণনাটি অগ্রগণ্য। কারণ মা'মার হলেন যুহরীর বিশিষ্ট শিষ্য, আর আব্দুর রাযযাক হলেন মা'মারের বিশিষ্ট শিষ্য। আব্দুর রাযযাক এ বর্ণনাটি যে অনুচ্ছেদে এনেছেন তা একটু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, ইমামের পেছনে পড়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে ইমামের পেছনে কিরাআত না পড়া সংক্রান্ত আলী রা.এর একটি বক্তব্য সহীহসূত্রে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

৬. উবাদা ইবনুস সামিত রা.এর হাদীস

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে এমন নামায পড়লেন, যে নামাযে সরবে কিরাআত পড়তে হয়। অতঃপর বললেন, আমি যখন সরবে কিরাআত পড়ব, তখন তোমাদের

কেউ সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না। জুযউল বুখারীসহ অনেক হাদীসগ্রন্থে এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু এ হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম আহমদ, ইবনে আব্দুল বার, ইবনে তায়মিয়া, ইবনে রজব হাম্বলী, আল্লামা কাশমিরী ও আলবানী প্রমুখ এ হাদীসকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র. ফাসলুল খিতাব, পৃ. ১৩৯ ও সহীহ ইবনে খুযায়মার টীকা, হা. ১৫৮১)

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.এর হাদীস

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা কি আমার পেছনে কিরাআত পড়? তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা চটজলদি পড়ে নিই। বললেন, তোমরা এমনটি করবে না, তবে সূরা ফাতিহা (এর ব্যতিক্রম)। (জুযউল বুখারী, ৩৩)

এ হাদীসটিও সহীহ নয়। ইবনে আব্দুল বার তামহীদ গ্রন্থে এটিকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এর কারণ, এটি বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে শুআইব তদীয় পিতার সূত্রে দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে। কিন্তু ইমাম আওযাঈর বর্ণনামতে আমর ইবনে শুআইব এটি বর্ণনা করেছেন তদীয় পিতার সূত্রে উবাদা রা. থেকে। এটাকে ইযতিরাব (একেক সময় একেক রকম বলা) বলা হয়, যা বর্ণনাটিকে দুর্বল করে দেয়। হাফেজ ইবনে তায়মিয়ার মতেও এটি দুর্বল। (দ্র. মাজমূউল ফাতাওয়া, ২/২৯৯)

তাছাড়া হযরত উবাদা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.এর হাদীস দুটিতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ফরজ হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। বড়জোর এতে বৈধতা দান করা হয়েছে। সুতরাং এদুটি দিয়ে প্রমাণ পেশ করা লা-মাযহাবী বন্ধুদের জন্য যথেষ্ট হবে না।

জালিয়াতির আরেক রূপ

আল্লামা আলবানী একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী শরীফের টীকায় আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ দীর্ঘ সতের পৃষ্ঠাব্যাপী এ মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে সহীহ-যঈফ সবধরনের বর্ণনা জমা করা হয়েছে। রাবী ও কিতাবের নাম বিকৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কিছু তুলে ধরা হলো:

১. ৫৫৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, উবাদাহ ইবনু সামিত (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করল না তার সলাত হল না। (ইমাম বায়হাকীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃ. ৫৬)

এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্যে খ নম্বরে বলা হয়েছে, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহ.) বলেন, এ হাদীস ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে আংটির চমকদার মতির ন্যায় উজ্জ্বল। (ফাসলুল খিতাব, পৃ. ১৪৭)

এটা একটা জালিয়াতি। কাশমিরী এ হাদীস সম্পর্কে বরং বলেছেন,

وتصحيحه لهذه الزيادة من حيث صنعة المحدث في غاية الاستعجاب فإن هذه الزيادة مدرجة قطعا ولو حلف أحد بإدراجها لكان بارا وما حنث.

অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণের রীতি অনুসারে ‘ইমামের পেছনে’ এই বাড়তি অংশকে সহীহ বলা বড়ই আশ্চর্য বিষয়। কারণ এই বাড়তি অংশটুকু নিঃসন্দেহে রাবীর পক্ষ থেকে সংযোজিত। কেউ যদি এর সংযোজনের পক্ষে হলফ করে তবে তার হলফ ঠিক থাকবে। ভঙ্গ হবে না। (পৃ. ১২০)

এরপর কাশমিরী রহ. বলেছেন, এ সংযোজন খুব সম্ভব মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহয়া ইবনুস সাফফার এর পক্ষ থেকে ঘটানো হয়েছে। কিংবা মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান ইবনে ফারিসের পক্ষ থেকে।

অতঃপর তিনি বলেন,

كيف! لو كانت هذه الزيادة عند الزهري لما خالفها ، وقد أخرج عنه البيهقي في الكتاب عن عبد الله بن المبارك نا يونس عن الزهري قال : لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام القراءة يكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم ولا يصلح لأحد ممن خلفه أن يقرأ معه فيما جهر به سرا ولا علانية ، قال الله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

অর্থাৎ এটি কিভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? যুহরী রহ.এর নিকট (ঐ হাদীসটি তার সূত্রেই বর্ণিত) যদি এ বাড়তি অংশ থাকত, তবে তিনি এর বিপরীত কথা বলতেন না। অথচ বায়হাকী তার উক্ত গ্রন্থেই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইউনুস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী রহ. বলেছেন, যেসব নামাযে ইমাম জোরে কিরাআত পড়ে সেসব নামাযে ইমামের পেছনে কেউ কিরাআত পড়বে না। তাদের পক্ষে ইমামের পাঠই যথেষ্ট হবে। যদিও ইমাম তার আওয়াজ তাদেরকে না শুনিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, যেসব নামাযে ইমাম সরবে কিরাআত পড়েন না সেসব নামাযে তাঁরা মনে মনে বা চুপে চুপে পড়বেন। তবে জাহরী নামাযে ইমামের পেছনে কোন ব্যক্তির জন্যই সরবে বা নীরবে কিরাআত পড়া সঙ্গত হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা কান পেতে শোন ও চুপ থাক, তাহলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (দ্র. পৃ. ১২১)

২. ইমামগণের মাযহাব ও মত বর্ণনা প্রসঙ্গে ৫৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া (মুক্তাদীর) সলাত সহীহ হবে না, যেরূপ ইমাম ও মুনফারিদের সলাত সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সহীহ হয় না। (তাফসীরে মাজহারী, ১/১১৮)

এ হলো আরেকটি জালিয়াতি। তাফসীরে মাজহারীতে ঐ কথা নেই, থাকতেও পারে না। সেখানে বরং বলা হয়েছে,

هل يجب القراءة على المقتدى أم لا فقال الشافعي يجب عليه قراءة الفاتحة كالامام والمنفرد قال البغوي كذا روى عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس ومعاذ رض وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجب ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة يكره مطلقا وقال مالك واحمد يكره فى الجهرية فقط وقال أحمد يستحب فى السرية وكذا فى الجهرية عند سكتات الامام ان سكت لا مع قراءته وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك

অর্থাৎ মুক্তাদির উপর কিরাআত জরুরী কি না? ইমাম শাফিঈ বলেন, ইমাম ও মুনফারিদ (একাকী নামায আদায়কারী)এর ন্যায় মুক্তাদির উপরও সূরা ফাতিহা পড়া জরুরী। ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমাদ বলেন, জরুরী নয়। এই তিনজনের মধ্যে আবার দ্বিমত হয়েছে। আবূ হানীফা বলেছেন, সব নামাযেই মাকরূহ, আর মালেক ও আহমাদ বলেছেন, শুধু জাহরী নামাযে মাকরূহ। ইমাম আহমাদ এও বলেছেন, সিররী নামাযে মুস্তাহাব, আর জাহরী নামাযেও ইমাম যদি বিরতি দেন তবে বিরতির মধ্যে পড়া মুস্তাহাব। ইমামের সঙ্গে সঙ্গে পড়বে না। যুহরী, মালেক ও ইবনুল মুবারকের মতও তাই।

৩. একই পৃষ্ঠার শেষে লেখক 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (রহ.) এ হুকুমের উপর একমত যে, সলাতের প্রত্যেক রাকআতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফারয। কোন মুসল্লী ইচ্ছাকৃতভাবে ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে।

এখানেও লেখক ধোঁকার আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ পূর্বোক্ত কথাগুলো উক্ত গ্রন্থের লেখক বলেছেন 'সূরা ফাতিহা নামাযের কোন পর্যায়ের অংগ' এ কথা তুলে ধরার জন্য। এরপরই তিনি একই পৃষ্ঠায় মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পাঠের বিধান কী– সেটি উল্লেখ করেছেন এবং উপরে তাফসীরে মাজহারী থেকে আমরা যা উদ্ধৃত করেছি তিনি সেই একইভাবে মাযহাব বর্ণনা করেছেন।

৪. হানাফী মাযহাবের পীর-সূফী ও বিখ্যাত আলেমগণের তালিকায় আব্দুল কাদির জিলানী ও ইমাম গাযযালীকে উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্র. পৃ. ৫৬৫) অথচ আব্দুল কাদের জিলানী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী, আর ইমাম গাযযালী ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী।

৫. হানাফী ফিক্বাহ গ্রন্থাবলীতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে ফাতাওয়াহ শিরোনামে 'ক' ধারায় লেখা হয়েছে, হাদীসের দৃষ্টিতে সূরা ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব। (উসূলুশ শাশী, ৮/১০১)

এখানে কয়েকটি ধোঁকা রয়েছে।

ক. উসূলুশ শাশী হানাফী ফিকার কিতাব নয়, বরং ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ।

খ. এটি এক খণ্ডের ছোট একটি কিতাব। লেখক ৮ খণ্ডের এত বড় কিতাব কোথায় পেলেন, তা তিনিই ভাল জানেন।

গ. উদ্ধৃত অংশে মুক্তাদীর কথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে, হানাফীদের নিকট নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব, ফরজ হলো কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করা। (দ্র. পৃ. ২৩)

৬. ৫৬০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, সহীহ কথা এই যে, সব উলামায়ে সালফ ও খালফ (সহীহ হবে, সালাফ ও খালাফ) এর উপর একমত হয়েছেন যে, সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করা ওয়াজিব। তা রাসূলুল্লাহ স. এর এ ফরমানের জন্য যে, ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (সহীহ মুসলিম শরাহ, ১/১৭০)

এটা মস্তবড় জালিয়াতি। এ কথাগুলো মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববীর। সপ্তম শতকের ভাষ্যকারের বক্তব্যটি লেখক কীভাবে তৃতীয় শতকের ইমাম মুসলিমের নামে চালিয়ে দিয়েছেন!? কেউ মিথ্যা বললে কি এতটা খোলাখুলি! ইমাম নববীর আরবী পাঠ হলো,

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه و سلم للأعرابي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

এখানে আরেকটি ধোঁকা হলো, ইমাম নববী এ বক্তব্যে মুক্তাদীর ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করেন নি। বরং এই আলোচনা করেছেন যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করা নামাযের সব রাকআতে জরুরী, নাকি বিশেষ কোন রাকআতে, এ বিষয়ে তিনি বলেন, (ইমাম সুফিয়ান) ছাওরী, আওযায়ী ও আবূ হানীফার মতে প্রথম দু'রাকআতে জরুরী, ২য় দু'রাকআতে নয়। সহীহ কথা এই যে, ...।

ইমাম নববী এর পূর্বে একই স্থানে আরো দুটি মাসআলা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ১. নামাযে ফাতিহা পড়া ফরয। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত এটি। আর আবূ হানীফা বলেছেন, ফরজ হলো একটি আয়াত পাঠ করা। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়, ওয়াজিব।)

২. ফাতিহা পাঠ মুক্তাদীর উপর ফরজ কি না– এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, ইমাম শাফিঈর মতে ফরজ।

এসব কথা একই স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। লেখক আহসানুল্লাহ যদি না বুঝে থাকেন, তবে তো তার মেধার উপর ক্রন্দন করা চাই। আর যদি বুঝে শুনে এমন ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তবে তো কথাই নেই। তবে এই যোগ্যতা নিয়ে বুখারী শরীফের মতো মহান হাদীস গ্রন্থের টীকা লিখতে দুঃসাহস করা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত তা ভেবে দেখা দরকার।

৭. রাবী, লেখক ও কিতাবের নাম তিনি যেভাবে বিকৃতরূপে পেশ করেছেন তাও তার যোগ্যতার সাক্ষর বহন করে বৈ কি। শারহুল মুহাযযাব-কে তিনি মাহযাব বলেছেন। আরফুশ শাযীকে তিনি উরফুশ শাযী নামে উল্লেখ করেছেন। কাযী ইয়াযকে তিনি আইয়ায বানিয়েছেন। এভাবে আবু নাদরা (أبو نضرة)কে আবূ নাসরাহ, রাজা ইবনে হায়ওয়াহকে হাইওয়াতাহ, বুওয়ায়তীকে বুয়ূতী, আবূ মিজলাযকে আবূ মুজাল্লিয, মুনাবীকে মুনাদী বানিয়েছেন। একটি মাসআলা আলোচনায় এতগুলো ভুল ও জালিয়াতি! এরাই হলেন সুযোগ্য আলেম এবং আহলে হাদীস!!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

নামাযে নিম্নস্বরে আমীন বলা সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

নামাযে নিম্নস্বরে আমীন বলা সুন্নত

আমীন সম্পর্কেও কিছু লোক বাড়াবাড়ি করে। তারা বলে নামাযে আমীন জোরে বলতে হবে। আস্তে বলা সুন্নতের পরিপন্থী। তাদের একথা সঠিক নয়। হাদীস শরীফ, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী'র আমল দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমীন আস্তে বলাই সুন্নত।

নিম্নস্বরে আমীন বলা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী র. (মৃ.৩১১ হি.) তাঁর তাহযীবুল আছার গ্রন্থে বলেছেন,

وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبي وابراهيم التيمى كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذكان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك . (شرح البخاري لابن بطال المتوفى ٤٤٩هـ باب جهر المأموم بالتأمين، والجوهر النقى ٢/٥٨)

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রা., ইবরাহীম নাখায়ী র. শা'বী র. ও ইবরাহীম তায়মী র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা আমীন আস্তে বলতেন। সঠিক কথা হলো আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলার উভয় হাদীসই সহীহ। এবং দুটি পন্থা অনুযায়ী এক এক জামাত আলেম আমলও করেছেন। যদিও আমি আস্তে আমীন বলাই অবলম্বন করি, কেননা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এ অনুযায়ীই আমল করতেন। (দ্রঃ শারহুল বুখারী লিইবনে বাত্তাল,মৃত্যু ৪৪৯হিজরী; আল জাওহারুন নাকী, ২খ, ৫৮পৃ,)

ইবনে জারীর র. এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও আস্তে আমীন বলাকেই অবলম্বন করেছেন।

মদীনাবাসীর আমলঃ

মদীনা শরীফে ইমাম মালেক র. এর নিবাস ছিল। তিনিও ফতোয়া দিয়েছেন,

ويخفي من خلف الإمام آمين. المدونة–فى الركوع والسجود ١/٧١

অর্থাৎ মুকতাদী আস্তে আমীন বলবে। (আল-মুদাওয়ানা, ১খ.৭১ পৃ.)

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আহমদ আদ দরদের র. লিখেছেন,

وندب الاسرار به اى بالتأمين لكل من طلب منه.

অর্থাৎ 'মুকতাদীর জন্য আস্তে আমীন বলাই মুস্তাহাব।'

কুফাবাসীর আমলঃ

এমনিভাবে কূফায় পনের শত সাহাবী বসবাস করতেন। এই কূফার সাধারণ আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। ইবনে মাসউদ, তাঁর শিষ্যবর্গ, ইবরাহীম নাখায়ী, ইবরাহীম তায়মী ও শা'বী প্রমুখ কূফার বড় বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস সকলে আমীন আস্তে বলার পক্ষপাতি ছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো ওয়াইল রা. এর মাধ্যমে বর্ণিত জোরে আমীন বলার হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরী রা. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ান ছাওরী ছিলেন আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস অর্থাৎ হাদীস সম্রাট। অথচ তিনি নিজেও ছিলেন আস্তে আমীন বলার পক্ষে।

বোঝার সুবিধার্থে এখানে আমরা আলোচনাকে দুটি ভাগে ভাগ করব। এক. ইমামের আস্তে আমীন বলা। দুই. মুকতাদীর আস্তে আমীন বলা।

ইমামের আস্তে আমীন বলার দলিলঃ

عن وائل بن حجر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى بها صوته.ورواه الترمذى رقم (٢٤٨) واحمد فى المسند.رقم (١٨٨٥٤) . ورواه الحاكم فى المستدرك (٢٩١٣)وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم

يخرجاه.وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم والطيالسى (١٠٢٤) والدارقطنى ٣٣٤/١ والبيهقى ٥٧/٢ والطبرانى فى الكبير ٤٣/٢٢ رقم(١٠٩،١١٠،١١٢)

অর্থ: ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি যখন غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়লেন, তখন আমীন বললেন এবং আমীন বলার সময় তাঁর আওয়াযকে নিম্ন করলেন। তিরমিযী শরীফ (২৪৯); দারাকুতনী ১ম খ. ৩৩৪পৃ. বায়হাকী, খ.২ পৃ.৫৭।

এ হাদীসকে হাকেম র. সহীহ বলেছেন। যাহাবী র.ও তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন। ইবনে জারীর তাবারী র.ও এটিকে সহীহ বলেছেন। পেছনে তাঁর হুবহু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। কাযী ইয়ায র.ও এটিকে সহীহ বলেছেন। (দ্র. শারহুল উব্বী, ৬খ, ৬০৮ পৃ.)

আমীন আস্তে বলার এ হাদীসটি ইমাম শো'বা র. কর্তৃক বর্ণিত। তারই সঙ্গী সুফিয়ান ছাওরী র.ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে জোরে আমীন বলার কথা এসেছে। অনেকে এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও জোরে আমীন বলেছেন। যেমন জোহরের নামাযের কেরাআত আস্তে পড়াই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম। কিন্তু মাঝে মধ্যে দু'একটি আয়াত তিনি জোরে বলতেন। যাতে সাহাবীগণ বুঝতে পারেন জোহরের নামাযে কোন সূরা বা কতটুকু কেরাআত পড়া সুন্নত। একইভাবে শেখানোর জন্য কখনও কখনও তিনি আমীন একটু জোরে বলেছেন। আর অন্য সময় আস্তে বলেছেন। এর পক্ষে সহীহ হাদীস একটু পরে আসছে।

আমীন জোরে বলার পক্ষে যেসব মুহাদ্দিস ছিলেন, তাঁরা শো'বা র. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের তুলনায় সুফিয়ান র. এর বর্ণিত হাদীসকে অধিক গ্রহণীয় আখ্যা দিয়েছেন এবং শো'বা র. এর বর্ণনার উপর কিছু আপত্তি

উত্থাপন করেছেন। অন্যরা আবার এসব আপত্তির সন্তোষজনক জবাবও দিয়েছেন।[১]

---

[১] যেহেতু আমাদের লা-মাযহাবী ভায়েরা এসব আপত্তি তাদের অনুদিত বুখারী শরীফের টীকায় উল্লেখ করেছেন, তাই সেগুলোর জবাব এখানে তুলে ধরছি। ক. প্রথম আপত্তি করা হয়েছে সনদ বা সূত্রের একটি নাম নিয়ে। সাধারণ ভাবে সুফিয়ান র. এর বর্ণনায় নামটি এসেছে হুজ্‌র ইবনুল আম্বাস। আর শো'বা র. এর বর্ণনায় এসেছে হুজর আবুল আম্বাস।

উল্লেখ্য যে, ইবনুল আম্বাস মানে আম্বাসের ছেলে, আর আবুল আম্বাস মানে আম্বাসের পিতা। আপত্তি কারীগণ বলেন, হুজর ছিলেন আসলে আবু'স-সাকান বা সাকানের পিতা। তিনি আবুল আম্বাস বা আম্বাসের পিতা ছিলেন না। আবুল আম্বাস বলা শো'বার একটি ভুল।

এর জবাব হলো, হুজরের পিতা ও ছেলে দু'জনের নামই ছিল আম্বাস। আবার তাঁর আরেক ছেলের নাম ছিল সাকান। তাই এখানে ভুলের কিছুই ঘটেনি। তাই তো ইমাম বুখারী এ আপত্তিটির কথা উল্লেখ করলেও তার সঙ্গে মুহাদ্দিসগণের কেউ একমত হন নি। আবু দাউদ (হাদীস নং ৯৩২) এবং দারাকুতনীতে (১/৩৩) সুফিয়ানের বর্ণনায়ও তাকে আবুল আম্বাস নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর 'আলকুনা ওয়াল আসমা' গ্রন্থে বলেছেন, أبو العنبس حجر بن العنبس আবুল আম্বাস হুজর ইবনুল আম্বাস (২৫৫৭)। আদদুলাবী রহ. (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) তার আলকুনা ওয়াল আসমা গ্রন্থে লিখেছেন, أبو العنبس حجر روى عنه سلمة بن كهيل আবুল আম্বাস হুজর, সালামা ইবনে কুহায়ল তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (২/৭৮৮)। আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতিম রাযী তার আল জারহু ওয়াত তাদীল গ্রন্থে বলেছেন, حجر بن عنبس أبو السكن ويقال أبو العنبس হুজর ইবনে আম্বাস আবুস সাকান, তাঁকে আবুল আম্বাসও বলা হয়। (৩/১১৯০) আবু নুয়াইমও (মৃত্যু ৪৩০ হি.) তার মারিফাতুস সাহাবা গ্রন্থে বলেছেন, আবুল আম্বাস হুজ্‌র ইবনে আম্বাস আল হাযরামী। (দ্র. ৫/২৭১১) এমনিভাবে যাহাবী রহ. তার আল মুকতানা ফী সারদিল কুনা গ্রন্থে লিখেছেন, أبو العنبس حجر بن العنبس আবুল আম্বাস হুজর ইবনুল আম্বাস। (নং ৪৭৯৮) ইবনে হিববান র. তাঁর আছ্‌ছিকাত গ্রন্থে বলেছেন, হুজর ইবনুল আম্বাস আবুস সাকান আল কূফী هوالذى يقال له ابوالعنبس অর্থাৎ তাঁকে আবুল আম্বাসও বলা হয়। ইবনুল কাত্তান র. বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে ইবনে হাজার আসকালানী আত তালখীস গ্রন্থে লিখেছেন, له كنيتان ، ابو السكن وابوالعنبس –অর্থাৎ

তাকে আবুস সাকানও বলা হয় আবুল আম্বাসও বলা হয়। দারাকুতনী রহ. তার আল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ গ্রন্থে বলেছেন,

أبو العنبس حجر بن عنبس سمع علي بن أبي طالب ووائل بن حجر روى عنه سلمة بن كهيل وموسى بن قيس الأنصاري وقال محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي السكن حجر بن عنبس.

অর্থাৎ 'আবুল আম্বাস হুজর ইবনে আম্বাস, আলী ইবনে আবু তালিব ও ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে হাদীস শুনেছেন। তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন সালামা ইবনে কুহায়ল ও মূসা ইবনে কায়স আল আনসারী রহ.। আর সালামা ইবনে কুহায়লের ছেলে মুহাম্মদ স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবুস সাকান হুজর ইবনে আম্বাস।' (৩/১৫৩৬)। আমীর ইবনে মাকূলাও (মৃত্যু ৪৭৫ হি.) তার ইকমাল গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (দ্র. ৬/৮১)

ইমাম দারাকুতনীর বক্তব্যে আবুস সাকান কুনিয়াত বা উপনামের সূত্র ও উৎসও পাওয়া গেল। তাহল, এটি উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ তদীয় পিতা সালামা ইবনে কুহায়ল থেকে। আর এই মুহাম্মদ মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে জয়ীফ বা দুর্বল ছিলেন। ইবনে সাদ, ইবনে মাঈন, জুযাজানী ও যাহাবী প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বোঝা গেল, আবুস সাকান উপনামটি দুর্বল সূত্রে প্রমাণিত। এ কারণে ইবনে আব্দুল বার তার আল ইসতিআব গ্রন্থে ও ইবনুল আছীর তার উসদুল গাবা (নং ১০৯৪) গ্রন্থে এই উপনামটি وقيل(কেউ কেউ বলেছেন) বলে উল্লেখ করে এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ইবনে হাজার র. তাহযীব গ্রন্থেও লিখেছেন,

حجر بن العنبس الحضرمى ابو العنبس ويقال له ابو السكن–অর্থাৎ হুজর ইবনুল আম্বাস আল হাযরামী আবুল আম্বাস, তাকে আবু'স-সাকানও বলা হয়।

খ. দ্বিতীয় আপত্তি হলো শো'বা র. হুজ্র ইবনুল-আম্বাসের পরে আলকামার নাম বৃদ্ধি করেছেন। অথচ সুফিয়ানের বর্ণনায় এসেছে, হুজর র. সরাসরি হযরত ওয়াইল রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

এর জবাব হলো হুজর দুভাবেই হাদীসটি শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন আলকামার সূত্রে ওয়াইল রা. থেকে, আবার সরাসরি ওয়াইল রা. থেকে। এর নজির হাদীসে অনেক আছে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (যিনি সরাসরি শো'বার শিষ্য ছিলেন) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হুজর র. এর বাচনিক উল্লেখ করেছেন, سمعت علقمة يحدث عن وائل وسمعته من وائل،–অর্থাৎ আমি আলকামাকে তাঁর পিতা ওয়াইল রা. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, আবার সরাসরি ওয়াইল রা. থেকেও শুনেছি। (হাদীস নং ১১১৭) এ কারণে শোবাও কখনও কখনও হুজর ইবনুল আম্বাস এর সূত্রে সরাসরি ওয়াইল রা.

থেকে (আলকামার মাধ্যম ছাড়া) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাহাবী র. আবূ দাউদ তায়ালিসীর সূত্রে, আবূ মুসলিম আল-কাজ্জী র. স্বীয় মুসনাদে (দ্রঃ আত তালখীসু'ল হাবীর ১/২৩৭) আমর ইবনে মারযূকের সূত্রে, এবং বায়হাকী (২/৫৮) আবুল ওলীদ তায়ালিসীর সূত্রে, তারা তিনজন (আবূ দাউদ তায়ালিসী, আমর ও আবুল ওলীদ) শো'বা র. থেকে সুফিয়ানের বর্ণনার মতোই সালামা ইবনে কুহায়ল থেকে, তিনি হুজর এর সূত্রে হযরত ওয়াইল রা. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা শো'বার কোন ভুল নয়।

গ. তৃতীয় আপত্তি হলো, জোরে আমীন বলার স্থানে শো'বা আস্তে আমীন বলার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা একটা দাবী, যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। হাকেম নিশাপুরী, ইবনে জারীর তাবারী, কাযী ইয়ায ও হাফেজ যাহাবী শো'বার বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলে উক্ত দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধিকন্তু সনদের ক্ষেত্রে শো'বার কিছু কিছু ত্রুটি এজন্যই ঘটতো যে, তিনি মতন বা হাদীসের মূল বক্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন বেশী। সুতরাং হাদীসের মূল বক্তব্যে তাঁর ভুলের সুযোগ কোথায়?

ঘ. চতুর্থ আরেকটি আপত্তি হলো, শো'বার বর্ণনায় যে আলকামা আছেন, তিনি তাঁর পিতা ওয়াইল রা. থেকে হাদীস শোনেন নি। তিরমিযী র. ইলালে কাবীর গ্রন্থে বুখারী র. এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, আলকামা তার পিতা থেকে শোনেন নি। তিনি তাঁর পিতার ইন্তেকালের ছয়মাস পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানী র. ও তাকরীবুত্ তাহযীবে বলেছেন, আলকামা তার পিতা থেকে শোনেন নি। এ হিসাবে শো'বার সূত্রটি বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য হয়। হাফেয ইবনে হাজার তার তাহযীবে আসকারীর বরাতে ইবনে মাঈন এরও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে মাঈনের কোন গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

এর জবাব হলো, ইলালে কাবীরের তথ্যটি ভুল। স্বয়ং ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে কাবীরে বলেছেন (سمع اباه) আলকামা তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন। (দ্র. ৭খ, ১৭৮) এমনকি ইমাম তিরমিযী নিজেও তিরমিযী শরীফে (১৪৫৪) বলেছেন, وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل،وعبد الجبار لم يسمع من ابيه.–অর্থাৎ আলকামা ইবনে ওয়াইল তার পিতা থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি ছিলেন আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়াইলের বড় ভাই। অবশ্য আব্দুল জব্বার তাঁর পিতা থেকে শোনেন নি।

ইবনে হিব্বানও তাঁর ছিকাত গ্রন্থে বলেছেন, 'আলকামা তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন।' মুসলিম শরীফে আলকামার সূত্রে তাঁর পিতা থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে আলকামা বলেছেন "حدثني

" أبي আমার পিতা এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (নং ১০৫৫) এমনিভাবে বুখারী র. রচিত জুযউ রাফইল-ইয়াদাইন গ্রন্থে আলকামার বাচনিক উল্লেখ রয়েছে " حدثني أبي "আমার পিতা এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

এসব কারণে লা-মাযহাবী শীর্ষ আলেম মুবারকপুরী তার তিরমিযীর আরবী ভাষ্যে বলেছেন, فالحق أن علقمة سمع من أبيه সত্য কথা হলো, আলকামা তার পিতা থেকে শুনেছেন। (দ্র. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/১৫) হাফেজ ইবনে হাজার তাকরীবে পূর্বোক্ত মন্তব্য করলেও বুলূগুল মারামে এই সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, بإسناد صحيح 'সহীহ সূত্রে'। (দ্র. হা. ৩১৮) এতে বোঝা যায়, তাঁর মতেও আলকামা স্বীয় পিতার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। একারণে মুবারকপুরী বলেছেন, স্পষ্ট এটাই, হাফেজ ইবনে হাজার তার তাকরীবের মত থেকে ফিরে এসেছেন । আলবানী সাহেবও বলেছেন, ولكني وجدت تصريحه بسماعه من أبيه في سنن النسائي ١/١٦١ بإسناد صحيح وكذا البخاري في رفع اليدين (٦-٧) কিন্তু আমি তার পিতা থেকে শোনার ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি পেয়েছি সুনানে নাসায়ীতে। (১/১৬১) এর সনদ সহীহ। এমনিভাবে বুখারী কৃত জুযউ রাফইল ইয়াদাইন গ্রন্থে। (পৃ. ৬-৭) (আসলু সিফাতিস সালাহ, ১/২১১)

ইমাম বুখারীর বরাতে ইমাম তিরমিযী র. আলকামা সম্পর্কে ইলালে কাবীরে যা উল্লেখ করেছেন, সেটা আসলে আব্দুল জব্বার সম্পর্কে হবে, আলকামা সম্পর্কে নয়। যার প্রমাণ ইমাম তিরমিযী নিজেই ইমাম বুখারীর বরাত দিয়ে তিরমিযী শরীফে লিখেছেন,

عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه ولا ادركه . يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر.

অর্থাৎ আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা থেকে হাদীস শোনেন নি। এমনকি তার দেখাও পাননি। বলা হয় তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। (১৪৫৩)

ইমাম বুখারী তারীখে কাবীরেও আব্দুল জব্বার সম্পর্কে লিখেছেন, انه ولد بعد موت ابيه بستة اشهر. তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন (৬/১৮৫৫)

অবশ্য গবেষকদের মতে, একথাও সহীহ নয় যে, আব্দুল জব্বার তার পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা তিনি তার পিতা থেকে হাদীস শোনেন নি। দেখুন, অত্র পুস্তকের ২৭৯ নং পৃষ্ঠা।

উল্লেখ্য যে, আলকামার আপন ছোট ভাই আব্দুল জব্বার । আলকামা-ই যদি পিতার ছয়মাস পরে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁর ছোট ভাই কিভাবে ওয়াইল রা. এর সন্তান হবেন? দুঃখজনক হলেও সত্য, একটি ভুল বরাতের উপর ভিত্তি করে লা-মাযহাবী ভাইয়েরা এখনও সেই পুরনো কথাই প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

আরেকটি কথা না বললেই নয়। নিজেদের অনুদিত বুখারী শরীফের টীকায় তাঁরা লিখেছেন, "অন্য পরেকার কথা, স্বয়ং মোল্লা আলী কারী হানাফী তদীয় মিশকাতের শরাহ মিরকাতে অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, হাদীস বিশারদগণ শো'বার এই ভুল সম্পর্কে একমত। তিনি বলেন, সর্বস্বীকৃত সঠিক কথা হচ্ছে 'মাদ্দা বিহা সাওতাহু ও রাফাআ বেহা সাওতাহু' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীনের শব্দ দারাজ করে পড়লেন এবং উচ্চ কণ্ঠে পড়লেন"। এ হলো হুবহু তাদের বক্তব্য। এতে অনুমিত হয় তাঁরা মিরকাত খুলেও দেখেন নি। কিংবা মিরকাতের বক্তব্য বোঝেন নি। অথবা বুঝেও তা গোপন করেছেন। অনুবাদে কিছু ঝামেলার কথা বাদ দিলেও ঐ বক্তব্যটি আসলে মোল্লা আলী কারীর নিজের নয়। তিনি বক্তব্যটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, قاله ميرك وفيه ما فيه، অর্থাৎ মীরাক (শাহ) এ কথা বলেছেন, তবে এতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। (২খ. ৫২৭ পৃ.)

লক্ষ্য করুন! বক্তব্যটি একজনের। কারী সাহেব এতে আপত্তি থাকার কথা বলেছেন। এরই নাম কি অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করা? কারী সাহেব তো এর পরের পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

قلت مع أن الأصل في الدعاء الإخفاء لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية (الأنعام) ولا شك أن آمين دعاء فعند التعارض يرجح الإخفاء بذلك وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية ولأن آمين ليس من القرآن إجماعا فلا ينبغي أن يكون على صوت القرآن.

অর্থাৎ আমি বলবো, দোয়ার ক্ষেত্রে আসল নিয়ম হলো নিঃশব্দে বলা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, "তোমরা বিনয়ের সঙ্গে এবং চুপিসারে তোমাদের রবের নিকট দোয়া কর"। (আলআনআম) আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমীন একটি দোয়া। সুতরাং হাদীসের পরস্পর বিরোধিতার সময় উক্ত কারণে এবং অন্যান্য যিকির ও দোয়ার উপর কিয়াসের কারণে নিঃশব্দে আমীন বলাই অগ্রগণ্য হবে। অধিকন্তু আমীন শব্দটির ব্যাপারে সকলেই একমত যে এটি কোরআনের অংশ নয়।

২.হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণিত–

عن سمرة قال : سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ فقال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال. وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.اخرجه الترمذى(٢٥١) واللفظ له وابوداود (٧٨٠) واحمد ٢٣/٥

অর্থাৎ সামুরা রা. বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি সাকতা (নীরবতা) স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এটা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমরা তো একটি সাকতা স্মরণ রেখেছি। পরে আমরা মদীনায় উবাই ইবনে কা'ব রা. এর নিকট পত্র লিখলাম। তিনি উত্তর লিখে পাঠালেন যে, সামুরা সঠিক স্মরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দুটি সাকতা কোথায় কোথায় ছিল? তিনি বললেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতেন। আর যখন কিরাআত পাঠ সমাপ্ত করতেন। এরপর কাতাদা বলেছেন, যখন ولا الضالين পাঠ শেষ করতেন। তিনি আরো বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ ছিল, যখন তিনি কেরাত পাঠ সমাপ্ত করতেন তখন শ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন। তিরমিযী (২৫১); আবূ দাউদ (৭৮০); মুসনাদে আহমদ, (৫খ, ২৩ পৃ,)।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দু'সময় নীরব থাকতেন। প্রথম নীরবতা তাকবীরে তাহরীমার পর।

তাই কোরআনের আওয়াযের মতো আওয়ায করে আমীন বলা উচিৎ হবে না। (মিরকাত ২/৫২৮)

এসময় তিনি নিঃশব্দে ছানা পড়তেন। দ্বিতীয় নীরবতা সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর। এ সময় "আমীন" বলতেন। বোঝা গেল আমীন তিনি নিঃশব্দে বলতেন।

হাদিসটিতে কাতাদা প্রথমতঃ বলেছিলেন ২য় নীরবতা হতো কেরাত শেষ করার পর। পরে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, কেরাত শেষ করা মানে সূরা ফাতেহার কেরাত শেষ করা। আর সম্পূর্ণ কেরাত শেষ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু নীরব থাকতেন যাতে শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এটা সামান্য নীরবতা হতো। আবূ দাউদ শরীফে (৭৭৯) কাতাদা র. হতে সাঈদে'র সূত্রে ইয়াযীদ র. এর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে -

سكتة اذاكبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولاالضالين.

অর্থাৎ একটি সাকতা হতো তাকবীরে তাহরীমার পর, আরেকটি সাকতা হতো.غير المغضوب عليهم ولاالضالين বলার পর। দারাকুতনীও ইবনে উলায়্যার সূত্রে, তিনি ইউনুস ইবনে উবায়দের সূত্রে হাসান বসরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। {দ্রঃ ১ম খ, ৩৩৬পৃ, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩(২০৫৩০)}।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন– ذكر ما يستحب ان يسكت سكتة اخرى عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب. অর্থাৎ সূরা ফাতেহা শেষ করার পর দ্বিতীয় বার নীরব থাকা মুস্তাহাব।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী র.– যার তাহকীক ও গবেষণার উপর লা-মাযহাবীদেরও বেশ আস্থা আছে– তাঁর যাদুল মায়াদ গ্রন্থে লিখেছেন–

وَقَدْ صَحّ حَدِيثُ السّكْتَتَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ وَأُبَيّ بْنِ كَعْبٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو حَاتِمٍ فِي " صَحِيحِهِ " وَسَمُرَةُ هُوَ ابْنُ جُنْدُبٍ وَقَدْ تَبَيّنَ بِذَلِكَ أَنّ أَحَدَ مَنْ رَوَى حَدِيثَ السّكْتَتَيْنِ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ وَقَدْ قَالَ حَفِظْتُ

مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالّينَ وَفِي بَعْضِ طُرُقِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ وَهَذَا كَالْمُجْمَلِ وَاللّفْظُ الْأَوّلُ مُفَسّرٌ مُبَيّنٌ.انتهى.(٧٩/١)

অর্থাৎ সামুরা রা., উবাই ইবনে কা'ব রা. ও ইমরান ইবনে হুসাইন রা.[1] থেকে সহীহ সনদে দুই সাকতার হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীস আবূ হাতিম {ইবনে হিব্বান র.} তাঁর "সহীহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সামুরা রা. হলেন ইবনে জুনদুব। এ থেকে স্পষ্ট যে, সামুরা ইবনে জুনদুব রা.ও দুই সাকতার হাদীসটি বর্ণনা কারীদের একজন। তিনি তাঁর হাদীসে বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুটি সাকতার কথা স্মরণ রেখেছি। একটি হলো তিনি যখন তাকবীর দিতেন । অপরটি হলো তিনি যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالّينَ পড়ে শেষ করতেন। কোন কোন বর্ণনায় হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ; তিনি যখন কেরাত শেষ করতেন, তখন নীরব থাকতেন। এই বর্ণনাটি অস্পষ্ট। প্রথম বর্ণনাটি ব্যাখ্যা-সম্বলিত ও সুস্পষ্ট। (দ্রঃ, ১ম; ৭৯ পৃ,)

৩.হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ فَانه مَنْ وَافَقَ قوله قول الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .ورواه البخارى برقم –٧٨٢ باب جهر المأمومين بالتأمين ومسلم (٤١٠)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলে শেষ করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাগণের আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। বুখারী শরীফ হাদীস নং ৭৮২; মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪১০

---

[1] হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এর হাদীসটি দুই সাকতা সম্পর্কে নয়, বরং একটি সাকতা সম্পর্কে। এখানে হয়তো তাঁর নাম উল্লেখে ভুল হয়ে গেছে।

মুসলিম শরীফে আবূ মুসা আশআরী রা. এর বর্ণিত হাদীসেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন –

إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ.

অর্থাৎ ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলে শেষ করবে, তোমরা তখন আমীন বলবে। (হাদীস নং- ৪০৪)

এ দুটি হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আমীন নিঃশব্দে বলবে। অন্যথায় এভাবে বলা হতো না যে, ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলবে, তোমরা তখন আমীন বলবে। বরং বলা হতো, ইমামকে যখন আমীন বলতে শুনবে তখন তোমরা আমীন বলবে। বিশেষ করে নাসাঈ শরীফে আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটিতে সহীহ সনদে একথাও বর্ণিত আছে যে–

فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ.

অর্থাৎ কেননা ফেরেশতারাও এসময় আমীন বলে, ইমামও আমীন বলে। (হাদীস নং ৯২৭)

ইমামও এসময় আমীন বলে কথাটি তখনই বলা চলে যখন ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলে। ফেরেশতাগণ যেমন নিঃশব্দে আমীন বলার কারণে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসময় ফেরেশতাগণ আমীন বলে। তদ্রুপ ইমামও নিঃশব্দে বলার কারণে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসময় ইমামও আমীন বলে।

সাহাবীগণের আমল ও ফতোয়া

৪. উমর রা. এর ফতোয়া:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُخْفِي الإِمَامُ أَرْبَعًا –: التَّعَوُّذُ، وَ بسم الله الرحمن الرحيم وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. المحلى لابن حزم ٢/٢٨٠

অর্থ: আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেন, উমর রা. বলেছেন, ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ। (আল মুহাল্লা, ২/২৮০)

৫. ইবনে মাসউদ রা. এর ফতোয়া:

عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُخْفِي الإِمَامُ ثَلاثًا الاسْتِعَاذَةُ، وَ بسم الله الرحمن الرحيم وَآمِينَ. المحلى لابن حزم ٢٨٠/٢

অর্থ: ইমাম তিনটি কথা নিঃশব্দে বলবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন। (আল মুহাল্লা, ২/২৮০)

৬. উমর রা. ও আলী রা. এর আমল:

عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين.رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١٥٠/١ رقم ١٢٠٨ قال حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني نا علي بن معبد نا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد عنه.

অর্থ: আবূ ওয়াইল র. হতে বর্ণিত। উমর রা. ও আলী রা. বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও আমীন স্বশব্দে পড়তেন না। (তাহাবী শরীফ ১/১৫০)

৭. ইবনে মাসউদ রা. এর আমল:

عن أبي وائل قال كان علي و ابن مسعود لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين. رواه الطبراني في الكبير-٩٣٠٤.وفي هذين الاثرين أبو سعد البقال، قال البخارى فيه مقارب الحديث كما فى علل الترمذى الكبير. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد١٠٨/٢ وهو ثقة مدلس.

অর্থ: আবূ ওয়াইল র. বলেন, আলী ও ইবনে মাসউদ র. বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও আমীন স্বশব্দে পড়তেন না। তাবারানী, আল কাবীর (৯৩০৪); মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, (৪১৬০)

তাবেয়ীগণের আমল ও ফতোয়া

৮. ইবরাহীম নাখায়ী র. এর ফতোয়া:

عن حماد عن إبراهيم قال أربع يخفيهن الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والإستعاذة وآمين وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد. عبد الرزاق- ٢٥٩٦ وابن ابى شيبة فى المصنف-برقم ٤١٥٩

অর্থ: হাম্মাদ {আবু হানীফা র. এর খাস উস্তাদ ছিলেন} র. ইবরাহীম নাখায়ী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম চারটি কথা নিঃশব্দে বলবে, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক (২৫৯৬); মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (৪১৫৯)

৯. ইবরাহীম নাখায়ী র. এর আমল

عن مغيرة عن ابراهيم انه كان اذا كبر سكت هنيهة ، واذا قال غيرالمعضوب عليهم ولا الضالين سكت هنيهة.رواه عبد الرزاق برقم-٢٨٥٨

অর্থ: মুগীরা র. বলেন, ইবরাহীম নাখায়ী র. তাকবীর দিয়ে কিছু সময় নীরব থাকতেন। আবার যখন غيرالمعضوب عليهم ولا الضالين পড়তেন তখনও কিছু সময় নীরব থাকতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক (২৮৫৮)

জোরে আমীন বলা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছিল

এমন কোন সহীহ হাদীস নেই, যেখানে স্পষ্টভাবে ইমামকে জোরে আমীন বলতে বলা হয়েছে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জোরে আমীন বলেছেন, সে সম্পর্কেও সুফিয়ান ছাওরী র. এর সূত্রে বর্ণিত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন সহীহ হাদীস নেই।

সুফিয়ান ছাওরীর হাদীসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরে আমীন বলার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা ছিল শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। হযরত ওয়াইল রা. ছিলেন ইয়ামানের নবাব খান্দানের মানুষ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা শরীফে হাজির হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নামাযে নিজের পেছনে প্রথম কাতারে জায়াগা

করে দেন। যাতে করে তিনি দেখেশুনে নামায শিখতে পারেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন নামাযে জোরে আমীন বলেছেন। এটা তাঁর সাধারণ নিয়ম ছিল না। সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকলে তা শুধু ওয়াইল রা. কেন, অন্যান্য সাহাবীও তা বর্ণনা করতেন।

জোরে আমীন বলা যে শেখানোর জন্য ছিল তার প্রমাণ

ক.হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন–

رأيت النبى صلى الله عليه وسلم دخل فى الصلاة ، فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال آمين ثلاث مرات.رواه الطبرانى فى الكبير ١٦/١٨ وقال الهيثمى : رجاله ثقات.

অর্থ: আমি দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করলেন। তিনি যখন সূরা ফাতিহা শেষ করলেন তখন তিনবার আমীন বললেন। তাবারানী, আল কাবীর ১৬/১৮ আল্লামা হায়ছামী র. বলেছেন, এর বর্ণনা কারীগণ বিশ্বস্ত।

এ হাদীস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেছেন–

الظاهر انه رآه فى ثلاث صلوات فعل ذلك. لا انه ثلّث التأمين. حكاه الزرقانى فى شرح المواهب ١١٣/٧

তিনবার আমীন বলার অর্থ এই নয় যে, এক রাকাতেই তিনবার আমীন বলেছেন। বরং এর অর্থ হলো তিন নামাযে তিনবার আমীন বলেছেন। তার মানে তিনি তিন নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমীন বলতে শুনেছেন। বাকি নামাযে শোনেন নি। অথচ এ যাত্রায় তিনি বিশ দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অবস্থান করেছিলেন।

খ. নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় হযরত ওয়াইল রা. বলেন–

فلما قرأ غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته وانا خلفه. رقم–٩٣٢

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين পড়ে শেষ করলেন তখন আমীন বললেন। আমি তাঁর পেছনেই ছিলাম। তাই তা শুনতে পেয়েছি। নাসায়ী (৯৩২), আলকুবরা (১০০৬)। ইমাম দারাকুতনী এই সনদকে সহীহ বলেছেন ১/৩৩৫(৫); তাবারানী ২২/২৩, ইবনে মাজাহ (৮৫৫)।

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায়, তাঁকে শেখানোর উদ্দেশ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন শব্দটি সামান্য জোরে উচ্চারণ করেছিলেন।

গ. অপর বর্ণনায় হযরত ওয়াইল রা. বলেন–

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلاة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب. وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته ما اراه الا ليعلمنا. رواه أبو بشر الدولابي في الكنى والأسماء. قال النيموى : وفيه يحى بن سلمة ، قواه الحاكم وضعفه جماعة.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সালাম ফেরানোর সময় আমি তাঁর ডান গাল ও বাম গাল দেখেছি। আর তিনি غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়ার পর লম্বা আওয়াযে আমীন বললেন। আমার মনে হলো আমাদেরকে শেখাবার জন্যই তিনি এমন করেছিলেন। (দ্র.হাফেজ আবূবিশর আদ দূলাবী র. রচিত 'আল কুনা ওয়াল আসমা', ১ম খ, ১৯৭ পৃ., নং ১০৯০) সনদটি যঈফ।

ঘ. হযরত ওয়াইল রা. কূফায় বসবাস করতেন। কূফার সাধারণ আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। ওয়াইল রা., তাঁর দুই ছেলে আলকামা ও আব্দুল জব্বার এবং অন্যান্য শাগরেদদের কেউ জোরে আমীন বললে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো। কিন্তু এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না । এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও মনে করতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই জোরে আমীন বলেছিলেন।

ঙ. হযরত ওয়াইল রা. উক্ত হাদীসটি সুফিয়ান ছাওরীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি নিজেও নিঃশব্দে আমীন বলতেন। (দ্র. আল মুহাল্লা, ২/২৯৫) এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও উক্ত হাদীসকে শিক্ষা দানের অর্থে গ্রহণ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল মারওয়াযী (মৃত্যু ২৯৪ হি.) তার ইখতিলাফুল উলামা গ্রন্থে লিখেছেন, قال سفيان : آمين يخفيه সুফিয়ান বলেছেন, আমীন নিঃশব্দে বলবে। (নং ৫)

ইবনুল মুনযির (মৃত্যু ৩১৯ হি.) আল আওসাত গ্রন্থে বলেছেন –

وقال سفيان الثورى : فاذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل آمين تخفيها.

অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী র. বলেন, তুমি যখন সূরা ফাতেহা সমাপ্ত করবে তখন নিঃশব্দে আমীন বলবে। (দ্র. ৩/২৯৫)

মুকতাদীর আস্তে আমীন বলার দলিল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ছিলেন। তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলেও মাঝে মধ্যে জোরে আমীন বলার প্রমাণ তাঁর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকতাদীকে জোরে আমীন বলতে বলেছেন, কিংবা তাঁর পেছনে সাহাবীগণ জোরে আমীন বলেছেন। এই কারণে ইমাম আবূ হানীফা র., ইমাম মালেক র. ও সুফিয়ান ছাওরী র. প্রমুখ বলেছেন, মুকতাদীরা আস্তে আমীন বলবে। ইমাম শাফেয়ী র. এ সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস না পাওয়ার কারণে তাঁর পূর্বের মত পাল্টিয়ে বলেছেন, মুকতাদী আমীন আস্তে বলবে। পেছনে আমাদের পেশকৃত দলিলগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইমাম আমীন আস্তে বলবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাধারণ ভাবে আমীন আস্তেই বলতেন। ঐ দলিলগুলি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মুকতাদীরাও আমীন আস্তে বলবে। সাহাবীগণের আমল ও ফতোয়াও ছিল তদ্রুপ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেছেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لاَ تُبَادِرُوا الإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ . فَقُولُوا آمِينَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. اخرجه مسلم فى الصحيح (٤١٥)

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শেখাতেন। তিনি বলতেন, ইমামের পূর্বে কিছু করো না। যখন ইমাম তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম যখন وَلاَ الضَّالِّينَ পড়ে শেষ করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। ইমাম যখন রুকু করবে তোমরাও তখন রুকু করবে। আর যখন سمع الله لمن حمده বলবে, তোমরা তখন বলবে اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪১৫।

এ হাদীসে তিনটি নির্দেশ এসেছে, তোমরা তাকবীর বলবে, তোমরা আমীন বলবে, তোমরা রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। প্রথম ও তৃতীয়টি সকলের মতে নিঃশব্দে পড়তে হবে। হাদীসটির বর্ণনাধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় নির্দেশটিও নিঃশব্দে পালন করবে।

জোরে আমীন বলার হাদীস : একটু পর্যালোচনা

জোরে আমীন বলা সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে মূল কথা হলো, যেটি সহীহ, সেটি সুস্পষ্ট (صريح)নয়। আর যেটি সুস্পষ্ট সেটি সহীহ নয়। যেমন:

১.বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে اذا امن الامام فامنوا হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এ বাক্যটির একটি অর্থ হলো, ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। এ অর্থে ইমাম বুখারীসহ অনেকেই এটি দ্বারা ইমামের জোরে আমীন বলা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রথমতঃ হাদীসটির শুধু এই একটি অর্থই নয়, আরো অর্থের অবকাশ আছে। অনেকে হাদীসটির অর্থ করেছেন, ইমাম যখন আমীন বলতে ইচ্ছে করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। যেহেতু ইমাম, মুকতাদী ও ফেরেশতার

আমীন বলা এক সঙ্গেই হওয়া কাম্য। তাই ইমাম যখন আমীন বলতে যাবে তখন যদি মুকতাদী আমীন বলা শুরু করে, তবেই একসঙ্গে হওয়া সম্ভব। অন্যথায় ইমামের আমীন বলা শুনে যদি মুকতাদী আমীন বলতে যায় তবে একসঙ্গে বলা হবে না।

এ অর্থে হাদীসটি জোরে আমীন বলার কোন প্রমাণই হয় না। দ্বিতীয়তঃ যদি প্রথম অর্থটিই ধরা হয়, তবুও জোরে আমীন বলার ব্যাপারে এর নির্দেশনা সুস্পষ্ট নয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যখন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এসময় ইমামও আমীন বলে, তখন ইমাম যখন আমীন বলে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে সূরা ফাতেহা শেষ করে ইমামতো আমীন বলবে, এসময় তোমরাও আমীন বলবে। এই কারণেই বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা মালেক প্রভৃতি গ্রন্থে এ হাদীসের শেষে ইবনে শিহাব যুহরী র. এর একথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এসময় আমীন বলতেন। প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হর-হামেশাই জোরে আমীন বলতেন তবে যুহরী র. এর একথা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলো কেন?

২. আবূ হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদীস সহীহ ইবনে খুযায়মায় (৫৭১) সহীহ ইবনে হিব্বানে (১৮০৬) বায়হাকী (২৪২২) সুনানে দারাকুতনীতে(১/৩৩৫) উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেহা শেষ করে উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। এ হাদীসটি সহীহ নয়। এর সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে উছমান সমালোচিত রাবী। তাঁর উস্তাদ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম যুবায়দীও দুর্বল রাবী। আবূ দাউদ র. ও নাসাঈ র. তাঁকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। হিম্সের মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আওফ আত্ তায়ী র. তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। হাকেম র. মুস্তাদরাক গ্রন্থে (৮১২) ও বায়হাকী আল মারিফা গ্রন্থে (৩১৭৫) এটিকে সহীহ বলেছেন এবং দারাকুতনী র. সুনান গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইলাল গ্রন্থে দারাকুতনী র. এর সনদে ও মতনে এখতেলাফ উল্লেখ করে বলেছেন والمحفوظ عن الزهرى اذا امن الامام فأمنوا অর্থাৎ আবূ হুরায়রা রা. থেকে যুহরী র. এর সঠিক বর্ণনাটি

হলো ইমাম যখন আমীন বলেন তোমরাও তখন আমীন বলো। (দ্র.আছারুস-সুনান,পৃ. ১২১,১২২)

উল্লেখ্য, সহীহ ইবনে খুযায়মার টীকায় আলবানী সাহেবও এটিকে যয়ীফ বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (হাদীস নং ৫৭১)

৩. ইবনে উমর র. হতে দারাকুতনীর সুনানে পূর্বোক্ত বক্তব্যের মতোই আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। (দ্র, ১ম খ, ৩৩৫পৃ,) এর সনদে একজন বর্ণনাকারী আছেন বাহর আস সাক্কা (بحر السقاء), দারাকুতনী র. হাদীসটি উল্লেখ করে নিজেই বলেছেন, বাহর আস সাক্কা যঈফ।

৪. হযরত আলী রা. থেকে এ মর্মে একটি হাদীস সুনানে ইবনে মাজা'য় (৮৫৪) ও মুজামে আওসাতে (৫৫৫৯) উদ্ধৃত হয়েছে। সেটিও যঈফ। এর সনদে মুহাম্মদ ইবনে আবী লায়লা আছেন। তিনি সমালোচিত। তথাপি ইবনে মাজার বর্ণনায় জোরে আমীন বলার কথা নেই। আওসাতের বর্ণনায় আছে, কিন্তু এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এর একজন বর্ণনাকারী দেরার ইবনে সুরাদকে ইবনে মাঈন ও ইবনে হিব্বান মিথ্যুক বলেছেন। বুখারী ও নাসাঈ বলেছেন, মাতরুকুল হাদীস অর্থাৎ তার হাদীস বর্জনযোগ্য। আবু হাতিম রাযী বলেছেন, তাকে প্রমাণরূপে পেশ করা উচিত নয় ।

৫. আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সুনানে ইবনে মাজা'য় উদ্ধৃত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেহা শেষ করার পর এমনভাবে আমীন বলতেন যে, প্রথম কাতারের লোকেরা তা শুনে ফেলতো, ফলে মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো। (হাদীস ৮৫৩), আবু ইয়ালা (৬২২০)।

এ হাদীসটিও সহীহ নয়। এর সনদে আবূ হুরায়রা রা. এর চাচাত ভাই আছেন, যার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানা যায় না। তাঁর শাগরেদ বিশর ইবনে রাফে চরম দুর্বল। ইবনে হিব্বান র. তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : يروى الموضوعات كأنه المتعمد لها অর্থাৎ তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করতেন, মনে হয় যেন তিনিই এগুলির আবিস্কারক। আলবানী সাহেব নিজেও এটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন। (দ্র, যয়ীফে আবূ দাউদ)

আবূ দাউদ শরীফেও একই সূত্রে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। তবে সেখানে 'ফলে মসজিদ আমীন ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতো' কথাটি নেই। (হাদীস নং ৯৩৪)

৬. উম্মুল হুসাইন (ام الحصين) রা. থেকে মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইতে (২৩৯৬) এবং তাবারানীর আল কাবীরে (৩৮৩) উদ্ধৃত হাদীসে বলা হয়েছে তিনি মহিলাদের কাতারে থেকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীনের আওয়ায শুনতে পেয়েছেন। আরো দ্র. মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩১৩), শারহু মুশকিলিল আছার, (৫৪০৭)। এ হাদীসটিও সহীহ নয়। এর সনদে ইসমাঈল ইবনে মুসলিম মক্কী আছেন, তিনি যঈফ বা দুর্বল। তাছাড়া আবু ইয়ালা ও তাহাবীর বর্ণনায় শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, রাসূল সা. ফাতেহা শেষে আমীন বলেছেন। তাঁর শোনার কথা বর্ণিত হয় নি।

৭. আতা র. থেকে বায়হাকী র. উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দু'শো সাহাবীকে পেয়েছেন যারা ইমামের সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে জোরে আমীন বলতেন।

এ হাদীসটিও সহীহ নয়। কেননা হাসান বসরী র. ছিলেন আতার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু তিনিও একশো বিশজনের বেশী সাহাবীর দেখা পাননি। মুজাহিদ র. এর অবস্থাও তাই। তাহলে আতা কি করে এত সাহাবীর দেখা পেলেন? অধিকন্তু আতা র. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন খালেদ ইবনে আবী আইয়্যুব। তিনি মাজহুল বা অজ্ঞাত-অখ্যাত বর্ণনাকারী। মাজহুল ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন সুন্নত

একাধিক হাদীস ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল একথা প্রমাণ করে যে, নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা সুন্নত। রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা সুন্নত নয়।

সাহাবীগনের যুগে মদীনা শরীফ এবং কুফা এই দুটি শহরেই অধিকাংশ সাহাবী বসবাস করতেন। কুফা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পাঁচশ সাহাবীসহ পনেরশ সাহাবী অবস্থান করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনশত সাহাবী ছিলেন, যারা বায়আতে রেযওয়ানে শরীক ছিলেন এবং সত্তরজন সাহাবী এমন ছিলেন, যারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।(মুকাদ্দমা নাসবুর রায়াহ দ্রষ্টব্য)

তাঁদের মধ্যে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.ও ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নামাযে অনেক স্থানে হাত তুলতে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী রা.ও ছিলেন, যারা অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে প্রথম কাতারেই নামায আদায় করেছিলেন। হযরত আলী রা.ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাধিক স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে। এই দুই নগরীর আমল আমাদের সামনে রাখতে হবে।

মদীনা শরীফের আমল:

ইমাম মালেক রহ. -যিনি মদীনা শরীফের বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন- তিনি বলেছেন,

لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة. (المدونة الكبرى صـ ١/٧١)

অর্থাৎ নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য কোন তাকবীরের সময়, ঝোঁকার সময় বা সোজা হওয়ার সময় হাত তোলার নিয়ম আমার জানা নেই। (আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১খ, ৭১পৃ)

কূফা নগরীর আমল:

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর (মৃত্যু ২৯৪ হি.) বলেছেন,

لا نعلم مصرا من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديما تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة، كذا في التمهيد ٩/٢١٢،٢١٣ وزاد في الاستذكار: فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام. (رقم ١٤٠)

আমরা কূফাবাসী ছাড়া আর কোন শহরবাসী– যারা প্রাচীনকালে ইলমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন– সম্পর্কে জানি না, যারা সকলে মিলে নামাযে ঝোঁকার সময় ও সোজা হওয়ার সময় হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন। (দ্র, তামহীদ লি ইবনি আব্দুল বার রহ. ৯/২১২,২১৩) আল ইসতিযকার গ্রন্থে একথাও ইবনে নাসর থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, কূফাবাসী সকলে শুধু তাহরীমার সময় হাত তুলতেন। (হাদীস ১৪০)[১]

লক্ষ করুন, সকলে মিলে ছেড়েছেন এমন শহর শুধু কূফাই ছিল। তার মানে অন্যান্য শহরে ছেড়ে দেয়ারও লোক ছিল, হাত তোলারও লোক ছিল।

চিন্তা করুন, কূফার পনেরশ' সাহাবীর কেউ যদি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তুলতেন, তাহলে তাঁদের শাগরেদদের কেউ না কেউ অবশ্যই হাত তুলতেন। কিন্তু না, তাঁদের

---

[১] ইবনে নাসরের এ বক্তব্যটি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে বক্তব্যটির মর্ম পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, وقال محمد بن نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী বলেছেন, কুফাবাসী ছাড়া সকল শহরের আলেমগণ রফয়ে ইয়াদাইন শরিয়তসম্মত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

কেউই হাত তুলতেন না। ইমাম তিরমিযীও হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর একবার হাত তোলার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন,

وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

অর্থাৎ এ হাদীস অনুসারেই মত দিয়েছেন একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী। সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসীদের মতও এই হাদীস অনুসারে।

তামহীদ গ্রন্থে ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেছেন,

روى ابن القاسم وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام وحدها وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين وهو قول الكوفيين سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وسائر فقهاء الكوفة قديما وحديثا.

অর্থাৎ ইবনুল কাসেম প্রমুখ ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া নামাযে অন্য কোথাও রফয়ে ইয়াদাইনকে দুর্বল মনে করতেন। ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত এ বর্ণনাকেই মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম গ্রহণ করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানীফা, তাঁর শিষ্যবর্গ, হাসান ইবনে হায়্য, এমনকি প্রাচীন ও পরবর্তী উভয়কালের সকল কূফাবাসীর মত এটাই। (৯/২১২,২১৩)

সুফিয়ান ছাওরীর জীবনী পড়ুন। তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' বা হাদীসের সম্রাট উপাধি দেওয়া হয়েছে। রফয়ে ইয়াদাইন নিয়মিত সুন্নত হিসাবে প্রমাণিত থাকলে তিনি তা ছেড়ে দিতেন না। ইমাম মালেক র.ও ছিলেন হাদীসের সম্রাট। মুয়াত্তায় তিনি রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এতদসত্ত্বেও মদীনা শরীফের অধিকাংশের আমল তদনুযায়ী না থাকার কারণে তিনিও হাত না তোলাকেই অবলম্বন করেছেন। মদীনা ও কূফার এ সকল সাহাবী ও তাবেয়ী একারণেই তো রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে হাত তুলতেন না যে- তাঁদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে তেমনটা করলেও অধিকাংশ সময় তা করেননি। কিংবা পূর্বে করেছেন বটে, পরে ছেড়ে

দিয়েছেন। ভূমিকা স্বরূপ একথাগুলো আরজ করার পর এ বিষয়ের হাদীসগুলো তুলে ধরছি।

শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইনের দলিল

১. আলকামা র. বলেন,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أول مَرَّة. أخرجه أبو داود (٧٤٨) والترمذي (٢٥٧) والنسائي (١٠٥٨) وقال الترمذي : حديث حسن وصححه ابن حزم في المحلى ٤/٨٨ وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوا في تعليله ليس بعلة.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মত নামায পড়বনা? একথা বলে তিনি নামায পড়লেন, এবং তাতে শুধু প্রথম বারই হাত তুললেন। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৪৮, তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৫৭, নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ১০৫৮, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৬, মুসনাদে আহমদ, ১খ, ৩৮৮পৃ।

ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসকে ‘হাসান’ বলেছেন, ইবনে হাযম জাহিরী (যিনি কোন মাযহাব অনুসরণ করতেন না) এটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী শরীফের টীকায় শায়খ আহমদ শাকের (তিনি মিসরের কাজী ছিলেন) বলেছেন, এ হাদীসটিকে ইবনে হাযমসহ অনেক হাফেজে হাদীস সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আসলেও এটি সহীহ হাদীস। অনেকে এর যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলো বাস্তবে কোন ত্রুটি নয়।

আহমদ শাকের রহ. অন্যদের উত্থাপিত যে ত্রুটির প্রতি ইংগিত করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো; কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বলেছেন :

ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة.

অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রা. এর এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথমবারই হাত তুলেছেন। এর জবাব এই যে, ইবনে মাসউদ রা. থেকে এ ব্যাপারে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি মৌখিক বর্ণনারূপে, অপরটি নিজে আমল করে দেখানোর মাধ্যমে। ইবনুল মুবারক র. প্রথমটি সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন। উপরে উদ্ধৃত তার বক্তব্য থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বর্ণনা সম্পর্কে তিনি ঐ মন্তব্য করেননি। এর প্রমাণ তিনি নিজেও দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। হাদীস নং ১০২৬।

২. হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. أخرجه أبو داود (٧٥٢) وابن أبي شيبة (٢٤٥٥) وعبد الرزاق في المصنف (٢٥٣١) والدارقطني (٢٩٣/١، رقم ٢١) فرواه عن البراء ثقتان عدي ين ثابت عند الدارقطني وعبد الرحمن بن أبي ليلى عند غيره وعنهما يزيد بن أبي زياد والحكم بن عتيبة وعيسى ، والحكم وعيسى ثقتان ويزيد صدوق عند البخاري ومسلم وصحح حديثه الترمذي (١١٤،٧٧٧) وعن يزيد ابن أبي ليلى والسفيانان وشريك و اسرائيل واسماعيل بن زكريا والإمام أبو حنيفة وغيرهم.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন। এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না।

আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৫। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৫৩১), দারাকুতনী (১খ, ২৯৩ পৃ.) হাদীস ২১।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترفع الأيدي في سبعة مواطن، افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين وعند الحجر، أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٥) موقوفا والطبراني (١٢٠٧٢) مرفوعا.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাতটি জায়গায় হাত তুলতে হয়। ১. নামাযের শুরুতে, ২. কাবা শরীফের সামনে আসলে, ৩. সাফা পাহাড়ে উঠলে, ৪. মারওয়া পাহাড়ে উঠলে। ৫. আরাফায় ৬. মুযাদালিফায় ৭. হাজরে আসওয়াদের সামনে।

তাবারানী, মুজামে কাবীর(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যরূপে) নং ১২০৭২। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬৫ (সাহাবীর বক্তব্যরূপে)। সুনানে বায়হবাকী, ৫খ, ৭২-৭৩ পৃ। হায়ছামী র. হযরত ইবনে উমর রা. থেকেও মারফূরূপে এটি উল্লেখ করেছেন।(দ্র. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২খ, ২২২ পৃ) এখানে উদ্ধৃত হাদীসটি এই শব্দে মুসনাদে বাযযারের বরাত দিয়ে হায়ছামী তার কাশফুল আসতারে উল্লেখ করেছেন। (হা. ৫১৯)

৪. হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. رواه البيهقي في الخلافيات من حديث محمد بن غالب ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا عبد الله بن عون الخراز ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. قال الحافظ مغلطائي: لا بأس بسنده. وقال الشيخ عابد السندي: هذا الحديث عندي صحيح لا محالة رجاله رجال الصحيح.(راجع- الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ص ٢٥٢) قلت: ويؤيده أيضا عمل ابن عمر على وفقه كما عند الطحاوي ١/١١٠ وابن أبي شيبة (٢٤٦٧) والبيهقي في المعرفة عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. وأخرجه الإمام محمد في الموطا عن محمد بن أبان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এর পর আর করতেন না। (বায়হাকী, আল খিলাফিয়াত) । হাফেজ মুগলতাঈ র. বলেছেন, এর সনদে কোন সমস্যা নেই। শায়খ আবেদ সিন্ধী র. বলেছেন, আমার দৃষ্টিতে এটি অবশ্যই সহীহ। ইমাম মালেক র. থেকে ইবনুল কাসেম ও ইবনে ওয়াহব র. একবার হাত ওঠানোর যে বর্ণনা পেশ করেছেন, যা আল মুদাওয়ানা'য় বিদ্ধৃত হয়েছে, তা এই বর্ণনার সমর্থন করে। এমনিভাবে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদীসটি এবং তাঁর আমলও এর সমর্থক।

ইবনে আবী শায়বা র. স্বীয় মুসান্নাফে ও তাহাবী র. শরহে মাআনিল আছার গ্রন্থে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত ইবনে উমর রা. এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি নামাযের সূচনায় ছাড়া আর কোথাও হাত তোলেন নি। এর সনদ সহীহ। ইমাম মুহাম্মদ র.ও মুয়াত্তায় হযরত ইবনে উমর রা.এর অনুরূপ আমলের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

৫. আসওয়াদ র. বলেছেন,

رأيت عمر بن خطاب رض يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٩) والطحاوي ١/١١١ وصححه الزيلعي وقال الحافظ ابن حجر في الدراية : وهذا رجاله ثقات. وقال الماردينى في الجوهر النقي ٢/٧٥: هذا سند صحيح على شرط مسلم.

অর্থ: আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.কে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন; পরে আর তুলতেন না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬৯; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১১১পৃ।

যায়লাঈ র. এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আদদিরায়া গ্রন্থে লিখেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত। আল্লামা আলাউদ্দীন মারদীনী র. আল জাওহারুন নাকী গ্রন্থে বলেছেন, এসনদটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

ইমাম তাহাবী এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

وفعل عمر رضي الله عنه هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه علي ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه

অর্থাৎ উমর রা. কর্তৃক এই আমল করা এবং সাহাবীগণের তার উপর কোন আপত্তি না করা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এটাই এমন সঠিক পদ্ধতি, যার ব্যতিক্রম করা কোন ব্যক্তির জন্য উচিৎ নয়।

৬. আসিম ইবনে কুলায়ব র. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

أن عليا رض كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد.

أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٥٧ والطحاوي ١/١١٠ والبيهقي ٢/٨٠ وصححه الزيلعي وقال الحافظ في الدراية : رجاله كلهم ثقات وقال العيني : صحيح على شرط مسلم.

অর্থ: হযরত আলী রা. নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন। এরপর আর কোথাও তুলতেন না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৭; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১১০পৃ।

যায়লাঈ র. এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আদদিরায়া গ্রন্থে লিখেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সবাই বিশ্বস্ত। আল্লামা আয়নী র. বলেছেন, এটি মুসলিম শরীফের সনদের মানসম্পন্ন।

ইমাম তাহাবী র. এটি উল্লেখ করার পর বলেন,

فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত তুলতে দেখেও তাঁর ইন্তেকালের পর আলী রা.তো শুধু একারণেই হাত তোলা ছেড়ে দিতে পারেন যে, তার নিকট হাত তোলার বিধান রহিত হওয়ার কোন প্রমাণ বিদ্যমান ছিল।

৭. ইবরাহীম নাখায়ী র. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

أنه كان يرفع يديه في أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٨) والطحاوي ١/١١١ وعبد الرزاق ٢/٧١ وإسناده صحيح.

অর্থ: তিনি নামায শুরু করার সময় হাত তুলতেন। পরে আর কোথাও হাত তুলতেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৫৮; তাহাবী শরীফ, ১খ, ১১১পৃ; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ২খ, ৭১পৃ। এটির সনদ সহীহ।

৮. হযরত আব্বাদ ইবনুয যুবায়র থেকে বর্ণিত:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يرفعهما في شيئ حتى يفرغ. أخرجه البيهقي في الخلافيات. كما في نصب الراية ١/٤٠٤

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন শুধু নামাযের শুরুতেই উভয় হাত তুলতেন। এর পর নামায শেষ করা পর্যন্ত আর কোথাও হাত তুলতেন না। বায়হাকী তার 'আল-খিলাফিয়াত' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সকলেই বিশ্বস্ত।

৯. আবূ ইসহাক সাবিয়ী র. বলেন,

كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ثم لا يعودون. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح جدا (٢٤٦١)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ এবং হযরত আলী রা. এর শাগরেদগণ কেবল মাত্র নামাযের শুরুতে হাত ওঠাতেন। ওয়াকী র. বলেন, এর পর আর হাত ওঠাতেন না।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬১। এর সনদ অত্যন্ত সহীহ।

রফয়ে ইয়াদাইন কত জায়গায় ছিল?

সহীহ হাদীসসমূহে দেখা যায়, রফয়ে ইয়াদাইন একবার থেকে শুরু করে প্রত্যেক ওঠানামায় ছিল। খোদ হযরত ইবনে উমর রা. এর হাদীসে এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

ক. শুধু এক জায়গায় অর্থাৎ নামাযের শুরুতে। যেমনটি পেছনের হাদীসগুলো থেকে জানা গেল।

খ. দুই জায়গায়, অর্থাৎ শুরুতে এবং রুকু থেকে ওঠার পর। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে ইমাম মালেক র. মুয়াত্তায় এটি উদ্ধৃত করেছেন। আবূ দাউদ হযরত ইবনে উমর রা. থেকে (৭৪২), ইবনে মাজা র. হযরত আনাস রা. থেকে (৮৬৬)।

গ. তিন জায়গায়, অর্থাৎ নামাযের শুরুতে এবং রুকুর পূর্বে ও পরে। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বুখারী ও মুসলিমসহ অনেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

ঘ. চার জায়গায়, অর্থাৎ উপরোক্ত তিন জায়গায় এবং দুরাকাত শেষ করে দাঁড়ানোর সময়। ইবনে উমর রা. থেকে বুখারী (৭৩৯), আবূ দাউদ(৭৪৩)। আবূ হুমায়দ রা. থেকে ইবনে মাজা (৮৬২) ও তিরমিযী (৩০৪), তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত আলী রা. থেকে আবূ দাউদ (৭৪৪), ইবনে মাজাহ (৮৬৪), ও তিরমিযী (৩৪২৩)। তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে আবূ দাউদ(৭৩৮)।

ঙ. পাঁচ জায়গায়, উক্ত চার জায়গা ছাড়াও সেজদায় যাওয়ার সময়। বুখারী, 'জুযউ রাফইল ইয়াদাইন গ্রন্থে', (পৃ ২৬); এবং তাবারানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে। হায়ছামী র.বলেছেন, এর সনদ সহীহ। নাসাঈ র. মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. থেকে (১০৮৫) । এর সনদও সহীহ। ইবনে মাজাহ র. হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে (৮৬০)। আবূ ইয়ালা র. হযরত আনাস রা. থেকে (৩৭৪০)। এর সনদও সহীহ। (দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/২২০)। দারা কুতনী র. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে। এর সনদও সহীহ। (দ্র, আছারুস সুনান)

এছাড়া হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর বর্ণনায় ২য় রাকাতের শুরুতে – আবূ দাউদ (৭২৩), এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় দুই সেজদার মাঝে – আবূ দাউদ (৭৪০), নাসায়ী (১১৪৩)- রফয়ে ইয়াদাইনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চ. প্রত্যেক ওঠানামার সময়। অর্থাৎ রুকু, সেজদা, কেয়াম (দাঁড়ানো), কুউদ (বসা) এবং উভয় সেজদার মাঝখানে রফয়ে ইয়াদাইন। তাহাবী মুশকিলুল আছার গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে (৫৮৩১) । এর রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত। ইবনে মাজাহ র. উমায়ের ইবনে হাবীব থেকে (৮৬১) এর সনদ দুর্বল। প্রত্যেক ওঠানামায় হাত তোলার হাদীসকে ইমাম আহমাদ সহীহ বলেছেন। (দ্র. মুগনী, ১/৩৬৯) আবুল হাসান ইবনুল কাত্তানও তার বায়ানুল ওয়াহাম ওয়াল ঈহাম গ্রন্থে এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। (৫/৬১২) ইবনে হাযমও (মৃত্যু-৪৫৬হি) আল মুহাল্লা গ্রন্থে এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। একটু পরেই তার বক্তব্য আসছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় সহীহ সনদে হযরত ইবনে উমর রা.এর দুই সেজদার মাঝেও রফয়ে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে। এমনিভাবে হযরত আনাস রা., নাফে র., তাউস র., হাসান বসরী র., ইবনে সীরীন র. ও আইয়ুব সাখ্‌তিয়ানী সকলেই দুই সেজদার মাঝখানে রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (দ্র.মুসান্নাফ, ৩খ.,৫০৯পৃ. ২৮১০-২৮১৫ নং হাদীস)

আহলে হাদীস ভাইদের সহীহ হাদীস অনুসরণের দাবী ঠিক রাখতে চাইলে এসবগুলো অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইবনে হাযম জাহেরী ও আলবানী সাহেব তাই করেছেন।

হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাফয়ে ইয়াদাইন অনেক জায়গায়ই ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে একবারের মধ্যে এসে ঠেকেছে, যা পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের কারণ হলো, প্রথম দিকে নামাযে চলাফেরা, সালাম-কালাম অনেক কিছুই বৈধ ছিল। ক্রমান্বয়ে স্থিরতা ও কম নড়াচড়ার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে আসতে থাকে। হানাফীগণ মনে করেন পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, রাফয়ে ইয়াদাইনও স্থিরতার পরিপন্থী। তাই ক্রমে ক্রমে এটিকে কমানো হয়েছে। অন্যথায় হযরত আলী রা., ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র রা.ও

আবু মূসা আশ্‌আরী রা. প্রমুখ সাহাবীগণ রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল না করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

বাড়াবাড়ি কাম্য নয়

আমাদের পূর্বসূরিগণের যুগেও এ মাসআলা নিয়ে দ্বিমত ছিল। তবে বাড়াবাড়ি ছিল না। এখানে দু'জন বড় আলেমের বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। একজন ইবনে হাযম জাহেরী এবং অপরজন ইবনুল কায়্যিম হাম্বলী। তারা দু'জনই আমাদের লা-মাযহাবী ভাইদের অত্যন্ত আস্থাভাজন।

ইবনে হাযম জাহিরী আল মুহাল্লা গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন–

فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ، وَلاَ يَرْفَعُ , كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحًا لاَ فَرْضًا , وَكَانَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَذَلِكَ , فَإِنْ رَفَعْنَا صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي , وَإِنْ لَمْ نَرْفَعْ فَقَدْ صَلَّيْنَا كَمَا كَانَ يُصَلِّي. المحلى ٣/٢٣٥

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক ওঠা-নামার সময় হাত তুলতেন বলে যখন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত, তখন এর সব ধরণই মুবাহ বা বৈধ হবে, ফরজ হবে না। আমরা এর যে কোন পদ্ধতি অনুসারেই নামায পড়তে পারি। আমরা যদি রফয়ে ইয়াদাইন করি তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে। আর যদি রফয়ে ইয়াদাইন না করি তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে। (মুহাল্লা, ৩ খ., ২৩৫ পৃ.)

হায়! যদি আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা ইবনে হাযম (তিনিও কোন মাযহাব অনুসরণ করতেন না)এর উপরোক্ত বক্তব্য গ্রহণ করে নিতেন তাহলে ফেতনা অনেকাংশেই কমে যেত।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. (মৃত্যু-৭৫০হি.)ও তাঁর 'যাদুল-মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনুত পড়া হবে কি না, সে প্রসঙ্গে লিখেছেন,

وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنَّف فيه من فعله، ولا مَنْ تَركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات، وأنواع الأذان والإقامة، وأنواع النسك من الإفراد والقِران والتمتع،

অর্থাৎ এটা এমন বৈধ মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি এটা করলো এবং যে করলো না কাউকেই দোষারোপ ও নিন্দা করা যায় না। এটা ঠিক তেমনই যেমন নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তদ্রুপ তাশাহহুদ বিভিন্ন শব্দে পড়া,আযান-ইকামতের বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করা, এবং হজ্জের তিনটি নিয়ম-ইফরাদ,কিরান ও তামাত্তু বিষয়ে মতানৈক্যের মতোই। (দ্র. ১/২৬৬)

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

এ মাসআলায় আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধু মুযাফফর বিন মুহসিন তার জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছালাত নামক বইটিতে বলেছেন:

'জ্ঞাতব্য : রাফউল ইয়াদায়েনের সুন্নাতকে রহিত করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ছাহাবীর নামে উক্ত হাদীছগুলো জাল করা হয়েছে।

কিন্তু 'ঐ সাহাবীগণের নামে এসব হাদীস জাল করা হয়েছে'– একথা বলার পূর্বে লেখকের ইলমী পুঁজি কতটুকু তাও তার উচিৎ ছিল খতিয়ে দেখা। কারণ বুদ্ধিমান সেই যে অপদস্থ হওয়ার পূর্বে নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে খবর নেয়। এই লেখকই উক্ত গ্রন্থের ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় জোহরের নামায সম্পর্কে আবূ যর গিফারী রা. বর্ণিত হাদীসটির অর্থ লিখেছেন, "তখন আবার বললেন, তালূল দেখা পর্যন্ত দেরি কর"। ছি ছি ছি! এই সহজ হাদীসটির অর্থ লিখতে তিনি এত মারাত্মক ভুল করলেন? এলেমের এই চালান নিয়ে আবার এতবড় আস্ফালন! সঠিক অর্থ হবে– অবশেষে আমরা (একথা বলছেন আবূ যর রা.) টিলার ছায়া দেখতে পেলাম।

হাদীস সংকলক মুহাদ্দিসগণ সনদ ও সূত্রসহ যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত করেছেন, সেই সনদে যদি কোন মিথ্যুক রাবী থেকে থাকে, তাহলেই সাধারণত হাদীসটিকে জাল বলা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটি ইমাম আহমদ (স্বীয় মুসনাদে), ইবনে আবী শায়বা (স্বীয় মুছান্নাফে), আবূদাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী স্ব স্ব সুনান গ্রন্থে, আবূ ইয়ালা তার মুসনাদে এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে এটি আলকামা (বুখারী-মুসলিমের রাবী) বর্ণনা করেছেন। তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (বুখারী-মুসলিমের রাবী), তার থেকে বর্ণনা করেছেন আসিম ইবনু কুলায়ব (মুসলিমের রাবী) তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ছাওরী (বুখারী-মুসলিমের রাবী) তার থেকে বর্ণনা করেছেন ওয়াকী ইবনুল জাররাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (তারাও বুখারী- মুসলিমের রাবী)। তাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনূ আবী শায়বা, আহমদ, হান্নাদ, মাহমূদ ইবনে গায়লান, সুয়াইদ ইবনে নাসর ও যুহায়র প্রমুখ। তাদের কাছ থেকেই বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ তিরমিযী ও নাসায়ী প্রমুখ।

এখন এ হাদীসকে জাল বলতে হলে লেখককে অবশ্যই বলতে হবে তা কে জাল করেছে। সংকলকগণ? না সনদের অন্য কোন রাবী?

ইবনে মাসউদ রা. এর এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন ইবনে হাযম জাহেরী তার আল মুহাল্লায়, আল্লামা আহমদ শাকের তার তিরমিযী শরীফের টীকায়, আলবানী সাহেব আবূ দাউদের টীকায়, শুআইব আরনাউত মুশকিলুল আছারের টীকায়, হুসায়ন সালীম আসাদ মুসনাদে আবূ ইয়ালার টীকায়। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান। এটি জাল হলে তারা সহীহ বা হাসান বললেন কিভাবে?

২নং হাদীস হিসাবে লেখক উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর (রা.) এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। কিন্তু তারা ছালাত আরম্ভের তাকবীর ছাড়া আর কোথাও হাত উত্তোলন করেন নি।

এরপর তিনি মন্তব্য লিখেছেন, বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, এর একজন রাবী মুহাম্মদ ইবনে জাবের সুহায়মী যঈফ।

তাহলে তিনি এ হাদীসকে যঈফ বলতে পারেন। যয়ীফ আর ভিত্তিহীন কি এক কথা? এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন ইসহাক ইবনে আবূ ইসরাঈল। আর ইবনে আদী রহ. আল-কামিল গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে জাবেরের জীবনীতে লিখেছেন,

وعند اسحاق بن ابي اسرائيل عن محمد بن جابر احاديث صالحة وكان اسحاق يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم افضل منه واوثق

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে জাবের থেকে ইসহাক ইবনে আবূ ইসরাঈলের নিকট ভাল ভাল কিছু হাদীস রয়েছে। ইসহাক রহ. মুহাম্মদ ইবনে জাবেরকে এমন অনেক শায়েখের উপর প্রাধান্য দিতেন যারা তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলেন।

দারাকুতনী এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন,

قال اسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها (١/٢٩٥)

অর্থাৎ ইসহাক বলেছেন, আমরা সকল নামাযে এ অনুযায়ীই আমল করে থাকি। (১/২৯৫)

উল্লেখ্য যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী ইসহাকের এ উক্তি প্রমান করে যে মুহাম্মদ ইবনে জাবেরের হাদীসটির উপর তার কতটা আস্থা ছিল।

ইবনে আদী তার উপরোক্ত বক্তব্যেও পর লিখেছেন-

وقد روى عن محمد بن جابر- كما ذكرت من الكبار ايوب وابن عون وهشام بن حسان وسفيان الثورى وشعبة وابن عيينة وغيرهم ولولا ان محمد بن جابر فى ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف فى احاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه.

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে জাবের থেকে বড়দের মধ্যে যারা বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, আইয়্যুব, ইবনে আওন, হিশাম ইবনে হাসসান, সুফিয়ান ছাওরী, শোবা ও ইবনে উয়ায়না প্রমুখ। মুহাম্মদ ইবনে জাবের যদি সেই মানের না হতেন, তাহলে তার সূত্রে এমন মনীষী হাদীস বর্ণনা করতেন না। অথচ তিনি তাদের তুলনায় নিম্নমানের ছিলেন।

কতিপয় হাদীসে তিনি (বিশ্বস্তদের বর্ণনার) বিপরীত বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে যারা সমালোচনা করেছেন তাদের সমালোচনা সত্ত্বেও তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যায়।

এর সঙ্গে আবু হাতেম রাযী ও আবূ যুরআ রাযী উভয়ের কথাটি যোগ করুন, তারা বলেছেন,

واما اصوله فصحاح.

তার মূল হাদীসগ্রন্থগুলো সহীহ ছিল।

এ ধরনের বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে যঈফ বলা যায়, ভিত্তিহীন বলা যায় না।

তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে জাবের একা নন। শক্তিশালী সূত্রে তার হাদীসটির সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম তাহাবী রহ. মুশকিলুল আছার গ্রন্থে লিখেছেন

حدثنا محمد بن النعمان السَقَطى نا يحيى بن يحيى النيسابورى نا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه فى اول تكبيرة ثم لايعود.

অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনুন নু'মান আস সাকাতী আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া ইবনে ইয়াহয়া আন নায়সাবূরী, তিনি বলেছেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ওয়াকী রহ. সুফিয়ান এর সূত্রে আসিম ইবনে কুলাইব থেকে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনুল আসওয়াদ এর সূত্রে আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করতেন, আর কখনো করতেন না। (হাদীস নং ৫৮২৬)

এ হাদীসটির সূত্র সম্পর্কে টীকাকার শুআয়ব আরনাউত লিখেছেন,

رجاله ثقات رجال الشيخين غيرعاصم بن كليب فمن رجال مسلم

অর্থাৎ এর বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশ্বস্ত, বুখারী ও মুসলিমের রাবী, আসিম ইবনে কুলায়ব ছাড়া, তিনি মুসলিমের রাবী।

৩ নম্বরে লেখক বারা ইবনে আযিব রা. এর হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন, 'অতঃপর তিনি হাত তুলতেন না' কথাটুকু উক্ত হাদীসের সঙ্গে পরবর্তীতে কেউ যোগ করেছে। আর ইমাম আবূ দাউদের ভাষ্য অনুযায়ী এটা কুফাতে হয়েছে। কারণ মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমনটি ঘটে নি। যেমন ইমাম আবু দাউদ বলেন, (অনুবাদ) সুফিয়ান যাদের কাছে ইয়াযীদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা পূর্বের শারীক বর্ণিত হাদীছের ন্যায়। কিন্তু 'অতঃপর আর করতেন না' একথা বলেন নি। সুফিয়ান বলেন, পরবর্তীতে কুফায় আমাদেরকে উক্ত কথা বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইয়াযীদ থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুশাইম, খালেদ ও ইবনু ইদরীস। কিন্তু 'অতঃপর পুনরায় আর হাত তুলেন নি' কথাটি উল্লেখ করেন নি। তাছাড়াও হাদীছটি যঈফ। এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ আছে, সে যঈফ রাবী। ইমাম আহমদ বলেন, হাদীসটি নিতান্তই যঈফ।

এরপর লেখক আরো লিখেছেন, আসলে বর্ণনাটি একেবারেই উদ্ভট; বরং একে জাল বলাই শ্রেয়। কারণ 'পুনরায় আর করেন নি' এই অংশটুকু কুফাতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। মুহাদ্দিছ আবূ উমর বলেছেন, ইয়াযিদ একাকী বর্ণনা করেছে। অনেক মুহাদ্দিছ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কেউই 'পুনরায় আর হাত তুলেন নি' এই বক্তব্য উল্লেখ করেন নি। ইমাম ইবনু মাঈন বলেছেন, এই হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম আহমাদ, বাযযার প্রমুখ মুহাদ্দিছ এই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলকথা হল, শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগন এমর্মে একমত যে, হাদীছের শেষাংশে সংযোজিত বাড়তি অংশটুকু কোন মানুষের তৈরি, হাদীসের অংশ নয়। অতএব উক্ত বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না।

এ দীর্ঘ বক্তব্য পুরোটাই লেখকের অন্ধ অনুসরণ মাত্র। নিম্নে এসব বক্তব্যের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

১- সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. এর উপরোক্ত বক্তব্যটির উপরই ভিত্তি করে ইমাম শাফিঈ, আহমদ, হুমায়দী, বুখারী প্রমুখ একই কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বক্তব্যটির মধ্যে সমস্যা আছে। কারণ এখানে বলা

হয়েছে সুফিয়ান কুফায় আগমনের পর ঐ বাড়তি অংশটুকু শুনতে পেয়েছেন। কুফার বাইরে মক্কায় যখন ইয়াযীদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন ঐ বাড়তি অংশটুকু ছিল না। ইতিহাসের আলোকে এই কথাগুলি খাটে না। কারণ ইয়াযীদ ৪৭ হি. সনে কুফায় জন্মগ্রহন করেন এবং ১৩৫ হি. সনে কুফায়ই মৃত্যুবরণ করেন। আর সুফিয়ান ১০৭ হি. সনে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৩ হি. সনে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭ হি. সনে মক্কায়ই তার ইন্তেকাল হয়। এতে দেখা যাচ্ছে, সুফিয়ান কুফায় ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত ইয়াযীদকে পেয়েছেন। ইয়াযীদের মৃত্যুর ২৭ বছর পর তিনি মক্কায় চলে যান। সুতরাং 'সুফিয়ান কুফায় ফিরে এসে দেখেন' কথাটির কোন অর্থ থাকে না।

যদি এ কথাটি সত্য ধরেও নিই তবুও বলা যায়, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না হলেন ইয়াযীদের নবীন শিষ্য। তার প্রবীন শিষ্যরা যেমন সুফিয়ান ছাওরী, শারীক, শো'বা ও হুশায়ম প্রমুখ অনেক পূর্বেই এই হাদীস শিখেছেন, তাতে ঐ বাড়তি অংশ রয়েছে। শারীকের বর্ণনা তো আবূ দাউদেই আছে। ছাওরীর বর্ণনা তাহাবীতে আছে । ইবনে আদীও আল কামিল গ্রন্থে লিখেছেন

وراه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد باسناده وقالوا فيه ثم لم يعد

অর্থাৎ হুশায়ম, শারীক ও তাদের সঙ্গে এক জামাত রয়েছেন, যারা ইয়াযীদ থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে তারা 'অতঃপর আর হাত তুলেন নি' কথাটি উল্লেখ করেছেন। ৯/১৬৫

দেখুন, তাদের কথার মধ্যে কত পার্থক্য। আবূ দাউদ প্রমুখ বলেছেন হুশায়মের বর্ণনায় ঐ বাড়তি অংশ নেই। আর ইবনে আদী বলেছেন আছে। ছাওরী ও শারীকের বর্ণনায় তো আছেই। সুতরাং এমন কথা বলে হাদীসটি বাদ দেওয়া কি ইনসাফপূর্ণ হবে? খাত্তাবী বলেছেন, শারীক একাই এমনটি বর্ণনা করেছেন তাই এটি গ্রহনযোগ্য হবে না। আবার আবূ উমর (ইবনে আব্দুল বার) বলেছেন, ইয়াযীদ একাই এমনটি বর্ণনা করেছেন তাই গ্রহনযোগ্য হবে না। কোনটা ঠিক? খাত্তাবীর কথা না আবূ উমরের কথা? ইবনে আদীর বক্তব্য থেকেই পরিস্কার বোঝা গেল যে, শারীক একা বর্ণনা করেন নি, আরো অনেকে করেছেন। ইয়াযীদও একা বর্ণনা করেন নি। বরং ইমাম আবূ দাউদ নিজেই আরেকটি সুত্রে এটি

উদ্ধৃত করেছেন। সুত্রটি হলো, আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনে আব্দুর রাহমান থেকে, তিনি ওয়াকী থেকে, তিনি ইবনে আবূ লায়লা থেকে, তিনি আপন ভ্রাতা ঈসা থেকে, তিনি হাকাম থেকে, তিনি আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ লায়লার সুত্রে বারা ইবনে আযিব রা. থেকে। হাদীসটি আমাদের মুযাফফর ভাই ৫ নম্বরে উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি যঈফ। এর সনদে ইবনু আবী লায়লা নামক যঈফ রাবী আছে। ইমাম বায়হাকী বলেন, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহন করা যায় না। তাছাড়া ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন– هذا الحديث ليس بصحيح. এই হাদীছ ছহীহ নয়।

কিন্তু ইবনে আবূ লায়লা সম্পর্কে আবু দাউদ ও বায়হাকীর কথাই চূড়ান্ত কিছু নয়। অনেকে তাকে বিশ্বস্তও বলেছেন। ইজলী বলেছেন,

صدوق ثقة তিনি সাদূক ও বিশ্বস্ত। দারাকুতনী তার সুনানে (১/১২৪) বলেছেন, ثقة في حفظه شيء তিনি বিশ্বস্ত তবে তার স্মৃতিতে কিছু সমস্যা ছিল। সকলের মতামত সামনে রেখে যাহাবী তার তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে বলেছেন,

حديثه فى وزن الحسن ولا يرتقى الى الصحة لانه ليس بالمتقن عندهم

অর্থাৎ তার হাদীস হাসান মানের, সহীহ'র মানে তা উন্নীত হবে না। কারন তিনি মুহাদ্দিসগনের দৃষ্টিতে সুদৃঢ় ছিলেন না।

এ হিসাবে এ বর্ণনাটি কমপক্ষে হাসান স্তরের। সুতরাং ঢালাওভাবে তার হাদীসকে যঈফ বলে দেওয়া সঙ্গত হবে না। যদি যঈফ বলে ধরেও নিই, তবুও পূর্বের সনদের সমর্থক হিসাবে এটা অবশ্যই গ্রহনীয় হবে। সারকথা ইয়াযীদ একা বর্ণনা করেন নি, বরং অন্য সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আবূ উমরের কথাটিও ঠিক রইল না।

২- ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ সম্পর্কে মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, তাছাড়াও হাদীছটি যঈফ। এর সনদে ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ আছে। সে যয়ীফ রাবী। (পৃ.১৮৯)

এটা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য। ইয়াযীদের যঈফ হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস একমত হন নি। অনেকে তার ব্যাপারে উচ্চ প্রশংসাও করেছেন।

ইমাম মুসলিম তাকে মধ্যম সারির রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা যঈফও নয়, আবার খুব উচ্চমান সম্পন্নও নয়। ইজলী রহ. বলেছেন, ثقة جائز الحديث. বিশ্বস্ত ও তার হাদীস চলার মতো। আজুররী ইমাম আবূ দাউদের মন্তব্য এভাবে উল্লেখ করেছেন, ثبت لا اعلم احدا ترك حديثه وغيره احب الى তিনি মজবুত, কেউ তার হাদীস বর্জন করেছেন বলে আমি জানি না। তবে তাঁর চেয়ে অন্যরা আমার বেশী পছন্দের। জারীর রহ. ও আহমদ র. বলেছেন, আতা ইবনুস সাইব ও লায়ছ ইবনে আবূ সুলায়মের তুলনায় তার হাদীস বেশী সঠিক হতো। ইবনে সা'দ বলেছেন,

كان ثقة فى نفسه الا انه اختلط فى اخر عمره فجاء بالعجائب

তিনি মূলত বিশ্বস্ত, তবে শেষ কালে তার হাদীস ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি অবাক লাগার মতো কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান তাকে ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনে শাহীন তার ছিকাত গ্রন্থে আহমাদ ইবনে সালেহ মিসরী'র এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, يزيد ثقة لايعجبنى قول من يتكلم فيه ইয়াযীদ বিশ্বস্ত, যারা তার সমালোচনা করেছেন তাদের কথা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। ইমাম বুখারী তার তারীখে কাবীরে তার জীবনী উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রশংসা ছাড়া বিরূপ কোন মন্তব্য উল্লেখ করেন নি। ইমাম তিরমিযী তার ইলালে কাবীরে ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, صدوق الا انه تغير باخره ইয়াযীদ সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ, তবে শেষ জীবনে তার স্মৃতিতে পরিবর্তন এসেছিল। (পৃ.৩৯১) ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (মৃত্যু ২৭৭ হি.) তার আল মা'রিফা ওয়াত তারীখ গ্রন্থে বলেছেন,

ورأيت فى كتاب يحيي بن معين قال حديث البراء ان النبى صالله عليه وسلم كان يرفع يديه ليس هو بصحيح الاسناد. وظننت ان الذى حكى لم يضبط كلام يحيي لان يزيد بن ابى زياد وان كان قد تكلم االناس فيه لتغيره

فى اخر عمره فهو على العدالة والثقة وان لم يكن مثل منصور والحكم والاعمش فهو مقبول القول ثقة اه

অর্থাৎ আমি ইয়াহয়া ইবনে মাঈনের কিতাবে দেখলাম, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রফয়ে ইয়াদাইন প্রসঙ্গে বারা রা. এর হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, এটির সনদ সহীহ নয়। আমার যতটুকু ধারণা যিনি ইয়াহয়া'র বক্তব্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি তা সঠিকভাবে করতে পারেন নি। কেননা ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ সম্পর্কে যদিও অনেকে শেষ জীবনে তার স্মৃতিতে পরিবর্তন ঘটার কারণে আপত্তি তুলেছেন, তথাপি তিনি ন্যায়পরায়নতা ও বিশ্বস্ততার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও তিনি মানসূর, হাকাম ও আ'মাশের মতো (উচ্চ মানের) ছিলেন না। কিন্তু তার কথা গ্রহণযোগ্য ছিল এবং তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। (৩/৮১)

ইমাম তিরমিযী ইয়াযীদের একাধিক হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, এবং টীকায় আলবানী সাহেব এর অনেকগুলোকে সহীহ বলেছেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইমাম তিরমিযীর নিকটও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। হাদীসগুলির শুধু নম্বর তুলে ধরা হলো। ১১৪, ২৩৯৩, ৩৭৬৮।

ইমাম আহমাদ, দারাকুতনী ও ইবনুল কাত্তান ঐ বাড়তি অংশটুকু বাদ দিয়ে ইয়াযীদের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এতেও তো বোঝা যায়, ইয়াযীদ তাদের দৃষ্টিতে এমন মানের ছিলেন যার হাদীসকে সহীহ বলা যায়।

চার নম্বরে উক্ত লেখক লিখেছেন, আবু সুফিয়ান আমাদের কাছে উক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি প্রথমবার দুইহাত উত্তোলন করেছেন। তাদের কেউ বলেন, মাত্র একবার। (আবূ দাউদ, হাদীস নং ৭৪১)

এরপর লেখক মন্তব্য করেছেন, একবার আমল করা যে কূফার আমল তা সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) এর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। যা পূর্বের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতেম এ সংক্রান্ত বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাছাড়া কারো ব্যক্তিগত আমল শরীয়তের দলীল হতে পারে না। (পৃ. ১৮৯)

লেখক আবু দাউদের কথা বোঝেন নি। এখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, শারীক যে সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেই একই সনদে সুফিয়ান ছাওরীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণিত শব্দ ছিল, তিনি প্রথমবার দুই হাত উত্তোলন করেছেন। কিন্তু লেখক এটাকে সুফিয়ান ছাওরীর বক্তব্য বানিয়েছেন। তাছাড়া তিনি যে ব্যক্তিগত আমলের কথা বলেছেন সে কথাও ঠিক নয়। কারণ এখানে কারো ব্যক্তিগত আমলের কথা বলা হয় নি। বরং ইবনে মাসউদ রা. এর আমলের কথা বলা হয়েছে, যে আমলের মাধ্যমে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল তুলে ধরেছেন।

আর এখানে লেখক আবূ সুফিয়ান কোথায় পেলেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। সহীহ তরজমা হবে সুফিয়ান। এমনিভাবে তিনি বলেছেন 'ইবনু আবী হাতেম', সঠিক কথা হবে আবূ হাতেম। লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত ৬৮০ নং টীকাটি ভাল করে দেখলেই এটা পরিস্কার ধরা পড়বে।

বুখারী ও আবূ হাতেম প্রত্যাখ্যান করেছেন এ কথাটা না বলে টীকায় উদ্ধৃত আরবী অংশের তরজমা উল্লেখ করাই সমুচিত হতো যে, বুখারী ও আবূ হাতেম এ ভুলের (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসে যে বলা হয়েছে প্রথম তাকবীরের পর আর কখনো হাত তুলেন নি এর) দায় চাপিয়েছেন সুফিয়ানের উপর। কিন্তু টীকাটি যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে সেখানের পুরো কথাটি উল্লেখ করা হয় নি। সেখানে এরপর বলা হয়েছে,

وابن القطان وغيره يجعلون الوهم فيه من وكيع وهذا اختلاف يؤدى الى طرح القولين والرجوع الى صحة الحديث لوروده عن الثقات (نصب الراية ٣٩٦/١)

অর্থাৎ আর ইবনুল কাত্তান প্রমুখ এ ভুলের দায় চাপিয়েছেন ওয়াকী'র উপর। তাই এ মতানৈক্যই বলে দেয় উভয় মতকেই পরিহার করতে এবং হাদীসটির বিশুদ্ধতা মেনে নিতে, কেননা হাদীসটি বিশ্বস্ত রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে । (নাসবুর রায়াহ, ১/৩৯৬)

৬ নং হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর তুলতেন না।

এর উপর মন্তব্য করে লেখক লিখেছেন, ইমাম বায়হাকী ও হাকেম বলেন, বর্ণনাটি বাতিল ও মিথ্যা।

কিন্তু কেন মিথ্যা আর কার কারণে বাতিল লেখক তা কিছুই বলেন নি। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বায়হাকী তার আল খিলাফিয়াত গ্রন্থে। এর বর্ণনাকারীগণ সকলে বিশ্বস্ত। মুগলতাঈ রহ. বলেছেন لا بأس بسنده এর সনদে কোন সমস্যা নেই। যেহেতু এটি ইবনে উমর রা. এর প্রসিদ্ধ বর্ণনার বিরোধী সে কারণেই হয়তো হাকেম ও বায়হাকী এটাকে বাতিল ও মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু আল্লামা আবেদ সিন্ধী রহ. বলেছেন,

قلت: تضعيف الحديث لايثبت بمجرد الحكم وانمايثبت ببيان وجوه الطعن وحديث ابن عمر هذا رجاله رجال الصحيح فما ارى له ضعفا بعد ذلك اللهم الا ان يكون الراوى عن مالك مطعونا. لكن الاصل العدم فهذا الحديث عندى صحيح لامحالة.

অর্থাৎ আমি বলবো, মন্তব্য করলেই একটি হাদীস দুর্বল প্রমাণিত হয় না। রাবীদের যেসব দোষক্রটি আছে তা উল্লেখ করার দ্বারাই কেবল তা প্রমাণিত হতে পারে। ইবনে উমর রা. এর এ হাদীসটির রাবীগণ বুখারী বা মুসলিমের রাবী। তাই এতে কোন দুর্বলতা আমি দেখছি না। হ্যাঁ, ইমাম মালেক থেকে যিনি এটি বর্ণনা করেছেন তিনি কোন দোষে অভিযুক্ত হলে হতেও পারেন। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তেমনটি না হওয়াই তো স্বাভাবিক। সুতরাং এ হাদীস নিঃসন্দেহে আমার দৃষ্টিতে সহীহ।

তিনি আরো বলেন,

وغاية ما يقال فيه : ان ابن عمر رأى النبى صلى الله عليه وسلم حينا يرفع فاخبر عن تلك الحالة واحيانا لايرفع واخبر عن تلك الحالة وليس فى كل من حديثيه ما يفيد الدوام والاستمرار على شئ معين منهما فلا سبيل الى تضعيفه فضلا عن وضعه والله اعلم.

অর্থাৎ খুব বেশি হলে এমনটা বলা যায় যে, ইবনে উমর রা. কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রফয়ে ইয়াদাইন করতে

দেখেছেন। আর তা সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো দেখেছেন রফা না করতে। একথাও তিনি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। তার দুটি হাদীসের কোন একটিতেও সার্বক্ষণিকতা বোঝায় এমন কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং উক্ত হাদীসকে জাল বলা তো দূরের কথা, যঈফ বলারই সুযোগ নেই। (দ্র. ইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহুস সুনান, পৃ. ২৫২)

ইবনে উমর রা. যে এই হাদীসটি সত্যিই বর্ণনা করেছেন, তার অনেক প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে একটি প্রমাণ লেখক ৭ নম্বরে উল্লেখ করেছেন। সেখানে উল্লেখ আছে যে, মুজাহিদ বলেন, আমি ইবনু উমর (রা.) এর পিছনে ছালাত আদায় করলাম। তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া আর রাফউল ইয়াদায়ন করলেন না। (তাহাবী, হাদীস নং ১৩৫৭)

এরপর লেখক মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবূ বকর ইবনু আইয়াশ নামে একজন রাবী আছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। এরপর টীকায় ৬৮৭ নম্বরে লিখেছেন, বায়হাকী, মারেফাতুস সুনান হাদীস ৮৩৭ এর বিশ্লেষণ দ্রঃ

وقد تكلم فى حديث ابى بكر بن عياش محمد بن اسماعيل البخارى وغيره من الحفاظ

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

১. বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। তার মানে আবূ বকর ইবনে আইয়াশকে কেউ বিশ্বস্ত বলেন নি। অথচ এটা চরম ধোঁকা। আবু বকর থেকে ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীতে একাধিক হাদীস প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। আবূ বকরের প্রশংসা করেছেন ছাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইবনে মাহদী। এছাড়া আহমদ, ইবনে মাঈন, ইবনে সা'দ, ইজলী, ইবনে হিব্বান, যাহাবী ও ইবনে হাজার প্রমুখ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবনে আদী তার সকল হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের পর মন্তব্য করেছেন,

وهو فى روايته عن كل من روى عنه لا بأس به وذلك انى لم اجد له حديثا منكرا اذا روى عنه ثقة.

অর্থাৎ সকল উস্তাদ থেকেই তার বর্ণনা সঠিক আছে। কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা তার সূত্রে যেসকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে আমি কোন আপত্তিকর বর্ণনা পাই নি। এছাড়া ইমাম তিরমিযী তার একাধিক হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং আলবানী সাহেবও টীকায় সেগুলিকে সহীহ বলেছেন সেগুলোর নম্বর যথাক্রমে ২৫৮, ৪৫৩, ৪৫৬, ৫৯৩, ১২০৮, ৩৪৮২।

২. বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন– এটা লেখক কোথায় পেলেন তাও বলেন নি। শুধু টীকায় বরাত দিয়েছেন বায়হাকীর মা'রিফাতুস সুনানের। বায়হাকীর উক্ত গ্রন্থে এমন কোন কথা নেই। আবার আরবী যে কথাটি উল্লেখ করেছেন (যার অর্থ হলো- আবূ বকরের এ হাদীসটি সম্পর্কে বুখারী ও অন্যান্য হাফেজে হাদীস আপত্তি তুলেছেন) তাতেও আবূ বকরকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হয় নি। সমালোচনা করা হয়েছে তার এ বর্ণনাটির। সেটাও করেছেন বুখারী ও বায়হাকীসহ কেউ কেউ। ঢালাওভাবে বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস বলা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

অবশ্য আবূ বকর ইবনে আইয়াশ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, শেষ জীবনে তার স্মৃতিতে পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু এ ধরনের রাবীদের ব্যাপারে তো মুহাদ্দিসগনের সিদ্ধান্ত হলো– যারা তাদের প্রবীন ছাত্র এবং স্মৃতি পরিবর্তনের পূর্বে যারা তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাদের হাদীস সঠিক ও সহীহ বলে বিবেচিত হবে। আবূ বকরের প্রবীন ছাত্র হলেন আহমাদ ইবনে ইউনুস। এ কারণে ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে আহমাদ ইবনে ইউনুসের সুত্রে আবূ বকরের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোর নম্বর যথাক্রমে ১৭২২, ১৯৫৮, ৪৮৮৮, ৬৪৪৬, ৬৬৬৬। আমাদের আলোচ্য হাদীসটিও তাহাবী শরীফে এই সূত্রেই উদ্ধৃত হয়েছে।

এরপর লেখক বলেছেন, কেউ কেউ উক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে বলতে চেয়েছেন, ইবনু উমর (রা.) রাসূল (ছাঃ) এর মৃত্যুর পর রাফউল ইয়াদায়েন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত দাবি সঠিক নয়। কারণ অনেক ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু উমর (রা.) আজীবন রাফউল ইয়াদায়েন করে ছালাত আদায় করেছেন। সরাসরি বুখারী ও মুসলিমে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- নাফে (রাঃ) বলেন, ইবনু উমর (রা.) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকু করতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন,

যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন এবং যখন দুই রাকাতের পর দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত উত্তোলন করতেন। ইবনু উমর (রাঃ) এই বিষয়টিকে রাসূল (ছাঃ) এর দিকে সম্বোধন করেছেন।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

১. ইবনু উমর আজীবন রফউল ইয়াদায়ন করতেন তার দলীল হিসাবে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তাতে উক্ত দাবী প্রমাণিত হয় না। যদি "كان"শব্দটির কারণে এমনটি বুঝে থাকেন তাহলে তার জানা থাকা দরকার, হাদীসে এ শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে সাময়িকতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২. লেখক শেষ বাক্যে যে বলেছেন, ইবনু উমর (রা.) এই বিষয়টিকে রাসূল (ছাঃ) এর দিকে সম্বোধন করেছেন। সহীহ তরজমা হবে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছেন।

এরপর লেখক ইবনে উমর রা. আজীবনের আমলের দলিল হিসাবে ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক যারা রফয়ে ইয়াদাইন করে না তাদেরকে কংকর ছুড়ে মারার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

লেখক এখানে পাথর ছুড়ে মারার অর্থ করেছেন যা ঠিক নয়। পাথর ছুড়ে মারলে মুসল্লির শরীর ক্ষতবিক্ষত হবে। এ হাদীসটি নাফে রহ. থেকে একমাত্র যায়দ ইবনে ওয়াকিদ বর্ণনা করেছেন। তিনি অবশ্য বিশ্বস্ত। তার বাড়ি ছিল দামেস্কে। মদীনায় নাফে'র অনেক ছাত্র ছিল, তাদের কারোর বর্ণনায় এটি আসে নি। এতেই অনুমিত হয়, হয়তো কদাচিৎ তিনি এমনটি করেছেন। বেশী বেশী করলে অন্য অনেকে তা বর্ণনা করতেন।

কিন্তু তাঁরও জানা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এমনটি করতেন না। অনেক সময় ছেড়েও দিয়েছেন। আর সেটাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলরূপে বর্ণনা করতেন এবং নিজেও আমল করে প্রকাশ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত জায়গায় রফা করতেন, সে সম্পর্কে অন্য সাহাবীগণের বর্ণনা আমরা তুলে ধরেছি। স্বয়ং ইবনে ইমর রা. থেকেও সাত রকম আমলের হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১. শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময়। এ হাদীস বায়হাকীর খিলাফিয়াত গ্রন্থের বরাতে একটু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এরই প্রমাণ হলো ইবনে উমর রা. এর শীর্ষ ছাত্র মুজাহিদ রহ. এর হাদীসটি। যদিও ইবনুল কায়্যিম রহ. বাদায়েউল ফাওয়াইদ গ্রন্থে (৩/৮৮) মুজাহিদের বর্ণনাটি সম্পর্কে ইমাম আহমদের এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন.

هذا خطأ نافع وسالم اعلم بحديث ابن عمر وان كان مجاهد اقدم فنافع اعلم منه.

অর্থাৎ এটা ভুল। নাফি'ও সালিম রহ. ইবনে উমর রা. এর হাদীস সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখতেন। যদিও মুজাহিদ তাদের তুলনায় প্রবীন। কিন্তু নাফি' অধিক জ্ঞাত।

কিন্তু যদি সমন্বয়ের পথ ধরে এভাবে বলা যায় যে, ইবনে উমর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বিভিন্নভাবে আমল করতে দেখেছেন, তাই নিজেও বিভিন্নরূপে আমল করতেন, তাহলে মুজাহিদের চাক্ষুস দেখাকে ভুল বলার প্রয়োজন হয় না। মুজাহিদ শুধু একা নন। মুয়াত্তা মুহাম্মদে ভিন্ন সনদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবান ইবনে সালিহ থেকে, তিনি আব্দুল আযীয ইবনে হাকীম রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه فى اول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك

আমি ইবনে উমর রা. কে নামাযের শুরুতে প্রথম তাকবীরের সময় কান বরাবর হাত তুলতে দেখেছি । এরপর আর কোথাও তিনি হাত তোলেন নি।

এ বর্ণনার একজন রাবী মুহাম্মদ ইবনে আবানকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। তবে ইমাম আহমাদ বলেছেন, তিনি মিথ্যা বলতেন না। আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, তিনি মজবুত নন। তার হাদীস লেখা যাবে তবে প্রমান স্বরূপ পেশ করা যাবে না । ইবনে আদী আল কামিলে তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরে বলেছেন,

وله غير ماذكرت من الحديث وفى بعض ما يرويه نكرة لا يتابع عليه ومع ضعفه يكتب حديثه

অর্থাৎ আমি যা উল্লেখ করলাম, এ ছাড়াও তার অনেক হাদীস রয়েছে। তার বর্ণিত কিছু কিছু হাদীস সম্পর্কে সামান্য আপত্তি রয়েছে. তবে দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যাবে।

এ ধরনের দুর্বল রাবীর বর্ণনা অন্য আরেকটি বর্ণনার সমর্থকরূপে গ্রহণ করা মুহাদ্দিসগনের স্বীকৃত নীতি। দারাকুতনী রহ. দুই জায়গায় তার বর্ণনাকে সমর্থকরূপে উদ্ধৃত করেছেন। এর একটি সামনে হযরত আলী রা. এর হাদীসে আসছে। অপরটি সুনানে দারাকুতনীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর তাশাহহুদ সংক্রান্ত হাদীসের আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। (১/৩৫২)

সুতরাং পূর্বের মজবুত ও সহীহ সনদের হাদীসটির সঙ্গে এ বর্ণনাটিকে মেলালে ইবনে উমর রা. এর আমলটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তাই এটাকে ভুল বলার সুযোগ নেই।

২. দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম মালেক রাহ. তার মুয়াত্তা গ্রন্থে সরাসরি সালিমের সূত্রে তদীয় পিতা ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে মাত্র দু'বার রফা করার কথা এসেছে। হাদীসটি এইঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকু থেকে উঠতেন তখনো অনুরূপভাবে হাত তুলতেন এবং বলতেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হামদ। (মুয়াত্তা মালেক, ১৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ২৫১৭)

আমরা হারামাইন শরীফাইনে অনেককে এভাবে আমল করতে দেখেছি।

৩. তৃতীয় হাদীসটিতে তিন জায়গায় রফার কথা এসেছে। প্রথম তাকবীরের সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময়। এটা প্রসিদ্ধ সব হাদীসের কিতাবেই উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম শাফেঈ, আহমাদ এটাকেই সুন্নত বলেছেন।

৪. চতুর্থ হাদীসটিতে চার জায়গায় রফার কথা এসেছে। উপরের হাদীসের তিন জায়গা, আর চতুর্থ জায়গা হলো দুই রাকাত পড়ে ওঠার পর। এটা তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে। এ হাদীসটি নাফি' রহ. ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এটি সম্পর্কিত করেছেন। (বুখারী ৭৩৯, আব্দুর রাযযাক, ৭৪৩) এছাড়া মুহারিব ইবনে দিছার (নাসাঈ কুবরা, ১১০৬) ও সালিম রহ. (মুশকিলুল আছার ৫৮৩০) ইবনে উমর রা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫. পঞ্চম হাদীসটি থেকে পাওয়া যায়, সেজদায় যাওয়ার সময়ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফা করতেন। সে হিসাবে পাঁচ জায়গায় রফা করা প্রমাণিত হয়। এ হাদীসটি ইবনে উমর থেকে তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থে এই শব্দে উল্লেখ করেছেন, وعند التكبير حين يهوى ساجدا অর্থাৎ যখন তিনি সিজদায় যাওয়ার জন্য তাকবীর দিতেন, তখনও রফা করতেন। হায়ছামী মাজমাউয যাওয়াইদে এটি উল্লেখ করে বলেছেন, واسناده صحيحএর সনদ সহীহ। (২/১০২) তাছাড়া ইমাম বুখারী রহ. তার জুযউ রাফইল ইয়াদাইনে নাফি'র সূত্রে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

عن النبي صلى لله عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا ركع واذا سجد.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন ও সেজদা করতেন তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (পৃ.২৬)

৬. ছয় নম্বর হাদীসটি বর্ণনা করছেন আব্দুল আ'লা রাহ. উবায়দুল্লাহ থেকে তিনি নাফি'র সূত্রে ইবনে উমর রা. থেকে,

انه كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

অর্থাৎ ইবনে উমর (নামাযে) প্রত্যেক ওঠা-নামার সময়, রুকু ও সেজদার সময়, দাঁড়ানোর সময় ও দুই সেজদার মাঝে বসার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন এবং বলতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমনটি করতেন। তাহাবী, মুশকিলুল আছার (৫৮৩১)

উল্লেখ্য এ হাদীসটির সনদ সহীহ। শুআয়ব আরনাউত বলেছেন, رجاله ثقات رجال الشيخين এর রাবীগন বিশ্বস্ত , বুখারী ও মুসলিম শরীফের রাবী। তবে এরপর শুআয়ব যে বলেছেন لكن هذه الرواية شاذة كما سيذكر المؤلف তবে এটি শায বা বিচ্ছিন্ন বর্ণনা, যেমনটি একটু পরেই গ্রন্থকার বলেছেন। এটি আসলে শুআয়বের ভুল বুঝাবুঝি। ইমাম তাহাবী আসলে বলেছেন وكان هذا الحديث من رواية نافع شادّا لما رواه عبيد الله অর্থাৎ নাফি'র এ বর্ণনাটি উবায়দুল্লাহর পূর্বোক্ত বর্ণনাকে আরো শক্তিশালী করে। এই شادا শব্দটি (দাল অক্ষরে) শুআয়বের সম্পাদনায় মুদ্রিত কপিতে "شاذا"(যাল অক্ষরে) ছাপা হয়েছে। পূর্বাপর বক্তব্য চিন্তা করলে এ ভুলটি পরিস্কার ধরা পড়ে।

ইবনে উমর রা. এর এই শেষোক্ত বর্ণনাটিকে ইবনে হাযম জাহিরীও সহীহ বলেছেন। আলবানী সাহেবও এসব জায়গায় রফা করাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন এবং এই বর্ণনাকে সহীহও আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র. সিফাতুস সালাহ, পৃ. ১৫১, ১৫৪) সুতরাং যারা তিন বা চার জায়গায় রফা করাকে সুন্নত বলেন, এসব সহীহ হাদীস তাদের বিপক্ষে যায় কি না সেটা তাদেরকে ভাবতেই হবে।

এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ইবনে উমর রা. যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন স্থানে রফা করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিজে আমলও করেছেন তদনুরূপ। তাই একবার রফা করার হাদীসকে ফেলে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। বুখারী শরীফসহ অনেক হাদীস গ্রন্থে ইবনে উমর রা.এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, ولا يرفع بين السجدتين অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সেজদার

মাঝে রফা করতেন না। কিন্তু এত জোর দিয়ে বলা কথাও দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কারণ ইবনে উমর নিজে ও তার ছাত্র নাফি' রহ. দুই সেজদার মাঝে রফা করতেন। একইভাবে আনাস রা., ইবনে সীরীন, তাউস, হাসান বসরী ও আইয়ূব সাখতিয়ানী প্রমুখও দুই সেজদার মাঝে রফা করতেন বলে মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বায় সহীহ সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। আছরম স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমাদেরও অনুরূপ আমলের উল্লেখ করেছেন। আলবানী সাহেবও এসবের বিশুদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন। তদুপরি মালেক ইবনুল হুওয়ায়রিছ রা. এর হাদীস তো নাসাঈ শরীফে সহীহ সনদে এসেছে, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুই সেজদার মাঝে রফা করতেন সেকথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একবার রফা করার হাদীসগুলোর উপর যারা আমল করে তাদের উপর এত ক্ষিপ্ত হওয়ার কী আছে।

এরপর লেখক ৮ নং থেকে ১১ নং পর্যন্ত কিছু জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন, আমাদের জানামতে কোন হানাফী আলেম এগুলো দলিল হিসাবে পেশ করে না । লেখক হয়ত হানাফীদের উপর আরোপিত জাল হাদীসের ফিরিস্তি দীর্ঘ করার মতলবে এগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন। কিন্তু টোকাইয়ের মতো রাস্তা-ঘাট থেকে এমন জাল হাদীস একত্রিত করলে আমরাও তাদের অনেক জাল হাদীস জমা করতে পারবো। তারা চাইলে ভবিষ্যতে এগুলো জমা করার ইচ্ছা রইলো।

১২ নম্বরে তিনি ইমাম আবূ হানীফার মুসনাদ এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা বর্ণনা করেছেন হাম্মাদের সূত্রে ইবরাহীম নাখাঈ থেকে, তিনি আসওয়াদের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বলেছেন, তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন। অতঃপর আর হাত তুলতেন না। তিনি এ আমলটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেও উল্লেখ করতেন।

এরপর লেখক মন্তব্য লিখেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। সুতরাং এই বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া এই বর্ণনা অনেক ত্রুটিপূর্ণ। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নামে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, মুহাদ্দিসগন সেগুলোর ব্যাপারে অনেক আপত্তি তুলেছেন।

এ সম্পর্কে আমরাও পিছনে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। এ বর্ণনাটির দ্বারা তা আরো অধিক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

ইমাম আবূ হানীফার বর্ণনাগুলির ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের যদি অনেক আপত্তি থাকে তবে সেগুলি কি? লেখক টীকায় আলবানী সাহেবের ইরওয়া গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। সেখানে যা আছে তার সারাংশ হলো অনেক মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফাকে বা তার হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু এটা তো একটি আপত্তি, অনেক আপত্তি কোথায়?

ইমাম আবূ হানীফা রহ.কে কোন কোন মুহাদ্দিস যঈফ বলেছেন? কেন বলেছেন? সে প্রসঙ্গ যেহেতু লেখক চাপা দিয়ে গেছেন, তাই সে প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। শুধু এতটুকু বলবো, যারা যঈফ বলেছেন তাদের চেয়ে ঢের বেশী সংখ্যক হাদীসের ইমাম তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

এরপর জ্ঞাতব্য শিরোনামে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযায়ীর একটি বিতর্ক (রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে)– উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, এটা চরম মিথ্যাচার। এরপর লা-মাযহাবী আলেম উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, তিনিও বলেছেন, এটি একটি বানোয়াট গল্প ও অভিনব মিথ্যাচার।

কি আশ্চর্য! এটি একটি ঘটনা, যা মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফায় হারিছী উল্লেখ করেছেন। এটি চরম মিথ্যাচার হলো কিভাবে? মুসনাদটির সংকলক হারিছী সম্পর্কে যাহাবী তার সিয়ার গ্রন্থে বলেছেন,

الشيخ الامام الفقيه العلامة عالم ماوراء النهر ابو محمد الاستاذ

অর্থাৎ আশ শায়খ আল ইমাম আল ফাকীহ আল আল্লামা, মা ওয়াউন নাহার এলাকার আলেম আবূ মুহাম্মদ আল উসতায।

তার বিশ্বস্ততা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে, তবে যাহাবী রহ. বলেছেন, وكان

ابن منده يحسن القول فيه. অর্থাৎ (মুহাদ্দিস) ইবনে মানদাহ রহ. তার ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করতেন।

এ ঘটনাটি তিনি সনদ ও সূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে যিয়াদ থেকে। দারাকুতনী,

হাকেম আবু আহমাদ প্রমুখ তাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী তার তারীখুল ইসলামে (নং ১২৩) ও ইবনে হাজার তার লিসানে দারাকুতনীর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদীস জাল করতেন। কিন্তু দারাকুতনীর কোন গ্রন্থে আমরা একথা পাই নি। এর সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। এদিকে বড় বড় মুহাদ্দিস তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন বা নিজেদের কিতাবে তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি। ইমাম তাহাবী মুশকিলুল আছার গ্রন্থে (নং ৫৮৪৬) তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাম্মাম তার ফাওয়াইদ গ্রন্থে (নং ৮০০, ৮০১, ৯৩০, ১১৩৪, ১১৯২) তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। আবু নুআইম ইসপাহানী তার হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন তার আত তিব্বুন নাবাবী গ্রন্থে (নং ১৪৭) ও তাছবীতুল ইমামাহ ওয়া তারতীবুল খিলাফাহ গ্রন্থে (নং ৮৮)। এছাড়াও তিনি তার হিলয়াতুল আউলিয়া ও ফাযাইলুল খুলাফা আর রাশিদীন গ্রন্থদ্বয়ের একাধিক স্থানে, সিফাতুল জান্নাহ গ্রন্থে এক স্থানে ও আল মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম গ্রন্থে (নং ৩১৩৫) তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। শিহাব কুযাঈ রহ.ও তার মুসনাদে (নং ৪৬) তার হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। একইভাবে বায়হাকী রহ. সুনানে কুবরা গ্রন্থে (নং ১৪৪৯২), তাঁর আল ইতিকাদ গ্রন্থে (১/৩৬৮) ও শুআবুল ঈমান গ্রন্থে (নং ৪০৪৮, ৪৬৫৬) তার হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। ইবনে আব্দুল বার রহ. তার জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী গ্রন্থে (নং ১৯৯৮) তার হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। তাবারানী রহ. তার মুজামে কাবীরে দুটি হাদীস (নং ১১৯৫২, ১৩৮৬৩) ও মুজামে সাগীরে একটি হাদীস (নং ৯৭৫) ও আওসাত গ্রন্থে বারটি হাদীস (নং ৬৮৭৫-৬৮৮৮) উদ্ধৃত করেছেন। আওসাতে তিনি বর্ণনাকারীদের বিভিন্নজন সম্পর্কে কথা বললেও কোথাও এই রাবী সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। এছাড়া হাকেম রহ. তার মুসতাদরাকে (নং ২৩১৮) ও জাওযাকানী তার আল আবাতীল ওয়াল মানাকীর ওয়াস সিহাহ ওয়াল মাশাহীর গ্রন্থে (৩৪৪) তর হাদীসকে সমর্থক ও সাক্ষী বর্ণনারূপে পেশ করেছেন। সুতরাং তার হাদীসকে জাল বা বানোয়াট বলা মুশকিল।

তার উস্তাদ সুলায়মান ইবনে দাউদ শাযাকুনী। তার বিশ্বস্ততা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। তবে ইবনে আদী তার সম্পর্কে লিখেছেন,

وللشاذكوني حديث كثير مستقيم ، وَهو من الحفاظ المعدودين من حفاظ البصرة ، وَهو أحد من يضم إلى يَحْيى وأحمد وعلي وأنكر ما رأيت هذه الأحاديث التي ذكرتها بعضها مناكير وبعضها سرقة وما أشبه صورة أمره بما قال عبدان إنه ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فيغلط وإنما أتى من هناك يشتبه عليه فلجرأته واقتداره على الحفظ يمر على الحديث لا أنه يتعمده

অর্থাৎ শাযাকুনীর অনেক সঠিক বর্ণনা রয়েছে। তিনি বসরায় হাদীসের হাফেজদের একজন। তাকে ইয়াহয়া ইবনে মাঈন, আহমদ ইবনে হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার সবচেয়ে আপত্তিকর বর্ণনাসমূহ এগুলোই যা আমি তুলে ধরলাম। এর মধ্যে কিছু আছে আপত্তিকর, আর কিছু আছে অন্যদের হাদীস নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া। তার অবস্থার সবচেয়ে সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন আবদান রহ. যে, তার কিতাব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে স্মৃতির উপর নির্ভর করে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন, আর এতেই তার ভুল হতো। এভাবে কোন হাদীস নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলেও তিনি তার দুঃসাহসিকতা ও স্মৃতিশক্তির জোরে সেটি বর্ণনা করেই যেতেন। তিনি যে মিথ্যা বলতেন তা নয়।

আর যাহাবী রহ. সিয়ার গ্রন্থে (১৭৮৮) বলেছেন, ومع ضعفه لم يكد يوجد له حديث ساقط بخلاف ابن حميد فإنه ذو مناكير

অর্থাৎ তিনি দুর্বল হলেও তার ফেলে দেওয়ার মতো কোন হাদীস পাওয়া যায় নি বললেই চলে। পক্ষান্তরে (মুহাম্মদ) ইবনে হুমায়দ, তার অনেক আপত্তিকর বর্ণনা রয়েছে।

এই শাযাকুনী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. থেকে। তিনি তো প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত। সকলেরই সেটা জানা। সুতরাং ঘটনাটিকে খুব বেশি হলে যঈফ বলা যেতে পারে। লেখক কেন চরম মিথ্যাচার বলে মনের খেদ ঝাড়লেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তাছাড়া বর্ণিত ঘটনাটি ইতিহাস সংক্রান্ত একটি বিষয়। আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে হাদীসবিদগণ কড়াকড়ি না করে ছাড় দিয়েছেন। (দ্র.

হাকেম, আল মুসতাদরাক, হা. ১৮০১) সুতরাং হাদীসের রাবীদের ক্ষেত্রে অবলম্বিত কড়াকড়ি এখানে কাম্য নয়।

১৩ নম্বরে লেখক হযরত আলী রা. এর আমল সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সারমর্ম হলো তিনি প্রথম তাকবীরের সময় শুধু হাত তুলতেন। পরে আর তুলতেন না।

এরপর লেখক মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল। মুহাদ্দিস উছমান দারেমী বলেন, আলী রা.এর নামে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী বলেন, আলী সম্পর্কে এই ধারণা সঠিক নয় যে, তিনি রাসূল সা. এর কর্মের উপর নিজের কর্ম প্রাধান্য দিয়েছেন। বরং এর রাবী আবু বকর নাহশালীই দুর্বল। কারণ সে এমন রাবী নয় যে, যার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় এবং কোন সুন্নাত সাব্যস্ত হয়। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, আলী, ইবনে মাসউদ এবং তাদের থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা ছালাতের শুরুতে ছাড়া রাফউল ইয়াদায়ন করতেন না মর্মে যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক নয়।

এ হলো লেখকের অন্ধ অনুকরণের আরেক দৃষ্টান্ত। এ হাদীসটির বর্ণনাকারী সকলেই মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত। আবু বকর নাহশালীকেও প্রায় সকল মুহাদ্দিস বিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম মুসলিম তার হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন, من ثقات مشيخة الكوفة কুফার বিশ্বস্ত শায়েখদের একজন। ইবনে মাঈন, আহমদ, আবু দাউদ, ইজলী, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান ও দারাকুতনী সকলেই তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবনে হিব্বান মাজরুহীন গ্রন্থে তার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলে যাহাবী রহ. তার তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে বলেছেন, دع عنك الخطابة فالرجل حجة قد وثقه إماما الفن واحتج به مسلم অর্থাৎ আপনার লেকচার ছাড়ুন, এই রাবী প্রমাণযোগ্য, তাকে শাস্ত্রের দুই ইমাম (ইবনে মাঈন ও আহমদ) বিশ্বস্ত বলেছেন, এবং ইমাম মুসলিম তার হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। (নং ৪৬১) কাশিফ গ্রন্থেও যাহাবী তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আলবানী সাহেব বহু জায়গায় তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইরওয়া গ্রন্থে (হাদীস ১৬৩৭) বলেছেন, নাহশালী বিশ্বস্ত, মুসলিমের রাবী।

লেখক বায়হাকীর বরাতে তাকে যে দুর্বল বলেছেন সেটা আসলে বায়হাকীর নয়। উছমান দারিমীরই বক্তব্য। বায়হাকী তার সুনানে কুবরায় নাহশালীর একাধিক হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং বায়হাকী নাহশালীকে দুর্বল বলতে পারেন না।

আরেকটি কথা, নাহশালী থেকে এ হাদীস তার এক ছাত্র আব্দুর রহীম ইবনে সুলায়মান মারফূরূপে অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করেছেন। তার উপর মন্তব্য করে দারাকুতনী রহ. তার ইলাল গ্রন্থে (নং ৪৫৭) লিখেছেন,

وَوَهِم فِي رَفعِهِ. وَخالَفَهُ جَماعَةٌ مِن الثِّقاتِ ، مِنهُم : عَبد الرَّحمَنِ بن مَهدِيٍّ ، ومُوسَى بن داؤد ، وأَحمَد بن يُونُس ، وغَيرُهُم ، عَن عاصِمٍ ، فَرَوُوهُ عَن أَبِي بَكرٍ النَّهشَلِيِّ مَوقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ ، وهُو الصَّوابُ. وَكَذَلِك رَواهُ مُحَمد بن أَبان ، عَن عاصِمٍ مَوقُوفًا.

অর্থাৎ মারফূ (রাসূল সা. এর দিকে সম্পর্কিত) রূপে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি (আব্দুর রহীম) ভুলের শিকার হয়েছেন। বিশ্বস্তদের এক জামাত তার বিরোধিতা করেছেন। তন্মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী, মূসা ইবনে দাউদ, আহমদ ইবনে ইউনুস প্রমুখ রয়েছেন, তারা আবু বকর নাহশালী থেকে আসিমের সূত্রেই এটি হযরত আলী রা. থেকে মাওকুফরূপে (অর্থাৎ তাঁরই আমলরূপে) বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক বর্ণনা। একইভাবে মুহাম্মদ ইবনে আবানও আসেম থেকে মাওকুফরূপে এটি বর্ণনা করেছেন।

দেখুন, দারাকুতনী রহ. তো হযরত আলী রা.এর আমল হিসাবে এ বর্ণনাকে সঠিক ও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা বলেন, এটা আলী রা. এর নামে মিথ্যাচার!!

উল্লেখ্য, দারাকুতনী শেষ বাক্যে মুহাম্মদ ইবনে আবানের বর্ণনাটিকে সমর্থক ও সাক্ষী বর্ণনারূপে পেশ করেছেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ তার মুয়াত্তা গ্রন্থে পেশ করেছেন। মূল বক্তব্যে উভয় বর্ণনা এক ও অভিন্ন। সুতরাং উছমান দারিমীর একথাও আর টিকল না যে, নাহশালী একাই এভাবে বর্ণনা করেছেন।

বাকি রইল উছমান দারিমীর একথা যে, আলী রা. সম্পর্কে এ ধারণা সঠিক নয় যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মের উপর নিজের কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এটা একটা খোঁড়া যুক্তি। কারণ সহীহ সনদে আলী রা.এর উক্ত আমল প্রমাণিত থাকাই নির্দেশ করে যে, তিনি ও অন্যান্য অনেক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক স্থানে রফয়ে ইয়াদাইনের যে কথা বর্ণনা করেছেন সেটা হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো করেছেন। অথবা প্রথম জীবনে করলেও শেষ দিকে ছেড়ে দিয়েছেন। এ সমন্বয়ের দিকে ঝুঁকেই ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. তার আল ইমাম গ্রন্থে দারিমীর বক্তব্যকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র. নায়লুল ফারকাদাইন, পৃ. ১৩০) আর ইমাম শাফিঈ রহ. যা বলেছেন এটা তার নিজস্ব বক্তব্য ও তাহকীক। সবাইকে তা মেনে নিতে হবে বিষয়টি এমন নয়। তার চেয়ে বড়দের থেকে তো এর বিপরীত বক্তব্যও রয়েছে।

১৪ নম্বরে লেখক উদ্ধৃত করেছেন যে, আবু ইসহাক বলেন, আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ও আলী রা. এর সাথীরা কেউই সালাতের শুরুতে ছাড়া তাদের হাত উঠাতেন না। ওয়াকী বলেন, তারা আর হাত উঠাতেন না।

এরপর লেখকের মন্তব্য হলো, উক্ত বর্ণনাও মুনকার। কারণ ইবনু মাসউদ রা. এর পক্ষে কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও আলী রা. সম্পর্কে রাফউল ইয়াদায়েন করার স্পষ্ট ছহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং উপরের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এ যেন লেখকের মুখস্থ কথা। এ নম্বরে তিনি উক্ত দুই সাহাবীর সাথীদের কথা লিখেছেন। তাহলে সাথীদের আমলের দায় তাদের উপর বর্তাবে কেন? আসলে এখানে সাথীরা অর্থই ভুল। সহীহ হবে শিষ্যরা। আর শিষ্যদের আমল দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ইবনে মাসউদ ও আলী রা.এর আমলও ছিল তদনুরূপ। কারণ ঐ যুগের শিষ্যরা উস্তাদের টু-কপি ছিল।

লেখক যে বলেছেন, আলী রা. সম্পর্কে রাফউল ইয়াদায়ন করার স্পষ্ট সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কথাটি এভাবে বলা ঠিক হয়নি। এতে পাঠক মনে করবে আলী রা. এর নিজস্ব আমল সম্পর্কে একথা বলা

হয়েছে। অথচ ব্যাপার আসলে তা নয়। বরং বলা উচিৎ ছিল, আলী রা. রাসূল সা. থেকে রাফউল ইয়াদায়ন করার হাদীস বর্ণনা করেছেন যা সহীহ সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। আর এ হাদীস ও তার জবাব পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।

এরপর লেখক বলেছেন, যারা উক্ত মিথ্যা বর্ণনার পক্ষে উকালতি করেন, তারা কি আলী রা.কে রাসূল (ছা.)এর অবাধ্য প্রমাণ করতে চান?

বুঝতে পারলাম না, মিথ্যা বর্ণনা কোনটি? লেখক মনে হয় আলী রা.এর আমল সম্পর্কিত পূর্বের হাদীসটির কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানে বলেছেন, নিতান্তই দুর্বল। আর এক পৃষ্ঠা পার না হতেই সেটা মিথ্যা হয়ে গেল!

হযরত আলী রা. সম্পর্কে কোন মুসলমানই তো রাসূল সা. এর অবাধ্য হওয়ার কল্পনা করতে পারে না। লেখকের মাথায় এটা ঢুকল কি করে? আমরা যে সুন্দর বিশ্লেষণ পেশ করেছি সেটা গ্রহণ করুন, দেখবেন তিনি রাসূল সা. এর অবাধ্য হওয়া প্রমাণিত হবে না।

এরপর লেখক ১৫ নম্বর হাদীস এভাবে উল্লেখ করেছেন, আসওয়াদ (রা:) বলেন, আমি উমর রা.কে একবার দুই হাত উত্তোলন করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি আর করতেন না। উল্লেখ্য যে, উক্ত মর্মে উমর রা.এর নামে আরো কিছু বর্ণনা এসেছে।

এ বর্ণনাটি সম্পর্কে লেখক মন্তব্য করেন যে, উক্ত বর্ণনা যঈফ। ইমাম হাকেম বলেন, বর্ণনাটি অপরিচিত। এর দ্বারা দলিল সাব্যস্ত করা যাবে না। যদিও ইমাম তাহাবী তাকে বিশুদ্ধ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইবনুল জাওযী তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলত উমর রা.এর নামে এ সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করাই মিথ্যাচার, কারণ উমর রা. রাফউল ইয়াদায়ন করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমর রা. বলেন, উমর রা. রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় রাফউল ইয়াদায়েন করতেন।

হাদীসটির অনুবাদ এভাবে হলে সুন্দর হতো, আসওয়াদ রহ. বলেন, আমি উমর রা.কে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত ওঠাতেন। পরে আর ওঠাতেন না। লেখক এ বর্ণনাটির সনদ যাচাই না করেই মুখস্থ

বলে দিয়েছেন এটি যঈফ। পরে হাকেম ও ইবনুল জাওযীর বক্তব্য পেশ করার পর মনের খেদ ঝেড়েছেন মিথ্যাচার বলে।

অথচ এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আবী শায়বা তার মুসান্নাফ গ্রন্থে (হাদীস নং ২৪৫৪), ইমাম তাহাবী তার মুশকিলুল আছার (১৫/৫০) ও তাহাবী শরীফে (হাদীস নং ১৩৬৪) ও ইবনুল মুনযির তার আল আওসাত গ্রন্থে (হাদীস নং ১৩৯১)। তিনজনই একই সূত্রে এটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ইয়াহয়া ইবনে আদম এটি বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি আব্দুল মালেক ইবনে আবজার থেকে, তিনি যুবায়র ইবনে আদী থেকে, তিনি ইবরাহীম (নাখাঈ) থেকে, তিনি আওয়াদ রহ. থেকে। এই ছয়জন বর্ণনাকারীর মধ্যে ইয়াহয়া ইবনে আদম, যুবায়র ইবনে আদী, ইবরাহীম ও আসওয়াদ চারজনই সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রাবী। আর হাসান ইবনে আইয়াশ ও আব্দুল মালেক ইবন আবজার (তার পুরো নাম আব্দুল মালেক ইবনে সাঈদ ইবনে হাইয়ান ইবনে আবজার) দুজনই সহীহ মুসলিমের রাবী। তাদের বিশ্বস্ততা নিয়েও কোন প্রশ্ন নেই। হাসান ইবনে আইয়াশকে ইবনে মাঈন, নাসায়ী, ইজলী, তাহাবী ও ইবনে মাকুলা প্রমুখ বিশ্বস্ত বলেছেন। আর ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন ও ইবনে খালফূন তাদের ছিকাত (বিশ্বস্ত রাবীচরিত) গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে আব্দুল মালেক ইবনে আবজারকে ইমাম আহমদ, ইবনে মাঈন, নাসায়ী, ইজলী, ইয়াকূব ইবনে সুফিয়ান ও যাহাবী প্রমুখ বিশ্বস্ত বলেছেন। আবু যুরআ ও আবু হাতেম তাকে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (বুখারী ও মুসলিমের রাবী) এর উপর অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া ইবনে হিব্বান, ইবনে শাহীন ও ইবনে খালফূনও তাকে ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজারও তাকরীব গ্রন্থে তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। এখন লেখক বলুক, এদের মধ্যে কে মিথ্যুক। কে বা মিথ্যাচার করেছেন? হাদীসের সংকলকগণ, না এর কোন রাবী?

আর তিনি যে বলেছেন, উমর রা. রাফউল ইয়াদায়েন করতেন মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এরপর বলেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, উমর (রাঃ) রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদায়েন করতেন।

লেখক এর বরাত দিয়েছেন, বায়হাকীর মা'রিফাতুস সুনান (লেখকের এখানে মাআরিফুস সুনান ছাপা হয়েছে, যা ভুল) ২/৪৭০ সনদ সহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৯৫।

এখানে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি, লেখক কর্তৃক বায়হাকীর উক্ত গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করা একটি প্রতারণা বৈ নয়। বায়হাকীর উক্ত গ্রন্থে এমন কথা নেই। আর তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থেও বায়হাকীর গ্রন্থের বরাত নেই। এটি বরং হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা যায়লাঈর নাসবুর রায়াহ থেকে তারা নিয়েছেন। কিন্তু সেটির বরাত তুহফাতুল আহওয়াযীতে দেওয়া হলেও লেখক তা এড়িয়ে গেছেন। আর নাসবুর রায়াহ গ্রন্থেও হাকেম বা বায়হাকীর কোন গ্রন্থের বরাত দেওয়া হয় নি।

আসলে হাকেমের বরাত দিয়ে যায়লাঈ কথাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন,

واعترضه الحاكم : بأن هذه رواية شاذة لا تقوم بها حجة ولا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في ا لركوع وعند الرفع منه.

অর্থাৎ হাকেম রহ. এর উপর আপত্তি তুলে বলেছেন, এ বর্ণনাটি শায বা দলবিচ্ছিন্ন। এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না। এবং সহীহ হাদীসসমূহের বিপরীতে এটা পেশও করা যায় না। তাউস ইবনে কায়সান হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমর রা. রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (নাসবুর রায়াহ, ১/৪০৫)

নাসবুর রায়াহ গ্রন্থে যেহেতু মূল গ্রন্থের বরাত নেই, তাই এ বক্তব্যটি মিলিয়ে দেখাও সম্ভব হয় নি। এর সনদ যাচাই করারও সুযোগ হয় নি। এ বক্তব্য ইবনুল মুলাক্কিনও তার আল বাদরুল মুনীর গ্রন্থে হাকেমের বরাত দিয়ে আরো গোলমেলে করে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনিও হাকেম বা বায়হাকীর কোন গ্রন্থের বরাত দেন নি। (দ্র. ৩/৫০০) এদিকে নাসবুর রায়ার সংক্ষিপ্ত রূপ আদ দিরায়া গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার হাকেমের এই বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ويعارضه رواية طاوس

عن ابن عمر كان يرفع يديه في التكبير وفي الركوع وعند الرفع منه অর্থাৎ এর বিপরীতে তাউস হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (১/১৫২) একইভাবে ইবনুল হুমামও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলেছেন, وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان عن ابن عمر كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه অর্থাৎ এর বিপরীতে হাকেম রহ. ইবনে উমর রা. থেকে তাউস ইবনে কায়সানের বর্ণনাটি পেশ করেছেন যে, তিনি রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (১/৩১১)

এ দুটি উদ্ধৃতিতে উমর রা. এর উল্লেখ নেই। তাই অনুমিত হয়, নাসবুর রায়া'র সংস্করণে ভুল আছে। উমর রা. নয়, ইবনে উমরের আমল দ্বারা হাকেম রহ. এটি খণ্ডন করতে চেয়েছেন। এ অনুমানটি আরো জোরদার হয় নীমাবী রহ.এর বক্তব্য দ্বারা। তিনি আছারুস সুনান গ্রন্থে বলেছেন, আমি নিজে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে নাসবুর রায়া'র বিশুদ্ধ কপিতে বক্তব্যটি এভাবে দেখেছি : عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه অর্থাৎ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। (পৃ. ১৩৬)

যদি ধরেও নিই, উমর রা. সম্পর্কেই হাকেম কথাটি বলেছেন, তথাপি এর সহীহ হওয়ার গ্যারান্টি কি? সনদ বা সূত্র যাচাইয়ের তো কোন উপায় নেই। হাকেম যে বলেছেন, 'সহীহ হাদীস সমূহের' এতটুকু কথায় কি এর সনদকে সহীহ বলা ঠিক হবে? হাকেম রহ. তার মুসতাদরাক গ্রন্থে বহু হাদীসকে সহীহ বলেছেন, অথচ যাহাবীসহ অনেকে সেগুলোকে জাল আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং শুধু হাকেমের কথার উপর নির্ভর করে এত জোর দেওয়া বিলকুল ঠিক নয়। পক্ষান্তরে আমরা উমর রা. এর যে আমলের কথা উল্লেখ করলাম সেটি একাধিক হাদীসগ্রন্থে সনদসহ বিদ্যমান আছে। আমরা এর সম্পর্কে রাবীদের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার বলিষ্ঠ প্রমাণ পেশ করেছি। সেই সঙ্গে মূল দলিলের আলোচনায়

কোন কোন মুহাদ্দিস ঐ হাদীসকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন তাও উল্লেখ করে দিয়েছি। এতে যে কেউ বুঝতে পারবেন হাদীসটি সহীহ।

আসলে হযরত উমর রা.এর মতো এমন মহান খলীফাতুল মুসলিমীন থেকে রফয়ে ইয়াদায়ন না করাটা প্রমাণিত হবে, এটা যেন লা-মাযহাবী বন্ধুদের কাছে বড্ড খারাপ লাগে। কিন্তু যতই খারাপ লাগুক, এটা সহীহ সনদে সন্দেহাতীতভাবে তার থেকে প্রমাণিত। দেখুন, বুখারী শরীফের প্রথম ভাষ্যকার ইবনে বাত্তাল রহ. (মৃত্যু ৪৪৯ হিজরী) তার ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন,

غير أنه يرجح القول بفعل الخليفتين بعد النبي ، عليه السلام ، عمر ، وعلى بن أبي طالب ، وإن كان قد اختلف فيه عن على ، فلم يختلف فيه عن عمر ،

অর্থাৎ তবে প্রথম মতটি (রফয়ে ইয়াদায়ন না করা) অগ্রগণ্যতা লাভ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাঁর দুই খলীফা উমর ও আলী ইবনে আবু তালিবের আমল দ্বারা। এ ব্যাপারে আলী রা. থেকে দুরকম বর্ণনা পাওয়া গেলেও উমর রা. থেকে ভিন্ন কোন বর্ণনা নেই। (২/৩৫৫)

১৬ নং দলিলে ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন মর্মে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখকের মন্তব্য হলো, বর্ণনাটি জাল। আলাউদ্দীন আল কাসানী (মৃত্যু ৫৮৮ হি.) তার বাদাইউছ ছানায়ে এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ছহীহ বুখারী ও আবু দাউদের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেউই কোন সূত্র উল্লেখ করেন নি। মূলত উক্ত বর্ণনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

আমাদের বক্তব্য হলো, কেউই যখন এর কোন সূত্র উল্লেখ করেন নি, তখন সূত্র না জানা পর্যন্ত কিসের ভিত্তিতে এটিকে জাল বলা হবে? সূত্র ছাড়াও যদি একটি হাদীসকে (বড় কোন হাদীসবিশেষজ্ঞের মন্তব্য ছাড়া) জাল ও বানোয়াট আখ্যা দেওয়া যায়, তবে হাকেম যে বলেছেন, বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন থেকে রফা করার হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

সেটি কেন জাল হবে না? তারও তো কোন সূত্র নেই। তাহলে কি লেখকের জাল হাদীস ধরার জালটি এমন যেখানে শুধু রফয়ে ইয়াদাইন না করার হাদীস ধরা পড়ে?

এরপর লেখক বলেছেন, ড. তাকীউদ্দীন বলেন, ولا عبرة بهذا الأثر ما لم يوجد سنده عند مهرة الفن مع ثبوت خلافه في كتب الحديث এই সনদে কোন উপদেশ নেই। কারণ এই বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের নিকটেই এই সনদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাছাড়া হাদীসের গ্রন্থসমূহে এর বিরোধী দলিলই বিদ্যমান। লেখক নীচে ৭২১ নম্বর দিয়ে টীকা লিখেছেন, মুওয়াত্ত্ব মালেক, তাহক্বীক, পৃ. ১৭৯।

এ হলো লেখকের ত্রুটিপূর্ণ গবেষণা ও অনুবাদের আরেক চিত্র। উদ্ধৃত বক্তব্যটুকু ড. সাহেবের নয়। বরং আব্দুল হক দেহলবী'র, যা তিনি সিফরুস সা'আদা গ্রন্থের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। উক্ত ভাষ্যগ্রন্থের বরাতে আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ নামে মুয়াত্তা মুহাম্মাদের ভাষ্যগ্রন্থে আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন। ড. সাহেব এই মুয়াত্তা মুহাম্মদ আরব থেকে ছেপেছেন তার নিজের সম্পাদনায়। তবে তিনি এর নাম দিয়েছেন মুয়াত্তা মালেক বি রিওয়াইতিল ইমাম মুহাম্মাদ।

এতো গেল এক প্রসঙ্গ। উদ্ধৃত অংশের অনুবাদে লেখক যে ভুল করেছেন তা বোঝাবার জন্য সঠিক অনুবাদ পেশ করাই বোধ করি সচেতন মহলের জন্য যথেষ্ট হবে। সঠিক অনুবাদ হলো, হাদীসশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত এর সনদ বা সূত্র পাওয়া না যাবে ততক্ষণ এ আছারটি গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু হাদীসগ্রন্থসমূহে এর বিপরীত তথ্যই প্রমাণিত রয়েছে।

এরপর লেখক ১৭ নং দলিল হিসাবে একটি হাদীস এনেছেন। হাদীসটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী সা. বলেছেন, সাতটি স্থানেই হাত উত্তোলন করা হয়, যখন সালাত শুরু করবে, যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কাবাঘর দেখবে, যখন সাফা ও মারওয়ার পাহাড়ে উঠবে। সূর্য ঢলে যাওয়ার পর মানুষের সঙ্গে যখন আরাফায় উকূফ করবে, মুজদালিফার ময়দানে এবং যখন পাথর মারবে দুই স্থানে (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায়)।

লেখক হাদীসটির উপর মন্তব্য করেছেন, বর্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল। এমনকি হিদায়ার ভাষ্যকার ইবনুল হুমামও তার বিরোধিতা করেছেন। যেমন,

لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ ، قال أيضا : فهم يعني أصحابنا خالفوا هذا الحديث في تكبيرات العيدين وتكبيرة القنوت

হাকাম মাকসাম থেকে মাত্র চার হাদীস শুনেছে। সেগুলোর মধ্যেও এটি নেই। সুতরাং তা মুরসাল ও অরক্ষিত। তাছাড়া আমাদের মাযহাবের লোকেরা ঈদ ও জানাযার তাকবীরের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছে।

এখানে লেখক অনেকগুলো ভুল করেছেন।

এক. হাদীসটিকে মিথ্যা ও বাতিল বলেছেন। যা ইতিপূর্বে কেউ বলেন নি। হাদীসটি ইমাম শাফেঈ তার মুসনাদে (৮৭৫ বা ৯৫০ নং), ইবনে আবী শায়বা তার মুসান্নাফে (২৪৫০, ১৫৭৪৮, ১৫৭৫২), বুখারী তার জুযউ রাফউল ইয়াদাইনে (৮১), বাযযার তার মুসনাদে (দ্র. কাশফুল আসতার, নং ৫১৯), ইবনে খুযায়মা তার সহীহ গ্রন্থে (নং ২৭০৩), তূসী তার মুখতাসারুল আহকাম গ্রন্থে (৭৮৬) তাহাবী তার শারহু মাআনিল আছারে (৩৮২১, ৩৮২২) তাবারানী তার মুজামে কাবীরে (১২০৭২) বায়হাকী তার সুনানে কুবরায় (৯২১০) ও যিয়া তার আল মুখতারা গ্রন্থে (নং ৩১০) উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম শাফেঈ রহ. এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন বায়তুল্লাহ দেখার সময় হাত তোলার মাসআলায়। তূসী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর হায়ছামী (৫৪৬১) বলেছেন, এর সনদে মুহাম্মদ ইবনে আবু লায়লা আছেন, وحديثه حسن إن شاء الله ইনশাআল্লাহ, তার হাদীস হাসান। যিয়া তার মুখতারা গ্রন্থে উল্লেখ করাও প্রমাণ করে, হাদীসটি তার নিকটও গ্রহণযোগ্য।

হাদীসটি মূলত ইবনে আব্বাস রা. থেকে দুইভাবে বর্ণিত আছে। ক. মারফু বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে, খ. মাওকুফ বা ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য হিসেবে। অনেক মুহাদ্দিসের মতে এটা মারফূ নয়, মাওকূফ হওয়াই সহীহ। বাযযার, ইবনুল জাওযী,

ইবনে আব্দুল হাদী ও ইবনুল মুলাক্কিন প্রমুখের মত এটাই। মোল্লা আলী কারী তার আসরারুল মারফুআহ গ্রন্থে বলেছেন,

قلت: على تقدير عدم صحة رفعه تكفينا صحة وقفه لا سيما هو في حكم المرفوع إذ لا يقال مثل هذا من قبل الرأي

অর্থাৎ আমি বলব, যদি ধরেও নিই, এটির মারফু হওয়া সহীহ নয়, তবুও এর মাওকুফ হওয়া সহীহ হওয়াটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। বিশেষত এ কারণে যে, এটি মারফু হাদীসের মর্যাদা ও বিধানভুক্ত। কারণ এ ধরনের বক্তব্য নিজের মতামত থেকে দেওয়া যায় না।

দুই, উদ্ধৃত আরবী অংশটির অনুবাদের শুরুতে বলা হয়েছে, 'হাকাম মাকসাম থেকে'। মাকসাম নয়, মিকসাম।

তিন. উদ্ধৃত অংশটুকু ইবনুল হুমামের নয়, বরং ইমাম বুখারীর, যা ইবনুল হুমাম উদ্ধৃত করেছেন। লেখক না বুঝে এ অংশটি ইবনুল হুমামের মনে করে অনুবাদেও ভুল করেছেন। 'অরক্ষিত' এর পরের বাক্যটির সঠিক অনুবাদ হবে– 'তিনি (ইমাম বুখারী) আরো বলেছেন, তাছাড়া তারা– এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো আমাদের ইমামগণ– দুই ঈদের তাকবীরসমূহে ও কুনুতের তাকবীরে এ হাদীসের বিপরীত করেছেন।

বাকি রইল ইমাম বুখারীর বক্তব্য যে, শোবা রহ. বলেছেন, হাকাম রহ. মিকসাম থেকে চারটি হাদীস শুনেছেন। এ হাদীসটি সেই চারের মধ্যে নেই। সুতরাং এটি মুরসাল বা সূত্রবিচ্ছিন্ন ও বেঠিক বর্ণনা।

এর জবাবে বলব, শোবা রহ. হয়তো বোঝাতে চাননি মাত্র চারটি হাদীসই শুনেছেন। আমরা যেমন দু'চারটি বলে স্বল্পতা বুঝিয়ে থাকি, তিনিও হয়তো তাই বুঝিয়েছেন। একথা এজন্যই বলছি, শো'বার অনুরূপ আরেকটি উক্তি আছে, কাতাদা রহ. আবুল আলিয়া রহ. থেকে তিনটি হাদীস শুনেছেন। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৩) আবু দাউদের বর্ণনায় চারটি হাদীসের কথা এসেছে। (হাদীস ২০২) অথচ বুখারী-মুসলিমেই আবুল আলিয়া থেকে কাতাদার আরো একাধিক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে যে জবাব এখানেও সেই একই জবাব।

হাকাম রহ. মিকসাম থেকে কতটি হাদীস শুনেছেন সে ব্যাপারে শোবার বক্তব্যেও বিভিন্নতা রয়েছে। এখানে চারটির কথা বলা হয়েছে।

তিরমিযী (নং ২৫৭) ও মুসনাদে ইবনুল জাদ (নং ৩১৭)এ বলা হয়েছে পাঁচটির কথা। আর ইবনে আবু হাতিম তার আল জারহু ওয়াত তাদীলে বলেছেন, ছয়টির কথা। এর বাইরে আর যেসব বর্ণনা রয়েছে শোবার মতে সেগুলো হাকাম কিতাব (অর্থাৎ মিকসামের কিতাব) থেকে বর্ণনা করেছেন। (দ্র. মুসনাদে ইবনুল জাদ (হাদীস ৩১৭)

ব্যাপারটি যদি এমনই হয় যে বাকি হাদীসগুলো হাকাম কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি সকলের নিকট অতি বিশ্বস্তও বটেন। তবে এসব হাদীসকে ঢালাওভাবে বর্জন করার কোন যুক্তি থাকে না। এ কারণেই ঐ ৫/৬টি হাদীসের বাইরে এই সনদের অনেক হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন– তিরমিযী শরীফের ৮৮০ নং হাদীসটিকে আলবানী সাহেব সহীহ বলেছেন। ৮৯৩ ও ৮৯৫ নং হাদীস দুটিকে ইমাম তিরমিযী ও আলবানী সাহেব উভয়ে সহীহ বলেছেন। একইভাবে হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ১৬৪২, ১৬৯৪ ও ১৭০৩ নং হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইবনে খুযায়মা রহ.ও তার সহীহ গ্রন্থে এসব উদ্ধৃত করেছেন। এর নম্বরগুলো যথাক্রমে ২৫৯৬, ২৭৯৯, ২৮৪৪। সহীহ ইবনে খুযায়মার টীকায় ড. মুস্তফা আজমী স্পষ্টভাবে এ তিনটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তবে আলোচ্য হাদীসটির সনদে যেহেতু ইবনে আবু লায়লা রয়েছেন, সেকারণে এটিকে সহীহ বলা না গেলেও হাসান অবশ্যই বলা যাবে। তাছাড়া এর ভিন্ন আরো দুটি সনদ রয়েছে। একটি সনদ রয়েছে মুসনাদে শাফিঈতে– أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ... অর্থাৎ আমাদের নিকট সাঈদ ইবনে সালেম বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরায়জ থেকে, তিনি বলেছেন, মিকসাম থেকে আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে নবী সা. থেকে। এ সনদে ইমাম বায়হাকীও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, এবং বলেছেন, এটি মুনকাতি বা সূত্রবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ ইবনে জুরায়জ রহ. সরাসরি এটি মিকসাম থেকে শোনেন নি।

অপর সনদটি তাবারানী রহ. উল্লেখ করেছেন,

حدثنا أحمد بن شعيب النسائي أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بُريد الجرمي نا سيف بن عبيد الله نا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ আমাদের নিকট আহমদ ইবনে শুআইব (ইমাম নাসায়ী) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট আমর ইবনে ইয়াযীদ আবু বুরায়দ আল জারমী বর্ণনা করেছেন, সাইফ ইবনে উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট ওয়ারাকা বর্ণনা করেছেন আতা ইবনুস সাইব থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে নবী স. থেকে। (হাদীস নং ১২২৮২) এই দ্বিতীয় সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন আবু আলী হাসান ইবনে আলী আত তূসী রহ. (মৃত্যু ৩১২ হি.) তার মুখতাসারুল আহকাম বা মুসতাখরাজুত তূসী আলা জামিইত তিরমিযী গ্রন্থে (হাদীস নং ৪৪-৭৮৬) এবং বলেছেন, هذا حديث حسن এ হাদীসটি হাসান। আর এই সনদেই যিয়া রহ. তার আল মুখতারা গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই বর্ণনাটি নিয়ে লেখক হিদায়া গ্রন্থকারের উপর কতই না বিষোদগার করেছেন।

নিজের পাতা জালে নিজেই আটক

লেখক হানাফী জাল হাদীস ধরার জন্য যেন জাল পেতেছেন। অবশেষে নিজের পাতা জালে নিজেই আটকা পড়েছেন। মানসুখ কাহিনী : ঐতিহাসিক মিথ্যাচার শিরোনামে তিনি রাসূল সা. যে সারাজীবন রফয়ে ইয়াদায়ন করেছেন তার প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে ইবনে উমর রা. বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন, যার শেষ বাক্যটি হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তার ছালাত সর্বদা এরূপই ছিল।

এ হাদীসটি জাল। এর সনদে দু'জন রাবী আছেন, যাদের ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি রয়েছে। একজন হলেন আব্দুর রহমান ইবনে কুরাইশ। দারাকুতনী আল মু'তালিফ গ্রন্থে (৪/১৮৭৯) বলেছেন, له أحاديث غرائب তার অজানা অচেনা কিছু হাদীস রয়েছে।

মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে যাহাবী ও লিসানুল মীযান গ্রন্থে ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন, اتهمه السليماني بوضع الحديث অর্থাৎ (মুহাদ্দিস) সুলায়মানী তাকে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। অপর রাবী হলেন 'ঈসমা ইবনে মুহাম্মদ আল আনসারী'। তার সম্পর্কে আবু হাতেম ও ইয়াহয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, كذاب يضع الحديث বড় মিথ্যুক, হাদীস জাল করতো। মুহাদ্দিস উকায়লী বলেছেন, يحدث بالبواطيل বাতিল ও অসত্য হাদীস বর্ণনা করতো। ইবনে আদী বলেছেন, وكل حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث তার সব হাদীসই বেঠিক, সে আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী।

আশ্চর্য হলেও সত্য, ড. আসাদুল্লাহ গালিবও তার ছালাতুর রাসূল ছা. গ্রন্থে এ জাল হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। (দ্র. পৃ. ১০৯)

আসল কথা কী, এ হাদীসটি তাদের খুবই দরকার। কারণ রাসূল সা. যে এক সময় একাধিক জায়গায় রফয়ে ইয়াদায়ন করতেন তা কোন হানাফী আলেম অস্বীকার করেন না। বরং তারা বলেন, রাসূল সা. ইন্তেকাল পর্যন্ত রফয়ে ইয়াদায়ন করেছেন এমন দাবির কোন দলিল নেই। এদিকে ইবনে মাসউদ রা. সহ একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে শুধু একবার হাত ওঠানোর কথা এসেছে। সেই সঙ্গে প্রবীন সাহাবী হযরত উমর, আলী ও ইবনে মাসউদ রা. সহ কূফার শত শত সাহাবীর শুধু একবার রফয়ে ইয়াদায়ন করেছেন। এসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু রফয়ে ইয়াদাইন করেন নি। আর এজন্যই এমন একটি হাদীস জাল করা হয়েছে। ইবনে উমর রা.এর হাদীসটি বুখারী-মুসলিম সহ প্রায় হাদীসের সকল গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু বায়হাকী ছাড়া তাদের কেউই এ অংশটি উল্লেখ করেন নি।

বাকি রইল, ইমাম বুখারী রহ. যে বলেছেন, 'কোন সাহাবী থেকে রফা না করা প্রমাণিত নয়', এ কথা ঠিক নয়। ইমাম বুখারীর শিষ্য ইমাম তিরমিযী পরিস্কার বলে দিয়েছেন, এটা একাধিক সাহাবী ও তাবিঈর মত (অর্থাৎ শুধু একবার রফয়ে ইয়াদায়ন করা)। এটাই সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসীর মত। ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারীর মতো একথাও বলেন নি

যে, সকল সাহাবী তাবিঈ ও আলেমগণ রফয়ে ইয়াদাইনের ব্যাপারে একমত। তিনি বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন,

وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم ابن عمر و جابر بن عبد الله و أبو هريرة و أنس و ابن عباس و عبد الله بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري و عطاء و طاووس و مجاهد و نافع و سالم بن عبد الله و سعيد بن جبير وغيرهم

অর্থাৎ আর এটাই মত হলো কিছু আলেমের, সাহাবীগণের মধ্যে ইবনে উমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মত। তাবিঈদের মধ্যে হাসান বসরী, আতা, তাউস, মুজাহিদ, নাফি, সালিম ও সাঈদ ইবনে জুবায়র প্রমুখের মত।

লেখক মুযাফফর বিন মুহসিন বলেছেন, রাফউল ইয়াদায়েনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলটি জাল হাদীসের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। আর এর কারখানা ছিল ইরাকের কুফা ও বসরায়। তাই তিরমিযী বলেন, এটা সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসীর বক্তব্য।

এরই নাম হলো লা-মাযহাবী ফেতনা। কুফায় জাল হাদীসের কারখানা কখন থেকে হলো? সাহাবীযুগ থেকে? না তাবিঈদের যুগ থেকে? লেখক তা বলেন নি। সুফিয়ান ছাওরীর মতো হাদীসসম্রাট কি করে জাল হাদীসের ফাঁদে আটকা পড়লেন? লেখক তাও বলেন নি। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে নসর মারওয়াযী ও ইবনে আব্দুল বার ও তিরমিযী রহ.এর কথা থেকে তো বোঝা যায়, সব যুগেই কূফার এ আমল ছিল। তাহলে এত শত শত সাহাবী ও তাবিঈ কিভাবে জাল হাদীসের ফাঁদে আটকা পড়লেন? আর ইমাম বুখারী কিভাবে বললেন, আমি হাদীস শিক্ষার জন্য অন্যান্য শহরে কতবার গিয়েছি তা বলতে পারব, কিন্তু কূফা ও বাগদাদে কতবার গিয়েছি তার হিসাব দিতে পারব না? হাকেম আবু আব্দুল্লাহ যখন বিভিন্ন শহরের বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসগণের পরিসংখ্যান দিলেন তার মারিফাতু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে, তখন সর্বাধিক সংখ্যক মুহাদ্দিসের তালিকায় আসল কূফা নগরী, এরই বা কারণ কি?

আমাদের জানামতে এত বড় শক্ত ও জঘন্য কথা ইতিপূর্বে কেউ বলেন নি। কূফা নগরী যে মদীনা শরীফের পরে বৃহত্তম ইলমী নগরী ছিল সে কথা শুরুতেই আমরা বলে এসেছি। এছাড়া আসওয়াদ ও আলকামা রহ. দুজনই ছিলেন মুখাযরাম অর্থাৎ রাসূল সা. এর যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পান নি। তাই বড় বড় সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস ও ইলম অর্জন করেছেন। একাধিকবার সফর করে কূফা থেকে মদীনায় গেছেন। হযরত উমর রা.এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.এর এ শীর্ষ দুই ছাত্র স্বীয় উস্তাদ থেকে শিখেছিলেন রুকু করার সময় দুহাত জোড় করে উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখতে হয়। কিন্তু মদীনায় গিয়ে তারা হযরত উমর রা. থেকে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিয়েছিলেন। তখন থেকে তারা হাঁটুর উপর হাত রাখতে শুরু করলেন। রফয়ে ইয়াদাইন সম্পর্কে কুফার জাল হাদীসের কারখানা দ্বারা তারা যদি প্রতারিত হয়ে থাকতেন, তাহলে মদীনা শরীফে যাওয়ার পর উমর রা. থেকে এটা কি সংশোধন করতে পারতেন না?

ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফে সহীহ সনদে তাদের থেকে বর্ণিত আছে, তারা শুধু প্রথম তাকবীরের সময়ই হাত তুলতেন। আর শুধু তারা কেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও আলী রা.এর সকল ছাত্র এমনটি করতেন। এটি ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন ওয়াকী ও আবু উসামা থেকে, তারা শোবা থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে। (নং ২৪৪৬) এর বর্ণনাকারীরা সকলে বুখারী ও মুসলিমের রাবী। তাহলে এটা কে জাল করল? হাদীস জালকারীর সূত্রেও কি ইমাম বুখারী-মুসলিম হাদীস নিয়েছেন? আব্দুল মালেক ইবনে আবজার মুসলিম শরীফের রাবী। তিনি বলেছেন, আমি শাবী, ইবরাহীম ও আবু ইসহাককে দেখেছি তারা শুধু নামাযের শুরুতেই হাত তুলতেন। (মুসান্নাফ, ২৪৫৪) এত বড় বড় ফকীহও জাল হাদীসের ফাঁদে পা দিলেন? এরা তিনজনই তো বুখারী ও মুসলিমের রাবী। শুধু কি তাই, তাহাবী বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী দাউদ থেকে, তিনি আহমদ ইবনে ইউনুস (বুখারী-মুসলিমের রাবী) থেকে, তিনি আবু বকর ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি বলেছেন, আমি কোন ফকীহকেই কখনো এমনটা করতে দেখিনি যে, তারা প্রথম তাকবীর ছাড়া হাত

উত্তোলন করতেন। (নং ১৩৬৭) এই আবু বকর ইবনে আইয়াশ বুখারী শরীফের রাবী। ১৯৩ বা ১৯৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কি মিথ্যা কথা বলেছেন? যদি তাই হয়, তবে ইমাম বুখারী কি মিথ্যুকের হাদীস নিয়েছেন?

রফয়ে ইয়াদায়নের হাদীস সংখ্যা

মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, 'ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

وذكر البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا.

ইমাম বুখারী ১৭ জন ছাহাবী থেকে রফউল ইয়াদায়েনের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও আবুল কাসেম ইবনু মান্দাহ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর হাফেয আবুল ফাযল অনুসন্ধান করে ছাহাবীদের থেকে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তার সংখ্যা ৫০ জনে পৌঁছেছে।

এখানে লেখক অনুবাদে মারাত্মক ভুল করেছেন। তিনি যে আরবী বোঝেন না তার এটিও একটি প্রমাণ। সঠিক অনুবাদ হবে, বুখারী রহ. এও উল্লেখ করেছেন যে, ১৭ জন সাহাবী রাফউল ইয়াদায়নের হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও আবুল কাসেম ইবনে মান্দাহ উল্লেখ করেছেন যে, তন্মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনও আছেন। আর আমাদের উস্তাদ হাফেয আবুল ফাযল উল্লেখ করেছেন যে, যে সব সাহাবী রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের ব্যাপারে তিনি অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, তাদের সংখ্যা ৫০ জনে পৌঁছেছে।

হাফেয আবুল ফাযল ইরাকীর এই বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে আবার আসাদুল্লাহ গালিব সাহেব নিজের পক্ষ থেকে 'অন্যূন' শব্দ যোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠার সময় রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছসমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে রাফউল ইয়াদায়েন এর

হাদীছের রাবী সংখ্যা আশারায়ে মুবাশশারাহসহ অনুন ৫০ জন সাহাবী। এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অনূ্যন চারশত।

লক্ষ করুন, অতিশয়োক্তি কাকে বলে? মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী বলেছেন, হাদীস ও আছার মিলে চারশত। এটাই অতিশয়োক্তির সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার ওপর গালিব সাহেব যোগ করলেন ছহীহ হাদীস ও আছারের সংখ্যা অনুন চারশত। তার মানে আরো বেশিও হতে পারে। সুবহানাল্লাহ।

গালিব সাহেবের মতে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫ জন সাহাবীর হাদীস ছহীহ। তার অর্থ দাঁড়ায় কমপক্ষে ৩৭৫টি আছার রয়েছে এ বিষয়ে। এসব কি মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য প্রতারণা নয়! তিনশটিই বাদ দিলাম, ৭৫টি আছারও কি দেখাতে পারবেন গালিব সাহেবরা?

তাছাড়া তারা যে বলেছেন ‘চার খলীফাসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে’ এটা শোনা কথা। কারণ এই দশজনের মধ্যে চার খলীফাসহ কারো থেকেই সহীহ সনদে এই হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম বুখারী তো এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করে ফেলেছেন। কিন্তু সেখানে এই দশজনের মধ্যে শুধুমাত্র আলী রা. বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। বাকি নয়জনের কারো বর্ণনাই তিনি উল্লেখ করতে পারেন নি। হ্যাঁ, উমর রা.এর বর্ণনার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন ইঙ্গিত করেছেন ইমাম তিরমিযীও।

বাস্তব কথা হলো চার খলীফার কারো থেকেই সহীহ সনদে রফয়ে ইয়াদায়নের হাদীস বর্ণিত হয়নি। হযরত উছমান রা. থেকে তো যঈফ সনদেও কোন হাদীস নেই। আবু বকর সিদ্দীক রা. এর হাদীসটি তো দীর্ঘ চারশত বছর পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। এ সময়ে হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ শতাধিক হাদীসগ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের জানামতে কোন হাদীস গ্রন্থেই এটি উদ্ধৃত হয়নি। এমনকি কেউ ইশারাও করেন নি। ইমাম বুখারী এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করলেও এর প্রতি ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নি। সর্বপ্রথম ইমাম বায়হাকী রহ. (শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী, মৃত্যু ৪৫৮ হি.) এটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি না হলে মনে হয় এটি আড়ালেই থেকে যেত। তদুপরি এর সনদও ঝামেলা মুক্ত নয়। (দ্র. নায়লুল ফারকাদাইন, পৃ. ৫৬, ৫৭)

হযরত উমর রা.এর হাদীসটির প্রতি অবশ্য ইমাম বুখারী ও তিরমিযী ইঙ্গিত করেছেন। তবে এটি উদ্ধৃত করেছেন বায়হাকী রহ. আসসুনানুল কুবরা গ্রন্থে (২/৭৪, হাদীস ২৫২১)। খতীব বাগদাদী আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে' গ্রন্থে (নং ১০১) ও ইবনুল আ'রাবী তার মু'জাম গ্রন্থে (নং ১১৪৭, ২৩১) তিনজনই শো'বার সূত্রে হাকাম থেকে, তিনি বলেছেন, আমি তাউসকে দেখলাম, তিনি (প্রথম) তাকবীরের সময়, রুকুর সময় ও রুকু থেকে মাথা তোলার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করলেন। আমি তার জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি (তাউস) এটি বর্ণনা করেন ইবনে উমর থেকে, তিনি উমর রা.এর সূত্রে নবী সা. থেকে। এরপর বায়হাকী রহ. হাকেম আবু আব্দুল্লাহর এ উক্তিও উল্লেখ করেছেন, দুটি হাদীসই সঠিক। ইবনে উমর রা. উমর রা.এর সূত্রে নবী সা. থেকে এবং ইবনে উমর রা. (সরাসরি) নবী সা. থেকে।

কিন্তু বাস্তবে উমর রা.এর সূত্রে হাদীসটি সহীহ নয়। হাকেম রহ. যদিও এটিকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তারই উস্তাদ দারাকুতনী রহ. স্পষ্ট বলেছেন, শো'বা থেকে এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন আদম ইবনে আবু ইয়াস ও আম্মার ইবনে আব্দুল জাব্বার মারওয়াযী। আর তারা দুজনই ভুলের শিকার হয়েছেন। সঠিক বর্ণনা হলো, ইবনে উমর নবী সা. থেকে। শুধু দারাকুতনীই নন, তার অনেক পূর্বে ইমাম আহমদও তাই বলেছেন। খাল্লাল রহ. তার ইলাল গ্রন্থে আহমদ ইবনে আসরাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, শোবা থেকে এভাবে কে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, আদম ইবনে আবু ইয়াস। তিনি বললেন, 'এটা কোন কিছুই নয়। এটি আসলে হবে ইবনে উমর রা. নবী সা. থেকে।'

তাছাড়া তাউসের জনৈক ছাত্র কে– তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। এমন অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা প্রামাণ্য হতে পারে না।

হযরত আলী রা.বর্ণিত হাদীসটিতে চার জায়গায় রফয়ে ইয়াদায়ন এবং রুকু-সেজদা ও কওমা জলসার বিভিন্ন দুআ ও যিকিরের কথা এসেছে। এটি উদ্ধৃত করেছেন আবু দাউদ (৭৪৪) তিরমিযী (৩৪২৩),

ইবনে মাজাহ (৮৪৬) ও আহমদ (৭১৭) প্রমুখ। কিন্তু ইমাম তিরমিযী এটিকে সহীহ আখ্যা দিলেও অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এটি সহীহ বা হাসান হতে পারছে না। কারণ :

ক. এর একাধিক সূত্র আছে। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে আবুয যিনাদের সূত্রেই কেবল রফয়ে ইয়াদায়নের উল্লেখ এসেছে। এমনকি আব্দুর রহমানের উস্তাদ মূসা ইবনে উকবা থেকে ইবনে জুরাইজ, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ও আসিম ইবনে আব্দুল আযীয আশযাঈ তিনজনই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় দুআ ও যিকির-আযকারের উল্লেখ এসেছে। রফয়ে ইয়াদায়নের উল্লেখ আসে নি।

খ. মূসা ইবন উকবার সঙ্গী আব্দুল আযীয মাজেশূন একই উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনুল ফাযল থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায়ও রফয়ে ইয়াদায়েনের উল্লেখ নেই।

গ. আব্দুল্লাহ ইবনুল ফাযলের সঙ্গী ইয়াকুব আল মাজেশূন থেকে তার ছেলে ইউসুফ (এ বর্ণনাটি মুসলিম শরীফে এসেছে) ও ভাতিজা আব্দুল আযীয একই উস্তাদ আল আরাজ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায়ও রফয়ে ইয়াদায়নের উল্লেখ আসে নি। শুধু দুআ ও যিকির-আযকার প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হয়েছে। সারকথা, হাদীসটি বহুসূত্রে বর্ণিত হলেও এতে রফয়ে ইয়াদায়নের কথা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আব্দুর রহমান নিঃসঙ্গ।

ঘ. এই আব্দুর রহমান ইবনে আবুয যিনাদকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস যঈফ বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, كان عند أصحابنا ضعيفا তিনি আমাদের উস্তাদগণের দৃষ্টিতে যঈফ ছিলেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, ضعيف الحديث তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনে মাঈন, আবু হাতেম ও নাসাঈ বলেছেন, لا يحتج بحديثه তার হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যায় না। এ ছাড়াও আমর ইবনে আলী আল ফাল্লাস, যাকারিয়া আস সাজী, ইবনে আদী, জাওযাকানী, ইবনে হিব্বান ও ইবনুল জাওযী তার দুর্বলতার ব্যাপারে স্ব স্ব মত প্রকাশ করেছেন। যাহাবী রহ. অবশ্য তাকে মধ্যম স্তরের হাসানুল হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। আর সেটিকেই গ্রহণ করে

নিয়েছেন আলবানী সাহেব। তবে তিনি একথাও বলেছেন, فان عبد الرحمن مختلف فيه والمتقرر أنه حسن الحديث إذا لم يخالف কেননা আব্দুর রহমানের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। সিদ্ধান্তের কথা হলো, তিনি হাসানুল হাদীস (যার হাদীস হাসান মানের হয়), যদি না কারো বিরোধী বর্ণনা পেশ করেন। (সহীহা, নং ২৯২৪)

দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে আব্দুর রহমান দুর্বল হওয়ার কারণে এ হাদীসটি যঈফ। আবার অন্যদের বর্ণনা থেকে তার বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেও এটি যঈফ। আলবানী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকেও এটি যঈফ। যদিও তিনি এ বক্তব্যের বাইরে গিয়ে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ রহ. স্পষ্টভাবে আব্দুর রহমানকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং খাল্লালের ইলাল গ্রন্থে আহমদ কর্তৃক এ হাদীসকে সহীহ আখ্যা দেওয়া সম্পর্কে যে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তা মূলত দুআ ও যিকির-আযকার সম্বলিত হাদীসটি সম্পর্কে হবে। হাত উত্তোলন করা সম্বলিত হাদীসটি সম্পর্কে নয়। হযরত কাশ্মিরী রহ.ও এমত গ্রহণ করেছেন। (দ্র. নায়লুল ফারকাদাইন, পৃ. ৬০)

এবার লক্ষ করুন, রফয়ে ইয়াদাইনের মত অবলম্বনকারী উছমান দারিমী কিভাবে এই দুর্বল বর্ণনাটি দ্বারা নাহশালী কর্তৃক বর্ণিত (যে নাহশালী অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট বিশ্বস্তও বটে) হযরত আলী রা.এর আমল সংক্রান্ত হাদীসটি (যা হানাফীদের দলিল)কে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। আর আমাদের লা-মাযহাবী বন্ধুরা অন্ধ অনুসরণ করে সেটাকেই এখনো উদ্ধৃত করে বেড়াচ্ছেন। এটা বড়ই লজ্জাজনক।

এ হলো চার খলীফা থেকে বর্ণিত হাদীসের অবস্থা। সুতরাং গালিব সাহেবসহ লা-মাযহাবী বন্ধুরা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ঢালাওভাবে এগুলোকে সহীহ বললেও প্রকৃত অবস্থা তাই, যা উপরে তুলে ধরা হলো।

সবশেষে মুযাফফর বিন মুহসিন শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি রফয়ে ইয়াদাইনের আমলকারী সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার নিকট অধিক প্রিয়। কেননা এ হাদীসের সংখ্যাও বেশি আবার তুলনামূলক মজবুতও বেশি।

কিন্তু লেখক এখানে ধোঁকা দিয়েছেন। শাহ সাহেবের পুরো বক্তব্য উদ্ধৃত করেন নি। শাহ সাহেব বলেছেন,

وهو من الهيئات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتركها أخرى والكل سنة وأخذ بكل جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان أهل المدينة وأهل الكوفة ولكل واحد أصل أصيل والحق عندي في ذلك أن الكل سنة ونظيره الوتر بركعة واحدة أوبثلاث. والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده.

অর্থাৎ রফয়ে ইয়াদাইনের আমল নবী সা. কখনো করেছেন, কখনো ছেড়ে দিয়েছেন। উভয় আমলই সুন্নত। সাহাবা তাবিঈন ও পরবর্তীগণের এক এক জামাত একেকটিকে গ্রহণ করেছেন। এটা সেইসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেসব বিষয়ে মদীনাবাসী ও কূফাবাসীর মধ্যে দ্বিমত রয়েছে, এবং প্রত্যেকের মতের পক্ষে মজবুত ভিত্তি রয়েছে। আমার দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে সত্য হলো উভয় আমলই সঠিক। এর নজির হলো, এক রাকাত বা তিন রাকাত বেতের। তবে যে ব্যক্তি রফয়ে ইয়াদাইন করে সে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসও বেশি। সেগুলো মজবুতও অধিক। তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে কারো জন্য উচিত হবে না, নিজের বিরুদ্ধে তার শহর বা দেশের জনগণের মধ্যে ফেতনা উসকে দেওয়া। (দ্র. ২/১৬)

মুযাফফর বিন মুহসিনগণ কি শাহ সাহেবের এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন? হলে এত ফেতনা ছড়াচ্ছেন কেন? শাহ সাহেবের মতো উভয় আমলকে সুন্নত বলারও কি সৎসাহস হবে তার?

জালিয়াতির আরেক চিত্র

আল্লামা আলবানী একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী শরীফের টীকায় আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ এ মাসআলায় প্রায় আঠার পৃষ্ঠা কলমবন্দ করেছেন। তথ্য বিকৃতি, জালিয়াতি, সাহাবী-তাবিঈ ও অন্যান্য মনীষীগণের নাম ও কিতাবের নামের বিকৃতিতে ভরা এই আঠার পৃষ্ঠা। নমুনা হিসাবে এখানে কিছু তুলে ধরা হলো।

১. রফয়ে ইয়াদায়নের পক্ষের হাদীসগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে ১ নম্বরে ইবনে উমর রা. বর্ণিত ও বুখারী-মুসলিমসহ বহু হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসদুটি তুলে ধরার পর ২ নম্বরে লেখক বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসটি বায়হাকীতে বর্ধিতভাবে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদাই উক্ত নিয়মেই সলাত আদায় করতেন (অর্থাৎ তিনি আজীবন উক্ত তিন সময়ে রফউল ইয়াদাইন করতেন।) (বায়হাকী, হিদায়াহ দিরায়াহ, ১/১১৪, ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, এ হাদীস আমার নিকট সব উম্মাতের উপর হুজ্জাত বা দলীলস্বরূপ। (পৃ. ৫১৬)

এখানে এই জালিয়াতি করা হয়েছে যে, আলী ইবনুল মাদীনীর মন্তব্যটি প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে। অথচ তিনি এটি দ্বিতীয় হাদীসটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। এতে করে পাঠক মনে করবেন, এ হাদীসটিও সহীহ। অথচ এটি একটি জাল হাদীস। পেছনে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. রফউল ইয়াদায়ন সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের অভিমত শিরোনামে ১ নম্বরে তিনি লিখেছেন, মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ.) বলেন, সলাতে রুকু'তে যাওয়ার সময় ও রুকু' থেকে উঠার সময় দু'হাত না তোলা সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে সেগুলো সবই বাতিল। তন্মধ্যে একটিও সহীহ নয়। (মাওযু'আতে কাবীর, পৃ. ১১০)

এখানে এই জালিয়াতি করা হয়েছে যে, একথাগুলো আসলে মোল্লা আলী কারীর নয়। বরং হাফেয ইবনুল কায়্যিমের, মোল্লা আলী কারী তা উল্লেখ করার পর খণ্ডন করেছেন। মনে হচ্ছে, এই লেখক কারী সাহেবের কিতাবটি দেখেন নি, অন্য কারো পুস্তক থেকে নকল করে দিয়েছেন।

৩. একই শিরোনামে ২ নম্বরে তিনি লিখেছেন, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ.) রুকুর পূর্বে রফউল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তা ত্যাগ করলে গুনাহ হবে। (উমদাতুল কারী, ৫/২৭২)

এও এক জালিয়াতি। পাঠকের অবগতির জন্য উমদাতুল কারী গ্রন্থের আরবী পাঠ এখানে তুলে ধরা হলো :

وفي (التوضيح) ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع وحكى الإجماع عليه وحكى عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام وبه قال ابن سيار من أصحابنا وحكي عن بعض المالكية وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه

৪. অর্থাৎ তাওযীহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রসিদ্ধ মত হলো কোন রফাই জরুরী নয়। এ ক্ষেত্রে ইজমাও উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকবীরে তাহরীমার সময় রফা করা জরুরী। আমাদের ফকীহগণের মধ্যে ইবনু সাইয়্যার এমতটিই অবলম্বন করেছেন। কোন কোন মালেকী থেকেও একথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা থেকে এমন কথা বর্ণিত হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় এটা ত্যাগ করলে গুনাহ হবে। (উমদাতুল কারী, ৫/২৭২)

বোঝাই যাচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা উক্ত কথা বলে থাকলে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা সম্পর্কে বলেছেন।

৫. উক্ত শিরোনামেই আব্দুল হাই লক্ষ্ণোভীর বরাতে ৭ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, সুফিয়ান সাওরী এবং শুবা বলেন, ইসাম ইবনু ইউসুফ মুহাদ্দিস ছিলেন। সেজন্য তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন। (আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃ. ১১৬)

এও একটি মারাত্মক জালিয়াতি। ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান ও শোবা আদৌ একথা বলেন নি। যিনি বলেছেন তিনিও এভাবে কথাটি বলেন নি। পাঠকের অবগতির জন্য আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যার মূল আরবী পাঠ তুলে ধরা হলো :

وفي طبقات القاري : عصام بن يوسف روى عن ابن المبارك والثوري وشعبة وكان صاحب حديث يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه اهـ

অর্থাৎ মোল্লা আলী কারীর আত তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'ইসাম ইবনে ইউসুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুবারক, (সুফিয়ান) ছাওরী ও শোবা থেকে। তিনি হাদীসবিদ ছিলেন। রুকুর সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় তিনি রফয়ে ইয়াদাইন করতেন।

৬. একই শিরোনামে ১৩ নম্বরে বলা হয়েছে, মুফতী আমিমুল ইহসান লিখেছেন, যারা বলে রফউল ইয়াদাইন করার হাদীস মানসূখ, আমি বলি তাদের একটি মাত্র দলীল (অর্থাৎ ইবনু মাসউদের হাদীস), দ্বিতীয় কোন দলীল নেই। (ফিকহুস সুন্নাহ ওয়াল আসার, পৃ. ৫৫)

এখানেও ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মুফতী সাহেব এখানে তিন জায়গা ছাড়াও যেসব হাদীসে আরো অন্যান্য স্থানে রফয়ে ইয়াদাইন করার উল্লেখ এসেছে সেসব হাদীস উল্লেখপূর্বক বলেছেন,

قلت : ومن ذهب إلى نسخه فليس له دليل إلا مثل دليل من قال : لا يرفع يديه في غير تكبيرة الافتتاح

অর্থাৎ আমি বলব, যারা এর (অর্থাৎ তিন স্থান ছাড়া অন্যান্য স্থানের রফয়ে ইয়াদাইন) মানসুখ বা রহিত হওয়ার মত পোষণ করেন, তাদের দলিলও ঠিক তেমন, যেমন শুধু প্রথম তাকবীরের সময় রফা করার প্রবক্তাদের দলিল।

মুফতী সাহেব একটি দলিলের কথা বলবেন কী করে? তিনি নিজেই তো শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় রফা করার পাঁচ-সাতটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৭. নামের ক্ষেত্রে তিনি বারা রা.কে বারাআ, কাতাদা ইবনে রিবঈকে রব্য়ী, আতা ইবনে আবূ রাবাহকে রিবাহ, নুমান ইবনে আবু আইয়্যাশকে আয়াশ, কায়সকে কায়িস, ইসহাক ইবনে রাহাওয়ায়হ্কে রাহওয়াহ, ইবনে মাঈনকে মুঈন, মিকসামকে মুকসিম, ইবনে দুকায়নকে দাকীন, যুহরীকে যুহুরী, মুহারিবকে মুহাররব, সাওওয়ারকে সিওয়ার ও 'আব্বাদকে উব্বাদ বানিয়ে রিজাল শাস্ত্র বিষয়ে বড় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

একইভাবে কিতাবের নামের ক্ষেত্রে বায়হাকীর খিলাফিয়্যাতকে খুলাফিয়াত, হাকেমের মাদখালকে মুদখাল নামে উল্লেখ করেছেন। ৫১৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যাহাবীর শারহু মুহাযযাব। অথচ এ নামে যাহাবী'র কোন কিতাব নেই। শারহুল মুহাযযাব হলো ইমাম নববীর লেখা। ৫৩৪ পৃষ্ঠার শুরুতে তিনি লিখেছেন, আনাস বর্ণিত হাদীসটি হাকিম মুদখাল গ্রন্থে বর্ণনার পর বলেন, হাদীসটি মাওযূ (বানোয়াট)। তিনি বাদরুল মুনীর গ্রন্থে বলেন, এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু উকাশাহ রয়েছে। অথচ আল বাদরুল মুনীর হাকেমের রচনা নয়, এটি ইবনুল মুলাক্কিনের রচনা। তবুও এরা আহলে হাদীস!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু, পরে হাত, তারপর চেহারা রাখা সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

সেজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু, পরে হাত, তারপর চেহারা রাখা সুন্নত

হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার দলিল

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন –

رَأَيْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وحسنه الترمذي.

অর্থ- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি যখন সেজদায় যেতেন তখন হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন। আর যখন সেজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৮৩৮; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৬৮; নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ১০৮৯; ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং ৮৮২; ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৬২৬; ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৯০৯ ও ইবনুস সাকান (দ্র. আছারুস সুনান,পৃ. ১৪৮) তিরমিযী বলেছেন এটি হাসান গারীব ।

২. হযরত আনাস রা. বলেন,

عن أنس رض قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة. وقال البيهقي : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول.

অর্থ– আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি তাকবীর দিয়ে সেজদায় গেলেন এবং হাত রাখার আগে হাঁটু রাখলেন। দারাকুতনী, হাদীস ১৩০৪, হাকেম, হাদীস ৮২২ ও বায়হাকী, হাদীস ২৬৩২ ।

৩. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন,

كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٢٨) وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان.

অর্থ: আমরা হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতাম। পরে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হল, হাতের পূর্বে হাঁটু রাখবে। সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৬২৮। এর সনদ দুর্বল।

৪. আসওয়াদ র. বলেন,

أن عمر كان يقع على ركبتيه . أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧١٩)

অর্থ: হযরত উমর রা. আগে হাঁটু রেখেই সেজদায় যেতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৭১৯।

তাহাবী র. আলকামা ও আসওয়াদ র. দুজনের সূত্রেই হযরত উমর রা. এর এই আমল উল্লেখ করেছেন। সেখানে একথাও আছে, তিনি হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন। এর সনদ সহীহ।

৫. নাফে র. হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন,

كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٢٠)

অর্থ: তিনি যখন সেজদায় যেতেন, তখন হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন। আর যখন সেজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠাতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৭২০। এর সনদ হাসান।

৬. ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেছেন,

حُفِظَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: " أَنَّ رُكْبَتَيْهِ، كَانَتَا تَقَعَانِ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ"

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে স্মরণ রাখা হয়েছে যে, তাঁর হাতের পূর্বে হাঁটু জমিনে লাগত। (১৫২৯)

এর সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত আছেন। তার বিশ্বস্ততা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্যগণের তদনুরূপ আমল প্রমাণ করে যে, তিনিও তাই করতেন। ইবনে আবী শায়বা তার মুসান্নাফ গ্রন্থে আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا انْحَطُّوا لِلسُّجُودِ وَقَعَتْ رُكَبُهُمْ قَبْلَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা.এর শিষ্যগণ যখন সেজদা করতেন, তখন তাদের হাতের পূর্বে হাঁটু পড়ত। (২৭১১)

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের আমল :

ইমাম তিরমিযী র. হযরত ওয়াইল রা. এর হাদীসটি উল্লেখপূর্বক বলেন,

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

অর্থাৎ এ হাদীস অনুসারে অধিকাংশ আলেমের আমল। তারা মনে করেন হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখবে। এবং হাঁটুর পূর্বে হাত ওঠাবে।

ইবনে হিব্বানও এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। তিনি হাদীসটির উপর এই অনুচ্ছেদ-শিরোনাম দিয়েছেন,

باب ذكر ما يستحب للمصلي وضع الركبتين على الأرض عند السجود قبل الكفين

অর্থাৎ অনুচ্ছেদ-মুসল্লির জন্য সেজদার সময় যমীনে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখা মুস্তাহাব হওয়ার আলোচনা সম্পর্কে। এমনিভাবে তার উস্তাদ ইবনে খুযায়মা র.ও এই হাদীস অনুসারে আমল করাকে সুন্নত বলেছেন। তিনি এই হাদীসকে রহিতকারী (ناسخ) এবং হাত আগে রাখার হাদীসকে রহিত (منسوخ) আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল মুনযির র. 'আলআওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন,

وقد تكلم في حديث ابن عمر ، قيل إن الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول (٣٢٧/٣)

অর্থাৎ ইবনে উমরের হাদীসটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সহীহ কথা হলো এটি ইবনে উমরের নিজস্ব আমল। আর ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীসটি প্রমাণিত। আমাদের মতও অনুরূপ।

ইবনে বাযের ফতোয়া

সৌদি আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে বায রহ. বলেছেন,

والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الأفضل ،

অর্থাৎ সেজদায় যাওয়ার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখাই উত্তম। (মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায)

ইবনে উছায়মীনের ফতোয়া

আরবের আরেকজন খ্যাতনামা আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ ইবনে উছায়মীন রহ.ও একই কথা বলেছেন। তার ফতোয়াটি উদ্ধৃত হয়েছে তৎপ্রণীত ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম গ্রন্থে। (নং ২৪১) এটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

আলবানী সাহেবের বক্তব্য : কিছু পর্যালোচনা

আমাদের জানামতে হযরত ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটিকে ছয়জন শীর্ষ মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন। ১. ইবনে খুযায়মা, ২. ইবনে হিব্বান, ৩, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, ৪. ইবনুস সাকান, ৫. হাফেয যাহাবী, ৬. ইবনুল মুলাক্কিন, আল বাদরুল মুনীর গ্রন্থকার।

এছাড়া যারা এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন তারা হলেন :

৭. ইমাম তিরমিযী। ৮. মুহিয়ুস সুন্নাহ বাগাবী, তার 'শারহুস সুন্নাহ'য় (নং

৬৪২) ৯. আবু বকর আল হাযেমী, তার আল ইতিবার গ্রন্থে, ১০. ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস, তার তিরমিযীর ভাষ্যে।

এটিকে ছাবিত বা প্রমাণিত বলেছেন একজন। তিনি হলেন, ১১. ইমাম ইবনুল মুনযির।

এটিকে আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসের তুলনায় মজবুত আখ্যা দিয়েছেন তিনজন। তারা হলেন,

১২. আবু সুলায়মান খাত্তাবী। তিনি বলেছেন, حديث وائل أثبت من هذا ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটি এটির (আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসের) চেয়ে মজবুত।

১৩. ইবনুল জাওযী।

১৪. আমীর ইয়ামানী। তার বক্তব্য সরাসরি এমন না হলেও তার আলোচনা থেকে তাই বোঝা যায়। (দ্র. সুবুলুস সালাম, সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ)

এছাড়া ১৫. ইমাম নববী ও ১৬.যুরকানী দুজনের দৃষ্টিতে এটির সনদ জায়্যিদ বা উৎকৃষ্ট। কারণ তারা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটির সনদকে জায়্যিদ বা উৎকৃষ্ট বলেছেন। আবার ইমাম নববী রহ. বলেছেন, দুটি মতের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে না। তার এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে যুরকানী তার আলোচনা শেষ করেছেন। (দ্র. শারহুল মাওয়াহিব) বোঝা গেল, উভয় হাদীস তাদের দৃষ্টিতে সমমানের ছিল।

আরেকজন শীর্ষ মুহাদ্দিস হাফেজ জিয়া আলমাকদিসী। তিনি তার আল মুখতারা নামক হাদীসগ্রন্থে শরীক বর্ণিত একাধিক হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, إسناده حسن এর সনদ হাসান। আর একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, إسناده صحيح এর সনদ সহীহ। (দ্র. নং ১০৫৭, এটি ইয়াযীদ ইবনে হারুন শরীক থেকে বর্ণনা করেছেন।)

সেই সঙ্গে ইমাম তিরমিযী খাত্তাবী, বাগাবী, আমীর ইয়ামানী ও শাওকানী প্রমুখ যে বলেছেন, ‘এ হাদীস অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত’ সে হিসাবে বলা চলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে এ হাদীসটি সহীহ বা হাসান মান সম্পন্ন।

কিন্তু এতসব আলেমের মতামতকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে আলবানী সাহেব মিশকাত শরীফ ও সহীহ ইবনে খুযায়মার টিকায় দাবি

করেছেন, এটি জয়ীফ বা দুর্বল। আর আসলু সিফাতিস সালাহ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. ও ইবনে উমর রা. বর্ণিত হাদীস দুটির আলোচনা শেষে তিনি বলেছেন,

وقد عارضها أحاديث لا يصح شيء منها ونحن نسوقها للتنبيه عليها ولئلا يغتر به من لا علم له

অর্থাৎ এ হাদীসদুটির বিপরীতে কিছু হাদীস রয়েছে। যার কোনটিই সহীহ নয়। আমরা সেগুলো উল্লেখ করছি সতর্ক করার জন্য এবং যাতে এলেম সম্পর্কে বেখবর ব্যক্তিরা এর ধোকায় না পড়ে সে জন্য।

মস্ত বড় দাবি! এ দাবির অনিবার্য ফল হলো ইমাম তিরমিযীসহ পূর্বোল্লিখিত শীর্ষ মুহাদ্দিসগণ সকলে ধোঁকার শিকার হয়েছেন। যেমন, ধোঁকায় পড়েছেন ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক রহ. সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও ফকীহ। এমন দাবি করা একজন আলেমের পক্ষে শোভনীয় কি না সে প্রশ্নে না গিয়ে আমরা এ দাবির পক্ষে পেশকৃত যুক্তি ও তার পর্যালোচনা তুলে ধরছি।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

وهذا سند ضعيف ، وقد اختلفوا فيه ؛ فقد حسنه الترمذي ، وقال الحاكم : "احتج مسلم بشريك " . ووافقه الذهبي . وليس كما قالا ؛ فإن شريكاً لم يحتج به مسلم ، وإنما روى له في المتابعات ؛ كما صرح به غير واحد من المحققين ، ومنهم الذهبي نفسه في " الميزان"

অর্থাৎ এটি জয়ীফ সনদ। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। আর হাকেম বলেছেন, শরীক (বর্ণিত হাদীস) দ্বারা মুসলিম রহ. প্রমাণ পেশ করেছেন। যাহাবীও তার (হাকেমের) সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাদের কথা ঠিক নয়। মুসলিম রহ. শরীকের হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করেননি। সমর্থক বর্ণনারূপে পেশ করেছেন মাত্র। একাধিক মুহাক্কিক (তাত্ত্বিক) আলেম একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। তন্মধ্যে যাহাবী নিজেও আল মীযান গ্রন্থে। (আসলু সিফাতিস সালাহ, ২/৭১৫)

এ ব্যাপারে অধমের আরজ হলো :

হাকেমের ন্যায় ইবনুল জাওযীও বলেছেন, ইমাম মুসলিম শরীকের বর্ণনাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। এজন্য মুগলতায়ী রহ. ইকমাল গ্রন্থে বলেছেন, فينظرএটা অনুসন্ধানের দাবি রাখে। আমাদের জানামতে মুসলিম শরীফে ১০৩৯-১০২ ও ২২৫৬-২ নম্বরে উদ্ধৃত শরীক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদুটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

তাছাড়া এ হাদীসটিকে তো আরো অনেকে সহীহ বা হাসান মনে করেছেন বা বলেছেন। আলবানী সাহেব এখানে এত কার্পণ্য করলেন কেন? নিজের পক্ষের দলিল হলে তো কে কি বলেছেন খুঁটে খুঁটে তা বের করে আনেন। কিন্তু এখানে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মন্তব্যগুলো তিনি এড়িয়ে গেলেন কেন? তার মতের পক্ষে নয় তাই?

এরপর তিনি লিখেছেন,

وكثيراً ما يقع الحاكم – ويتبعه الذهبي في " تلخيصه " – في هذا الوهم ؛ فيصححان كل حديث يرويه شريك على شرط مسلم

অর্থাৎ অনেক স্থানেই হাকেম ও তার অনুসরণে যাহাবী তার তালখীসুল মুসতাদরাক গ্রন্থে এ ভুলের শিকার হয়েছেন। শরীক কর্তৃক বর্ণিত (মুসতাদরাকে উদ্ধৃত) সব হাদীসকেই তারা মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। (প্রাগুক্ত)

কিন্তু আমাদের ধারণা যদি সত্য হয় এবং পেছনে উল্লেখকৃত নম্বর দুটির হাদীস দুটি যদি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে, হাকেমের এক্ষেত্রে একটি ভুলও হয় নি। আর যদি তার ভুল হয়েই থাকে তাতেই বা সমস্যা কী? তিনি ছাড়াও তো অনেকেই এই হাদীসকে সহীহ মনে করতেন। তাছাড়া হাকেমের এ ধরনের ভুল তো শরীক ছাড়া অন্য অনেকের বর্ণনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কিন্তু আলবানী সাহেব সেকথা বলছেন না কেন? সেটা কি তার পক্ষের দলিল ইবনে উমর রা. এর হাদীসটি সম্পর্কে হাকেমের সহীহ বলাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য? কারণ আমাদের জানামতে ঐ হাদীসটিকে হাকেম ছাড়া অন্য কেউ সহীহ বলেন নি।

Contents

এরপর তিনি লিখেছেন,

وأما الدارقطني ؛ فقال ": تفرد به يزيد عن شَرِيك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كُلَيب غير شريك ، وشريك : ليس بالقوي فيما يتفرد به . " وهذا هو الحق ؛ فقد اتفقوا كلهم على أن الحديث مما تفرد به شريك دون أصحاب عاصم ، وممن صرح بذلك غير الدارقطني : الترمذي ، والبيهقي ، بل قال يزيد بن هارون: " إن شريكاً لم يرو عن عاصم غير هذا الحديث " .

অর্থাৎ 'দারাকুতনী রহ. বলেছেন, 'এ হাদীসটি শরীক থেকে শুধু ইয়াযীদ (ইবনে হারুনই) বর্ণনা করেছেন। আর আসেম ইবনে কুলায়ব থেকে শরীক ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি। আর নিঃসঙ্গ বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীক মজবুত নন।'

এটিই সত্য কথা। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ হাদীসটি আসেমের শাগরেদদের মধ্যে শরীকই একাকী বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী ছাড়া তিরমিযী ও বায়হাকী সুস্পষ্ট করে এ কথা বলেছেন। বরং ইয়াযীদ ইবনে হারুন এ কথাও বলেছেন যে, এ হাদীসটি ছাড়া শরীক আসেম থেকে অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি।' (প্রাগুক্ত, ২/৭১৫)

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্যঃ

ক. ইয়াযীদ ইবনে হারুন শরীক থেকে একা বর্ণনা করেছেন, একথা ঠিক নয়। সহীহ ইবনে খুযায়মায় সাহল ইবনে হারুনও শরীক থেকে বর্ণনা করেছেন। (দ্র. হাদীস নং ৬২৯)

খ. 'আসেম ইবনে কুলায়ব থেকে শরীক একা বর্ণনা করেছেন' তিরমিযী প্রমুখের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, অবিচ্ছিন্ন সূত্রে কেবল তিনিই বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনার সমর্থক আরো যে দুটি বর্ণনা রয়েছে তার একটি মুরসাল, অপরটি মুনকাতি। মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত হলো, মুরসাল ও মুনকাতি বর্ণনাও সমর্থকরূপে পেশ করা যায়। এ দুটি বর্ণনা আরো পরে আসছে। তাছাড়া শরীকের বর্ণনার সত্যতার সাক্ষী (শাহেদ) হিসাবে আছে

হযরত আনাস রা. বর্ণিত হাদীসটি। সুতরাং শরীককে নিঃসঙ্গ বলাটা মোটেও ঠিক নয়।

গ. ইয়াযীদ যে বলেছেন, 'এ হাদীসটি ছাড়া শরীক অন্য কোন হাদীস আসেম থেকে বর্ণনা করেন নি' কথাটি আদৌ সঠিক নয়। আলবানী সাহেবের মতো বিস্তর ঘাটাঘাটি করা মানুষের পক্ষে এমন কথা উদ্ধৃত করা বড়ই আশ্চর্যের বলে মনে হয়। আসেম থেকে শরীক যে আরো অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো এখানে উল্লেখ করতে গেলে এ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাবে, তাই তিনটি হাদীস সম্পর্কে শুধু হাদীসগ্রন্থের নাম ও হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হলো।

১. আবু দাউদ (৭২৮), তাবারানী কৃত মুজামে কাবীর, (৯৬)।

২. মুসনাদে আহমদ (১৮৮৪৭), আবু দাউদ (৭২৯), তাবারানী কৃত মুজামে কাবীর (৮৬১)।

৩. মুসনাদে আহমদ(১৮৮৬৮, ১৮৮৬৯), তাবারানী কৃত মুজামে কাবীর (১০২)।

এরপর আলবানী সাহেব লিখেছেন,

وشريك سيئ الحفظ عند جمهور علماء الحديث ، وبعضهم صرح بأنه كان قد اختلط ؛ فلذلك لا يحتج به إذا تفرد ، ولا سيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ

অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ হাদীসবিদের দৃষ্টিতে শরীক ছিলেন দুর্বল স্মৃতির অধিকারী। তাদের কেউ কেউ তো স্পষ্ট বলেছেন, তার স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটেছিল। তাই তিনি যখন এককভাবে কোন হাদীস বর্ণনা করেন সেটা প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাবে না। বিশেষত যদি তিনি বিশ্বস্ত ও হাফেযে হাদীসগণের বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করে থাকেন। (প্রাগুক্ত, ২/৭১৬)

এ হলো আলবানী সাহেবের দাবি। মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য ও কর্মপন্থার সঙ্গে এ দাবির কোন মিল নেই। আলবানীভক্তরা হয়তো চোখ বুঁজেই তার দাবিকে শতভাগ সত্য মনে করবেন। কিন্তু পেছনে একবার তাকিয়ে দেখুন, কত বিরাট সংখ্যক শীর্ষ হাদীসবিদ শরীকের হাদীসটিকে হয় সহীহ না হয় হাসান আখ্যা দিয়েছেন। আমি মনে করি আলবানী সাহেবের দাবির

অসারতা প্রমাণের জন্য উক্ত সংখ্যাই যথেষ্ট। তদুপরি শরীক সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো।

ইমাম আহমদ ও ইবনে মাঈন বলেছেন, صدوق ثقة তিনি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত। ইবনে মাঈন আরো বলেছেন, ثقة ثقة তিনি বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত। নাসাঈ বলেছেন, ليس به بأس তার মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই। আবু দাউদ বলেছেন, ثقة يخطئ على الأعمش তিনি বিশ্বস্ত, তবে আমাশের হাদীসে ভুল করতেন। উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসটি আমাশ থেকে বর্ণিত নয়। আবু ইসহাক আল হারবী তার তারীখ গ্রন্থে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। ইবনে শাহীন তার ছিকাত গ্রন্থে বলেছেন, ثقة ثقة তিনি বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত। আহমদ আল ইজলী বলেছেন, كوفي ثقة وكان حسن الحديث তিনি কুফার অধিবাসী, বিশ্বস্ত ও উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। আবু হাতেম রাযীকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবুল আহওয়াস (বুখারী ও মুসলিমের রাবী) ও শরীক এ দুজনের মধ্যে ভাল কে ? তিনি বললেন, আমার দৃষ্টিতে শরীকই ভালো। شريك صدوق قد كان له أغاليط শরীক সাদুক বা সত্যনিষ্ঠ, অবশ্য তার কিছু কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতিও রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, তিনি ইসরাঈল (বুখারী-মুসলিমের রাবী) এর চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। আর তার তুলনায় ইসরাঈলের ভুল হতো কম। ইবনে সাদ বলেছেন, كان ثقة مأمونا كثير الحديث وكان يغلط كثيرا তিনি বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ছিলেন। বহু হাদীসের অধিকারী। তিনি অনেক ভুল করতেন। ইয়াকুব ইবনে শায়বা বলেন, ثقة صدوق صحيح الكتاب رديئ الحفظ مضطربه তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ, তার কিতাব ছিল সহীহ বা বিশুদ্ধ, তার স্মৃতিশক্তি ছিল খারাপ, তাতে স্থিরতা ছিল না। (তারীখে বাগদাদ)

যারা বলেছেন, তিনি অনেক ভুল করতেন তাঁর সেসব ভুলের পরিমাণ কি ছিল, ইবনে আদী'র কথায় তারও তথ্য মেলে। তিনি বলেছেন, الغالب

على حديثه الصحة والاستواءতার বর্ণনায় সঠিক ও বিশুদ্ধের সংখ্যাই বেশি।

এসব ভুল তার কোন কোন উস্তাদ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে ঘটেছে? আবু দাউদ বলেছেন আমাশের নাম। এছাড়া কুফার অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوريঅর্থাৎ শরীক কুফাবাসীদের হাদীস সুফিয়ান ছাওরীর চেয়েও বেশি ভাল জানতেন।

বোঝা গেল, ভুলগুলো তিনি কুফার বাইরের উস্তাদগণ থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে করতেন। উল্লেখ্য যে, শরীক এ হাদীসটি কুফাবাসী মুহাদ্দিস আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এতে সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হলো, এ ভুলগুলো তার জীবনে কখন ঘটেছিল। শুরু থেকেই তিনি স্মৃতিদুর্বল ছিলেন, না পরবর্তীকালে এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সালিহ ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, صدوق لما ولى القضاء تغير حفظهতিনি সাদুক ছিলেন। বিচারকের দায়িত্ব পাওয়ার পরেই তার স্মৃতিতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ইবনে হিব্বান তো আরো স্পষ্ট করে বলেছেন,

ولى القضاء بواسط سنة خمسين ومائة ثم ولى الكوفة ومات بها سنة سبع وسبعين ومائة وكان في آخر عمره يخطئ فيما روى وتغير عليه حفظه فسماع المتقدمين الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة.

অর্থাৎ তিনি ১৫০ হি. সনে ওয়াসিতের বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর কুফার বিচারক হয়েছিলেন, এবং সেখানেই তিনি ১৭৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। শেষ বয়সে তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করতেন তাতে ভুল করতেন। তখন তার স্মৃতিও বদলে যায়। তাই কুফার কাজী হওয়ার পূর্বেই ওয়াসিতে যারা তার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন, তাতে কোন

বিভ্রাট ছিল না। যেমন, ইয়াযীদ ইবনে হারুন ও ইসহাক আল আযরাক। আর যারা এরপরে কুফায় শুনেছেন, সেখানে ভুল ছিল অনেক।

হাফেয ইবনে হাজারও তাকরীব গ্রন্থে বলেছেন, صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه بعد ما ولى قضاء الكوفة অর্থাৎ সাদূক, ভুল করতেন বেশি, কুফার কাজী নিযুক্ত হওয়ার পর তার স্মৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। যাহাবীর মতেও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তাকে من تكلم فيه وهو موثق (যারা সমালোচিত অথচ বিশ্বস্ত) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল মুগনী গ্রন্থে যাহাবী বলেছেন, صدوق সাদুক।

আধুনিক কালের দুজন গবেষক ইবনে হিব্বানের এমতটিই পছন্দ করেছেন। একজন হলেন, আলাউদ্দীন আলী রেজা 'আল ইগতিবাত বিমান রুমিয়া মিনার রুওয়াতি বিল ইখতিলাত' গ্রন্থের (কৃত সিবতু ইবনিল আজমী) টীকায়, অপরজন হলেন ড. রিফয়াত ফাওযী আলাঈ কৃত আল মুখতালিতীন গ্রন্থের টীকায়।

অবাক হওয়ার বিষয় হলো, আলবানী সাহেব নিজেও অন্যত্র এই শরীক কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, إسناده حسن এর সনদ হাসান। কিন্তু এটা ছিল আমীন জোরে বলার হাদীস। তার পক্ষের, তাই। (দ্র. আসলু সিফাতিস সালাহ, জোরে আমীন বলার আলোচনা) একই গ্রন্থে অন্যত্র শরীকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, إسناده جيد এর সনদ উৎকৃষ্ট। (দ্র. উতীতু মিযমারান মিন মাযামীরি আলি দাউদ– হাদীসটির আলোচনা।) এ যেন তার মর্জি, যখন যাকে ইচ্ছা বিশ্বস্ত আখ্যা দেবেন, আবার সময়মতো দুর্বল সাব্যস্ত করবেন।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে হারুনই– যিনি ওয়াসিত নিবাসী ছিলেন– শরীক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বানের ভাষ্যমতে শরীকের স্মৃতিতে পরিবর্তন আসার আগেই তিনি তার কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন। অথচ এ হাদীসকেই আলবানী সাহেব জয়ীফ বা দুর্বল বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। শরীক সম্পর্কে এ আলোচনা ভাল করে পড়ুন আর ভাবুন, লা-মাযহাবী বন্ধুদের ভাষায় যুগশ্রেষ্ঠ প্রকৃত মুহাদ্দিস সাহেব যা বলেছেন, তার সঙ্গে হাদীসবিদগণের বক্তব্যের মিল কতটুকু।

আরেকটি কথা হলো, আলবানী সাহেব যে বলেছেন, 'বিশেষত যদি বিশ্বস্ত ও হাফেযে হাদীসগণের বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা করে থাকেন'। এ কথাটি তিনি এখানে কেন জুড়ে দিয়েছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। শরীক এখানে কোন হাফেযে হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন নি।

আলবানী সাহেব আরো লিখেছেন,

فقد روى جمع منهم عن عاصم بإسناده هذا عن وائل صفة صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وليس فيها ما ذكره شريك.

অর্থাৎ তাদের অনেকে আসিম থেকে একই সনদে ওয়াইল রা. থেকে রাসূল সা. নামাযের বিবরণমূলক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শরীক যা উল্লেখ করেছেন সেখানে তা নেই। (প্রাগুক্ত, ২/৭১৬)

ভাল কথা, কিন্তু এ আপত্তি শুধু এখানে কেন? বুকে হাত বাঁধার হাদীস মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে অনেক গবেষক বলেছিলেন, মুআম্মাল এমনিতেই জয়ীফ, আবার সুফিয়ানের শাগরেদদের মধ্যে এই বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। কিন্তু সেখানে আপনি তা কর্ণপাত করেন নি। কারণ সেটি ছিল পক্ষের হাদীস। আবার হাঁটুর আগে হাত রাখা সংক্রান্ত ইবনে উমর রা. এর হাদীসটি দারাওয়ার্দী একাই উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। উবায়দুল্লাহ থেকে দারাওয়ার্দীর বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ও নাসাঈ প্রমুখের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আপনি সেটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। শুধু কি তাই? আপনি সেখানে এই নীতিও আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, وليس من شرط الحديث الصحيح أن لا ينفرد بعض رواته والا لما سلم لنا كثير من الأحاديث الصحيحة অর্থাৎ হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে এমন শর্ত নেই যে, এর কোন বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। এমনটি হলে অনেক সহীহ হাদীসই রক্ষা পাবে না। (প্রাগুক্ত, ২/৭২১)

এসব কথা কি এখানে দিব্যি ভুলে গেছেন?

তিনি আরো লিখেছেন,

على أنه قد رواه غيره عن عاصم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً ؛ لم يذكر وائلاً. أخرجه أبو داود ، والطحاوي ، والبيهقي عن شَقيق أبي ليث قال : ثني عاصم به. لكن شقيق : مجهول لا يعرف – كما قال الذهبي وغيره. -

অর্থাৎ অধিকন্তু শরীক ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী আসিমের সূত্রে তদীয় পিতা থেকে, তিনি নবী সা. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন মুরসাল (সূত্রবিচ্ছিন্ন) রূপে, ওয়াইল রা. এর উল্লেখ ছাড়া। আবু দাউদ, তাহাবী ও বায়হাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন শাকীক আবু লায়ছের সূত্রে। তিনি বলেছেন, আসিম আমার নিকট এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শাকীক মাজহুল বা অজ্ঞাত, যেমনটি বলেছেন যাহাবীসহ কেউ কেউ। (প্রাগুক্ত, ২/৭১৬)

আমাদের বক্তব্য হলো, শাকীক অজ্ঞাত, সুতরাং তার বর্ণনাকে শরীকের বর্ণনার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে শরীকের বর্ণনাকে নাকচ করার সুযোগ কোথায়? কথাটি তো এভাবেও বলা যেত যে, এ মুরসাল বর্ণনাটিও শরীকের বর্ণনার সমর্থন যোগায়। কারণ সমর্থনের জন্য রাবীর অজ্ঞাত হওয়া বা সূত্র বিচ্ছিন্নতা কোনটিই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত এমনই।

শেষকথা তিনি লিখেছেন,

وله طريق أخرى معلولة عند أبي داود ، والبيهقي أيضاً عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرفوعاً بمعناه وهذا منقطع بين عبد الجبار وأبيه ، فإنه لم يسمع منه

অর্থাৎ এর আরেকটি সনদ আছে। সেটিও মা'লুল বা দোষযুক্ত। আবু দাউদ ও বায়হাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন আব্দুল জব্বার ইবনে ওয়াইল থেকে, তিনি তার পিতার সূত্রে নবী সা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি সূত্রবিচ্ছিন্ন। কারণ আব্দুল জব্বার তার পিতা থেকে হাদীস শোনেন নি। (প্রাগুক্ত)

লক্ষ করুন, এ বর্ণনাটির সকল রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। দোষ শুধু এতটুকু, সাহাবী ওয়াইল রা. এর ছেলে আব্দুল জব্বার পিতার কাছ থেকে হাদীস শোনেন নি। তার পরও তিনি পিতা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। বোঝা গেল, মাঝখানে অন্য কেউ আছেন, যার কাছ থেকে তিনি হাদীসটি শুনেছেন। ব্যাস, শুধু এই দোষের কারণে এটি শরীকের বর্ণনার সমর্থকরূপেও উল্লেখিত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে!

আলবানী সাহেবের এ বক্তব্য বড়ই আশ্চর্যের। কারণ প্রথমত, সূত্রবিচ্ছিন্ন বর্ণনাকে শর্তসাপেক্ষে পূর্ববর্তী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের অধিকাংশই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। (দ্র. আবু দাউদ কৃত রিসালা আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ ও ইবনে আব্দুল বার কৃত আত তামহীদের ভূমিকা।)

ইমাম বুখারী ও তার যুগের ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিস অবশ্য এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করেছেন। আর সেটাও শুধু এই সাবধানতার জন্য যে, পাছে না জানি কোন ভেজাল লোক মাঝখানে ঢুকে থাকে। আর জানা কথা যে, সাহাবীগণের ছেলেদের যুগে ভেজাল লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাছাড়া আব্দুল জব্বার পিতার কাছ থেকে হাদীস শোনার সুযোগ না পেলেও পিতার হাদীসগুলো তিনি তার বড় ভাই আলকামা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য থেকে শুনেছেন। এসব ভেবেই হয়তো দারাকুতনী আব্দুল জব্বারের একটি হাদীস যা তিনি পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। (দ্র. আসসুনান, ১/৩৩৫)

দ্বিতীয়ত, যদি ধরেও নিই, সূত্র বিচ্ছিন্নতার কারণে এটি জয়ীফ বা দুর্বল, তথাপি অন্য আরেকটি হাদীসের সমর্থক হওয়ার ক্ষেত্রে তো কোন সমস্যা নেই। মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত হলো জয়ীফ হাদীসও সমর্থকরূপে পেশ করা যায়। আলবানী সাহেবের মতো মানুষের কাছে এটা অজানা থাকার কথা নয়। কারণ তিনি নিজেই ইরওয়া গ্রন্থে ২৩১৭ নং হাদীসটি প্রসঙ্গে বলেছেন, وله شاهد مرفوع এর সমর্থক একটি মারফূ হাদীস আছে। অতঃপর তিনি আব্দুল জব্বার কর্তৃক তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, 'আছছামারুল মুসতাতাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব' গ্রন্থে আব্দুল জব্বারের এমন একটি সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا لأن عبد الجبار ثبت عنه في (صحيح مسلم) أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي

অর্থাৎ এ হাদীসটির সনদ হাসান। তবে এতে সূত্রবিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কেননা (সহীহ মুসলিমে) আব্দুল জব্বারের বাচনিক বিধৃত হয়েছে যে, আমি ছোট ছিলাম, বাবার নামায বুঝতাম না। (দ্র. পৃ. ১৫৪)

এখানে তিনি কত সুন্দর সনদটি হাসান তবে ... বলে উল্লেখ করলেন। আর হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার হাদীসটিকে প্রথমেই মা'লুল (দোষযুক্ত দুর্বল) বলে নাকচ করে দিলেন।

আলবানী সাহেবের একটি বড় ভুলও এখানে ধরা পড়েছে। তিনি আব্দুল জব্বারের এই শেষোক্ত বক্তব্যটিকে সহীহ মুসলিমের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। অথচ এটি মুসলিম শরীফে নেই। আছে আবু দাউদ (৭২৩) ইবনে খুযায়মা (৯০৫), তাহাবী (১৫৩৪), ইবনে হিব্বান (১৮৬২), ও তাবারানীর আল মুজামুল কাবীর (৬১) গ্রন্থে।

'আমি ছোট ছিলাম' আব্দুল জব্বারের এ উক্তির সনদ সহীহ। যেমনটি বলেছেন শোয়াইব আরনাউত ও আলবানী সাহেব। ইমাম বুখারীসহ অনেকে যে বলেছেন, 'আব্দুল জব্বার মার্তৃগর্ভে থাকাকালে তার পিতার ইন্তেকাল হয়' সেটা এই উক্তি দ্বারা নাকচ হয়ে যায়। একারণে তাহযীবুল কামালে মিযযী ও জামিউত তাহসীলে আলাঈ রহ. জোর দিয়ে বলেছেন, বুখারী প্রমুখের বক্তব্য সঠিক নয়। আসলে ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইবনে হুজর এর কথার উপর ভিত্তি করেই ঐ বক্তব্য দিয়েছেন। (দ্র. আততারীখুল কাবীর) অথচ মুহাম্মদ ইবনে হুজর ছিলেন জয়ীফ বা দুর্বল। দুর্বল রাবীর কথায় বিশ্বস্ত রাবীর মতামতকে উপেক্ষা করার এও একটি নজীর। ইমাম বুখারী নিজেও তার 'তারীখে' ফিতর ইবনে খালীফার বরাত দিয়ে আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল জব্বার বলেছেন, আমি পিতাকে বলতে শুনেছি। কিন্তু বুখারী ও ইবনে হিব্বান এ কথাটিও নাকচ করে দিয়েছেন।

হযরত আনাস রা. বর্ণিত হাদীসঃ

এ হাদীস সম্পর্কে আলবানী সাহেব বলেছেন,

قال الدارقطني والبيهقي: "تفرد به العلاء بن إسماعيل. " قلت : وهو مجهول ؛ كما قال ابن القيم (١/٨١) ، وكذلك قال البيهقي – على ما في " التلخيص"

অর্থাৎ দারাকুতনী ও বায়হাকী বলেছেন, এ হাদীসটি বর্ণনার ব্যাপারে আলা ইবনে ইসমাঈল নিঃসঙ্গ। আমি (আলবানী সাহেব) বলব, তিনি ছিলেন মাজহূল বা অজ্ঞাত। যেমনটি বলেছেন ইবনুল কায়্যিম এবং বায়হাকীও তাই বলেছেন। তালখীস গ্রন্থ থেকে সেটা জানা গেছে।

বায়হাকীও মাজহূল বলেছেন– একথাটি আলবানী সাহেবের বোঝার ভুল। আত তালখীসুল হাবীর গ্রন্থের উপস্থাপনা থেকে এ ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। ঐ মন্তব্য আসলে ইবনে হাজার আসকালানীর, বায়হাকীর নয়। তবু তো শোকর, আলবানী সাহেব সেই গ্রন্থের বরাতেই কথাটি উল্লেখ করেছেন, যে গ্রন্থে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। কিন্তু মুবারকপুরী সাহেব তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে এবং শামসুল হক আযীমাবাদী সাহেব 'আওনুল মাবুদ' গ্রন্থে তালখীস গ্রন্থের বরাত ছাড়াই বলে দিয়েছেন, বায়হাকী তাকে মাজহূল বলেছেন!!

অবশ্য আলবানী সাহেবের ব্যাপারে একটু বেশি আশ্চর্য এজন্য লাগে যে, বায়হাকী'র গ্রন্থাবলি তার সামনে। তিনি সেগুলো ঘাটাঘাটিও করেছেন বিস্তর। বায়হাকীর কোন গ্রন্থে তিনি ঐ মন্তব্য অবশ্যই দেখতে পাননি। তারপরও কেন এত শৈথিল্য তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

আমাদের জানামতে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের কেউই আলা ইবনে ইসমাঈলকে মাজহূল বলেন নি। বরং হাকেম তার আল মুসতাদরাক গ্রন্থে আলা'র এ হাদীসকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ আখ্যা দিয়ে জানান দিয়েছেন, আলা তার নিকট পরিচিত। এদিকে আলা থেকে হাদীস বর্ণনাকারী তিনজন মুহাদ্দিসের নাম পাওয়া গেছে। ১. আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ আদ দূরী, (হাকেম, দারাকুতনী, বায়হাকী) ২. মুহাম্মদ ইবনে আইয়্যূব (দ্র. ইবনে মানদাহ কৃত ফাতহুল বাব ফিল কুনা ওয়াল

আলকাব, নং ১৯৪৭, ৩. ইবনে আবূ খায়ছামা। এই তৃতীয়জন তার আত তারীখুল কাবীরে (নং ৮১) বলেছেন,

حدثنا العلاء بن إسماعيل الكوفي أبو الحسن منزله بفيد نا حفص بن غياث فذكر حديث الباب

অর্থাৎ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আলা ইবনে ইসমাঈল আলকূফী আবুল হাসান। তার নিবাস ছিল ফায়দ (মক্কা ও কুফার মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ এলাকা।) তিনি বলেছেন, হাফস ইবনে গিয়াস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, ...। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবু খায়ছামা শুধু তার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনাই করেন নি। সেই সঙ্গে আলা কোথায় বসবাস করতেন তাও উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, তিনি তাকে ভালোভাবেই চিনতেন জানতেন। সুতরাং এমন ব্যক্তি অজ্ঞাত হয় কীভাবে? দারাকুতনী ও বায়হাকী তার হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তাকে মাজহূল বা অজ্ঞাত বলেন নি।

এরপর আলবানী সাহেব লিখেছেন,

وأما قول الحاكم والذهبي : إنه " حديث صحيح على شرط الشيخين " فمنكر من القول ، لم يسبقهما ، ولم يتابعهما عليه أحد.

অর্থাৎ হাকেম ও যাহাবী যে বলেছেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ, এটা অশোভন কথা। তাদের পূর্বেও কেউ এমন কথা বলেন নি। তাদের পরেও কেউ এটা সমর্থন করেন নি। (আসলু সিফাতিস সালাহ, ২/৭১৭)

অথচ আলবানী সাহেবের বিভিন্ন গ্রন্থে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে তিনি হাকেমের সহীহ বলাকে লুফে নিয়েছেন। সেখানেও হাকেমের আগে পরে কেউ উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেন নি। ইবনে উমর রা.এর হাদীসটির কথাই ধরুন, যেটাকে আলবানী সাহেব তার মতের স্বপক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। সে হাদীসকেও হাকেম ছাড়া কেউ সহীহ বলেন নি। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে। অথচ আলবানী সাহেব হাকেমের উদ্ধৃতি থেকে জোর দিয়ে বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

তাহলে এখানে তিনি হাকেমের উপর এত ক্ষিপ্ত হলেন কেন? এ হাদীসটি তার মতের বিপক্ষে গেছে তাই?

এরপর তিনি লিখেছেন,

وقال الحافظ في ترجمة العلاء هذا من "اللسان: " "وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث ، وهو من أثبت الناس في أبيه ؛ فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه . وهذا هو المحفوظ. "

অর্থাৎ হাফেজ (ইবনে হাজার) লিসানুল মীযান গ্রন্থে এই আলা'র জীবনীতে বলেছেন, হাফস ইবনে গিয়াসের ছেলে উমর– যিনি তার পিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য– তার (আলা'র) থেকে ব্যতিক্রম বর্ণনা করেছেন। তিনি তার পিতার সূত্রে আ'মাশ থেকে, তিনি ইবরাহীম নাখায়ীর সূত্রে আলকামা প্রমুখ থেকে উমর রা.এর নিজস্ব আমলরূপে এটি বর্ণনা করেছেন। আর এটাই হলো সঠিক বর্ণনা। (প্রাগুক্ত, ২/৭১৭)

আমরা বলব, এ দুটি বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন দুটি হাদীস। এর একটিকে অপরটির মোকাবেলায় দাঁড় করানো উচিৎ নয়।

পরিশেষে তিনি বলেছেন,

على أن حديث أنس لو صح ؛ ليس فيه التصريح أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضع ركبتيه قبل يديه ، وإنما فيه سَبْقُ الركبتين اليدين فقط ، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما – كما قال ابن حزم رحمه الله. -

অর্থাৎ অধিকন্তু আনাস রা. বর্ণিত হাদীসটি যদি সহীহও হয়, তথাপি এতে স্পষ্ট বলা হয় নি যে, নবী সা. হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন। সেখানে এতটুকু বলা হয়েছে, তাঁর হাঁটু আগে যেত। এমনও তো হতে পারে, মাটিতে রাখার সময় নয়, নড়াচড়ার সময় হাঁটু আগে যেত। যেমনটি বলেছেন ইবনে হাযম রহ.। (প্রাগুক্ত)

এ বড়ই আশ্চর্যের কথা। নড়াচড়ার সময় হাঁটু আগে যাবে কি করে? যারা বলেন, হাঁটুর পূর্বে হাত রাখবে তারা তো হাত মাটিতে রাখার পর হাঁটু হেলিয়ে থাকেন। সুতরাং সেটা আগে যাওয়ার সুরত কী? হাঁটু তো আর কাপড়ের আচল নয় যে, এমনিতেই নড়াচড়া করবে।

তাছাড়া শুধু ইবনে হাযমের উপর নির্ভর করলেন কেন? দারাকুতনী, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখকে একটু জিজ্ঞেস করুন, তারা হাদীসটির কি অর্থ বুঝেছেন এবং কোন বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ সেটি উদ্ধৃত করেছেন?

হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার দলিল : একটু পর্যালোচনা

এক্ষেত্রে দুটি হাদীস এসেছে। হাদীসদুটি পর্যালোচনাসহ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রথম হাদীস

প্রথম হাদীসটি আবু হুরায়রা রা.এর সূত্রে বর্ণিত। এটি দুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ক. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন,

يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل

অর্থাৎ তোমাদের কেউ কেউ কি এমন করে যে, নামাযে উটের মতো করে বসে? (তিরমিযী, ২৬৯; নাসাঈ, ১০৯০)

এ হাদীসে উটের মতো করে বসা যে অপছন্দনীয় সেটাই প্রকাশ করা হয়েছে। আলেমগণের এক জামাত বলেছেন, উটের সামনের পা দুটিই হলো হাত। তাই যেহেতু উট প্রথমে হাত গুটিয়ে বসে, তাই এটা অপছন্দ করার অর্থ হলো আগে হাঁটু পরে হাত রেখে সেজদা করা। আল্লামা আবু বকর জাসসাস রাযী, সারাখসী, ইবনুল কাইয়্যিম, আমীর ইয়ামানী, হাসান ইবনে আহমদ সানআনী (ফাতহুল গাফফার প্রণেতা) ও শায়খ সালিহ উছায়মীন প্রমুখ এ মতই অবলম্বন করেছেন। আবার ইমাম তাহাবী, ফযলুল্লাহ তুরেবিশতী, মুবারকপুরী ও আলবানী সাহেবসহ অনেকে বলেছেন, উটের সামনের পায়েই যেহেতু তার হাঁটু, সে হিসাবে উট প্রথমে

হাঁটু রাখে, তাই হাদীসে এটাকে অপছন্দ করে আগে হাত রেখে পরে হাঁটু রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

কিন্তু এই বিতর্কের পূর্বে আমাদেরকে দেখতে হবে, হাদীসটি আসলে সঠিক ও প্রমাণিত কি না। হাদীসটির দুজন রাবী নিয়ে কথা আছে। একজন হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান। তার সম্পর্কে নাসাঈ বিশ্বস্ত হওয়ার দাবি করলেও ইমাম বুখারী রহ. তার আত তারীখুল কাবীরে এ হাদীসটি উল্লেখপূর্বক মন্তব্য করেছেন, لا يتابع عليه ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لা অর্থাৎ তার হাদীসটির সমর্থন পাওয়া যায় না। আমি জানি না তিনি আবুয যিনাদ থেকে (হাদীসটি) শুনেছেন কি না। (নং ৪১৮)

অপর রাবী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নাফি আস সাইগ। তার বিশ্বস্ততা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ইবনে মাঈন ও ইজলী প্রমুখ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ বলেছেন, لم يكن في الحديث بذاك অর্থাৎ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে তেমন মজবুত ছিলেন না। ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, يعرف حفظه وينكر وكتابه أصح অর্থাৎ তার স্মৃতি কখনো ঠিক থাকে, কখনো আপত্তিকর ঠেকে, তবে তার কিতাব অধিক শুদ্ধ। আবু হাতেম রাযী বলেছেন, هو لين في حفظه وكتابه أصح অর্থাৎ তিনি স্মৃতির ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন, তার কিতাব অধিক শুদ্ধ ছিল। (দ্র. তাহযীবুল কামাল ও আলজারহু ওয়াত তাদীল) আবু যুরআ রাযী এক বর্ণনায় তো বলেছেন, لا بأس به অর্থাৎ তার মধ্যে তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু বারযায়ীর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, هو عندي منكر الحديث অর্থাৎ তিনি আমার দৃষ্টিতে আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। বারযায়ী আরো বলেন, ذكرت أصحاب مالك يعني لأبي زرعة فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ فكلح وجهه

অর্থাৎ আমি মালেক রহ.এর শিষ্যদের কথা উল্লেখ করলাম অর্থাৎ আবু যুরআর নিকট, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে নাফি আস সাইগ এর কথা বলতেই তিনি মুখ কালো করে ফেললেন।

ইবনে হিব্বান বলেছেন, كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ অর্থাৎ তার কিতাব সঠিক, যখন তিনি মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করেন, তখন মাঝেমধ্যেই ভুল করেন। দারাকুতনী বলেছেন, فقيه يعتبر به অর্থাৎ তিনি ফকীহ, অন্যের সমর্থনকল্পে তাকে গ্রহণ করা যায়। ইবন মানজুয়াহ তার রিজালু সাহীহ মুসলিম গ্রন্থে বলেছেন, في حفظه شيئ তার স্মৃতিশক্তিতে সমস্যা ছিল। এসব মন্তব্য বিবেচনায় নিয়েই ইবনে হাজার আসকালানী তার তাকরীব গ্রন্থে লিখেছেন, ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين অর্থাৎ তিনি বিশ্বস্ত, তার কিতাবও সঠিক, তবে তার স্মৃতিতে দুর্বলতা ছিল।

এখন এ হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দেওয়ার একটাই পথ। আর তা হলো একথা প্রমাণ করা যে, তিনি এ হাদীসটি তার কিতাব থেকেই বর্ণনা করেছেন। কিতাব থেকে বর্ণনা করলেও সহীহ তখন হতো যদি তার উস্তাদ সমালোচনার উর্ধ্বে হতেন। কিন্তু পেছনে আমরা দেখলাম, তিনিও সমালোচনা মুক্ত নন। বিশেষ করে ইমাম বুখারী তার নির্ণয়ন নিয়েও দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। এবং তাকে তার আয যুআফা (দুর্বল রাবীদের জীবনচরিত) গ্রন্থে উল্লেখ করে তার দুর্বল হওয়ারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ কথার উদ্ধৃতি একটু পরেই আসছে।

এসব কারণে এই হাদীসকে সহীহ বলা তো দূরের কথা, হাসান বলাও মুশকিল। তাই তো ইমাম তিরমিযী ও আবু বকর হাযেমী এই হাদীসকে গরীব বলে এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বুখারী ও দারাকুতনীও এটি মা'লুল বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। মুহাদ্দিস হামযা কিনানী (মৃত্যু ৩৫৭ হিজরী) বলেছেন, هو منكر অর্থাৎ এটি আপত্তিকর

বর্ণনা। ইবনে রজব হাম্বলী তার বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেছেন, لا يثبت এটি প্রমাণিত নয়।

শুধু তারাই নন, স্বয়ং আলবানী সাহেবও সাহীহা গ্রন্থে (৩১৯৬) وفيه ضعف من قبل حفظه قال আব্দুল্লাহ ইবনে নাফি' সম্পর্কে বলেছেন, الحافظ في التقريب : ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তার মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। হাফেজ তাকরীবে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত, তার কিতাব সঠিক কিন্তু তার স্মৃতিতে কিছু দুর্বলতা আছে। এর চেয়েও আশ্চর্য হলো, জয়ীফা গ্রন্থে (৬৬১৬) তিনি তার হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن نافع – هو: الصائغ، وهو -: ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين – كما في " التقريب " -، ولا أدري هذا مما حدث به من كتابه أم من حفظه.

অর্থাৎ আমি বলব, এই সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনে নাফি' আসসাইগ বিশ্বস্ত, তার কিতাবও সঠিক। কিন্তু তার স্মৃতিতে কিছু দুর্বলতা রয়েছে, যেমনটি তাকরীব গ্রন্থে বলা হয়েছে। আমার জানা নেই, এই হাদীসটি তিনি কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন না স্মৃতি থেকে।

এমনিভাবে জয়ীফে আবু দাউদে আলবানী সাহেব তার হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন, وهو ضعيف من قبل حفظه অর্থাৎ তিনি স্মৃতির দুর্বলতার কারণে দুর্বল। (নং ৭৮) উক্ত গ্রন্থেই ২২১ নং হাদীস সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, إسناده ضعيف ابن نافع لين الحفظ অর্থাৎ এর সনদ দুর্বল। ইবনে নাফি স্মৃতি-দুর্বল ছিলেন।

তাহলে আলবানী সাহেবের নীতি অনুসারেও উল্লিখিত হাদীসটি যঈফই প্রমাণিত হয়। আর বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তো এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেনই।

খ. হাদীসটি ভিন্ন আরেকটি সূত্রে একটু ভিন্ন শব্দে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন,

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যখন সেজদা করে তখন উটের মতো করে যেন না বসে। সে যেন তার হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখে। (আবু দাউদ, হাদীস ৮৪০; নাসাঈ, হাদীস ১০৯১; দারিমী, হাদীস ১৩৬০; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৯৫৫; দারাকুতনী, ১/৩৪৫; বায়হাকী, হাদীস ২৬৩৩)

এ হাদীসটির সনদেও দুজন সমালোচিত রাবী রয়েছেন। একজন তো হলেন পূর্ববর্তী সনদটিতে উল্লিখিত সেই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান। অপরজন হচ্ছেন তারই শিষ্য আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ আদ দারাওয়ার্দী। দারাওয়ার্দীর স্মৃতিদুর্বলতা নিয়ে অনেক মুহাদ্দিসই সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেছেন, যখন তিনি স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন ভুল করে ফেলেন, তখন আর তিনি বিশ্বস্ত থাকেন না। আর যখন কিতাব থেকে বর্ণনা করেন তখন ঠিক মতোই বর্ণনা করেন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, স্মৃতি থেকে বর্ণনা করার সময় তিনি অনেক বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, অনেক সময় তিনি অন্যদের কিতাব থেকে বর্ণনা করতেন এবং ভুলের শিকার হতেন। আবু যুরআ রাযী বলেছেন, তিনি দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন। স্মৃতি থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ভুলের শিকার হয়েছেন। নাসাঈ এক বর্ণনায় বলেছেন, তিনি মজবুত বর্ণনাকারী নন। আবু হাতেম রাযী বলেছেন, তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না। এসব কারণে বুখারী ও মুসলিম তার একক কোন বর্ণনা গ্রহণ করেন নি। সুতরাং তার একক বর্ণনাকে সহীহ আখ্যা দেওয়া কঠিন।

আরেকটি কথা, দারাওয়ার্দীর এই বর্ণনায় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাত কোথায় রাখবে তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। কিন্তু এই আব্দুল আযীয দারাওয়ার্দীর অপর একটি বর্ণনা বায়হাকীতে উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, وليضع يديه على ركبتيه অর্থাৎ সে যেন তার উভয় হাত দু'হাঁটুর উপর রাখে। (নং ২৬৩৪)

এটি উদ্ধৃত করার পর বায়হাকী রহ. লিখেছেন,

فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا كَانَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ

অর্থাৎ এ বর্ণনাটি সঠিক হলে এটি সেজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখার দলিল হবে।

এ হিসাবে হাদীসটির মর্ম দাঁড়াবে, তোমাদের কেউ যেন উটের মতো করে সেজদায় না যায়। বরং তার হাঁটু জমিতে রাখার পূর্বেই যেন উভয় হাত দু'হাটুর উপর রাখে। ইমাম কাশ্মিরী রহ.ও হাদীসটির এমর্ম সমর্থন করেছেন। নীমাবী রহ. কৃত আছারুস সুনান গ্রন্থের টীকায় তিনি লিখেছেন,

إنما يريد جعل اليدين على الركبتين حتى يصير شيئا واحدا ولم أر في لفظ ذكر الأرض فالمراد وضع اليدين على موضعهما وهما الركبتان فإنه لا موضع لهما في حين الانحطاط وبين السجدتين والقعدة إلا الركبتان

অর্থাৎ হাদীসটির মর্ম হলো, উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা, যাতে সবটা এক জিনিস হয়ে যায়। এর কোন বর্ণনাতেই আমি জমিনে রাখার উল্লেখ পাই নি। সুতরাং এর মর্ম হবে, উভয় হাত যথাস্থানে রাখা। আর সেই স্থান হলো হাঁটু। কেননা সেজদায় যাওয়ার সময়, দুই সেজদার মাঝে ও বৈঠককালে হাত রাখার স্থানই হলো হাঁটু। (পৃ. ১১৬)

দ্বিতীয় হাদীস :

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. যখন সেজদা করতেন, তখন হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখতেন। (দারাকুতনী, ১/৩৪৪)

এ হাদীস ভিন্ন শব্দে এভাবেও উদ্ধৃত হয়েছে–

عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك

নাফি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখতেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. এমনটি করতেন। সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬২৭), মুসতাদরাকে হাকেম (৯৩০) ও বায়হাকী (২৬৩৮)। হাকেম বলেছেন, এটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

পর্যালোচনা

একাধিক হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হলেও এ হাদীসটির সনদ বা সূত্র মাত্র একটিই। আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দারাওয়ার্দী এটি বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর আলউমারী থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি হযরত ইবনে উমর রা. থেকে। আব্দুল আযীয দারাওয়ার্দী ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেন নি। দারাওয়ার্দীর স্মৃতিদুর্বলতা সম্পর্কে পেছনের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। স্মৃতিদুর্বলতার পাশাপাশি এ হাদীসে আরেকটি বড় সমস্যা হলো, উবায়দুল্লাহ আল উমারী থেকে তাঁর বর্ণনার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। ইমাম আহমদ বলেছেন, ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر অর্থাৎ তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে যত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা সবই আসলে (তারই ভাই) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (আল উমারী) থেকে। (দ্র. আলজারহু ওয়াত তা'দীল লি ইবনি আবী হাতিম, নং ১৮৩৩)

যদি তাই হয়, তবে আব্দুল আযীয দারাওয়ার্দী যত হাদীস উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন তার সবই জয়ীফ বা দুর্বল। কেননা আব্দুল্লাহ আল উমারী মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে দুর্বল ছিলেন।

ইমাম নাসাঈ দারাওয়ার্দী সম্পর্কে বলেছেন, ليس به بأس وحديثه عن عبيد الله منكر অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই, তবে উবায়দুল্লাহ থেকে তার বর্ণনা আপত্তিকর। (দ্র. তাহযীবুল কামাল)

সুতরাং এ হাদীসটি সহীহ হতে পারে না। তাই তো ইমাম মুসলিম রহ. দারাওয়ার্দীর একক বর্ণনা যেমন গ্রহণ করেন নি, তেমনি উবায়দুল্লাহ থেকেও তাঁর কোন বর্ণনা গ্রহণ করেন নি। আর ইমাম বুখারী তো আরো কড়াকড়ি করেছেন। তাই বলা যায়, এটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হয় নি। যদিও হাকেম সে দাবি করেছেন। যারা বলেন, দারাওয়ার্দী যখন মুসলিম শরীফের রাবী, তাই তার একক বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই, বা উবায়দুল্লাহ থেকে দারাওয়ার্দীর বর্ণনা সহীহ হতে কোন বাধা নেই, তাদের বক্তব্য যেমন সুক্ষ্ম চিন্তাপ্রসূত নয়, তেমনি মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্তের সঙ্গেও এর কোন মিল নেই।

ইমাম দারাকুতনীও দারাওয়ার্দীর একক বর্ণনার কারণে এই হাদীসকে মালুল বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র. তানকীহ লি ইবনে আবদিল হাদী, ৮১৫) আর বায়হাকী এটি উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, ما أراه إلا وهما অর্থাৎ আমি এটাকে (দারাওয়ার্দীর) ভুলই মনে করি।

বায়হাকী রহ. আরো বলেছেন,

وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، فَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ لاَ التَّقْدِيمُ فِيهِمَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে এ ক্ষেত্রে যে হাদীসটি প্রসিদ্ধ সেটি হলো, যখন তোমাদের কেউ সেজদা করে সে যেন হাত রাখে এবং যখন উঠে তখন যেন হাত তুলে নেয়। কেননা হাতও চেহারার মতো সেজদা করে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো সেজদার সময় হাত রাখা, পূর্বে রাখা নয়। (নং ২৬৩৯)

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ.ও তার 'তাহযীবে সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে বায়হাকীর এ বক্তব্যের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছেন। সর্বোপরি ইবনে উমর রা.এর এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. মাওকূফ তথা ইবনে উমর রা. এর আমলরূপে উদ্ধৃত করেছেন। মারফূ রূপে নয়। (দ্র, বুখারী শরীফ, অনুচ্ছেদ নং ১২৮)

উল্লেখ্য যে, এই মাওকুফ বর্ণনাটিও দারাওয়ার্দী সেই উবায়দুল্লাহ'র সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম বুখারী সূত্র ব্যতীত এটি উল্লেখ করলেও এতে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। তদুপরি ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বিপরীত আমল উদ্ধৃত হয়েছে মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায়। সেখানে বলা হয়েছে, ইবনে আবু লায়লা বর্ণনা করেছেন নাফে রহ. থেকে, তিনি ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বলেছেন,

أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

অর্থাৎ তিনি সেজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং ওঠার সময় হাঁটু তোলার পূর্বে হাত তুলতেন। (নং ২৭২০)

এর সনদে ইবনে আবু লায়লা রয়েছেন। তার বিশ্বস্ততা নিয়ে দ্বিমত আছে। তিনি মধ্যম স্তরের রাবী, যেমনটি বলেছেন হাফেজ যাহাবী রহ.। অনেকে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে উমর রা.এর পূর্বোক্ত আমলটিও যেহেতু সহীহ সনদে নেই, তাই দুটিই সমমানের হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এ কারণেই ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. তার আল আওসাত গ্রন্থে ইবনে উমর রা. এর মাওকুফ বর্ণনাটি দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন,

وقد تكلم في حديث ابن عمر ، قيل : إن الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف ، وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول

অর্থাৎ ইবনে উমর রা. এর (মারফূ) হাদীসটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বলা হয়, ইবনে উমর রা. এর হাদীসটি মওকুফ হওয়াই সঠিক। আর ওয়াইল ইবনে হুজর রা.এর হাদীসটি প্রমাণিত। আমাদের মতও অনুরূপ। (৩/৩২৭)

আলবানী সাহেবের দাবি : একটু পর্যালোচনা

হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে উমর রা. এর হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা সংক্রান্ত হাদীস দুটি সম্পর্কে আলবানী সাহেব বেশ কিছু দাবি উত্থাপন করেছেন। সেগুলোর কারণে অনেকে ধোঁকায় পড়ে যেতে পারেন। তাই সেসব দাবি সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করা হলো।

১. আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে তিনি তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন, إسناده جيد كما قال النووي والزرقاني অর্থাৎ এর সনদ জাইয়্যিদ বা উৎকৃষ্ট, যেমনটি বলেছেন নববী ও যুরকানী। আর সাহীহা গ্রন্থে লিখেছেন, لقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ منهم عبد الحق الأشبيلي والشيخ النووي অর্থাৎ এক জামাত হাফেযে হাদীস এ হাদীসটিকে

সহীহ বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আব্দুল হক ইশবিলী ও শায়খ নববী।

অথচ ইমাম নববী এটাকে সহীহ বলেন নি। জাইয়্যেদ বলেছেন। জাইয়্যেদ আর সহীহ এক কথা নয়।

ইরওয়াউল গালীল ও আসলু সিফাতিস সালাহ গ্রন্থদ্বয়ে তিনি বলেছেন,

وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهو المعروف بالنفس الزكية العَلَوي ، وهو ثقة – كما قال النسائي وغيره ، وتبعهم الحافظ في " التقريب. - " ولذلك قال النووي في " المجموع " (٤٢١/٣) ، والزُّرْقاني في " شرح المواهب " (٣٢٠/٧): " إسناده جيد " . ونقل ذلك المناوي عن بعضهم ، وصححه السيوطي في " الجامع الصغير . " وصححه عبد الحق في " الأحكام الكبرى " (٥٤/١) . وقال في "كتاب التهجد" (٥٦/١): "إنه أحسن إسناداً من الذي قبله. "

يعني : حديث وائل المعارض له.

অর্থাৎ এ সনদটি সহীহ। এর বর্ণনাকারী সকলে বিশ্বস্ত ও মুসলিমের রাবী। শুধু ব্যতিক্রম হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান, যিনি আন নাফসুয যাকিয়্যা উপাধিতে খ্যাত, তিনি মুসলিমের রাবী না হলেও বিশ্বস্ত। ইমাম নাসাঈ প্রমুখ তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। তাদের অনুসরণে হাফেজ ইবনে হাজারও তাকরীব গ্রন্থে তাই উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই নববী আল মাজমূ গ্রন্থে ও যুরকানী শারহুল মাওয়াহিব গ্রন্থে (৭/৩২০) বলেছেন, এর সনদ জাইয়্যেদ। একই কথা মুনাবীও উল্লেখ করেছেন কারো কারো বরাতে। জামে সগীরে সুয়ূতী এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আব্দুল হকও আল আহকামুল কুবরা গ্রন্থে (১/৫৪) এটিকে সহীহ বলেছেন। আর কিতাবুত তাহাজ্জুদ গ্রন্থে (১/৫৬) তিনি বলেছেন, পূর্বের হাদীসটির (অর্থাৎ এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হযরত ওয়াইল রা.এর হাদীসটির) তুলনায় এর সনদ উত্তম।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

বুখারী ও মুসলিমের রাবীদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, তাদের কেউ যদি স্মৃতিদুর্বল হয়, তাহলে তাঁরা তার হাদীস গড়ে গ্রহণ না করে বেছে বেছে সেসব হাদীসই গ্রহণ করেছেন যেগুলোর সমর্থন অন্যান্য সূত্রে পাওয়া গেছে। এ ধরনের রাবীদের যে কোন হাদীস নিয়েও বলা যাবে না, ইনি বুখারী ও মুসলিমের রাবী, তাই তার হাদীসটি সহীহ।

এ কথা যে আলবানী সাহেব জানতেন না তা নয়। কিন্তু নিজের দলিল পেশ করার সময় এসব কথা তার মনে থাকে না।

দেখুন, সুওয়ায়দ ইবনে সাঈদ মুসলিম শরীফের রাবী। সহীহা গ্রন্থে তার একটি হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

قلت : والإسناد الأول ضعيف فإن سويد بن سعيد مع كونه من شيوخ مسلم فقد ضعف

অর্থাৎ প্রথম সনদটি জয়ীফ বা দুর্বল। কারণ সুওয়ায়দ ইবনে সাঈদ যদিও মুসলিম রহ.এর উস্তাদ, কিন্তু তাকে জয়ীফ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যদিও এ গ্রন্থের ৫০০ নং হাদীসে তিনি উল্টো কথা বলেছেন,

ومثل طريق سويد بن سعيد في الحديث فإنه ثقة من شيوخ مسلم ولكنه اختلط

অর্থাৎ হাদীসে সুওয়ায়দ ইবনে সাঈদের সনদটি যেমন। তিনি তো বিশ্বস্ত ও মুসলিমের উস্তাদ, তবে তার হাদীস উল্টাপাল্টা হয়ে গিয়েছিল।

আবার জয়ীফা গ্রন্থে ৫২৫৫ নং হাদীসটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير سويد ؛ فإنه – مع كونه من شيوخ مسلم – فقد ضعفوه. ومن هنا يظهر لك تساهل البوصيري في "الزوائد" (٢/ ٢٧٩) ؛ حيث قال: "هذا إسناد حسن ؛ سويد مختلف فيه ، ولعله تبع المنذري في تحسينه ،

অর্থাৎ এর রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত ও বুখারী-মুসলিমের রাবী। অবশ্য সুওয়ায়দ ব্যতিক্রম। কেননা তিনি মুসলিমের উস্তাদ হলেও মুহাদ্দিসগণ তাকে জয়ীফ বলেছেন। এখান থেকেই যাওয়াইদ গ্রন্থে বূসীরীর শৈথিল্য ধরা পড়ে। কারণ তিনি বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান, সুওয়ায়দ বিতর্কিত'। হাসান বলার ক্ষেত্রে তিনি হয়ত মুনযিরির অনুসরণ করেছেন।

এতদসত্ত্বেও ইরওয়া গ্রন্থে তিনি সুওয়ায়দ বর্ণিত একটি হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসটি ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে (নং ৪৪৩)। ইরওয়ায় এটি ৮৪ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আন নুকাত গ্রন্থে সুওয়ায়দের কারণে হাদীসটিকে জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে, আলবানী সাহেব একই রাবী ও তার হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। এ নিয়ে আমরা আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ তার লেখায় এমন স্ববিরোধিতা বিস্তর। এ নিয়ে তানাকুযাতুল আলবানী (আলবানীর স্ববিরোধী বক্তব্য) নামে আরবী ভাষায় স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আমরা যে বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি তা হলো, সুওয়ায়দ মুসলিম শরীফের রাবী। ইমাম মুসলিম তার সেই সময়কার হাদীস নিয়েছেন যখন তার স্মৃতিশক্তি ভাল ছিল। অথবা বেছে বেছে তার সেসব বর্ণনা নিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তার আস্থা অর্জিত হয়েছিল। সুতরাং এ ধরনের রাবীর যে কোন হাদীস নিয়েই বলা যাবে না, ইনি মুসলিম শরীফের রাবী, তাই হাদীসটি সহীহ।

এবারে আমাদের আলোচ্য হাদীসগুলোতে আসা যাক। এর একজন রাবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান। তার হাদীসের সঠিকতা নিয়ে ইমাম বুখারীর আপত্তি রয়েছে। বুখারী মুসলিমের কেউই তার হাদীস গ্রহণ করেন নি। ইবনে সাদ বলেছেন, وكان قليل الحديث অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বুখারী বলেছেন, لا يتابع عليه অর্থাৎ তার এ হাদীসটির সমর্থন পাওয়া যায় না। তাহলে এ ধরনের রাবীর স্মৃতি যে দুর্বল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাছাড়া এ রাবীর নির্ণয়ন নিয়েও ঝামেলা আছে। ইবনে রজব হাম্বলী তার বুখারী শরীফের ভাষ্য ফাতহুল বারীতে লিখেছেন,

ومحمد راويه ، ذكره البخاري في الضعفاء ، وقال : يقال : ابن حسن فكأنه توقف في كونه محمد بن عبد الله بن حسين بن حسن الذي خرج بالمدينة على المنصور ، ثم قتله المنصور بها.

অর্থাৎ ইমাম বুখারী তার জুয়াফা (দুর্বল রাবীদের জীবনচরিত) গ্রন্থে বলেছেন, বলা হয় ইনি ইবনে হাসান। তিনি যেন এ নিয়ে দ্বিধান্বিত যে, ইনিই সেই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান কি না। যিনি খলীফা মনসূরের বিরুদ্ধে মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। পরে মনসূর তাকে সেখানেই হত্যা করেছিল। (ফাতহুল বারী, ৭/২১৮)

আরেকজন রাবী হলেন দারাওয়ার্দী। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য পেছনে সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। আলবানী সাহেবেরও সেগুলো জানা। একারণে দারাওয়ার্দীর হাদীসকে তিনি কখনো বলেছেন সহীহ, কখনো হাসান কখনো জয়ীফ। কখনো তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন, কখনো সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ (মধ্যম মান বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা), কখনো তার হাদীসকে জয়ীফ বলে মুহাদ্দিসগণের মন্তব্যগুলো এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, দারাওয়ার্দী তার নিকটও জয়ীফ। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করে পারছি না।

১. ইরওয়া গ্রন্থে ২৩২২ নং হাদীসের আলোচনায় নুআয়ম ইবনে হাযযালের বর্ণনাটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد إسناده حسن ورجاله رجال مسلم

অর্থাৎ আবু দাউদ, ইবনে আবী শায়বা ও আহমদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এর সনদ হাসান। এর রাবীগণ মুসলিমের রাবী।

উল্লেখ্য, এর সনদে দারাওয়ার্দী আছেন। কিন্তু সকলে মুসলিমের রাবী হওয়া সত্ত্বেও কেন সনদটি হাসান হলো তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি।

২. সহীহা গ্রন্থে ২২১৮ নং হাদীসের আলোচনায় এই দারাওয়ার্দী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

و هو ثقة عند ابن حبان و غيره ، فيه ضعف يسير من قبل حفظه ، فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن ، و قد احتج به مسلم.

অর্থাৎ তিনি ইবনে হিব্বান প্রমুখের নিকট বিশ্বস্ত, স্মৃতিশক্তির দিক থেকে তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তাই তার হাদীস হাসান মানের চেয়ে নিম্নের হবে না। মুসলিম রহ. তাকে (তার হাদীসকে) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

৩. 'তাসহীহু হাদীসি ইফতারিস সাইম' গ্রন্থে দারাওয়ার্দির একটি হাদীসকে মুনকার (আপত্তিকর) ও শায (দলবিচ্ছিন্ন) আখ্যা দিয়ে আলবানী সাহেব মন্তব্য করেছেন,

لأنه مختلف فيه وقد وصفه أبو زرعة وغيره بأنه سيئ الحفظ فلا جرم أن البخاري لم يحتج به.

অর্থাৎ কেননা তিনি বিতর্কিত, আবু যুরআ প্রমুখ তাকে স্মৃতি-দুর্বলতার শিকার আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই বুখারী রহ. তার হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন নি।

৪. ইরওয়া গ্রন্থে ৫৬৪ নং হাদীসের আলোচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন,

لكن الظاهر أن الدراوردي كان يضطرب في إسناده وهو صدوق احتج به مسلم إلا أنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ

অর্থাৎ এটাই স্পষ্ট যে, দারাওয়ার্দী এ হাদীসটির সনদ একেক বার একেক রকম বলেছেন। তিনি সাদূক। ইমাম মুসলিম তাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন। তবে তিনি (দারাওয়ার্দী) অন্যের কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতে যেয়ে ভুল করতেন।

৫. ইরওয়া গ্রন্থেই ২৪২১ নং হাদীসটিকে আলবানী সাহেব জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসটি দারাওয়ার্দী বর্ণিত এবং অন্যান্য রাবীগণও মুসলিমের মানোত্তীর্ণ। যেমনটি বলেছেন হাকেম, আর সমর্থন করেছেন যাহাবী ও শেষে আলবানী সাহেব নিজেও। এ হাদীসটির সকল রাবী বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও আলবানী সাহেব এটিকে জয়ীফ বলেছেন শুধু এ কারণে যে, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে ইসহাক ও ইবনে জুরায়জ হাদীসটি মুরসাল (সূত্রবিচ্ছিন্ন)রূপে বর্ণনা করেছেন। এরপর আলবানী সাহেব মন্তব্য লিখেছেন,

وإنَّ وَصْلَه وَهمٌ من الدراوردي فإنه وإن كان ثقة في نفسه ففي حفظه شيئ قال الحافظ صدوق يخطئ كان يحدث من كتب غيره فيخطئ وقال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر وقال الذهبي في الميزان : صدوق غيره أقوى وقال أحمد : إذا حدث من حفظه يهم ليس هو بشيء وإذا حدث من كتابه فنعم ، وإذا حدث من حفظه جاء بالبواطيل وأما ابن المديني فقال : ثقة ثبت وقال أبو حاتم : لا يحتج به.

এ হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা দারাওয়ার্দীর একটি ভুল। তিনি মূলত বিশ্বস্ত হলেও তার স্মৃতিশক্তিতে সমস্যা ছিল। হাফেজ (ইবনে হাজার) বলেছেন, তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ, তবে ভুল করতেন। অন্যদের কিতাব থেকে তিনি হাদীস বর্ণনার সময় ভুল করতেন। নাসাঈ বলেছেন, উবায়দুল্লাহ থেকে তার বর্ণনা আপত্তিকর। যাহাবী মীযান গ্রন্থে বলেছেন, তিনি সাদূক, তবে অন্যরা তার চেয়ে মজবুত। ইমাম আহমদ বলেছেন, তিনি যখন স্মৃতি থেকে বর্ণনা করতেন তখন ভুল করতেন, আর যখন কিতাব থেকে বর্ণনা করতেন, তখন ঠিক ঠিক বর্ণনা করতেন। তিনি আরো বলেছেন, যখন তিনি স্মৃতি থেকে বর্ণনা করতেন তখন বাতিল হাদীস বর্ণনা করতেন। ইবনুল মাদীনী অবশ্য বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত ও সুদৃঢ় ছিলেন। আবু হাতেম রাযী বলেছেন, তার (হাদীস) দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না।

এ হলো আলবানী সাহেবের বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণের এসব মন্তব্যের কারণেই তো আমরা বলেছি, দারাওয়ার্দীর আলোচ্য হাদীসকে (সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখা) সহীহ বলা মুশকিল। ইমাম তিরমিযী ও হাযেমী এ হাদীসকে গরীব বলে এর দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হামযা আল কিনানী বলেছেন, মুনকার বা আপত্তিকর। ইবনে রজব বলেছেন, لا يثبت এটি প্রমাণিত নয়। এছাড়া বুখারী ও দারাকুতনীও এটিকে মালূল বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আলবানী সাহেবও দারাওয়ার্দীকে কখনো বিশ্বস্ত (ছিকাহ), কখনো সাদূক বলেছেন। তার হাদীসকে কখনো

সহীহ, কখনো হাসান এবং কখনো জয়ীফ আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসকে এত জোর দিয়ে সহীহ বলা পক্ষপাতমূলক দুষ্টতা বৈ নয়।

খ. নববী ও যুরকানী এর সনদকে উৎকৃষ্ট বলেছেন ঠিক আছে, কিন্তু তারা তো শরীকের বর্ণনাকেও জাইয়্যেদ বা উৎকৃষ্ট মনে করতেন। সেটা গ্রহণ করা হলো না কেন?

তাছাড়া ইমাম নববী তার রওযাতুত তালিবীন গ্রন্থে স্পষ্ট লিখেছেন,

فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض من الساجد ركبتيه ثم يديه ثم أنفه وجبهته

অর্থাৎ সুন্নত হলো সিজদাকারীর হাঁটু সর্বপ্রথম মাটিতে লাগবে, তারপর হাত, তারপর নাক ও কপাল। (১/২৫৮)

ইমাম নববীর একথা কি আপনি মানেন?

গ. আলবানী সাহেব বলেছেন, মুনাবীও কারো কারো বরাতে একথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আলবানী সাহেব রীতিমতো সত্য গোপন করেছেন। মুনাবী তার ফায়যুল কাদীর গ্রন্থে লিখেছেন,

رمز المؤلف لصحته اغترارا بقول بعضهم سنده جيد وكأنه لم يطلع على قول ابن القيم وقع فيه وهم من بعض الرواة الخ

অর্থাৎ গ্রন্থকার (সুয়ূতী) এটি সহীহ হওয়ার সংকেত ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ যে বলেছেন, এর সনদ জাইয়্যেদ বা উৎকৃষ্ট, তিনি হয়তো সে কারণে ধোঁকার শিকার হয়েছেন। তিনি মনে হয় ইবনুল কায়্যিমের বক্তব্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না যে, এ হাদীসে জনৈক রাবীর তরফ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। (১/৩৭৩)

একইভাবে আত তায়সীর গ্রন্থে মুনাবী বলেছেন,

رمز المؤلف لصحته وليس كما قال

অর্থাৎ গ্রন্থকার (সুয়ূতী) এটি সহীহ হওয়ার সংকেত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি যেমনটি বলেছেন ব্যাপারটি তেমন নয়। (১/১০৪)

লক্ষ করুন, মুনাবী কি বলেছেন, আর আলবানী সাহেবের উদ্ধৃতি থেকে কি বোঝা যায়।।

ঘ. জামে সগীরে সুয়ূতীও এটিকে সহীহ বলেছেন একথা ঠিক আছে। কিন্তু পাঠক একটু পূর্বে এই কিতাবের ভাষ্যকার মুনাবীর মন্তব্য অবহিত হয়েছেন। আসলে সহীহ বলার ক্ষেত্রে সুয়ূতী ছিলেন শিথিল মনোভাবাপন্ন। এই কিতাবটি সম্পর্কে ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, এতে কোন জাল হাদীস আনবেন না। কিন্তু তারপরও এতে অনেক অনেক জাল হাদীস এসে গেছে। সুতরাং জামে সাগীরে সহীহ বলার কথা বলে লাভ নেই।

ঙ. আলবানী সাহেব লিখেছেন, আব্দুল হক (আল ইশবিলী) তার আল আহকামুল কুবরা গ্রন্থে (১/৫৪) এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

এ বরাতটি ভুল বলে মনে হয়। আহকামুল কুবরা গ্রন্থে এ কথা নেই। সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায়ও নেই, অন্য কোথাও নেই। অনেক অনুসন্ধান করেও আমরা এর হদিস পাই নি। হ্যাঁ, কিতাবুত তাহাজ্জুদে তিনি যে أحسن إسنادا বলেছেন, সেটি পাওয়া গেছে।

এরপর আলবানী সাহেব লিখেছেন,

وقد أعله بعضهم بثلاث علل: الأولى : تفرد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله . والثانية : تفرد محمد هذا عن أبي الزناد . والثالثة : قول البخاري : "لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا. "

অর্থাৎ কেউ কেউ এ হাদীসটির তিনটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে দারাওয়ার্দী একাকী এটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়, মুহাম্মদও একাকী আবুয যিনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়, ইমাম বুখারীর বক্তব্য, জানি না আবুয যিনাদ থেকে তিনি (মুহাম্মদ) শুনেছেন কি না।

প্রথমত, এখানে আলবানী সাহেব ‘কেউ কেউ ... উল্লেখ করেছেন’ বলে ব্যাপারটিকে হালকা করেছেন। বড় বড়দের নাম উল্লেখ করলে পাঠক সেদিকেই ঝুঁকে পড়েন কি না সেজন্যই কারো নাম উল্লেখ না করে শুধু কেউ কেউ বলেই চালিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, ইমাম বুখারীর কথা তিনি অর্ধেক নকল করেছেন। কারণ এ অর্ধেকের জবাব দেওয়া সহজ। বাকি অর্ধেকের জবাব দেওয়া অত সহজ

নয়। সে অর্ধেকে বুখারী রহ. বলেছেন, لا يتابع عليه এ হাদীসটির ক্ষেত্রে তার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কে– তা নিয়েও ইমাম বুখারী দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। পেছনে ইবনে রজব হাম্বলীর বরাতে এ কথা তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর আলবানী সাহেব বলেন,

وهذه العلل ليست بشيء: أما الأولى والثانية ؛ فلأن الدراوردي وشيخه محمداً هذا ثقتان – كما تقدم – ؛ فلا يضر تفردهما بهذا الحديث ، وليس من شرط الحديث الصحيح أن لا ينفرد بعض رواته به ، وإلا ؛ لما سلم لنا كثير من الأحاديث الصحيحة ،

অর্থাৎ এগুলো কোন ত্রুটি নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, দারাওয়ার্দী ও তার উস্তাদ এই মুহাম্মদ দুজনই যখন বিশ্বস্ত, তখন এই হাদীস বর্ণনায় তাদের নিঃসঙ্গতা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। সহীহ হাদীসের জন্য এমন কোন শর্ত নেই যে, তার কোন বর্ণনাকারী নিঃসঙ্গ হতে পারবে না। অন্যথায় অনেক সহীহ হাদীসই নিখাদ থাকবে না।

সেই ঘুরে ফিরে একই কথা। তাদের বিশ্বস্ততাই তো প্রশ্নবিদ্ধ। স্বয়ং আপনার কাছেও। সুতরাং বারবার একই কথা বলে পাঠককে ধোঁকা দেওয়ার কি অর্থ? আমরা কি ইমাম বুখারী, তিরমিযী, হামযা কিনানী, আবু বকর হাযিমী ও ইবনে রজব হাম্বলী প্রমুখের কথা মানব, না আপনার কথা? এমনিভাবে ইমাম আহমদ, আবু যুরআ রাযী, আবু হাতেম রাযী সহ যারা দারাওয়ার্দীর স্মৃতিশক্তি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন তাদের কথা গ্রহণ করব, না আপনার কথা? দারাওয়ার্দীর স্মৃতিদুর্বলতার কথা তো আপনিও মেনে নিয়েছেন। তাহলে তার বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত থাকে কীভাবে?

আর আপনি যে বলেছেন, 'সহীহ হাদীসের জন্য এমন কোন শর্ত নেই যে, তার কোন বর্ণনাকারী নিঃসঙ্গ হতে পারবে না' এটি আংশিক সত্য। কারণ কোন রাবীর স্মৃতি যদি দুর্বল হয় তবে তার হাদীস ত্রুটি মুক্ত হলে হাসান স্তরের হবে। একাধিক সনদ ও সূত্রে বর্ণিত হলেই কেবল সেটি সহীহ'র মানে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

এত গেল যদি তার বর্ণনা অন্য কোন হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। যদি সাংঘর্ষিক হয়, তবে তো হাসান হওয়াও মুশকিল।

আলবানী সাহেব নিজেও একথা বলেছেন। 'আছ ছামারুল মুসতাতাব ফী ফিকহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব' গ্রন্থে মসজিদে প্রবেশ ও সেখান থেকে বের হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদীসের আলোচনায় দারাওয়ার্দীর দুটি ভুল চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন,

وهو وإن كان ثقة ففيه شيء فلا يحتج به أيضا إذا خالف الثقات

অর্থাৎ তিনি বিশ্বস্ত হলেও তার মধ্যে কিছু সমস্যা ছিল। সুতরাং তিনি অন্যান্য বিশ্বস্ত রাবীদের বিপরীত বর্ণনা করলে সেটা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না।

আলোচ্য বিষয়ে দারাওয়ার্দীর বর্ণনাটি যেমন শরীকের বর্ণনার বিপরীত, তেমনি হযরত উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.এর মতো প্রবীন সাহাবীগণের আমলেরও বিপরীত। সুতরাং এটা কি করে প্রামাণ্য হবে?

চ. আলবানী সাহেব জয়ীফাগ্রন্থে (৯২৯) হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

لما ثبت في أحاديث كثيرة من النهي عن بروك كبروك الجمل

অর্থাৎ কেননা বহু হাদীসে উটের মতো করে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য হলো এটা অতিশয়োক্তি মাত্র। আমাদের অনুসন্ধানমতে হযরত আবু হুরায়রা রা.এর হাদীসটি ছাড়া এ মর্মে দ্বিতীয় কোন হাদীস নেই। আলবানী-ভক্তদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন আরেকটি হাদীস বের করে দেখান। অন্যথায় এর দ্বারা মানুষ প্রতারিত হতে পারে।

জ. আরেকটি কথা আলবানী সাহেব ও তার ভক্তরা উদ্ধৃত করে থাকেন হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর বুলূগুল মারাম থেকে। তিনি আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখপূর্বক সেখানে (২৯২, ২৯৩) লিখেছেন,

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ : اِبْنِ عُمَرَ – رضي الله عنه – صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا.

অর্থাৎ এ হাদীসটি ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা এর সমর্থক ও সাক্ষী রয়েছে ইবনে উমর রা.এর হাদীসটি। ইবনে খুযায়মা এটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারী তালীক (সূত্রের উল্লেখ ছাড়া)রূপে ও মাওকুফ (ইবনে উমরের নিজস্ব আমল) রূপে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় ;

১. ইবনে হাজার রহ. এর চেয়ে অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান বলেছেন এবং তাদের অনেকেই এটিকে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসের উপর অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। পেছনে সে কথা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

২. ইবনে হাজার আসকালানীর কথাটি আপনারা পুরোপুরি মানেন না। কারণ তার বক্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, হযরত ওয়াইল রা. এর হাদীসটিও শক্তিশালী। কিন্তু আপনারা সেটিকে জয়ীফ বলেছেন। একইভাবে ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস রহ. ও আব্দুল হক ইশবেলীর কথাও আপনারা মানছেন না। ইবনে সাইয়্যেদুন্নাস তো স্পষ্টভাবে হযরত ওয়াইল রা. বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর আব্দুল হক ইশবিলীর কথা থেকেও তাই বুঝে আসে। কারণ তিনি যখন আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটিকে অধিক হাসান বলছেন, তাতেই তো বোঝা যায় ওয়াইল রা. এর হাদীসটিও তার দৃষ্টিতে হাসান। অথচ আপনারা বলছেন জয়ীফ!!

৩. ইবনে হাজার রহ. যে সমর্থক ও সাক্ষী বর্ণনার কারণে আবু হুরায়রা রা.এর হাদীসটিকে অধিক শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন, সেই হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণে তার দাবিও সঠিক বলে বিবেচিত হচ্ছে না। পূর্বেই বলেছি, মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে উবায়দুল্লাহ উমারী থেকে দারাওয়ার্দীর বর্ণনা মুনকার আপত্তিকর ও জয়ীফ। আর ইবনে উমর রা. এর হাদীসটি একমাত্র ঐ সূত্রেই বর্ণিত। খোদ আলবানী সাহেব এই সূত্রে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসকে জয়ীফ সাব্যস্ত করে বলেছেন,

وأنا أرى أن التردد المذكور إنما هو من شيخ إسحاق وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، فإنه وإن كان ثقة ومن رجال مسلم ، ففي حفظه شيء أشار إليه الحافظ بقوله فيه في " التقريب " : " صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر. "

قلت : وهذا من روايته عن عبيد الله كما ترى فهو منكر مرفوعا ، والمحفوظ موقوف على ابن عمر ، كذلك رواه جمع من الثقات عن نافع (الضعيفة ٧١٧).

অর্থাৎ আমি মনে করি এই দোদুল্যমানতা ইসহাকের উস্তাদ দারাওয়ার্দী থেকে ঘটেছে। কেননা তিনি যদিও বিশ্বস্ত ও মুসলিম শরীফের রাবী, তথাপি তার স্মৃতিশক্তিতে কিছু সমস্যা ছিল। হাফেজ (ইবনে হাজার) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তার এই মন্তব্যে– তিনি সাদূক, তবে ভুল করতেন। অন্যদের কিতাব থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন আর ভুলের শিকার হতেন। আর ইমাম নাসাঈ বলেছেন, উবায়দুল্লাহ থেকে তার বর্ণনা আপত্তিকর। আমি (আলবানী সাহেব) বলব, এ বর্ণনাটি তিনি উবায়দুল্লাহ থেকেই করেছেন। যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং এটি মারফূরূপে আপত্তিকর। সঠিক হবে এটি ইবনে উমর রা.এর নিজস্ব বক্তব্য। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়।) একাধিক বিশ্বস্ত রাবী নাফে'র সূত্রে ইবনে উমর রা.এর বক্তব্য হিসেবেই এটি বর্ণনা করেছেন। (যয়ীফা, ৭১৭)

সুতরাং একথা বুঝতে আর বাকি নেই যে, উবায়দুল্লাহ থেকে দারাওয়ার্দীর বর্ণনা স্বয়ং আলবানীর কাছেও আপত্তিকর। আর এটি আপত্তিকর ও জয়ীফ হলে এর উপর ভিত্তি করে যে হাদীসকে অধিক শক্তিশালী বলা হলো সেটাও আর সঠিকতা পাবে না।

৪. হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটির যেমন বলা হয় সমর্থক ও সাক্ষী হিসাবে ইবনে উমর রা.এর বর্ণনা রয়েছে, যদিও সেটি দুর্বল। তেমনি শরীকের বর্ণনাটিরও তো সাক্ষী ও সমর্থক বর্ণনা রয়েছে হযরত

আনাস রা.এর হাদীসটি। আমীর আল ইয়ামানী রহ. বুলূগুল মারাম গ্রন্থের ভাষ্য সুবুলুস সালামে কতই না সুন্দর বলেছেন–

وقول المصنف إن لحديث أبي هريرة شاهدا يقوى به معارض بأن لحديث وائل أيضا شاهدا قد قدمناه وقال الحاكم إنه على شرطهما وغايته وإن لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد أبي هريرة الذي تفرد به شريك فقد اتفق حديث وائل وحديث أبي هريرة في القوة وعلى تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل وإنما وقع فيه قلب ولا ينكر ذلك فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث

অর্থাৎ গ্রন্থকার যে বলেছেন, আবু হুরায়রা রা.এর হাদীসের সমর্থক ও সাক্ষী বর্ণনা রয়েছে, যেটির দ্বারা এটি শক্তিশালী হয়। এর বিপরীতে বলা যায় ওয়াইল রা.এর হাদীসেরও সমর্থক ও সাক্ষী রয়েছে, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। হাকেম রহ. বলেছেন, সেটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত মোতাবেক (সহীহ)। হাকেমের মন্তব্য যদি পুরোপুরি সঠিক না-ও হয়, তবুও এতটুকু তো নিশ্চিত যে, আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসটির সমর্থক ও সাক্ষীর মতো এটি ঐ হাদীসের সমর্থক ও সাক্ষী, যেটি এককভাবে শরীক বর্ণনা করেছেন।

আর ইবনুল কায়্যিমের গবেষণা অনুযায়ী তো আবু হুরায়রা রা.এর হাদীসটি ওয়াইল রা.এর হাদীসের সমার্থক হয়ে যায়। আবু হুরায়রা রা.এর হাদীস (বর্ণনাকারীর কারণে) ওলটপালট হয়ে গেছে। এটা অস্বীকার করার জো নেই। কেননা হাদীসের একাধিক শব্দে ও বাক্যে ওলটপালট সংঘটিত হয়েছে। (সুবুলুস সালাম, ১/২৮১)

আরেকটি কথা, পেছনে তিরমিযী, খাত্তাবী ও ইমাম মুহিয়্যুস সুন্নাহ বাগাবী'র বরাতে উল্লেখ করেছি যে, আগে হাঁটু রাখা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণের মত। একই কথা উল্লেখ করেছেন আমীর ইয়ামানী, শাওকানী ও আযীমাবাদী প্রমুখ। এ সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, তিন মুজতাহিদ ইমাম ও মুহাদ্দিস-ফকীহ সকলে আছেন।

আলবানী সাহেব নিজের পক্ষের একটি দলিল পেশ করতে গিয়ে একটি হাদীস সম্পর্কে কত সুন্দর বলেছেন,

ممن صححه الترمذي وابن العربي والضياء وابن القيم ويمكن أن يضم إليهم الإمام أحمد وإسحاق ، فإنهما أخذا بالحديث وعملا به باعتراف العراقي نفسه وذلك دليل إن شاء الله تعالى على أن الحديث ثابت عندهما وهو المطلوب (تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر)

অর্থাৎ তিরমিযী, ইবনুল আরাবী, আয যিয়া ও ইবনুল কায়্যিম এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তাদের সঙ্গে ইমাম আহমদ ও ইসহাককেও যুক্ত করা যেতে পারে। কারণ তারা দুজনই এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এবং এতদনুসারে আমল করেছেন। যেমনটি স্বয়ং ইরাকী রহ. স্বীকার করে নিয়েছেন। এতে ইনশাআল্লাহু তায়ালা এ কথার দলিল রয়েছে যে, হাদীসটি তাদের দুজনের কাছেই প্রমাণিত। আর এটাই বলা এখানে উদ্দেশ্য। (তাসহীহু হাদীসে ইফতার ...,পৃ. ২২)

পাঠক, লক্ষ করুন, এ বক্তব্য কি আমাদের এ মাসআলায় খাটে না? এখানে যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা ওয়াইল রা. এর হাদীসটি গ্রহণ করলেন এবং তদনুযায়ী আমল করলেন, এতে কি প্রমাণিত হয় না– হাদীসটি তাদের নিকট প্রমাণিত? বিশেষ করে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে যখন উল্লিখিত দুজন মনীষী ইমাম আহমদ ও ইসহাকও রয়েছেন? তাহলে আলবানী সাহেব, ড. আসাদুল্লাহ গালিব (তার ছালাতুর রাসূল ছাঃ গ্রন্থে) ও মুযাফফর বিন মুহসিন (তার জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত গ্রন্থে) কেন এ হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিচ্ছেন?

একটি উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে :

লা-মাযহাবী বন্ধুরা কাযী আবু ইয়ালা রহ. এর তাবাকাতুল হানাবেলা গ্রন্থ থেকে ইমাম আহমদের একটি উক্তি সম্ভবত হানাফীদেরকে কটাক্ষ করেই উদ্ধৃত করে থাকেন। উক্তিটি হলো, তুমি যদি (বাগদাদের) একশত মসজিদেও ছালাত আদায় কর, তবুও তুমি কোন মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের ছালাত দেখতে পাবে না।

এ উক্তিটি তারা যেভাবে উপস্থাপন করেন, তাতে অনুমিত হয় যে, ইমাম আহমদ হানাফীদের উদ্দেশ্যেই উক্তিটি করেছিলেন। তারা ইমাম আহমদের মূল আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু তাঁর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। মূলত তিনি কোন এক মসজিদে নামায আদায়কালে লক্ষ করেছিলেন, অনেক মুসল্লি ইমামের পূর্বেই রুকু ও সেজদা করে। ফলে তাদের নামায ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গেই তিনি ঐ উক্তিটি করেছিলেন। কিন্তু এ কথা বলাও এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্ধৃতি খুঁজতে গিয়ে সেই জায়গায়ই– আল হামদু লিল্লাহ– ইমাম আহমদের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি পেয়ে গেছি, যাতে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন,

خصلةٌ ، قد غلب عليها الناس في صلاتهم . إلا من شاء الله . من غير علة ، وقد يفعلها شبابهم وأهل القوّة والجلد منهم : ينحطّ أحدهم من قيامه للسّجود ، ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ، وإذا نهض من سجوده ، أو بعدما يفرغ من التّشهّد : يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه ، وهذا خطأ ، وخلاف ما جاء عن الفقهاء ، وإنّما ينبغي له إذا انحطّ من قيامه للسّجود : أن يضع ركبتيه على الأرض ، ثم يديه ، ثم جبهته ، وإذا نهض : رفع رأسه ، ثم يديه ، ثم ركبتيه ، بذلك جاء الأثر عن النّبيّ – صلى الله عليه وسلم فأمروا بذلك ، وانهوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك ، وأمروه أن ينهض – إذا نهض – على صدور قدميه ،

অর্থাৎ কোন রকম ওযর ছাড়া একটি অভ্যাস নামাযে মানুষের উপর– কিছু ব্যতিক্রম লোক ছাড়া– প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের যুবক শ্রেণী ও শক্তিমান ও বলবানরাও এটি করে থাকে। তারা যখন দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সেজদায় যায়, তখন মাটিতে হাত রাখে হাঁটু রাখার পূর্বে। আর যখন সেজদা থেকে উঠে কিংবা তাশাহহুদ শেষ করে ওঠে, তখন হাত ওঠানোর পূর্বে মাটি থেকে হাঁটু উত্তোলন করে। এটা একটি ভুল পদ্ধতি। ফকীহগণের কাছ থেকে যা পাওয়া গেছে এটা তার বিপরীত। তার জন্য

উচিৎ হলো, সেজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাঁটু রাখা, পরে হাত, পরে চেহারা। আর যখন উঠবে, তখন প্রথমে মাথা, পরে হাত, পরে হাঁটু উঠাবে। নবী সা. থেকে এভাবেই হাদীস এসেছে। তাই তোমরা এভাবেই করার নির্দেশ দাও এবং যাদেরকে এর ব্যতিক্রম করতে দেখ তাদেরকে ঐ কাজ থেকে নিষেধ কর। তাদেরকে বল, যেন পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠে পড়ে। (তাবাকাতুল হানাবিলা, ১/৩৬৩)

এখন দেখুন, এরা কি বলে, আর ইমাম আহমদ কি বলেন? মানুষ কোনটা মানবে? ইমাম আহমদের কথা, না এদের মতো মানুষের কথা, যাদের বক্তব্য স্ববিরোধিতা ও ভুলে ভরা?

ইমাম আহমদের মতো ইসহাক রহ.ও এ মাসআলায় একই মত অবলম্বন করেছেন।

ইমাম ইবনুল মুনযিরও (মৃত্যু ৩১৯ হিজরী) তার আল ইকনা' গ্রন্থে তার নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

ثم خر ساجدا تكبر مع انحطاطك وأنت تهوي للسجود ولتقع ركبتاك على الأرض قبل يديك ويداك قبل وجهك.

অর্থাৎ অতঃপর তুমি সেজদা করো, এবং সেজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বল। মাটিতে হাত পড়ার পূর্বে যেন তোমার হাঁটু পড়ে এবং চেহারা পড়ার পূর্বে যেন হাত পড়ে। (১/৯৪)

অসম দুঃসাহসিকতা

পূর্বেই বলেছি, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হাতের পূর্বে হাঁটু দিয়েই সেজদায় যাওয়ার পক্ষে। ইমাম দারিমী অবশ্য বলেছেন, আগে হাত দিক বা হাঁটু, উভয়টিই ভাল কাজ। ইমাম মালেক রহ. থেকেও এমন একটি বর্ণনা রয়েছে যে, বিষয়টি মুসল্লির এখতিয়ারাধীন। ইমাম ইবনে তায়মিয়াও এ মতটি অবলম্বন করেছেন। তবে ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হলো, হাত আগে দেবে, পরে হাঁটু। এমনটি করা তার নিকট মুস্তাহাব। মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে নামাযে মুস্তাহাব আমলের তালিকায় এটি উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্র. আহমাদ আদ দারদের, আশ শারহুল কাবীর, ১/২৫০) এসব থেকে স্পষ্ট যে, উম্মতের কেউই এটাকে ফরজ বলেন নি।

হিজরী পঞ্চম শতকে সর্বপ্রথম ইবনে হাযম জাহিরী (মৃত্যু ৪৫৬) আগে হাত দিয়ে সেজদায় যাওয়াকে ফরজ বলে উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন মত পোষণ করেছেন। দীর্ঘ শতাব্দী পর আলবানী সাহেব (মৃত্যু ১৪২০ হিজরী) সেই বিচ্ছিন্ন মতটিকে বেছে নিয়ে অসম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। (দ্র. আসলু সিফাতিস সালাহ্) তার ভক্তরা সকলে এ বিষয়ে তার সঙ্গে একমত হতে পারে নি। ড. আসাদুল্লাহ গালিব তার ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থে নামাযের সুন্নত আমলগুলোর মধ্যে এটিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (দ্র. পৃ. ৫২)

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

প্রথম রাকাত শেষ করে সোজা উঠে দাঁড়ানো সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

প্রথম রাকাত শেষ করে সোজা উঠে দাঁড়ানো সুন্নত

সোজা উঠে দাঁড়ানোর দলিল :

১. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.

أخرجه الترمذي (٢٨٨) وقال: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه.

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠে পড়তেন। তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৮৮; বায়হাকী, ২/১২৪

এর একজন রাবী খালিদ ইবনে ইলয়াস যঈফ। তিরমিযী র. বলেন, এ হাদীস অনুযায়ীই আলেমগণের আমল। তারা নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোই পছন্দ করতেন।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন,

....عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال(في المسيئ في الصلاة): إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. أخرجه البخاري (٦٦٦٧)

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গলদ তরীকায় নামায আদায়কারী জনৈক ব্যক্তিকে) বলেছেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা কর, তখন ভালভাবে ওযু করে নাও। অতঃপর কিবলামুখী হও। আল্লাহু আকবার বলো এবং কুরআনের যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয় পাঠ কর। অতঃপর রুকু কর এবং স্থির হয়ে রুকু কর। এরপর মাথা তোল এবং স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এরপর সেজদা কর এবং সেজদায় স্থির হয়ে থাক। অতঃপর ওঠো এবং স্থির ও শান্ত হয়ে বসে পড়। এরপর আবার সেজদা কর এবং সেজদায় স্থির হয়ে থাক। অতঃপর উঠে দাঁড়াও। পুরো নামাযে এভাবেই সব কাজ কর। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৬৬৭। এখানে দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে।

এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় একটু বসে পরে দাঁড়ানোর কথা আছে। কিন্তু বায়হাকী এটাকে বর্ণনাকারীর ভুল আখ্যা দিয়েছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী ও আত তালখীস উভয় গ্রন্থে তাঁর মত সমর্থন করেছেন।

৩. হযরত রিফায়া রা. বর্ণনা করেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيئ في الصلاة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم (مختصرا)

রাসূলুল্লাহ সা. (নামাযে গলদকারী ব্যক্তিকে) বলেছেন, অতঃপর তুমি রুকু কর, স্থির হয়ে রুকু কর। এরপর ওঠো, এবং স্থির হয়ে দাঁড়াও। এরপর সিজদা কর, এবং সিজদায় স্থির হয়ে থাক। তারপর ওঠো এবং স্থিরভাবে বসে পড়। আবার সিজদা কর এবং সিজদায় স্থির হয়ে থাক। এরপর উঠে দাঁড়াও। মুসনাদে আহমদ (১৮৯৯৭), তাহাবী, মুশকিলুল আছার (৬০৭৪), তাবারানী, মুজামে কাবীর (৪৫২১)

৪. ইকরিমা র. বলেন,

صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البخاري (٧٨٨)

অর্থ: আমি মক্কা শরীফে এক শায়খের পেছনে নামায পড়লাম। তিনি নামাযে ২২ বার আল্লাহু আকবার বললেন। আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.কে বললাম, লোকটি আহমক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে

হারিয়ে ফেলুক, এটা তো আবুল কাসেম (রাসূল) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৮৮।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, ১ম ও ৩য় রাকাতের পরে না বসেই উঠে পড়বে। অন্যথায় বসাই যদি সুন্নত হতো তাহলে তাকবীর ২৪ বার হওয়া উচিৎ ছিল। কেননা একথা স্বীকৃত এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠানামায় তাকবীর বলতেন।

৪. হযরত আব্বাস ইবনে সাহল আস-সাইদীর বর্ণনা:

أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ فذكر الحديث وفيه: ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ. أخرجه أبو داود (٩٦٦) وإسناده صحيح.

অর্থ: তিনি একটি মজলিসে ছিলেন যেখানে তার পিতাও ছিলেন। তার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। উক্ত মজলিসে আবূ হুরায়রা রা., আবূ হুমায়দ আসসাইদী রা. ও আবূ উসায়দ রা.ও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে একথাও আছে- পরে তিনি তাকবীর বললেন এবং সেজদা করলেন। এরপর আবার তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে গেলেন, বসেন নি। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৩৩, ৯৬৬; মুসনাদে সাররাজ ১০০, ১৯২৬; তাহাবী মুশকিলুল আছার ৬০৭২; তাহাবী শরীফ ৭৩১০; ইবনে হিব্বান ১৮৬৬; বায়হাকী ২৬৪২। এর সনদ সহীহ।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তার বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন,

وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية .ويدل عليه : أن طائفة من الحفاظ ذكروا أن حديث أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة .

অর্থাৎ এ বর্ণনাটি খুবই স্পষ্ট যে, তিনি দ্বিতীয় সেজদার পর বসেন নি। এটা এভাবেও বোঝা যায়, হাফেযে হাদীসগণের এক জামাত বলেছেন, আবু হুমায়দের বর্ণনায় এই বৈঠকের কথা নেই। (৪/৩০১)

৫. আব্দুর রহমান ইবনে গানম র. বলেন,

أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه و سلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار. أخرجه أحمد ٥/٣٤٣ (٢٣٢٩٤) قال النيموي: إسناده حسن

অর্থ: হযরত আবূ মালেক আল আশআরী রা . তার গোত্রের লোকদের একত্রিত করে বললেন, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের নারী ও সন্তানরা একত্রিত হও। আমি তোমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায শেখাব, তিনি আমাদেরকে নিয়ে মদীনায় পড়েছিলেন। তারা সবাই একত্রিত হলেন। স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও একত্রিত করলেন। পরে তিনি ওযু করলেন এবং সবাইকে তার ওযু দেখালেন। তিনি ওযুর স্থানগুলো ভাল করে ধৌত করলেন। অতঃপর যখন বেলা গড়ে গেল তখন তিনি দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। এরপর পুরুষদেরকে তার কাছের কাতারে দাঁড় করালেন। ছেলেদেরকে তার পরের কাতারে এবং নারীদেরকে তার পরের কাতারে দাঁড় করালেন। এরপর ইকামত দিয়ে

সামনে গেলেন। অতঃপর হাত তুলে আল্লাহু আকবার বললেন। পরে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা নিঃশব্দে পাঠ করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকু করলেন। রুকুতে তিনবার বললেন, سبحان الله وبحمده এরপর বললেন, سمع الله لمن حمده এবং সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাকবীর বলে সেজদায় চলে গেলেন। পরে তাকবীর বলে মাথা তুললেন। এরপর পুনরায় তাকবীর বলে সেজদা করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রথম রাকাতে তার তাকবীর হলো ছয়টি। দ্বিতীয় রাকাত থেকে তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখনও তাকবীর বললেন। নামায শেষ করে গোত্রের লোকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, আমার তাকবীর (সংখ্যা) ভালভাবে স্মরণ রাখ এবং আমার রুকু ও সেজদা শিখে নাও। কেননা দিনের এই সময়ে আমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়েছিলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই নামায।

(মুসনাদে আহমদ, ৫খ,৩৪৩পৃ, হাদীস নং ২৩২৯৪)। এর সনদ হাসান।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, আবুন নদর (أبو النضر) থেকে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনে বাহরাম আল ফাযারী থেকে, তিনি শাহর ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি ইবনে গানম থেকে।

এ হাদীসে তিনি প্রথম রাকাতের পর না বসে সোজা দাঁড়িয়ে গেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তেমনটি করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় জানা গেল যে, নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া কোথাও রফয়ে ইয়াদাইন নেই।

৬. নুমান ইবনে আবূ আয়্যাশ র. বলেন,

أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠١١) وإسناده حسن ، قاله النيموي رحمه الله.

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবীকে দেখেছি, তারা ১ম ও ৩য় রাকাতে সেজদা থেকে উঠে সোজা

দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০১১। নীমাবী র. বলেছেন, এটির সনদ হাসান।

৭. আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ র. বলেন,

رمقت عبد الله بن مسعود رض في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس قال : ينهض على صدور قدميه في الركعة الاولى والثالثة. أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٦-٢٩٦٧) وابن أبي شيبة (٣٣٩٩) والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٥/٢) وصححه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. (آثار السنن صـ ١٥٢)

অর্থ: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে নামাযে ভালভাবে লক্ষ্য করলাম, আমি লক্ষ্য করলাম , তিনি সোজা উঠে পড়লেন, বসলেন না। তিনি আরো বলেন, তিনি ১ম ও ৩য় রাকাতে পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২৯৬৬,২৯৬৭। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৩৯৯,৪০০১। তাবারানী র. আলকাবীর গ্রন্থে, বায়হাকী আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থে (২/১২৫), তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। হায়ছামী র. 'মাজমাউয যাওয়াইদ' গ্রন্থে বলেছেন, এর রাবীগণ সহীহ হাদীসের রাবী। (দ্র, আছারুস সুনান,পৃ ১৫২)।

৮. আবু আতিয়্যা র. বর্ণনা করেছেন,

ابن عباس وابن عمر كانا يفعلان ذلك. أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٨)

অর্থ– ইবনে আব্বাস রা. ও ইবনে উমর রা.ও অনুরূপ করতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস নং ২৯৬৮।

৯. ইবনে জুরায়জ র. বর্ণনা করেন,

أخبرني عطاء : أنه رأى معاوية إذا رفع رأسه من السجود لم يتلبث قال : ينهض وهو يكبر في نهضته للقيام. أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٠) وإسناده صحيح

অর্থ– আতা র. আমাকে বলেছেন, মুআবিয়া রা.কে দেখেছি, তিনি সেজদা থেকে উঠে দেরী করতেন না। তাকবীর বলেই দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস নং ২৯৬০। এর সনদ সহীহ।

১০. ওয়াহব ইবনে কায়সান র. বলেন,

رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه .

أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٥) وإسناده صحيح.

অর্থ– আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রা.কে দেখেছি, তিনি যখন দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠতেন তখন পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০৫। এর সনদ সহীহ।

১১. উবায়দ ইবনে আবুল-জা'দ র. বলেছেন,

كان على ينهض في الصلاة على صدور قدميه . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٠)

অর্থ– আলী রা. নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০০।

১২. হযরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে খায়ছামা র. বলেন,

ينهض في الصلاة على صدور قدميه . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٢)

وعن نافع كذلك (٤٠٠٧)

অর্থ– আমি তাঁকে নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে পড়তে দেখেছি। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০২। নাফে' থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, (দ্র. হাদীস নং ৪০০৭)।

১৩. শা'বী র. বর্ণনা করেন,

أن عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٤)

অর্থ– উমর রা., আলী রা. ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ নামাযে পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠে পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০৪।

১৪. ইমাম যুহরী র. বলেন,

كان أشياخنا لا يمايلون يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس . أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٠٩)

অর্থ– আমাদের উস্তাদগণ যখন ১ম ও ৩য় রাকাতে ২য় সেজদা থেকে উঠতেন তখন তাঁরা সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৪০০৯।

১৫. আবুয যিনাদ (একজন তাবেয়ী) রহ. বলেছেন, تلك السنة অর্থাৎ এটাই সুন্নত। (দ্র. ইবনে বাত্তাল রহ. কৃত বুখারীর ভাষ্য)

১৬. আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. বলেন,

كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

অর্থাৎ আমি আমর ইবনে সালামা রহ.কে দেখেছি, তিনি এমনভাবে নামায পড়তেন, যেভাবে নামায পড়তে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে বৈঠক করতেন। (বুখারী, ৮১৮)

লক্ষ করার বিষয় হলো, আইয়ুব সাখতিয়ানী রহ. নিজেও তাবেয়ী ছিলেন এবং বড় বড় অনেক তাবেয়ীকে তিনি দেখেছেন। কিন্তু এ বৈঠক করতে তিনি অন্য কাউকে দেখেননি। উল্লেখ্য, এখানে চতুর্থ কথাটি বর্ণনাকারীর ভুল। কারণ চতুর্থ রাকাতের পর বৈঠক হয় তাশাহহুদের জন্য। সুতরাং সঠিক কথা হবে প্রথম ও তৃতীয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের আমলের ভিত্তিতেই পরবর্তী যুগে প্রায় সকল আলেম একমত ছিলেন যে, ১ম ও ৩য় রাকাতের পরে না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

ইমাম মালেক, সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ, ইমাম আহমদ, ইসহাক প্রমুখ সকলের মত হলো, উক্ত বৈঠক করবে না।

আল্লামা আলাউদ্দীন আল মারদীনী র. আল জাওহারুন-নাকী গ্রন্থে লিখেছেন,

أجمعوا على أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم يجلس إلا الشافعي.(١٢٦/٢)

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী র. ছাড়া সকল ইমাম ও আলেমই এ বিষয়ে একমত যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর সোজা দাঁড়িয়ে যাবে, বসবে না। (দ্র, ২খ, ১২৬পৃ) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, لم يستحبها الأكثر অর্থাৎ অধিকাংশ আলেম এটাকে মুস্তাহাবও বলেননি। (২/৩৫২)

বৈঠক সম্পর্কিত হাদীসটির জবাব:

মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন: ليس لهذا الحديث ثان يعني أنه لم ترو هذه الجلسة في غير هذا الحديث অর্থাৎ মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ রা. এর হাদীসটি এমন যার সমর্থনে দ্বিতীয় কোন হাদীস নেই। অর্থাৎ এই বৈঠকটির কথা অন্য কোন হাদীসে উদ্ধৃত হয় নি। ইবনে রজব রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে একথা উল্লেখপূর্বক লিখেছেন:

وهذا يدل على أن ما روي في هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث ، فانه غير محفوظ. (٣٠٠/٤)

অর্থাৎ এ বক্তব্য নির্দেশ করে যে, মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ রা. বর্ণিত হাদীস ছাড়া এ বৈঠক সম্পর্কে অন্য যেসকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সঠিক নয়। (৪/৩০০)

ইমাম তাহাবী র. বলেন–

فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من

سنة الصلاة وقال: ولو كانت هذه الجلسة مقصودة تشرع لها ذكر مخصوص.

(باختصار ٢/٣٧٦)

অর্থাৎ যখন দু'টি হাদীসের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা যাচ্ছে, তখন ধরে নিতে হবে, মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. এর হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলটি কোন উযরের কারণে হয়ে থাকবে। নামাযের সুন্নত হিসাবে করা হয়নি । তিনি আরো বলেন, এই বৈঠক যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এতে বিশেষ কোন যিকিরের বিধান অবশ্যই রাখা হতো। (তাহাবী, ২খ. ৩৭৬পৃ.)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র.ও তাঁর যাদুল-মাআদ গ্রন্থে বলেছেন,

ولو كان هديُه صلى الله عليه وسلم فعلَها دائماً، لذكرها كلُّ من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجردُ فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدلُّ على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علِمَ أنه فعلها على أنها سنَّة يُقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة،

অর্থাৎ এটা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত আমল হতো তবে তাঁর নামাযের বিবরণ দানকারী প্রত্যেক সাহাবী তা উল্লেখ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু কোন কাজ করাই একথা প্রমাণ করে না যে, এটা নামাযের একটি অনুসৃত আমল। তবে হ্যাঁ, যদি জানা যায় এটাকে তিনি অনুসরণযোগ্য সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন তবে সেটা নামাযের সুন্নত বলে গন্য হবে। কিন্তু যদি (কোন দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে) ধরে নেয়া হয় যে, তিনি বিশেষ প্রয়োজনে সেটা করেছেন, তাহলে তা নামাযের সুন্নত বলে প্রমাণিত হবে না। (দ্র. ১খ. ২৪০ পৃ.)

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ রহ. এর একটি মত তো হলো, এ বৈঠক করা মুস্তাহাব। তাঁর আরেকটি মত হলো বৈঠক করবে না, যেমনটি বলেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও ফকীহ।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. লিখেছেন,

وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين ، لا على اختلاف قولين ، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك ، وان النبي (كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه ؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النَّبيّ (في آخر عمره . ويشهد لذلك ، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم ، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقاً .

অর্থাৎ আবু ইসহাক মারওয়াযী রহ. ইমাম শাফেঈ রহ. এর দু'টি বক্তব্যকে দুটি অবস্থার সঙ্গে ফিট করেছেন। দুটি মত হিসাবে ধরেন নি। মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ রা.এর বর্ণনাকে আলেমগণ একইভাবে গ্রহণ করেছেন। নবী করীম সা. যখন বৃদ্ধ হলেন এবং দেহ মুবারক ভারি হয়ে গেল তখন অনেক সময় তিনি এই বৈঠক করেছেন। মালেক রা.এর ঘটনাটি যে শেষ দিকের ছিল তার প্রমাণ, উফূদ বা আরবের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে তাঁর শেষ বয়সেই এসেছিল। (আর এ বৈঠক যে শেষ আমলে উযরের কারণে ছিল) তার বড় প্রমাণ, রাসূল সা. এর বিশিষ্ট সাহাবী ও শীর্ষ সাহাবীগণের কেউ তাঁদের নামাযে এ বৈঠক করেন নি। বোঝা গেল, তাঁরা জানতেন, এটা সাধারণ অবস্থায় নামাযের সুন্নত নয়।

আলবানী সাহেবের বাড়াবাড়ি

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও ইমামের সঙ্গে এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ.এর দ্বিমত থাকলেও সেটা জায়েয-নাজায়েযের নয়। উত্তম-অনুত্তমের। তাই এ নিয়ে কখনোও বাড়াবাড়ি ছিল না। ফাতাওয়ায়ে জহীরিয়ার বরাতে আল্লামা ইবনে নুজায়ম রহ. তার আলবাহরুর রায়েক গ্রন্থে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রহ.এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে,

إن الخلاف إنماهو في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهب الشافعي لا بأس به عندنا (فصل ما يفعله من أراد الدخول في الصلاة ، ١/٣٤٠)

এ বিষয়ে দ্বিমত হয়েছে উত্তম অনুত্তম নিয়ে, তাই যদি কেউ শাফেয়ী রহ. এর মাযহাব মতো আমল করে তাতেও আমাদের মতে তেমন কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আলবানী সাহেব এক্ষেত্রে খুব বাড়াবাড়ি করেছেন। আর তারই অনুসরণ করছেন আমাদের দেশের লা-মাযহাবী বন্ধুরা।

আলোচ্য বিষয়ে তার লেখার দুর্বলতা ও ফাঁকগুলো তুলে না ধরলে পাঠক হয়তো ভুল বুঝবেন। তাই এখানে কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

এক. বুখারী শরীফে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি তিনি বিলকুল চেপে গেছেন। হাদীসটি পেছনে ২ নং দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই, আবু হুমায়দ রা. বর্ণিত একটি হাদীস তিনি বিশ্রামের বৈঠকের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন আবু দাউদ (৭৩০), ইবনে মাজাহ (১০৬১), ইবনুল জারূদ (১৯২), ইবনে হিব্বান (১৮৬৭) ও বায়হাকী (৪০৮)।

হাদীসটি সম্পর্কে আলবানী সাহেব মন্তব্য করেন:

حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم – وفيها الجلسة – بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره : قالوا : صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو مخرج في " الإرواء " (٣٠٥) فليس الحديث من رواية أبي حميد وابن الحويرث فقط كما يوهمه الكلام المذكور عن ابن القيم وإنما معهما عشرة آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا صلاته صلى الله عليه وسلم وقليل من السنن يتفق على روايتها مثل هذا الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم(تمام المنة)

অর্থাৎ আবু হুমায়দ রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ রয়েছে, এই বৈঠকের কথাও সেখানে উল্লেখ আছে। হাদীসটি তিনি দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির শেষে আছে, তারা বলেছেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি (নবী সা.) এভাবেই নামায পড়তেন। সুনান (চতুষ্টয়) এর সংকলক অন্যান্য হাদীস গ্রন্থকারগণ এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইরওয়া গ্রন্থেও এটি বিধৃত হয়েছে (৩০৫)। সুতরাং (বৈঠকের) হাদীস শুধু মালেক ইবনুল হুওয়ায়রিছ রা. ও আবু হুমায়দ রা. কর্তৃক বর্ণিত, একথা ঠিক নয়। যেমনটি ধারণা জন্মে ইবনুল কায়্যিমের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে। বরং তাদের দু'জনের সঙ্গে আরো দশজন সাহাবী আছেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায প্রত্যক্ষ করেছেন। আর এমন সুন্নাহ খুব কমই পাওয়া যাবে, যা এত বিরাট সংখ্যক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। (দ্র. তামামুল মিন্নাহ, ১/২১১-২১২)

কথাগুলো তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, যে কোন পাঠকই মনে করবেন হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী যেন এই বিশ্রামের বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ না তো এর বর্ণনাকারীদের সকলের বর্ণনায় তা এসেছে। আর না এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে তুলে ধরা হলো:

ক. এটি আবু হুমায়দ রা. থেকে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা বর্ণনা করেছেন, তাঁর সূত্রে আবার অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর ছাড়া অন্য কেউ এ বৈঠকের কথা উল্লেখ করেননি।

খ.আব্দুল হামীদের বিশ্বস্ততা নিয়ে দ্বিমত আছে। সুফিয়ান ছাওরী ও ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান তাকে 'দুর্বল' বলেছেন। আবু হাতেম রাযী বলেছেন, لا يحتج به অর্থাৎ তাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাবে না। ইমাম নাসায়ী যুআফা গ্রন্থে বলেছেন, ليس بالقوي তিনি মজবুত নন। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ليس به بأس তার ব্যাপারে অসুবিধার কিছু নেই। ইমাম আহমদও এমন মন্তব্য করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও ইয়াহয়া

ইবনে মাঈন অবশ্য তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতেও তিনি খুব উঁচু মানের রাবী ছিলেন না। তার একটি প্রমাণ এও যে, ইবনে মাঈন অন্যত্র তার সম্পর্কে বলেছেন, ليس بحديثه بأس তার হাদীসের ব্যাপারে তেমন অসুবিধা নেই। একারণেই যাহাবী সিয়ার গ্রন্থে বলেছেন, وهو حسن الحديث। তিনি এমন স্তরের, যার হাদীস হাসান হয়ে থাকে। ইবনে হাজার তাকরীবে বলেছেন, صدوق ربما وهم তিনি সাদূক (মধ্যম স্তরের জন্য ব্যবহৃত শব্দ) তবে মাঝেমধ্যে ভুলের শিকার হন। ইবনে হিব্বানও বলেছেন, ربما أخطأ তিনি কখনও কখনও ভুলের শিকার হন।

এ ধরনের বর্ণনাকারী যদি কোন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হন তবে তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কঠিন। এটা উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গ. আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর যে এই বৈঠকের উল্লেখ করেছেন, তাও নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কেননা তার অনেক শিষ্যই তার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় এ বৈঠকের উল্লেখ আসে নি। যেমন, আব্দুল মালেক ইবনুস সাব্বাহ আল মিসমাঈ। (দ্র. ইবনে খুযায়মা ৬৭৭) ইয়াহয়া আলকাত্তান, (দ্র. ইবনে হিব্বান ১৮৬৫)।

ঘ. এসব কারণেই হয়তো ইমাম আহমদ এ হাদীসকে দুর্বল মনে করেছেন। কেননা মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ليس لهذا الحديث ثان এ হাদীসটির পক্ষে দ্বিতীয় কোন হাদীস নেই। অথচ এ বিষয়ে আবু হুমায়দ রা.এর হাদীসটির উক্ত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. এটিকে সমর্থক ও সাক্ষীরূপেও গুরুত্ব দেওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি।

তাঁর এ মন্তব্য উদ্ধৃত করে ইবনে রজব বলেছেন,

هذا يدل على أن ما روى في هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث فإنه غير محفوظ فإنها قد رويت في حديث أبي حميد

وأصحابه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه أحمد وابن ماجه.

অর্থাৎ একথা নির্দেশ করে যে, মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. বর্ণিত হাদীস ব্যতীত উক্ত বৈঠকের পক্ষে আরো যেসব হাদীস বর্ণিত আছে, সেগুলো বিশুদ্ধ নয়। (সেগুলোর একটি হলো,) নবী সা. এর নামাযের বিবরণে আবু হুমায়দ রা. ও তাঁর সঙ্গীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি, সেখানে এ বৈঠকের উল্লেখ এসেছে। এটি আহমদ ও ইবনে মাজাহ উদ্ধৃত করেছেন। (দ্র. ফাতহুল বারী, ৭/২৮২, ৮৩২ নং হাদীসের আলোচনায়) ইমাম আহমদ এটিরই দুর্বলতার প্রতি ইংগিত করেছেন।

ঙ. আব্দুল হামীদের আরেক সঙ্গী ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহ একই উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাসূল সা. বৈঠক না করেই উঠে গেছেন। এটিও আবু হুমায়দ রা.এর হাদীস। পেছনে ৪ নম্বরে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

চ. আলবানী সাহেব দাবি করেছেন, দু'জন নয়, বারোজন সাহাবী এ বৈঠকের বর্ণনাকারী।

কিন্তু এ হাদীসটি যদি সহীহ না হয় তবে তো এগারজনই বাদ। বাকি থাকেন শুধু একজন। যেমনটি বলেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। পক্ষান্তরে বৈঠক না করার পক্ষে অনেক হাদীস আমরা পেশ করেছি। বিশেষ করে আব্বাস ইবনে সাহল বর্ণিত হাদীসটিতে বলা হয়েছে, তিনি আনসার সাহাবীগণের এক মজলিসে ছিলেন। সেখানে তার পিতা সাহল ইবনে সাদ, আবু হুমায়দ, আবু উসায়দ ও আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ ছিলেন। আবু দাউদ (৭৩৩), মুসনাদে সাররাজ (১০০) (১৯২৬)। তাহাবী শরীফের বর্ণনায় উল্লিখিত সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, 'ওয়াল আনসার রা.' অর্থাৎ আরো অন্যান্য আনসার সাহাবীগণ ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে আবু হুমায়দ রা. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন এবং সেজদা করলেন। এরপর আবার তাকবীর বললেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন,

বৈঠক করেন নি। তাহলে এখানেও তো একই হাদীসে অনেক বর্ণনাকারী সাহাবী পাওয়া গেল।

তিন, আব্বাস ইবনে সাহল বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে আলবানী সাহেব মন্তব্য করেছেন, إن هذه الزيادة ضعيفة لأنه تفرد به عيسى بن عبد الله بن مالك وهو مجهول(أصل صفة الصلاة) অর্থাৎ এ বাড়তি অংশটুকু (বৈঠক করেন নি) দুর্বল। কেননা ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক এটি একাই বর্ণনা করেছেন। আর তিনি অজ্ঞাত ছিলেন।

কিন্তু এটাকে দুর্বল বলা আলবানী সাহেবের একটি ভুল। কারণ ঈসা ইবনে আব্দুল্লাহকে কেউ দুর্বল বলেন নি। বরং ইবনে হিব্বান তার আছছিকাত গ্রন্থে (বিশ্বস্ত রাবীচরিত) তাকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর আত তারীখুল কাবীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবু হাতেম তার আল জারহু ওয়াত তাদীল গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারা বিরূপ কোন মন্তব্য করেন নি। আলী ইবনুল মাদীনী অবশ্য তাকে অজ্ঞাত বলেছেন। তবে তিনি তাকে অজ্ঞাত আখ্যা দেওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, শুধু মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকই তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ রিজাল শাস্ত্র অনুসন্ধান করে দেখা গেছে তার সূত্রে আরো সাতজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন যিয়াদ ইবনে সাদ, জাহহাফ ইবনে আব্দুর রহমান, হাসান ইবনে হুরর, উতবা ইবনে আবু হামীম, ফুলায়হ ইবনে সুলায়মান ও ঈসার ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। সুতরাং যে কারণে ইবনুল মাদীনী তাকে মাজহুল বা অজ্ঞাত বলেছেন, সেটি যখন ঠিক রইল না, তাই তাকে অজ্ঞাত বলাও আর সঙ্গত হবে না। তাই তো ইবনুল মাদীনীর পর অন্য কেউই তাকে মাজহুল বলেন নি। হাফেজ যাহাবী কাশেফ গ্রন্থে বলেছেন, وثق তাকে বিশ্বস্ত বলা হয়েছে। আর হাফেজ ইবনে হাজার তাকরীব গ্রন্থে বলেছেন, مقبول। এ মাকবূল শব্দটি ইবনে হাজারের বিন্যাস অনুসারে গ্রহণযোগ্য রাবীর সর্বনিম্নস্তর।

তাছাড়া তাহাবী শরীফে (নং ১৫৪৮) উতবা ইবনে হাকীম এটি বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে আব্দুর রহমান আল আদাবীর সূত্রে আব্বাস ইবনে সাহল থেকে, সেখানেও এই বৈঠকের কথা নেই।

চার. ফিকহুস সুনান গ্রন্থে সায়্যেদ সাবেক এ বৈঠক সম্পর্কে লিখেছেন,

وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ونحن نوردها ما لخصه ابن القيم في ذلك.

অর্থাৎ হাদীসের বিভিন্নতার কারণে এ বৈঠকটি সম্পর্কে আলেমগণেরও মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখানে ইবনুল কায়্যিমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরব। (দ্র. তামামুল মিন্নাহ, ১/২১০)

এ বক্তব্য সম্পর্কে আলবানী সাহেব লিখেছেন,

هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد

অর্থাৎ উক্ত বক্তব্য এই ধারণা জন্মায় যে, এ মাসআলায় পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এক্ষেত্রে যতগুলো হাদীস এসেছে সবগুলো এ বৈঠক প্রমাণ করে। এমন একটি হাদীসও আসে নি, যা এই বৈঠক সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়। খুব বেশি এ কথা বলা যায় যে, কিছু কিছু হাদীসে এর উল্লেখ আসে নি। আর এই না আসা ঐ বিভিন্নতাকে অনিবার্য করে না, যার দাবি করা হচ্ছে। অন্যথায় অনুরূপ দাবি প্রত্যেক সুন্নাহ সম্পর্কেই করা যাবে, যেগুলোর বিবরণ সব হাদীসে আসে নি। অথচ এমন কথা কেউ বলতে পারে না। (তামামুল মিন্নাহ, ১/২১০)

আলবানী সাহেবের এ বক্তব্য যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তা পেছনের হাদীসগুলো লক্ষ করলেই ধরা পড়বে। নবী করীম সা. যখন এক ব্যক্তিকে নামায শেখাচ্ছিলেন, আর বলছিলেন, এরপর দ্বিতীয় সেজদা কর, এরপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, এতে কি উক্ত বৈঠক সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা বা নির্দেশনা পাওয়া যায় না? তবে কি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এতকাল ভুল বুঝেছেন?

পাঁচ. হাফেজ ইবনুল কায়্যিমের বরাতে ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার লিখেছেন,

وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث

অর্থাৎ ইবনে আজলান এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি নির্দেশ করে যে, তিনি (রাসূল সা.) পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। রাসূল সা. এর অনেক সাহাবী এবং তাঁর নামাযের বিবরণদানকারীগণের কেউই এ বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন নি। শুধুমাত্র আবু হুমায়দ ও মালেক ইবনুল হুয়ায়রিছ রা. বর্ণিত হাদীসে এর উল্লেখ এসেছে।

আলবানী সাহেব উক্ত বক্তব্যের উপর টীকা লিখে মন্তব্য করেছেন–

قلت : إن كان يعني حديث ابن عجلان عن رفاعة المذكور في رواية عبد الله عن أحمد المتقدمة فليس فيها ما ذكر من النهوض ثم هو من تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وليس من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم وإن كان يعني غيره فلم أعرفه وعلى الأول فالعبارة مشكلة لأنها تفيد أن حديث رفاعة غير حديث ابن عجلان مع أنهما حديث واحد فتأمل

অর্থাৎ আমি বলব, যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে রিফায়া রা. থেকে ইবনে আজলানের সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যা ইতিপূর্বে আহমদ রহ.থেকে আব্দুল্লাহ'র বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে সেখানে সেজদা থেকে ওঠার উল্লেখ নেই। তাছাড়া হাদীসটি মূলতঃ নামাযে গলদকারী ব্যক্তিকে দেওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালিম বা শিক্ষা। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল সম্পর্কে নয়। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি তাঁর উদ্দেশ্য অন্য কিছু হয়, তবে তা আমার জানা নেই। আর প্রথমটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে বাক্যটি

দুর্বোধ্য। কারণ এতে অনুমিত হয়– রিফায়া রা. বর্ণিত হাদীসটি ইবনে আজলান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে ভিন্ন। অথচ দুটি একই হাদীস। (তামামুল মিন্নাহ, ১/২১১)

অধমের আরজ এই যে, আসলে ইমাম আহমদ রহ. ইবনে আজলানের সূত্রে বর্ণিত রিফাআ ইবনে রাফে রা.এর হাদীসকে আমলের জন্য অবলম্বন করেছেন। হাদীসটি মুসনাদে আহমদে (নং ১৮৯৯৭) উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে ৩নং প্রমাণে আরো কে কে উদ্ধৃত করেছেন তার বিবরণ আছে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় সেজদার পরেই তুমি দাঁড়িয়ে যাও। আর এর থেকেই বোঝা যায়, রাসূল সা. নিজেও দ্বিতীয় সেজদার পর সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। কেননা তিনি অন্যদেরকে যা আদেশ করতেন, নিজেও তাই করতেন। তাঁর তালীম ও নিজের আমলে কোন ফারাক ছিল না। এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, বার্ধক্যের কারণে কখনও কখনও বসতেন, সেটাই মালেক রা.এর হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন–"وأذهب أنا إلى حديث رفاعة "ثم قم" অর্থাৎ রিফায়া রা.এর বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. যে বলেছেন–এরপর তুমি দাঁড়িয়ে যাও, আমি এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি।

এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে আলবানী সাহেব বলেন–

وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه وهي سنة وليست بواجب فكيف تذكر في حديث المسيئ صلاته الذي علمه صلى الله عليه وسلم فيه الواجبات دون السنن والمستحبات راجع " المجموع " (٣ / ٤٤٣) وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى العمل بحديث ابن الحويرث وهو الحق الذي لا شك فيه

অর্থাৎ হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ রা. প্রমুখের হাদীস থেকে যে বৈঠক প্রমাণিত, এটি তার বিপক্ষে প্রমাণ হয় না। কারণ বেশির থেকে বেশি একথা বলা যায় যে, এতে বৈঠকটির কথা উল্লেখ করা হয় নি। এ বৈঠক সুন্নত, ওয়াজিব নয়। সুতরাং নামাযে গলদকারী ব্যক্তির হাদীসে এর

উল্লেখ থাকার কথা নয়। তাঁকে তো নবী সা. সুন্নত-মুস্তাহাব শেখান নি, ফরজ-ওয়াজিব শিখিয়েছেন। দেখুন, আলমাজমু' ৩/৪৪৩। এ প্রমাণটি দুর্বল হওয়ার কারণেই হয়তো ইমাম আহমদ রহ. মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ রা. বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমলের দিকে ফিরে এসেছেন। এটা এমন সত্য, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। (তামামুল মিন্নাহ, ১/২১১)

আমাদের তো বুঝে আসে না, রিফায়া রা.এর হাদীসটি কেন প্রমাণ হতে পারবে না। উক্ত হাদীসে তো নবীজী সা. দ্বিতীয় সেজদার পর সোজা দাঁড়িয়ে যেতে বলেছেন। তাহলে বসার সুযোগ থাকল কোথায়?

ইমাম আহমদের মাযহাব

ইমাম আহমদের মাযহাব ও আমল নিয়েও আলবানী সাহেব সত্য গোপন করেছেন। তিনি শুধু খাল্লালের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে দাবি করেছেন যে, ইমাম আহমদ ফিরে এসেছেন। খাল্লাল তো সরাসরি ইমাম আহমদের শিষ্য নন। আলবানী সাহেব এক্ষেত্রে ইমাম আহমদের শিষ্যবৃন্দ ও তার মাযহাবের সংকলকগণের বক্তব্য সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন।

ইমাম আহমদের সকল ছাত্র যারা তার মাসায়েল সংকলন করেছেন, যেমন, ইমাম আবু দাউদ, ইসহাক ইবনে মানসুর আলকাওসাজ, ইবনে হানী, আলআছরাম আবুবকর ও ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ, তারা সকলেই তাঁর মত ও মাযহাব এটাই উল্লেখ করেছেন যে, এ বৈঠক করবে না। ইমাম আহমদের মাযহাবের সংকলকগণও তাই লিখে গেছেন। ইমাম আহমদ যদি এ মাসআলা থেকে ফিরে আসতেন তাহলে তার সরাসরি শিষ্যরা এবং তার মাযহাবের সংকলকরা তা কি জানতেন না?

ইমাম আবু দাউদ বলেন: سمعت أحمد يقول : ينهض على صدور القدمين لا يقعد অর্থাৎ আমি আহমদকে বলতে শুনেছি, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, বসবে না। (১/৫৩) ইসহাক আলকাওসাজ বলেন, قال : وفي الركعة الأولى والثالثة ينهض على صدور قدميه অর্থাৎ ইমাম আহমদ বলেছেন, প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। (নং ২২৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন,

قال أبي : واذهب انا الى حديث رفاعة... قال ابي بلغني ان حماد بن زيد كان يذهب الى حديث رفاعة والى ما روى عن عبد الله بن مسعود وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا ينهضون على صدور اقدامهم اذهب الى هذا

আমার পিতা বলেছেন, আমার মত রিফাআর হাদীস অনুযায়ী। তিনি আরো বলেন, আমি শুনেছি, হাম্মাদ ইবনে যায়েদও উক্ত হাদীস এবং তৎসঙ্গে ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবী সম্পর্কে যে কথা বর্ণিত আছে যে, তাঁরা পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতেন, সে অনুযায়ী আমল করতেন। আমিও এ অনুযায়ী আমল করি। (১/৮২)

তিনি আরো বলেছেন, وكذا قال داود بن قيس وافق ابن عجلان 'রিফাআর হাদীসটি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আজলানই ইয়াহয়া ইবনে খাল্লাদের সূত্রে বর্ণনা করেন নি, বরং দাউদ ইবনে কায়সও একইভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।' (মাসায়েলে আহমদ লি আব্দুল্লাহ, ১/৮১)

ইসহাক আল কাওসাজ আল মারওয়াযী সংকলিত 'মাসাইলে ইমাম আহমাদ ওয়া ইসহাক' গ্রন্থের টীকায় টীকাকার লিখেছেন:

نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٢ (٢٨٧، ٢٨٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٤ (٢٥٩)، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد بالأرض. قال ابن الزاغوني: هو المختار عن جماعة المشايخ. وروي عن أحمد: أنه يجلس جلسة الاستراحة، اختاره الخلال، وقال: إن أحمد رجع عن الأول، وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفاً، اختاره القاضي وابن قدامة وغيرهما الخ

অর্থাৎ ইমাম আহমদ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন আব্দুল্লাহ (ইবনে আহমদ) তার মাসায়েলে (পৃ.৮২, নং ২৮৭,২৮৮), ইবনে হানী তার মাসায়েলে, (১/৫৪, নং ২৫৯) ও আবু দাউদ তার মাসায়েলে (পৃ.৩৫)। ইমাম আহমদের সহীহ মাযহাব এসব বর্ণনা অনুসারেই। অর্থাৎ মুসল্লী দ্বিতীয় সেজদা থেকে ওঠার পর বিশ্রামের বৈঠকটি করবে না, বরং উভয় পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সময় দুই হাতের ভর থাকবে হাঁটুর উপর। তবে যদি কষ্ট হয় তবে মাটিতে হাত রেখে ভর দিয়ে উঠবে। ইবনুয যাগুনী (আবুল হাসান আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ আল বাগদাদী, মৃত্যু ৫২৭ হি.) বলেছেন, এ মাযহাবের মাশায়েখগণের নিকট এটাই পছন্দনীয় মত।

ইমাম আহমদ থেকে ঐ বৈঠকের পক্ষেও একটি বর্ণনা আছে, খাল্লাল সেটি গ্রহণ করেছেন, এবং বলেছেন, আহমদ এ মতের দিকেই ফিরে এসেছেন। ইমাম আহমদ থেকে আরেকটি বর্ণনা হলো দুর্বল ব্যক্তি এ বৈঠক করবে। আলকাযী ও ইবনে কুদামা এটিই অবলম্বন করেছেন। (২/৫৬৬)

আলবানী সাহেব তার 'আসলু সিফাতিস সালাহ' গ্রন্থে ইমাম আহমদের এসব সরাসরি শিষ্যের বর্ণনা উপেক্ষা করে লিখেছেন:

وعن أحمد نحوه في " التحقيق " (١/١١١) وهو الأحرى به لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها . وقد قال ابن هانئ في " مسائله عن الإمام أحمد " (١/٥٧) : " رأيت أبا عبد الله ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة ، وربما استوى جالساً ، ثم ينهض . وهو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه ؛ فقد قال في "مسائل المروزي " : " مضت السنة من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعتمد على يديه ويقوم ؛ شيخاً كان أو شاباً " . واستحبه الإمام ابن حزم وهو الصواب لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة وكل ما جاء مما يخالفها لا يثبت ؛الخ

অর্থাৎ ইমাম আহমদ থেকে তাহকীক গ্রন্থে (১/১১১) অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি এর অধিক উপযুক্তও বটেন। কেননা যে সব সুন্নাহর কোন বিপরীত বর্ণনা নেই, সেসব সুন্নাহর অনুসরণে তাঁর অতীব আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। ইবনে হানীও ইমাম আহমদ থেকে সংগৃহীত মাসাইলে উল্লেখ করেছেন যে, আমি আবু আব্দুল্লাহ (আহমদ) কে দেখেছি, কখনও কখনও তিনি শেষ রাকাতে উভয় হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। আবার কখনও কখনও সোজা বসে যেতেন। অতঃপর উঠতেন। (১/৫৭) ইসহাকও এটাই পছন্দ করেছেন। মারওয়াযী সংকলিত মাসাইলে তিনি বলেছেন, নবী সা. থেকে এ সুন্নাহই চলে আসছে যে, বৃদ্ধ যুবক সকলেই হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। ইবনে হাযমও এটিকে মুস্তাহাব মনে করতেন। আর এটাই সঠিক। কেননা এ সুন্নাহর বিপরীত কোন কিছু প্রমাণিত নেই। এর বিপরীত যা কিছুই এসেছে তার কোনটিই প্রমাণযোগ্য নয়। (৩/৮১৭, ৮১৮)

আলবানী সাহেব সিফাতু সালাতিন নবী স. (নবী সা. এর ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি) গ্রন্থেও ইসহাক রহ.এর অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। শেষে বলেছেন, দেখুন আল ইরওয়া, ২/৮২, ৮৩। অথচ সেখানে ইসহাক রহ.এর বক্তব্য নেই। (দ্র. নবী সা. এর ছলাত ..., পৃ. ১৫৩)

আলবানী সাহেব এখানেও অনেক বিষয় গোপন করে গেছেন। ইমাম আহমদের মাযহাব প্রমাণ করার জন্য তিনি প্রথমত ইবনুল জাওযীর আত তাহকীক গ্রন্থের বরাত উল্লেখ করেছেন। অথচ তাহকীক গ্রন্থে বলা হয়েছে:

الْمُسْتَحبّ أَن ينْهض من السُّجُود عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ مُعْتَمدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الإستراحة عَلَى قَدَمَيْهِ وأليتيه (رقم ٥٩٧)

অর্থাৎ মুস্তাহাব হলো হাঁটুর উপর হাতের ভর রেখে পায়ের উপর ভর দিয়ে সেজদা থেকে উঠবে। ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনা এও আছে যে, উভয় পা ও নিতম্বের উপর বিশ্রামের জন্য বসে পড়বে। (আত তাহকীক, নং ৫৯৭)

লক্ষ করুন, তাহকীক গ্রন্থে ইবনুল জাওযী ইমাম আহমদের মূল মাযহাব হিসাবে বৈঠক না করার কথাই উল্লেখ করেছেন। আর বৈঠক

করার পক্ষে ইমাম আহমদের একটি মত থাকার কথা বলেছেন। অথচ আলবানী সাহেব প্রথম ও মূল মতটির কথা সম্পূর্ণ গোপন করে গেছেন।

ইমাম আহমদের মাযহাব প্রমাণের জন্য তিনি দ্বিতীয়ত দাবি করেছেন যে, 'বিরোধপূর্ণ নয় এমন সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি তাঁর যে অতীব আগ্রহ লক্ষ করা গেছে সে হিসাবে এর উপর আমল করার তিনিই সর্বাধিক উপযুক্ত।' এখানে আলবানী সাহেব মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে কেয়াস ও যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আহমদের যারা সরাসরি শিষ্য ছিলেন এবং যারা তার মাসাইল সংকলন করেছেন তারা সকলেই তার মত এটাই উল্লেখ করেছেন যে, এ বৈঠকটি করবে না। পরবর্তীকালে হাম্বলী মাযহাবের বড় বড় মনীষীবৃন্দও এটাকেই তাঁর মাযহাব আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এখানে এদিক-সেদিকের কথা বলে কোন লাভ নেই।

তাছাড়া ইমাম আহমদ সম্পর্কে তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্য অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের মর্যাদাকে খাটো করে কি না তাও ভাববার বিষয়। ইমাম আহমদ থেকে বৈঠক না করার মতটি যখন অকাট্য ভাবে প্রমাণিত, আর আলবানী সাহেবের দাবি অনুযায়ী তিনি সুন্নাহর অনুসরণে অতীব আগ্রহী ছিলেন, তাহলে তো একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, মূল সুন্নাহ হলো বৈঠক না করা। অন্যথায় ইমাম আহমদ এটি অবলম্বন করতেন না।

এরপর আলবানী সাহেব ইবনে হানীর মাসাইল গ্রন্থের উদ্ধৃতি টেনেছেন। সেখানেও তিনি সত্য গোপন করেছেন। কারণ ইবনে হানীর যে বক্তব্য তিনি উল্লেখ করেছেন তার পূর্বেই ইবনে হানী লিখেছেন, ইমাম আহমদ বলেছেন,

لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا فينهض على يديه وينهض على صدور قدميه (رقم ٢٥٩)

বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া কেউ হাতের উপর ভর দিয়ে উঠবে না। পায়ের উপর ভর দিয়েই উঠে দাঁড়াবে। (নং ২৫৯)

এরপর ২৬০ নম্বরে আলবানী সাহেবের উদ্ধৃত অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে। আলবানী সাহেব কেন ইমাম আহমদের উক্তিটি গোপন করে গেলেন তা বোধ করি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলবানী সাহেবের উদ্ধৃত অংশটুকুর সঙ্গে ইমাম আহমদের পূর্বের বক্তব্য ও ফতোয়ার মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। কারণ আহমদ রহ.তো বলেছেন, বয়োবৃদ্ধের জন্য এমন করার সুযোগ আছে। ইবনে হানী (জন্ম ২২৮ হি. মৃত্যু ২৭৫ হি.) ইমাম আহমদকে বার্ধক্য অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। ইমাম আহমদ ২৪১ হি. সনে ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই ইবনে হানী যদি কখনও কখনও তাকে এ বৈঠক করতে এবং হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে দেখে থাকেন তাতে তো বৈঠক না করার ব্যাপারে ইমাম আহমদের উল্লিখিত ফতোয়াটি আরো মজবুতভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা বার্ধক্য বয়সেও তিনি সব সময় নয়, বরং মাঝেমধ্যে তাও আবার শেষ রাকাতে ওঠার সময় এ বৈঠক করতেন।

এরপর তিনি ইসহাক রহ. সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি এ মতটি অবলম্বন করেছেন। 'এ মতটি' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন সেটা তিনিই জানেন। কিন্তু এর প্রমাণ হিসাবে তিনি মারওয়াযী সংকলিত মাসাইল এর উদ্ধৃতি টেনে যে কথাটি বলেছেন তাতে বৈঠক সম্পর্কে কোন কথা এমনকি ইশারা ইঙ্গিতও নেই। সেখানে শুধু হাতের উপর ভর দিয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এমন তো হতে পারে, উক্ত উদ্ধৃতি অনুসারে তার মত হচ্ছে বৈঠক না করেই হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে পড়বে। অধিকন্তু উদ্ধৃত অংশটুকু আমরা বহু খোঁজাখুঁজি করেও মারওয়াযীর উক্ত গ্রন্থে পাই নি। পেয়েছি তার বিপরীত কথা।

ইসহাক ইবনে রাহুয়ার মাযহাব

মারওয়াযী তাঁর উক্ত গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেছেন,

قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على الأرض، فإن لم يقدر أن يعتمد على يديه وصدور قدميه جلس، ثم اعتمد على يديه وقام.(رقم ٢٢٦)

অর্থাৎ ইসহাক বলেছেন, উভয় হাত দ্বারা মাটিতে ভর দেবে, এবং পায়ের উপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে যাবে। যদি মাটিতে ভর দিয়েও পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে বসে পড়বে, পরে হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। (নং ২২৬)

আলবানী সাহেব যে মাঝে মধ্যে ভুল বরাত দেন এটি তার একটি প্রমাণ।

ইসহাক রহ. যে বৈঠক না করার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন, সে কথা শুধু মারওয়াযীই বলেন নি। ইবনুল মুনযির রহ. (মৃত্যু ৩১৮ হি.) তার আল আওসাত গ্রন্থে (৩/১১৫) ও ইমাম বাগাবী রহ. তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে (৩/১৬৫) একই কথা বলেছেন।

বড়ই আশ্চর্য লাগে, কোনরূপ তাহকীক ছাড়া আসাদুল্লাহ গালিব তার ছালাতুর রাসূল ছাঃ গ্রন্থে (পৃ. ১১৫) ও মুযাফফর বিন মুহসিন তার জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ ছাঃ এর ছালাত গ্রন্থে (পৃ. ২৭৩) আলবানী সাহেবের উদ্ধৃত ইসহাক রহ.এর পূর্বোক্ত বক্তব্যটি উল্লেখ করে দিয়েছেন।

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রহ.এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য :

আরবের প্রথম ও প্রধান মুফতী তৎসঙ্গে প্রধান বিচারপতি খ্যাতনামা আলেম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রহ. (মৃত্যু ১৩৮৯ হি.) এবং সেই সঙ্গে শায়খ সালিহ উছায়মীনের তথ্যপূর্ণ ও প্রমাণভিত্তিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই পর্যালোচনার ইতি টানছি। তাদের বক্তব্যে পাঠক মহোদয় অন্যান্য উপকারী কথার পাশাপাশি আলবানী সাহেবের সে প্রশ্ন ও আপত্তির জবাবও পেয়ে যাবেন, যা তিনি ইবনুল কায়্যিম রহ. এর বক্তব্য না বুঝেই তার উপর উত্থাপন করে বসেছেন। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম লিখেছেন :

فإن الجماعة من الصحابة الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي حميد الذي كان أوعى لهذا، وكذلك سائر الصحابة الذين رووا(٣) لم يذكروا هذه الجلسة. ولا يقال هنا أنها من باب الزيادة التي انفرد بها الثقة، فإن مثل هذا الشيء المتكرر في اليوم والليلة خمس مرات خمسة عشر عامًا لا يتصور أن يحفظه واحد والبقية لا يحفظون. أما لو كانت واقعة واحدة لتصور فيها. الحاصل أنهم جماعة وعدد كثير لا يحفظون صلاة الرسول

كل يوم خمس مرات ويحفظ الواحد!. هذا من البعيد جدًا أَو الممتنع.(فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رقم: ٥٥٨)

অর্থাৎ বিরাট সংখ্যক সাহাবা যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বিশেষত আবু হুমায়দ রা. যিনি খুব বেশি তা মনে রেখেছেন, এছাড়া অন্যান্য সকল সাহাবী, যারা এতদবিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের কেউই এ বৈঠকের কথা উল্লেখ করেন নি। এখানে একথা বলার সুযোগ নেই যে, এটা সেই বাড়তি অংশের মতো যা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করে থাকেন। কেননা এ ধরনের আমল, যা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পনের বছর পর্যন্ত বারবার ঘটতে থাকবে, তা শুধু একজন মনে রাখবেন আর বাকিরা কেউই মনে রাখবেন না, এটা কল্পনাও করা যায় না। হ্যাঁ, ঘটনা যদি শুধু একবার ঘটতো তবে এটা ভাবতে অসুবিধা হতো না। সারকথা, এত বিরাট সংখ্যক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এ আমল মনে রাখবেন না, শুধু একজন মনে রাখবেন, এটা দুস্কর বা প্রায় অসম্ভব। (ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল, শায়ক মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আলে শায়েখ, নামায অধ্যায়, নং ৫৫৮)

একইভাবে শায়খ মুহাম্মদ সালিহ উছায়মীন রহ. তার ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম গ্রন্থে (এটির বাংলা অনুবাদও প্রকাশ পেয়েছে) বলেছেন, এ মাসআলাটিতে বিদ্বানদের তিন ধরনের মত পাওয়া যায়। এক. উক্ত বৈঠক সর্বদাই মুস্তাহাব। দুই. কখনোই মুস্তাহাব নয়। তিন. উল্লিখিত দুটি মতের মাঝামাঝি মত। অর্থাৎ সরাসরি দাঁড়াতে যাদের কষ্ট হয় তারা বৈঠক করবে। আর যাদের কষ্ট না হয় তারা করবে না। মুগনী গ্রন্থকার (ইবনে কুদামা রহ.) এটিকে মধ্যপন্থী মত আখ্যা দিয়েছেন। আর মালেক ইবনুর হুওয়ায়রিছ রা. বর্ণিত হাদীসটিকে রাসূল সা. এর বৃদ্ধকালীন আমল হিসাবে গণ্য করেছেন। শায়খ উছায়মীন বলেন,

وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف،

অবশেষে আমি এমতটিই গ্রহণ করেছি। কেননা মালেক ইবনুল হুওয়ায়রিছ রা. এমন সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেছিলেন, যখন তিনি তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আর এসময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এবং তার শারীরিক দুর্বলতাও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এরপর শায়খ এই শারীরিক দুর্বলতার কিছু প্রমাণ তুলে ধরে বলেন,

ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه

অর্থাৎ উক্ত দুর্বলতা এর দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, মালেক ইবনুল হুওয়ায়রিছ রা. বর্ণিত হাদীসে মাটির উপর ভর করার উল্লেখ এসেছে। আর প্রয়োজনের মুহূর্তেই কেবল কোন কিছুর উপর ভর দেওয়া হয়ে থাকে। (নং ২৫৩)

উলামায়ে কেরামের এসব বক্তব্য সামনে রেখে আলবানী সাহেবের বক্তব্যগুলো একটু ভেবে দেখুন। সেই সঙ্গে তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে তার যে চূড়ান্ত বক্তব্য এসেছে সেটি আরো বেশি করে ভেবে দেখুন। তিনি বলেছেন,

وإذ الأمر كذلك فيجب الاهتمام بهذه الجلسة والمواظبة عليها رجالا ونساء وعدم الالتفات إلى من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لمرض أوسن لأن ذلك يعني أن الصحابة ما كانوا يفرقون بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم تعبدا وما يفعله لحاجة وهذا باطل بداهة

অর্থাৎ বিষয়টি যখন এমন, তাই এই বৈঠকটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং সদা সর্বদা আমল করা অত্যাবশ্যক। চাই পুরুষ হোক বা নারী। সেই সঙ্গে যারা দাবি করেন যে, নবী সা. অসুস্থতা বা প্রয়োজনের তাগিদে এমনটি করেছিলেন, তাদের কথায় কর্ণপাত না করা চাই। কেননা এর অর্থ দাঁড়ায় সাহাবীগণ এ পার্থক্যটিও করতে পারতেন না যে, কোনটি তিনি ইবাদত হিসাবে করেছেন আর কোনটি প্রয়োজনের খাতিরে। আর একথা সুস্পষ্ট বাতিল। (দ্র. ১/২১২)

এ বাড়াবাড়িরই শিকার হয়েছেন আমাদের দেশের কিছু লোক। মুযাফফর বিন মুহসিন কৃত জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায গ্রন্থটিতে এ মাসআলাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমাদের উদ্ধৃত তিনটি দলিল উল্লেখ করা হয় নি। কিছু দুর্বল বর্ণনা এনে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে মুরাদ বিন আমজাদ কৃত 'প্রচলিত ভুল বনাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত আদায়ের পদ্ধতি' গ্রন্থ ও আসাদুল্লাহ গালিব কৃত 'ছালাতুর রাসূল (ছা.)' গ্রন্থে একই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে।

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাশাহহুদে বসার সুন্নত পদ্ধতি

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

তাশাহহুদে বসার সুন্নত পদ্ধতি

নামাযে ১ম ও শেষ বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা ও ডান পা খাড়া রাখা সুন্নত।

ডান পা বিছিয়ে দেওয়া ও বাম পা খাড়া রাখার দলিল

১. হযরত আয়েশা রা. বলেন,

كَانَ(رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–) يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. أخرجه مسلم في باب صفة الصلاة (٤٩٨) وابن أبي شيبة، (٢٩٤٣)

অর্থ: তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক দুই রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন। এবং বাম পা বিছিয়ে দিতেন ও ডান পা খাড়া রাখতেন। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৪৯৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৯৪৩; আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস নং ১৬৫১, আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৩০৫০; মুসনাদে ইসহাক, হাদীস নং ১৩৩১, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৪০৩০, ইবনে মাজাহ,হাদীস নং ৮৯৩; আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৮৩; আবু আওয়ানা, হাদীস নং ২০০৪।

২: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. أخرجه الترمذي(٢٩٢)وقال حسن صحيح وابن أبي شيبة، (٢٩٤٢).

অর্থ: আমি মদীনা আসলাম, আর (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখবো। (তিনি বলেন), যখন তিনি বৈঠক করলেন, অর্থাৎ তাশাহহুদের জন্য তখন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন, এবং তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর

রাখলেন। আর ডান পা খাড়া রাখলেন। তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৯২; তিনি বলেছেন, এটি হাসান সহীহ। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৯৪২; নাসাঈ, হাদীস নং ১১৫৯; সুনানে দারিমী, ১/৩১৪, মুসনাদে আহমদ, ৪/৩১৮, তাহাবী ১/১৫২; বায়হাকী, ২/১৩২।

৩ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন,

إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. أخرجه البخاري(٨٢٧) والنسائي(١١٥٧-١١٥٨) وابن أبي شيبة (٢٩٤٤).

অর্থ: নামাযে সুন্নত হলো ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৮২৭; নাসায়ী শরীফ, হাদীস নং ১১৫৭, ১১৫৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৯৪৪।

নাসায়ী শরীফে বাম পায়ের উপর বসার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় হযরত কা'ব রা., হযরত আলী রা., মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. ও ইবরাহীম নাখায়ী র. প্রমুখের আমলও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

এসব হাদীসে ১ম ও ২য় বৈঠকের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। শুধু আবূ হুমায়দ আস সাইদী রা. বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ বৈঠকে উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে (বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে) নিতম্বের উপর বসে পড়তেন। এ হাদীসটির কারণে কোন কোন ফকীহ ও মুহাদ্দিস মনে করেন, উপরোক্ত হাদীসগুলো ১ম বৈঠক সম্পর্কে। কিন্তু হাদীসগুলোর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা তা সঠিক মনে হয় না। অনেকেই মনে করেন, আবূ হুমায়দ রা. এর হাদীসটিতে যে পদ্ধতিতে বসার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটা বরং উযরের কারণে ছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় বৈঠকে একইভাবে বসা হতো। যা উপরের হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে কম সংখ্যক ফকীহ হযরত আবু হুমায়দ রা. বর্ণিত হাদীসের নিয়মানুসারে আমল করতেন। ইমাম তিরমিযী র. আবু হুমায়দ রা.এর হাদীসটি উল্লেখপূর্বক লিখেছেন,

وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

অর্থাৎ কিছু কিছু আলেম এই মত অবলম্বন করেছেন। শাফেয়ী র. আহমাদ র. ও ইসহাক র. এর মতও অনুরূপ।

পক্ষান্তরে হযরত ওয়াইল রা.এর হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর তিরমিযী র. লিখেছেন,

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة

অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমের আমল হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর হাদীস অনুসারে। সুফিয়ান ছাওরী র., আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. ও কূফাবাসীর মতও ছিল অনুরূপ।

লক্ষ্য করুন, পূর্বসূরি আলেমগণের অধিকাংশের আমল কি প্রমাণ করে না যে, হযরত আবূ হুমায়দ রা. বর্ণিত পদ্ধতিটি উযরের কারণে ছিল? অধিকন্তু এরা নিজেদেরকে সালাফী (পূর্বসূরিদের অনুসারী) বলে পরিচয় দেয়। অথচ তারা পূর্বসূরিগণের অধিকাংশের আমল ছেড়ে দিয়েছে! শুধু ছেড়ে দিয়েছে তাই নয়, বরং সেটিকে সুন্নতের পরিপন্থী আখ্যা দিচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সুফিয়ান ছাওরী র. ও ইবনুল মুবারক র. প্রমুখ হাদীসের সাগর-মহাসাগর বেঁচে থাকলে তাদেরকেও এরা সুন্নত শিখিয়ে দিত। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সুমতি দান করুন।

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

জুমআর আগের ও পরের সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

জুমআর আগের ও পরের সুন্নত

আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা আজকাল কিছু কিছু মিডিয়ায়ও প্রচার শুরু করেছে, জুমআর আগে পরে কোন সুন্নত নাই। তাদেরকে না চেনার কারণে অনেকে ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। যারা এ সুন্নত আদায় করে আসছেন তারা সন্দেহে পড়ে যাচ্ছেন। অনেকে স্থানীয় ইমাম সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করে বিষয়টি পরিস্কার করে নিচ্ছেন। আবার অনেকে ঐ অপপ্রচারকেই গনিমত মনে করে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে গোনাহগার হচ্ছেন। এসব কারণে এ মাসআলাটিও পরিস্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তাই জুমআর সুন্নত সম্পর্কে হাদীসগুলো তুলে ধরা হচ্ছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

১. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন:

عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ». أخرجه مسلم (٨٥٧)

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করলো, অতঃপর জুমআয় আসলো, এবং তৌফিক অনুসারে নামায পড়লো, এরপর ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ রইলো এবং তার সঙ্গে নামায আদায় করলো তার পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৮৫৭।

২. হযরত সালমান ফারসী রা. বলেছেন:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ

بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. أخرجه البخاري (رقم ٨٨٣) وفي رواية له: ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি জুমআর দিন গোসল করে, সাধ্যমতো পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে কিংবা ঘরে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর ঘর থেকে বের হয় এবং (বসার জন্য বা পার হওয়ার জন্য) দুজনকে আলাদা না করে, এরপর তাওফিক মতো নামায পড়ে, অতঃপর ইমাম যখন খুতবা দেয় তখন চুপ থাকে, তাহলে অন্য জুমআ পর্যন্ত তার পাপ ক্ষমা করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৮৩) বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর ইমাম (খুতবার উদ্দেশ্যে) বের হলে চুপ থাকে। (হাদীস নং ৯১০)

৩. এ মর্মে হযরত নুবায়শা আল হুযালী রা. থেকে আরেকটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ

অর্থাৎ যদি ইমামকে বের হতে না দেখে তবে যে পরিমাণ ইচ্ছা নামায পড়ে। .... (মুসনাদে আহমদ, ৫খ. ৭৫পৃ.)

৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণিত অপর একটি হাদীসে জুমআর পূর্বে নামায পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন, ثم ركع ما شاء أن يركع অর্থাৎ তার যে পরিমাণ ইচ্ছা রুকু (নামায আদায়) করে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১১৭৬৮)

এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে নামায পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এসব হাদীস পেশ করলে ঐ সব বন্ধু সুর পাল্টে বলেন, হ্যাঁ, নামায তো আছে, তবে সুন্নতে মুয়াক্কাদা নেই। অথচ মুয়াক্কাদা– গয়র মুয়াক্কাদা ফকীহগণের পরিভাষা। ফিকাহ শাস্ত্র ও ফকীহগণের কোন গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তারা তো দেখবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে উৎসাহিত করেছেন

কি না। তিনি উৎসাহিত করে থাকলে তারাও উৎসাহিত করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করেছেন এমন বিষয়কেই তো সুন্নত বলা হয়। চাই তা মুয়াক্কাদা হোক বা গয়র মুয়াক্কাদা।

আসলে কোন আমলকে সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা রাতিবা আখ্যা দেওয়া মুজতাহিদ ফকীহগণের ইজতিহাদ বা সুচিন্তিত মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোন আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান, উক্ত আমলের উপর তাঁর নিজের পাবন্দি ও সাহাবায়ে কেরামের আমল ও গুরুত্বারোপের আলোকেই ফকীহগণ উক্ত পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এই সুন্নতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তা পেছনের হাদীসগুলো থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর নিজস্ব আমল এবং তাঁর সাহাবীগণের নির্দেশ ও আমল সংক্রান্ত হাদীসগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। তার আগে হাদীসশাস্ত্রবিদদের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নীতিটি তারাবীর আলোচনায় সবিস্তারে আসছে। তা হলো, কোন হাদীস যদি একাধিক সনদ বা সূত্রে বর্ণিত থাকে, আর পৃথক পৃথক ভাবে সবগুলো সূত্র দুর্বল হয়, তথাপি সেগুলোর সমষ্টি মিলে হাসান স্তরে উন্নীত হয় এবং প্রমাণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। পরিভাষায় এটাকেই হাসান লিগায়রিহী বলে। আর তদনুযায়ী সাহাবীগণের আমল পাওয়া গেলে তা আরো শক্তিশালী হয়। আর যদি মূল হাদীসটিরই কোন শক্তিশালী সনদ থাকে তবে তো কোন কথাই নেই। আলোচ্য বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে একাধিক হাদীস রয়েছে। সূত্র ও সনদের দিক থেকে এর কোন কোনটি বেশ শক্তিশালী। সেই সঙ্গে রয়েছে বহু সাহাবীর আমল। নিম্নে এগুলো তুলে ধরা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল:

১. হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة أربعا . لا يفصل في شيء منهن

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। মাঝে সালাম ফেরাতেন না। ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১১২৯, তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, হাদীস নং ১৬৪০। এর সনদ দুর্বল।

২. হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন,

كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে পড়তেন চার রাকাত, পরে পড়তেন চার রাকাত। আর চার রাকাতের পরেই তিনি সালাম ফেরাতেন। তাবারানী, আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং ১৬১৭; আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী, (মৃত্যু ৩৪০ হি.) আল মুজাম, হাদীস নং ৮৭৪।

এ হাদীসটির সনদ বা সূত্র নিম্নরূপ:

حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر أبو جعفر نا خليفة بن خياط شباب العصفري نا محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي

এ সনদটির সকল রাবী (বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্য। শুধু সামান্য আপত্তি করা হয়েছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আসসাহ্মী সম্পর্কে। ইবনে হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, وهو ضعيف عند البخاري وغيره অর্থাৎ তিনি বুখারী প্রমুখের দৃষ্টিতে দুর্বল। অথচ ইমাম বুখারী রহ. কোথাও তাকে দুর্বল বলেন নি। তিনি বরং তাঁর আত তারীখুল কাবীর গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারীর অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, لا يتابع عليه অর্থাৎ তার এ বর্ণনায় অন্য কারো সমর্থন মেলে না। বুখারী রহ. এর এ কথাটিই ইবনে হাজার রহ. তার লিসানুল মীযান গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন– لا يتابع على روايته অর্থাৎ তার বর্ণনার সমর্থন মেলে না। অথচ এই ব্যাপক অর্থে ইমাম বুখারী রহ. ঐ কথা বলেননি। বুখারী

রহ. ছাড়া আবু হাতেম রাযী রহ. উক্ত বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেছেন, ليس بمشهور অর্থাৎ তিনি প্রসিদ্ধ নন। এ কথাটি উক্ত বর্ণনাকারীর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। হ্যাঁ, ইবনে আবু হাতেমের সূত্রে ইবনে মাঈন রহ. এর কথা লিসানুল মীযানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু কথাটি ইবনে আবী হাতেমের ইলাল কিংবা আলজারহু ওয়াত তাদীলেও নেই। তারীখে ইবনে মাঈনেও নেই। অপর দিকে ইবনে আদী রহ. তার আলকামিল গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারীর হাদীসসমূহ যাচাইপূর্বক বলেছেন, عندي لا بأس به অর্থাৎ আমার দৃষ্টিতে তার মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই। এমনকি ইবনে আদী এই দাবিও করেছেন, বুখারী রহ. যার সম্পর্কে لا يتابع عليه বলেছেন, তিনি হয়তো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে তালহা আলকুরাশী হবেন। ইবনে হিব্বানও সাহমীকে আছছিকাত (বিশ্বস্ত রাবী চরিত) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ কালে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আজমী রহ. তার 'আলআলবানী শুযুযুহু ওয়া আখতাউহু' গ্রন্থে বলেছেন,

والحق عندي أنه حسن الحديث لأنه روى عنه ابن المثنى ونصر بن علي وخليفة العصفرى فبطل قول أبي حاتم أنه ليس بمشهور ووثقه ابن عدي وابن خبان فحديثه هذا حسن لذاته ولا شك في كونه حسنا لغيره لأن له شواهد.

অর্থাৎ আমার মতে সঠিক হলো, তিনি হাসানস্তরের রাবী। কারণ তাঁর থেকে ইবনুল মুছান্না, নাস্‌র ইবনে আলী ও খালীফা আলউসফুরী প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই আবু হাতেমের বক্তব্য– 'তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না' সঠিক থাকল না। ইবনে আদী ও ইবনে হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং তার বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান লি যাতিহী। আর হাসান লি গাইরিহী হওয়ার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই। কেননা এ হাদীসটির অনেক শাহেদ বা সমর্থক বর্ণনা রয়েছে।

এতো গেল তাবারানী ও ইবনুল আরাবী রহ. এর সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনা। এ ছাড়া এই হাদীসটি আবুল হাসান আল খিলায়ীও (মৃত্যু ৪৯২ হি.) তার আল ফাওয়াইদ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর বর্ণিত সনদ আবু ইসহাক রহ. থেকে উপরের দিকে আলী রা. পর্যন্ত ঠিক তেমনই, যেমনটি তাবারানীর সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু আবু ইসহাক থেকে নীচে খিলায়ী পর্যন্ত সনদ সম্পর্কে আমরা অবগতি লাভ করতে পারিনি। সনদের এ অংশে আস সাহমী'র উল্লেখ রয়েছে কি না তাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে যারা অবগত ছিলেন তাদের মধ্যে একাধিক হাফেযে হাদীস খিলায়ীর সনদ সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেছেন। হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হি.) বলেছেন, وإسناده جيد অর্থাৎ খিলায়ী বর্ণিত সনদটি জাইয়েদ। (দ্র. ফায়যুল কাদীর, হাদীস নং ৭০৩৩)। হাফেয ওয়ালীউদ্দীন ইরাকীও (মৃত্যু ৮২৬ হি.) তার 'তারহুত তাছরীব' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত উল্লিখিত ১নং হাদীসটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَالْمَتْنُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْخَلَعِيِّ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসটির মূল বক্তব্য আবুল হাসান আলখিলায়ী রহ. তার ফাওয়াইদ গ্রন্থে জাইয়েদ বা উত্তম সনদে উদ্ধৃত করেছেন। আবু ইসহাক আসিম ইবনে দামরা'র সূত্রে আলী রা. থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (দ্র. ৩খ. ৪২ পৃ.)

শুধু এই দুই খ্যাতিমান মুহাদ্দিস উল্লিখিত সনদকে জাইয়েদ বলেছেন তা নয়। বরং তাদের সঙ্গে সহমত ব্যক্ত করেছেন আরো তিনজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তাদের একজন হলেন হাফেজ শিহাবুদ্দীন বূসিরী রহ. (মৃত্যু ৮৪০ হি.) তার মিসবাহুয যুজাজাহ গ্রন্থে (১ খ. ১৩৬ পৃ.)। দ্বিতীয় জন মুহাদ্দিস আব্দুর রউফ আল মুনাবী রহ. (মৃত্যু ১০৩২ হি.) তার ফায়জুল কাদীর গ্রন্থে (হাদীস নং ৭০৩৩) ও তৃতীয়জন মুহাদ্দিস মুরতাজা হাসান

যাবীদী রহ. (মৃত্যু ১২০৫ হি.) তার ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন গ্রন্থে(৩ খ. ২৭৫ পৃ.)।

হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব লিখেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আস-সাহমীর এ বর্ণনার সমর্থন আলী রা.এর ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারাও হয়, যা সুন্নত ও নফল সম্পর্কে খুবই প্রসিদ্ধ এবং 'সুনান' ও 'মাসানীদ' গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত।

আসিম ইবনে দামরা বলেন-

أتينا عليا، فقلنا : يا أمير المؤمنين ألا تحدثنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار تطوعا؟ فقال : من يطيق ذلك منكم؟ قلنا نأخذ منه ما أطقنا.

আমরা আলী রা. এর কাছে এলাম এবং আরজ করলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সালাতুত তাতাওউ' (সুন্নত ও নফল নামাযসমূহের) বিষয়ে অবগত করবেন না? তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে তার (অনুসরণের) হিম্মত রাখে? আরজ করলাম, 'আমরা সাধ্যমতো আমল করব।'

এরপর আলী রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবসের সুন্নত ও নফল নামাযের বিবরণ দিলেন। প্রথমে ফজরের পর সূর্য মাথার উপর আসার আগ পর্যন্ত দুই নামাযের কথা বললেন: দুই রাকাত এবং চার রাকাত (অর্থাৎ ইশরাকের দুই রাকাত ও চাশতের চার রাকাত)

এর পর বলেন-

ثم أمهل فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا، ثم صلى بعد الظهر ركعتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين ومن اتبعهم من المؤمنين والمسلمين، فتلك ست عشرة ركعة.

'এরপর তিনি নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য ঢলে যেত তখন দাঁড়াতেন ও চার রাকাত পড়তেন। এরপর যোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন, আসরের আগে চার রাকাত পড়তেন। প্রতি দুই

রাকাতকে তাশাহহুদ দ্বারা আলাদা করতেন। এ হল সর্বমোট ষোল রাকাত। (আল-আহাদীসুল মুখতারা, যিয়াউদ্দীন আলমাকদেসী খ. ১, পৃ. ১৪২-১৪৩ হাদীস : ৫১৪)

সুনানে ইবনে মাজায় (হাদীস : ১১৬১) এই হাদীসের শেষে আছে-

قال علي فتلك ست عشرة ركعة، تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال وكيع : زاد فيه أبي : فقال حبيب بن أبي ثابت : يا أبا إسحاق! ما أحب أن لي بحديثك هذا مِلْءَ مسجدك هذا ذهبا.

অর্থাৎ, আলী রা. বললেন, 'এ হচ্ছে সর্বমোট ষোল রাকাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের তাতাওউ (নফল ও সুন্নত) নামায। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তা নিয়মিত আদায় করে।'

রাবী বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করার পর (উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে থেকে ইমাম) হাবীব ইবনে আবী ছাবিত বলে উঠলেন, 'আবু ইসহাক! আপনার বর্ণিত এই হাদীসের বিনিময়ে তো আপনার এই মসজিদ ভরা স্বর্ণের মালিক হওয়াও আমি পছন্দ করব না!

এ হাদীসে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে চার রাকাতের কথা এসেছে, খুব সহজেই বোঝা যায়, সপ্তাহের ছয়দিন তা যোহরের আগের সুন্নত আর জুমার দিন জুমার আগের সুন্নত। কিন্তু অধিকাংশ দিনে তা যেহেতু 'কাবলায যোহর' আর জুমাও হচ্ছে যোহরেরই স্থলাভিষিক্ত, তাই এ চার রাকাতকে অন্যান্য বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে- وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس (এবং যোহরের আগে চার রাকাত, যখন সূর্য ঢলে যায়) এবং এভাবে- ويصلي قبل الظهر أربعا. (এবং যোহরের আগে চার রাকাত পড়তেন)

এই বর্ণনাগুলোতে 'যোহর' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় অনেকে মনে করেছেন, এই চার রাকাত শুধু 'যোহরের নামাযে'র আগে পড়তে হবে,

কারণ এই হাদীসে তো 'কাবলায যোহর' বলা হয়েছে, 'কাবলাল জুমা নয়।' বলাবাহুল্য, এটা অগভীর চিন্তার ফল। কারণ,এখানে ঐ সকল সুন্নত ও নফল নামাযের আলোচনা হচ্ছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে আদায় করতেন। জুমার দিনও তো দিনই বটে, রাত তো নয়। তাহলে এই 'দিন' সূর্য ঢলে যাওয়ার পর চার রাকাত নামায কেন হবে না? এ বিষয়ে জুমার দিনের নিয়ম যদি আলাদা হত তাহলে আলী রা. তা বলতেন। বলেননি যখন বোঝা গেল যে, জুমার দিনেও এ নামায পড়া হত। জুমার দিন কি ইশরাক, চাশত ও আসরের আগের সুন্নতসমূহ নেই? তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরের এই চার রাকাত কেন থাকবে না? এটিও তো 'আন নাহার' (দিবস) শব্দের অন্তর্ভুক্ত। (সূত্র: কাবলাল জুমা : কিছু নিবেদন, মাওলানা আব্দুল মালেক, মাসিক আলকাউসার, ডিসেম্বর, ২০১২)

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণিত হাদীস:

ইমাম তাবারানী রহ. তাঁর আল মু'জামুল আওসাত গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال نا عتاب بن بشير عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها أربعا

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত পড়তেন। (হাদীস নং ৩৯৫৯)

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, وفي إسناده ضعف وانقطاع অর্থাৎ এর সনদে দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। (২খ. ৫১৮পৃ.)

উল্লেখ্য, এ হাদীসের বর্ণনাকারী কেউ দুর্বল নন। সনদের বিচ্ছিন্নতার কারণেই হয়তো ইবনে হাজার রহ. এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর সনদের বিচ্ছিন্নতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, আবু উবায়দা তাঁর পিতা ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাদীস শোনেন নি। কিন্তু এ অভিযোগে এই হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। তার কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক. হাফেজ যাহাবী রহ. আবু উবায়দা সম্পর্কে সিয়ার গ্রন্থে লিখেছেন, روى عن أبيه شيئا وأرسل عنه اشياء অর্থাৎ তিনি কিছু হাদীস সরাসরি তাঁর পিতা থেকে (শুনে) বর্ণনা করেছেন, আর অনেক হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। (৪খ, ৩৬৩পৃ)

খ. ইমাম বুখারী রহ. তার আলকুনা গ্রন্থে (নং ৪৪৭) সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন, أنه فيما سأل أباه عن بيض الحمام فقال صوم يوم অর্থাৎ তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইহরামরত ব্যক্তি যদি কবুতর জাতীয় পাখির ডিম ভেঙ্গে ফেলে তাকে কী ক্ষতিপূরণ আসবে? তিনি বললেন, একদিনের রোজা রাখতে হবে।

এসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবু উবায়দা তার পিতা থেকে কিছুই শোনেননি– কথাটি সঠিক নয়। ফলে সূত্র বিচ্ছিন্নতার অভিযোগটিও ঠিক থাকে না।

গ. যদি ধরেও নিই যে, তিনি তাঁর পিতা থেকে শোনেন নি, তথাপি এ অভিযোগে তার বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দেওয়া মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতেই সঠিক নয়। আলী ইবনুল মাদীনী রহ. আবূ উবায়দা বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, هو منقطع وهو حديث ثبت অর্থাৎ সূত্র বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এটি একটি দৃঢ় ও উত্তম হাদীস। ইয়াকুব ইবনে শায়বা রহ. বলেছেন,

إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند – يعني في الحديث المتصل . لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها ، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر

অর্থাৎ আমাদের মুহাদ্দিসগণ পিতার সূত্রে আবু উবায়দার বর্ণিত হাদীসকে মুসনাদ তথা মুত্তাসিল বা সূত্র অবিচ্ছিন্ন হাদীসের অন্তর্ভুক্ত এজন্য করেছেন যে, তিনি তার পিতার হাদীস সম্পর্কে খুব ভালো জ্ঞান রাখতেন। তার সে সম্পর্কিত জ্ঞান বিশুদ্ধ ছিল। এবং তিনি তাতে কোন আপত্তিকর বর্ণনা পেশ করেননি। (দ্র. শারহু ইলালিত তিরমিযী, ইবনে রজব হাম্বলী, পৃ. ১৮২)

এসব কারণে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী রহ. মুসতাদরাক গ্রন্থে এ সূত্রের অনেক হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র. আলকাশিফ এর টীকা)

লক্ষ করুন, এসব সিদ্ধান্ত ঐ মুহাদ্দিসগণের, যাদের কেউই হানাফী নন। এতদসত্ত্বেও আলবানী সাহেব তাঁর সিলসিলাহ যয়ীফা গ্রন্থে বলেছেন,

وقد حاول بعض من ألف في مصطلح الحديث من حنفية هذا العصر أن يثبت سماعه منه دون جدوى

অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক রচনায় বর্তমান কালের কোন কোন হানাফী লেখক আবু উবায়দার স্বীয় পিতা থেকে হাদীস শ্রবণ প্রমাণ করতে অনর্থক চেষ্টা চালিয়েছেন। (হাদীস নং ১০১৬)

আলবানী সাহেব এ হাদীস সম্পর্কে পাঁচটি অভিযোগ এনেছেন। এর একটির জবাব পূর্বোক্ত আলোচনায় এসে গেছে। ৫ম অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

وهي العلة الحقيقية، وهي خطأ عتاب بن بشير في رفعه، فإنه مع الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل فقال : عن خصيف به موقوفا على ابن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة

অর্থাৎ পঞ্চম কারণটি হচ্ছে এ হাদীস দুর্বল হওয়ার প্রধান ও প্রকৃত কারণ। আর তা হলো, হাদীসটি মারফূ রূপে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আত্তাব ইবনে বশীরের ভ্রান্তি। তার স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা তো ছিলই। অধিকন্তু তাঁর বিপরীতে মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়ল একই সূত্রে এ হাদীসটি ইবনে মাসউদ রা. এর আমলরূপে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী শায়বা এটি উদ্ধৃত করেছেন।

এর জবাবে আমরা বলব, আত্তাব ইবনে বশীর বুখারী শরীফের রাবী। (দ্র. হাদীস নং ৫৭১৮ ও ৭৩৪৭) অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার বিশ্বস্ত হওয়ার পক্ষে। তাঁর বর্ণনাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক ইবনে আদী রহ. বলেছেন, ومع هذا فإني أرجو أنه لا بأس به. অর্থাৎ এতদসত্বেও আমি মনে করি তাঁর

মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই। অপর দিকে মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়লও সমালোচনার উর্ধ্বে নন। ইবনে সাদ বলেছেন, وبعضهم لا يحتج به অর্থাৎ কেউ কেউ তাকে প্রমাণযোগ্য মনে করেন না। আবু হাতিম রাযী রহ. বলেছেন, كثير الخطأ অর্থাৎ তিনি অনেক ভুলভ্রান্তির শিকার। তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারীর বাচনিক উদ্ধৃত হয়েছে যে, وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়লের হাদীসটি ভুল। ভুলটির শিকার হয়েছেন ইবনে ফুযায়ল। (হাদীস নং ১৫১)

সুতরাং ইবনে ফুযায়লের বর্ণনার কারণে আত্তাবের বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দেওয়া যায় না। বিশেষ করে এ কারণেও যে আত্তাব সম্পর্কে ইবনে সাদ বলেছেন, راوية لخصيف অর্থাৎ তিনি খুসায়ফ রহ. এর বিশিষ্ট রাবী।

৪. নাফে' রহ. বর্ণনা করেন,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ইবনে উমর রা. জুমআর পূর্বে দীর্ঘ নামায পড়তেন এবং জুমআর পরে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন। আর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। (আবু দাউদ শরীফ, ১১২৮)

এ হাদীসের শেষ বাক্যটি থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে চার রাকাত পড়তেন। ইমাম নববী রহ. এ হাদীস দ্বারা জুমআর পূর্বে চার রাকাত সুন্নত হওয়ার দলিল পেশ করেছেন। ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তো স্পষ্ট করে তার বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেছেন,

وظاهر هذا : يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) : صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيته ؛ فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد ، صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين. وهذا فيما وضع

للإشارة إلى البعيد أظهر ، مثل لفظة : " ذلك " ؛ فإن تخصيص القريب بها دون البعيد يخالف وضعها لغة.

অর্থাৎ এই শেষ বাক্যটি বাহ্যিকভাবে নির্দেশ করে যে, জুমআর পূর্বে চার রাকাত ও পরে ঘরে পড়া দুই রাকাত সবটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছিল। কেননা ইসমে ইশারা বা ইংগিত বাচক বিশেষ্য (ذلك) তার পূর্বের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবটাকেই ইংগিত করে। একাধিক ফকীহ ও উসূলবিদ একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর এ ذلك দূরবর্তী বস্তুর প্রতি ইংগিতবাচক হওয়ার ক্ষেত্রে ততধিক স্পষ্ট। কারণ দূরবর্তীকে বাদ দিয়ে নিকটবর্তী বস্তুর জন্য সেটাকে খাস করা তার শাব্দিক গঠনের উদ্দেশ্য বিরোধী। (দ্র. হাদীস নং ৯৩৭)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব রা. বর্ণনা করেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر – أي :قبل صلاة فريضتها – وقال أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أخرجه أحمد ٣/٤١١ والترمذي (٤٧٨) وهذا المعني مذكور في حديث أبي أيوب عند ابن أبي شيبة (٥٩٩٢) ولفظه: أن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে - অর্থাৎ জোহরের ফরজ পড়ার পূর্বে - চার রাকাত নামায পড়তেন। তিনি বলেছেন, এ সময়টায় আসমানের দ্বার খোলা হয়। আর এ সময় আমার নেক আমল উপরে উঠুক, আমি তা পছন্দ করি। মুসনাদে আহমদ, ৩/৪১১; তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৪৭৮।

হযরত আবূ আইয়্যুব রা. এর হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে- সূর্য ঢলার সময় জান্নাতের দরজা খোলা হয়। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৯৯২।

হাদীস দুটির সনদ সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা লেখেন,

فحديث أبي أيوب وحده بطرقه قوي وحديث عبد الله بن السائب كذلك حسن لذاته فازداد قوة.

অর্থাৎ শুধু আবূ আইয়্যূব রা. এর হাদীসটি তার সূত্রগুলোর কারণে বেশ মজবুত। আর আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব রা. এর হাদীসটি حسن لذاته । সুতরাং এতে আরো শক্তি বেড়ে গেল। পরিশেষে শায়খ বলেন,

فهذا المعنى هو حجة لمن يقول بسنية أربع ركعات قبل فرض الجمعة لأن فتح أبواب السماء أو الجنة مناط بزوال الشمس وهذا متحقق في يوم الجمعة وغيره. (المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١١٥-١١٦)

অর্থাৎ যারা জুমআর ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নতের কথা বলেন এ হাদীসটিই তাদের প্রমাণ। কেননা আসমান কিংবা জান্নাতের দরজা খোলাটা সূর্য ঢলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এ অবস্থা জুমআর দিন ও অন্যান্য দিনে সমানভাবে বিদ্যমান। দ্র, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার টীকা, ৪খ, ১১৫-১১৬পৃ।

আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী র. বলেছেন,

بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم، سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود

অর্থাৎ এ হাদীস থেকে সূর্য ঢলার পর প্রতিদিন– জুমআর দিন হোক আর অন্য কোন দিন– চার রাকাত নামায পড়া উত্তম প্রমাণিত হয়। আর এটাই এর উদ্দেশ্য। (দ্র. ফায়যুল কাদীর, হাদীস নং ৭০৭১)

সাহাবায়ে কেরামের আমল:

১. হযরত আলী রা. এর আমল:

আবূ আব্দুর রহমান সুলামী র. বলেন,

كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا ، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا . أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥) وإسناده صحيح.

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে কাবলাল জুমআ চার রাকাত, বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিতেন। অবশেষে হযরত আলী রা. যখন আমাদের এখানে (কূফায়) আসলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বা'দাল জুমআ দুই রাকাত তারপর চার রাকাত (মোট ছয় রাকাত) পড়ার আদেশ দিয়েছেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৫২৫। এর সনদ সহীহ।

২. কাতাদা র. বলেন,

أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات ، قال أبو إسحاق : وكان علي يصلي بعد الجمعة ست ركعات ، وبه يأخذ عبد الرزاق . أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٤) ورواه الطبراني وإسناده صحيح قاله النيموي في آثار السنن.

অর্থ: ইবনে মাসউদ রা. কাবলাল জুমআ চার রাকাত ও বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়তেন। আবূ ইসহাক বলেন, আলী রা. বা'দাল জুমআ ছয় রাকাত পড়তেন। (আব্দুর রাযযাক বলেন,) আব্দুর রাযযাক এ হাদীস অনুসারেই আমল করে থাকে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৫২৪। তাবারানী শরীফ। এর সনদ সহীহ।

৩. হযরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে আতা র. বলেছেন,

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَفْعَلُ ذَلِكَ. أخرجه أبو داود (١١٣٠) وقال العراقي: إسناده صحيح. آثار السنن ص ٣٠٢

অর্থ: তিনি যখন মক্কা শরীফে অবস্থান করতেন এবং জুমআর ফরজ পড়তেন, তখন সামনে অগ্রসর হয়ে দুই রাকাত পড়তেন, পরে আরেকটু অগ্রসর হয়ে চার রাকাত পড়তেন। আর যখন মদীনা শরীফে জুমআ

আদায় করতেন তখন ঘরে ফিরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন। মসজিদে পড়তেন না। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন।

আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ১১৩০; আল্লামা ইরাকী বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বর্ণিত,

أنه كان يصلي يوم الجمعة في بيته أربع ركعات ، ثم يأتي المسجد فلا يصلي قبلها ولا بعدها

অর্থাৎ তিনি জুমআর দিন ঘরে চার রাকাত পড়তেন। এরপর মসজিদে আসতেন এবং জুমআর আগে ও পরে আর কোন নামায পড়তেন না।

মুহাদ্দিস হারব ইবনে ইসমাইল কিরমানী (মৃত্যু ২৮০ হি.) তাঁর কিতাবে সনদসহ এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী কিরমানীর বরাতে তাঁর বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে প্রমাণ হিসেবে এটি উল্লেখ করেছেন। (হাদীস নং ৯৩৭) উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে যে বলা হয়েছে, জুমআর আগে ও পরে আর কোন নামায পড়তেন না– তার মানে মসজিদে পড়তেন না।

৫. হযরত সাফিয়া (صافية) বলেন :

رأيت صفية بنت حيي صلت أربعا قبل خروج الإمام وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين

আমি হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রা. (উম্মুল মুমিনীন)কে দেখেছি, ইমাম বের হওয়ার পূর্বে চার রাকাত পড়তেন এবং ইমামের সঙ্গে জুমআর দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। ইবনে সাদ তাঁর তাবাকাতে এটি উদ্ধৃত করেছেন। (ক্রমিক নং ৪৭০১)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল:

৬. আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস রহ. (মৃত্যু ৭০ হি.) বলেন,

كنت أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا فصلوا أربعا

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে দেখতাম, জুমআর দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন, এবং চার রাকাত পড়তেন। ইবনে আব্দুল বার রহ. তামহীদ গ্রন্থে (حديث ثامن لزيد بن أسلم) আবূ বকর আল আছরাম রহ. (মৃত্যু ২৭০ হি.) এর বরাতে এটি সনদসহ উল্লেখ করেছেন। এর সনদ সহীহ। ইবনে রজব হাম্বলীও তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে আছরামের বরাতে এটি উদ্ধৃত করেছেন। (হাদীস নং ৯৩৭)

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত সনদটি নিম্নরূপ:

الأثرم قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال كنت أرى ...

৭. ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (মৃত্যু ৯৬ হি.) বলেন,

كانوا يصلون قبلها أربعا وبعدها أربعا .أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٠٥، ٥٤٢٢)

অর্থ: সাহাবায়ে কেরাম কাবলাল জুমআ চার রাকাত, বা'দাল জুমআ চার রাকাত পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৪০৫,৫৪২২।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এটি ইবনে আবুদ দুনিয়া রহ. রচিত কিতাবুল ঈদায়ন এর বরাতে স্বীয় ফাতহুল বারী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে,

قال النخعي : كانوا يحبون أن يصلوا قبل الجمعة أربعا

অর্থাৎ তাঁরা (সাহাবী ও তাবেয়ীন) জুমআর পূর্বে চার রাকাত পড়া পছন্দ করতেন। ইবনে রজব রহ. বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

এরপর ইবনে রজব রহ. ইমাম ইবনে আবু খায়ছামা রহ. (মৃত্যু ২৭৯ হি.) এর কিতাবুত তারীখ-এর উদ্ধৃতিতে ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর নিম্নোক্ত উক্তি ও নীতিটি আ'মাশ রহ. এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন–

ما قلت لكم : كانوا يستحبون ، فهو الذي أجمعوا عليه .

অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আমি كانوا يستحبون (তারা পছন্দ করতেন) বলব, সেটা এমন বিষয়েই হবে, যার উপর তাঁদের ইজমা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ দুজন তাবেয়ীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবা-তাবেয়ীনের সাধারণ কর্মধারা ছিল জুমআর পূর্বে চার রাকাত নামায পড়া। হাদীস শরীফ ও সাহাবা-তাবেয়ীনের এই কর্মধারার অনুসরণেই অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমাম মত দিয়েছেন যে, জুমআর পূর্বে জোহরের সুন্নতের মতোই সুন্নতে মুয়াক্কাদা রয়েছে। এই ইমামগণের অনুসারীরা সে হিসেবেই এ সুন্নত আদায় করে আসছে। অধিকাংশ ইমামের মতের কথা শুধু আমরাই বলছি না। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম হাফেযে হাদীস ইবনে রজবও তাঁর বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

অধিকাংশ আলেমের মত:
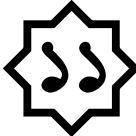
ইবনে রজব রহ. বলেছেন:

وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة : هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلها ، أم هي مستحبة مرغب فيها كالصلاة قبل العصر ؟ وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة ، منهم : الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في " شرح المذهب " وابن عقيل ، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي . وقال كثير من متأخري أصحابنا : ليست سنة راتبة ، بل مستحبة .

কাবলাল জুমআ নামাযটি কি জোহরের পূর্বের সুন্নতের মতো সুন্নতে রাতিবা (মুয়াক্কাদা), নাকি আসরের পূর্বের নামাযের মতো মুস্তাহাব? এনিয়ে দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে এটি সুন্নতে রাতিবা। ইমাম আওযায়ী, ছাওরী, আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যবর্গের মত এটাই। ইমাম আহমদের উক্তি থেকেও এটাই স্পষ্ট। কাযী আবূ ইয়ালা ও ইবনে আকীল এ কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যগণের নিকট এটাই সহীহ ও বিশুদ্ধ মত। আমাদের (হাম্বলীদের) পরবর্তী আলেমগণের অনেকে বলেছেন, এ নামায সুন্নতে রাতিবা নয়, বরং মুস্তাহাব। (ইবনে রজব, ফাতহুল বারী, হাদীস নং ৯৩৭)

Contents

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর হবে

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর হবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ হাদীসে এবং বহু সাহাবী ও তাবিয়ীর ফতোয়া ও আমল দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর হবে। হানাফী ফেকাহ অনুসারে এই ছয় তাকবীর বলা ওয়াজিব। কিন্তু আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয় তাকবীরের বিরোধিতা করে মানুষকে এই ধারণা দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে যে, ১২ তাকবীর দেওয়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, ছয় তাকবীর প্রমাণিত নয়। এখানে আমরা প্রথমে ছয় তাকবীরের হাদীসগুলো পেশ করবো। পরে বার তাকবীরের হাদীসগুলোর অবস্থা সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরবো।

উল্লেখ্য, দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় রাকাতে মোট তাকবীর হলো নয়টি। প্রথম রাকাতে পাঁচটি ও দ্বিতীয় রাকাতে চারটি। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা, তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকুর তাকবীর– এই মোট পাঁচ তাকবীর। দ্বিতীয় রাকাতে তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর ও রুকুর তাকবীর– এই মোট চার তাকবীর। সামনের হাদীসগুলোর কোনটিতে মোট সংখ্যা ধরে নয়টি তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। আবার কোনটিতে পাশাপাশি তাকবীর হিসেবে চারটি করে আটটি তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। এসবের মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। সর্বাবস্থায় অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি করে ছয়টিই থাকছে। এসব বিষয় সামনে রেখেই হাদীসগুলো বুঝতে হবে।

ছয় তাকবীর সম্পর্কিত মারফূ হাদীসঃ

১. কাসেম আবূ আব্দির রহমান র. বলেন,

حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم عيد فكبر اربعا واربعا ثم اقبل علينا بوجهه

حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٤٠٠ من طريق عبد الله بن يوسف عن يحيي بن حمزة عن الوضين بن عطاء عنه. قال الطحاوي: فهذا حديث حسن الإسناد وعبد الله بن يوسف ويحيي بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فان كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد يؤخذ فان هذا أولى ان يؤخذ به مما خالفه غيره.

অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ঈদের দিন নামায পড়লেন এবং চারটি করে তাকবীর দিলেন। নামায শেষ করে আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, ভুলে যেয়ো না, জানাযার তাকবীরের মতো। এই বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে বাকী চার আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। (তাহাবী শরীফ, ২খ, ৪০০ পৃ)

তাহাবী র. বলেন, এই হাদীসটির সনদ চমৎকার। এর বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে হামযা, ওয়াদীন (وضين) ও কাসেম সকলেই হাদীস বর্ণনাকারী, সহীহ বর্ণনা পেশ করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তী হাদীসগুলো (১২তাকবীরের হাদীস) যাদের সূত্রে বর্ণিত, এরা তাদের মতো সমালোচিত নয়। সুতরাং এর সমাধান যদি সনদের বিশুদ্ধতা দিয়ে করতে হয়, তবে এই হাদীসটি তার বিপরীত হাদীস থেকে আমলের অধিক হক রাখে।

২ . মাকহুল র. বলেন,

أخبرنى أبو عائشة جليس لأبى هريرة ان سعيد بن العاص سال أبا موسى الأشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يكبر فى الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر فى

البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص.

أخرجه أبو داود (١١٥٣) وسكت عنه هو والمنذري ورواه أحمد في مسنده ٤١٦/٤ وابن أبي شيبة (٥٧٤٤)

অর্থ: আবূ হুরায়রা রা. এর একজন সঙ্গী আবূ আয়েশা র. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনুল আস রা. (কুফার গভর্নর) এসে আবূ মূসা আশআরী রা. ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় কিভাবে তাকবীর দিতেন? আবূ মূসা রা. বললেন, তিনি জানাযার মতো চার তাকবীর দিতেন। তখন হুযায়ফা রা. বললেন, আবূ মূসা সঠিক বলেছেন। আবূ মূসা রা. বললেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম তখন এভাবেই তাকবীর দিতাম। আবূ আয়েশা র. বলেন, এসময় আমি সাঈদ ইবনুল আসের কাছে উপস্থিত ছিলাম। আবূ দাউদ শরীফ (১১৫৩), মুসনাদে আহমাদ ৪খ, ৪১৬পৃ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং (৫৭৪৪)

ইমাম আবূ দাউদ ও মুনযিরী দুজনই এই হাদীসের উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে হাদীসটি তাদের নিকট আমলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। নীমাবী বলেছেন, এর সনদ হাসান । (দ্র. আসারুস সুনান, ৩১৪ পৃ)

উল্লেখ্য, এই দুটি হাদীসে প্রথম রাকাতের তাকবীরে তাহরীমাসহ এবং ২য় রাকাতের রুকুর তাকবীর সহ চার তাকবীর উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী হাদীসগুলো থেকেও একথা পরিস্কার বোঝা যায়।

সাহাবীগণের আমল

১. আলকামা ও আসওয়াদ বলেছেন,

كان ابن مسعود رض جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الاشعري رض فسالهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والاضحى ، فجعل هذا يقول : سل هذا ، وهذا يقول : سل هذا فقال له حذيفة :سل هذا – لعبد الله بن مسعود – فساله ، فقال ابن مسعود : يكبر اربعا ، ثم

يقرا ، ثم يكبر ، فيركع ، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر اربعا ، بعد القراءة. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عنهما. ٣/٢٩٣-٢٩٤ وإسناده صحيح. وهذا وان كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع لان مثل هذا لا يكون من جهة الرأي والقياس وقد وافق ابن مسعود جماعة من الصحابة.

অর্থ: ইবনে মাসউদ রা. বসা ছিলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন হুযায়ফা রা. ও আবূ মূসা আশআরী রা.। তাঁদের দুজনকে সাঈদ ইবনুল আস রা. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইনি বলতে লাগলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। আর উনি বললেন, এনাকে জিজ্ঞেস করুন। অবশেষে হুযায়ফা রা. তাঁকে বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। এই বলে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে মাসউদ রা. তখন বললেন, চার তাকবীর দেবে। অতঃপর কেরাত পড়বে। আবার তাকবীর বলে রুকু করবে, এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে ও কেরাত পড়বে। কেরাতের পরে চার তাকবীর দেবে।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৩খ. ২৯৩-৯৪পৃ.। এর সনদ সহীহ।

এটি সাহাবীর বক্তব্য হলেও মূলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বক্তব্য। কারণ কিয়াস ও যুক্তি দ্বারা এমনটা বলা অসম্ভব। তাছাড়া এক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রা. একা নন। অনেক সাহাবী তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

التكبير في العيدين اربعا كالصلاة على الميت. رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

অর্থ: জানাযার নামাযের মতো দুই ঈদে (প্রতি রাকাতে) চার তাকবীর হবে। তাবারানী র. এটি উদ্ধৃত করেছেন। (হা. ৯৫২২) হায়ছামী র. বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগন সকলে বিশ্বস্ত। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৩৬৮)

৩. মাসরূক বলেন,

كان عبد الله يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولى واربع في الآخرة ويوالى بين القراءتين . أخرجه ابن أبي شيبة — وإسناده حسن.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদেরকে দুই ঈদের তাকবীর শেখাতেন, মোট নয় তাকবীর। প্রথম রাকাতে পাঁচ ও দ্বিতীয় রাকাতে চার। উভয় রাকাতের কেরাত একাধারে পড়বে। ইবনে আবী শায়বা এটি উদ্ধৃত করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৪৬)। এটির সনদ হাসান।

৪. কুরদুস ইবনে আব্বাস বলেন,[১]

لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وأبي مسعود وحذيفة والأشعري فقال لهم إن العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله يقوم فيكبر أربع تكبيرات ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربع تكبيرات ثم يركع بالرابعة. أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن أشعث عن كردوس عنه (٥٧٥٤)

---

[১] মুসান্নাফের উভয় সংস্করণে (শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা ও কামাল ইউসুফ আল হূতের সম্পাদিত সংস্করণে) এখানে কুরদূসের পর عن ابن عباس 'ইবনে আব্বাস থেকে' কথাটি এসেছে। কিন্তু এটি ভুল। সঠিক হবে عن كردوس بن عباس কুরদূস ইবনে আব্বাস থেকে। মুসান্নাফে পরবর্তী নম্বরের হাদীসটি ও তাবারানীর ৯৫১৪ নং হাদীসটি এবং সেই সঙ্গে রাবীদের জীবনীমূলক গ্রন্থাদি দেখলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

وأخرجه بنحوه الإمام محمد في كتاب الآثار صـ ٢٠٥ وفي الحجة على أهل المدينة صـ ٨٥ من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود

ورواه الطبراني في الكبير من طريق ابن أبي زائدة (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) عن أشعث عن كردوس (٩٥١٤) ، وفيه : فقال : يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر ويركع فتلك خمس ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر أربعا يركع في آخرهن فتلك تسع في العيدين فما أنكره واحد منهم. قال الهيثمي: رجاله ثقات،

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي بكر ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على ابن مسعود وحذيفة والاشعري رضي الله عنهم فقال ان العيد غدا فكيف التكبير فقال ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال الاشعري وحذيفة رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن. ذكره ابن كثير بإسناد الطحاوي (تحت قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي) وقال: إسناد صحيح.

অর্থ: ওয়ালীদ ইবনে উকবা ঈদের রাতে ইবনে মাসউদ রা., আবূ মাসউদ রা., হুযায়ফা রা. ও আবূ মূসা আশআরী রা. এর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আগামী কাল তো ঈদ, তাকবীর কিভাবে দিতে হবে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, নামাযে দাঁড়িয়ে চার তাকবীর দেবে, পরে সূরা ফাতিহা এবং মুফাসসাল থেকে এমন একটি সূরা পড়বে যা বড়ও নয়, ছোটও নয়। এরপর রুকু করবে। পরে (রাকাত শেষ করে) পুনরায় দাঁড়াবে। এবং কেরাত পাঠ করবে। কেরাত পাঠ শেষ হলে

চারটি তাকবীর দেবে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৪; ইমাম মুহাম্মদ র. এর কিতাবুল আসার, পৃ,২০৫; কিতাবুল হুজ্জাহ , পৃ ৮৫; তাবারানী, আলমুজামুল কাবীর, (দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/৩৬৭) হায়ছামী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীগন বিশ্বস্ত; তাহাবী শরীফ ১খ, ৩১৯পৃ,। তাহাবীর সনদে ইবনে কাছীর র. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে। ইবনে কাছীর বলেছেন, সনদটি সহীহ। (৩খ, ৫৬৪পৃ)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. যেমন ফতোয়া দিতেন, নিজেও ঠিক সেভাবে আমল করতেন। নিম্নের হাদীসটি তার প্রমাণ।

৫. আলকামা র. ও আসওয়াদ র. বলেন,

.... ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا اربعا قبل القراءة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرا فإذا فرغ كبر اربعا ثم ركع . أخرجه عبد الرزاق ٢٩٣/٣ (٥٦٨٦) عن الثوري عن أبي إسحاق عنهما وابن أبي شيبة نحوه عن الشعبي (٥٧٤٧) والإمام محمد في الحجة ص ٨٥

ورواه الطبراني في الكبير (٩٥١٨) من طريق زهير عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة ومسروق عن عبد الله أنه كان يكبر بتسع في الأضحى والفطر يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم فيقرأ ويكبر أربعا يركع بواحدة

ورواه أيضا من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن كردوس قال : كان عبد الله بن مسعود يكبر في الأضحى والفطر تسعا تسعا يبدأ فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم في الركعة الآخرة فيبدأ فيقرأ ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن (٩٥١٣)

অর্থ: ইবনে মাসউদ রা. দুই ঈদে নয়টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে চার তাকবীর বলতেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। দ্বিতীয় রাকাতে আগে কেরাত পড়তেন। কেরাত শেষ

হলে চার তাকবীর বলে রুকু করতেন। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৮৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৪৭; কিতাবুল হুজ্জাহ, ৮৫পৃ.; তাবারানী কাবীর, হাদীস নং ৯৫১৮।

এ বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয় রাকাতে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে রুকু করতেন।

৬. কাতাদা বলেন,

عن جابر بن عبد الله وسعيد ابن المسيّب قالا تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٥٦)

অর্থ: জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব দুজনই বলেছেন, তাকবীর হবে মোট নয়টি আর উভয় রাকাতের কেরাত হবে লাগাতার। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৬।

৭. আব্দর রাযযাক র. বলেছেন,

أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات والى بين القراءتين قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا فسالت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء. أخرجه عبد الرزاق (٥٦٨٩) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد به (٥٧٥٧)

অর্থ: ইসমাঈল ইবনে আবিল ওয়ালিদ র. খালেদ আল হায্যা র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ র. থেকে, তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস রা. বসরায় ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর দিয়েছিলেন এবং উভয় রাকাতের কেরাত লাগাতার পড়েছিলেন। ঐ নামাযে আমি তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। মুগীরা ইবনে শো'বা রা.ও অনুরূপ করেছিলেন। সে নামাযেও আমি উপস্থিত ছিলাম। ইসমাঈল বলেন, আমি খালেদকে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে আব্বাস রা. কিরূপ করেছিলেন? তখন তিনি আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন। মা'মার ও ছাওরী কর্তৃক আবূ ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ইবনে মাসঊদ রা. এর

নামাযের যে বিবরণ এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. এর নামাযও ছিল ঠিক তদ্রুপ। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৮৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৭। সনদ সহীহ।

৮. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হযরত আনাস রা. সম্পর্কে বলেছেন,

انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله . أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٦٠)عن يحي بن سعيد عن أشعث عنه. وإسناده صحيح.

অর্থ: তিনি ঈদের নামাযে নয়টি তাকবীর বলতেন। এরপর ইবনে সীরীন র. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর নামাযের মতো করে এর বিবরণ দিলেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬০। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

৯. আব্দুর রাযযাক রহ. ইবনে জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেছেন:

ان يوسف بن ماهك أخبرني ان ابن الزبير كان لا يكبر إلا اربعا في كل ركعة سواء ، يكبرهن في كل ركعتين ، سمعنا ذلك منه. المصنف ٢٩١/٣ (٥٦٧٦)

অর্থ: ইউসুফ ইবনে মাহাক র. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. প্রত্যেক রাকাতে চার তাকবীরই বলতেন, এর বেশী বলতেন না। এভাবে উভয় রাকাতেই তিনি তাকবীর বলতেন। আমরা তার কাছ থেকেই এটা শুনেছি। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৭৬। এই হাদীসের সনদ সহীহ।

মোট ছয়জন সাহাবীর হাদীস সহীহ সনদে আমরা উল্লেখ করলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রা., আনাস রা., জাবের রা. ও মুগীরা ইবনে শো'বা রা.। আর তিনজন সাহাবী অর্থাৎ আবূ মাসউদ রা. আবূ মূসা আশআরী রা. ও হুযায়ফা রা. ইবনে মাসউদ রা. এর মতকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং বলা চলে, নয় জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে ছয় তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, যেখানে নয় তাকবীর বলার কথা উল্লেখ আছে, সেখানে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ পাঁচ তাকবীর গণ্য করা হয়েছে। আর যে হাদীসে চার বলা হয়েছে সেখানে প্রথম রাকাতে শুরুর তাকবীর ও ২য় রাকাতে রাকাত রুকুর তাকবীরসহ চার ধরা হয়েছে।

ইবরাহীম নাখায়ী বলেছেন যে,

انكم معاشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكانما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله عنه بل أشيروا انتم على فانما انا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر اربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك .

(الطحاوي – باب التكبير على الجنائز كم هو) ص ٣١٩/١

অর্থাৎ আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। আপনাদের দ্বিমত পরবর্তীদের উপর প্রভাব ফেলবে। আর আপনাদের ঐকমত্যের ফলে অন্যরাও একমত থাকবে। সুতরাং ভেবে চিন্তে আপনারা একটি বিষয়ে একমত হোন। এ কথায় তিনি যেন তাঁদের জাগিয়ে তুললেন। তারা বললেন, হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন। তবে এ বিষয়ে আপনি আপনার মতামত বলুন। তিনি বললেন, আপনারাই বরং আমাকে পরামর্শ দিন। কারণ, আমি তো আপনাদের মতোই একজন মানুষ। পরে তাঁরা মত বিনিময় করে এ বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছলেন যে, যেভাবে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় চার তাকবীর হয়ে থাকে, তেমনি জানাযার নামাযেও চার তাকবীর হবে। (তাহাবী শরীফ, ১খ, ৩১৯পৃ)

এ বর্ণনা থেকে বোঝা গেল, ঈদের নামাযে চার তাকবীর হওয়ার বিষয়টি ছিল সর্বজন স্বীকৃত।

তাবেয়ীগণের আমল:

১. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব যিনি মদীনা শরীফে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন, তার ফতোয়া ৮নং দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. মাসরূক এর ফতোয়া :

عن الشعبي قال أرسل زياد إلى مسروق انا تشغلنا أشغال فكيف التكبير في العيدين قال تسع تكبيرات قال خمسا في الاولى واربعا في الآخرة ويوالي بين القراءتين . أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه وهذا إسناد صحيح (٥٧٥٨) وأخرجه عبد الرزاق نحوه عن معمر عن قتادة (٥٦٨٨) وهذا إسناد حسن.

অর্থ : শা'বী র. বলেন, যিয়াদ লোক পাঠিয়ে মাসরূক র. এর নিকট জানতে চাইল। আমরা তো খুব কর্মব্যস্ত। ঈদের তাকবীর কিভাবে দিতে হবে? তিনি বললেন, নয়টি তাকবীর বলতে হবে। ৫টি প্রথম রাকাতে , চারটি ২য় রাকাতে। আর কেরাত পড়বে উভয় রাকাতে একটানা। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৮; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৫৬৮৮। সনদ সহীহ।

৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ও মাসরূক এর আমল:

عن إبراهيم عن الأسود ومسروق انهما كانا يكبران في العيد تسع تكبيرات . أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٥٩) عن غندر وابن مهدي عن شعبة عن منصور عنه

অর্থ: ইবরাহীম নাখায়ী র. থেকে বর্ণিত, তিনি আসওয়াদ র. ও মাসরূক র. সম্পর্কে বলেছেন, তারা দুজনই ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৫৯। এর সনদ সহীহ।

৪. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও হাসান বসরীর আমল:

عن هشام عن الحسن ومحمد انهما كانا يكبران تسع تكبيرات. أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٦٥) عن إسحاق الأزرق عنه.

অর্থ: হিশাম র. বলেন, হাসান বসরী র. ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. নয় তাকবীর বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬৫। সনদ সহীহ।

৫. শা'বী ও মুসায়্যাব ইবনে রাফে'র ফতোয়া:

عن الشعبي والمسيب قالا الصلاة يوم العيدين تسع تكبيرات خمس في الاولى واربع في الآخرة ليس بين القراءتين تكبيرة . أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٧٤) عن إسحاق بن منصور عن أبي كدينة عن الشيباني عنهما.

অর্থ: শা'বী ও মুসায়্যাব র. বলেন, উভয় ঈদের নামাযে তাকবীর হবে নয়টি। প্রথম রাকাতে ৫টি ও ২য় রাকাতে চারটি। উভয় রাকাতের মাঝে (অতিরিক্ত) তাকবীর হবে না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৭৪।

৬. আবূ কিলাবার ফতোয়া:

أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال التكبير في العيدين تسع تسع. (٥٧٦٢)

অর্থ: আবূ কিলাবা র. বলেন, দুই ঈদে তাকবীর হবে নয়টি করে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬২। সনদ সহীহ।

৭. ইমাম বাকেরের ফতোয়া:

عن أبي جعفر انه كان يفتي بقول عبد الله في التكبير في العيدين. أخرجه ابن أبي شيبة عن شريك عن جابر عنه.(٥٧٦٣)

অর্থ: জাফর সাদেক র.এর আব্বা (ইমাম বাকের র.) উভয় ঈদের তাকবীর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর মত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬৩। সনদ দুর্বল।

৮. হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণের আমল:

عن إبراهيم ان اصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد تسع تكبيرات .

أخرجه ابن أبي شيبة عن إسحاق الأزرق عن الأعمش عنه. (٥٧٦١)

وإسناده صحيح.

অর্থ: ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ দুই ঈদে নয়টি তাকবীর বলতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৫৭৬১। এর সনদ সহীহ।

১২ তাকবীরের হাদীসগুলো সম্পর্কে পর্যালোচনা

১. কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস: তিনি তার পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় এটি উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী র. ও তিরমিযী র. এর মতে বার তাকবীরের হাদীসগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে ভাল। তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন। কিন্তু কাছীর সম্পর্কে আবূ দাউদ র. বলেছেন, كان أحد الكذابين (সে ছিল একজন মিথ্যুক)। ইমাম শাফেয়ী র. বলেছেন, এ ব্যক্তি চরম মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম আহমদ, ইবনে মাঈন, আবূ যুরআ, আবূ হাতেম, নাসায়ী, দারাকুতনী, ইবনে সা'দ, ইবনে হিব্বান, ইবনুস সাকান, হাকেম ও ইবনে হাযম সকলে তাকে যঈফ (দুর্বল) অথবা মাতরূক (পরিত্যাগযোগ্য) আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, তার যঈফ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। মিযযী, যাহাবী ও ইবনে হাজার আসকালানীও তাকে যঈফ বলেছেন। লা-মাযহাবী আলেম তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার মোবারকপুরী ও আলবানী (ইবনে খুযায়মার টীকায়) সাহেবও যঈফ বলেছেন।

২.আয়েশা রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদে ইবনে লাহীআ আছেন। ইমাম বুখারী এই হাদীসকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন। (দ্র, ইলালে তিরমিযী আল কাবীর, পৃ, ৯৪) হাকেম আবূ আব্দুল্লাহও এটিকে যঈফ বলেছেন। দারাকুতনী ও তাহাবী র. একই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইবনে হাজার আসকালানী তালখীসুল

হাবীর গ্রন্থে বলেছেন, ইবনে লাহীআ থেকে এর সনদে এজতেরাব ও এখতেলাফ রয়েছে। তদুপরি ইবনে লাহীআ তাদের দৃষ্টিতে যঈফ ।

৩. ইবনে উমর রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি দারাকুতনী, তাহাবী ও বাযযারে আছে। এর সনদে ফারাজ ইবনে ফাদালা (فرج بن فضالة) আছেন। তিনি যঈফ। তার এ হাদীসকে বুখারী, আবূ হাতেম রাযী ও তিরমিযী প্রমুখ ভুল বর্ণনা আখ্যা দিয়েছেন। ফারাজের উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আমের আসলামীও দুর্বল। আহমাদ, ইবনে মাঈন, ইবনুল মাদীনী, আবূ যুরআ, আবূ হাতেম, বুখারী , আবু দাউদ ও দারাকুতনী র. তাকে যঈফ ও দুর্বল বলেছেন।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তাইফী আছেন। ইবনে মাঈন, আবূ হাতেম, নাসায়ী, দারাকুতনী, উকায়লী, ইবনুল জাওযী ও ইবনুল কাত্তান র. প্রমুখ তাকে যঈফ বা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাকেম এই হাদীসের সনদকে ফাসেদ আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে হাজার অবশ্য 'তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসকে আহমাদ, ইবনুল মাদীনী ও বুখারী র. সহীহ বলেছেন। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয় । কারণ ইমাম আহমাদ স্পষ্ট বলেছেন যে, ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح (উভয় ঈদের তাকবীর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই)[১]। (দ্র. নাসবুর রায়াহ, ২/২১৫, ২১৮) সুতরাং এই হাদীসকে তিনি সহীহ বলতে পারেন না। বুখারী র. এর কথা যদিও তিরমিযী র. উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই 'সহীহ' শাব্দিক অর্থে হবে। অর্থাৎ হাদীসটি ঠিক আছে; পারিভাষিক অর্থে নয়। কারণ বুখারী ও তিরমিযী দুজনের মতেই বার তাকবীর সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো হাদীস হল পূর্বে উল্লিখিত

---

[১] এটা ইমাম আহমাদের মত। তিনি যেহেতু বার তাকবীর উত্তম হওয়ার মতটি অবলম্বন করেছেন, তাই তার এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে, বার তাকবীরের হাদীস তাঁর দৃষ্টিতে সহীহ নয়। বাকি রইল ছয় তাকবীরের হাদীস, পেছনের আলোচনায় দেখা গেছে, সেগুলোর সনদ সহীহ।

প্রথম হাদীসটি। আর সেটাকে তিরমিযী সহীহ বলেননি, হাসান বলেছেন। যা সহীহ থেকে নীচের স্তরের। আর অন্যান্য অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতানুসারে সেটিও চরম দুর্বল। সুতরাং সেই হাদীসের চেয়ে নিম্নস্তরের হাদীস পারিভাষিক অর্থে সহীহ হতে পারে না। এই কারণে মুনযিরী র. মুখতাসার আবূ দাউদে বলেছেন,

وفي إسناده عبد الله الطائفي وفيه مقال

এর সনদে আব্দুল্লাহ তাইফী আছেন, যার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

তাহাবী র. বলেছেন, والطائفي ليس عندهم بالذي يحتج بروايته মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তাইফীর বর্ণনা প্রমাণযোগ্য নয়। তাছাড়া বুখারী র. তার সম্পর্কে বলেছেন, فيه نظر তার ব্যাপারে আপত্তি আছে। (দ্র, তাহযীবুত তাহযীব)

৫. হযরত আলী রা. এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির সূত্র বিচ্ছিন্ন। তদুপরি এর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে আবী ইয়াহয়া চরম দুর্বল।

৬. হযরত জাবের রা. থেকে একটি হাদীস বায়হাকীতে উদ্ধৃত হয়েছে। এর সনদে আলী ইবনে আসেম আছেন। শো'বা, ইবনুল মুবারক, ইবনুল মাদীনী, ইবনে মাঈন, নাসায়ী, সাজী ও সালেহ জাযারা প্রমুখ তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এর বিপরীত জাবের রা. থেকে সহীহ সনদে আমরা ছয় তাকবীরের হাদীস উল্লেখ করেছি।

৭. আব্দুর রহমান ইবনে আওফের মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদীস বাযযারে আছে। এর সনদে হাসান ইবনে হাম্মাদ বাজালী আছেন। তাকে বাযযার র.(দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদের টীকা) ও শাওকানী (তিনি লা-মাযহাবী আলেম) বলেছেন لين الحديث (অর্থাৎ তার হাদীস দুর্বল)। দারাকুতনীর মতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসরূপে এটা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন, এটি মাওকূফ (সাহাবীর বক্তব্য বা কর্ম) হওয়াই সঠিক।

৮. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদীস তাবারানীর আলমুজামুল কাবীরে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে সুলায়মান ইবনে

আরকাম আছেন, যিনি সকল মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে পরিত্যাগযোগ্য। এর আরেকটি সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আযীয তদীয় পিতা আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আযীয সম্পর্কে বুখারী র. বলেছেন, منكر الحديث (আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী)। নাসায়ী র. বলেছেন, متروك الحديث (তার হাদীস বর্জনযোগ্য)। আর আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, ضعيف الحديث (তার হাদীস দুর্বল)। অধিকন্তু তার পিতা আব্দুল আযীয সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান র. বলেছেন, তার অবস্থা অজানা।

৯. আবূ ওয়াকিদ লায়ছী রা. এর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস তাহাবী ও তাবারানী উদ্ধৃত করেছেন। এটি সম্পর্কে আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, هذا حديث باطل بهذا الإسناد এইসূত্রে হাদীসটি বাতিল। (দ্র, আত তালখীসুল হাবীর)

অবশ্য হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস রা. এর আমলরূপে ১২ তাকবীরের বর্ণনাও সহীহ সনদে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

দলাদলি কাম্য নয়

পরিশেষে লা-মাযহাবী বন্ধুদেরকে একটি কথা বলতে চাই। মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা ভাল কাজ নয়। বিরোধপূর্ণ মাসআলায় সালাফ ও পূর্বসূরিগণের পথ অনুসরণ করাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমাদের পূর্বসূরিগণ দ্বিমত করেছেন কিন্তু কাদা ছোড়াছুড়ি করেননি। ইমাম আহমাদ র. বার তাকবীরকে পছন্দ করতেন। কিন্তু সাথে তিনি একথাও বলেছেন,

وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز

অর্থাৎ ঈদের তাকবীর নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে দ্বিমত ছিল। সব পন্থাই জায়েয।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী র. তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইমাম আহমাদের এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন,

وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة ، وإن كانَ الافضل عنده سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية .ورجح هذا ابن عبد البر ، وجعله من الاختلاف المباح ، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها .(فتح الباري ٥/٢١٤)

অর্থাৎ এটা তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, ঈদের তাকবীর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যেসব বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, এর সবই জায়েয, কোনটিই মাকরূহ নয়। যদিও তার মতে উত্তম হলো, প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর। ইবনে আব্দুল বার র.ও সকল পদ্ধতি জায়েয হওয়ার এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বিমতকে মতের বৈধ বিভিন্নতা আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, আযান ও তাশাহহুদ ইত্যাদির একাধিক পদ্ধতি সম্পর্কে দ্বিমত। (দ্র, ফাতহুল বারী, ৫খ, ২১৪পৃ; আলইসতিযকার,২খ, ৩৯৭ পৃ)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া র. লিখেছেন, এ ব্যাপারে আমাদের নীতি - আর এটাই বিশুদ্ধ নীতি – এই যে, ইবাদতের পদ্ধতি বিষয়ে যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদীস বা আছার রয়েছে তা মাকরূহ হবে না। বরং তা হবে শরীয়তসম্মত। সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম, তারজী' যুক্ত ও তারজী' বিহীন, ইকামতের দুই নিয়ম, বাক্যগুলো দুবার করে বলা বা একবার করে, তাশাহহুদ, ছানা, আউযু এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন্ন কেরাত, এসবই উক্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা, জানাযা নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সেজদার একাধিক নিয়ম, কুনুত পাঠ- রুকুর আগে বা পরে, রাব্বানা লাকাল হামদ 'ওয়া'সহ বা 'ওয়া' ছাড়া এসবই

শরীয়তসম্মত। কোন পদ্ধতি কখনও উত্তম হতে পারে। কিন্তু অন্যটি মাকরূহ কখনই নয়। (দ্র, মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৪খ, ২৪২-২৪৩পৃ)

ইবনে রুশদ মালেকী র. তার বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে ইমাম আহমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, একারণে ফকীহগণ বিভিন্ন সাহাবীর আমলকে দলিল বানিয়েছেন। আর এক্ষেত্রে দ্বিমত হচ্ছে কোন পদ্ধতি উত্তম তা নিয়ে। অন্যথায় যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক, সকলের নিকট তা জায়েয।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মত হচ্ছে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নত নয়। বরং প্রথম তাকবীর বলে ছানা পড়বে, দ্বিতীয় তাকবীর বলে দুরূদ শরীফ পড়বে, তৃতীয় তাকবীর বলে দুআ পড়বে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। হ্যাঁ, ছানা হিসেবে (অর্থাৎ ছানার পরিবর্তে) সূরা ফাতেহা ও পড়তে পারে, কেরাত হিসেবে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের আমল দ্বারাই একথা প্রমাণিত। এমতের পক্ষে দলিলগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল:

মারফু হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ »

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে, তখন তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দুআ কর। (আবূ দাউদ শরীফ, ২খ, ৪৫৬পৃ)

সাহাবায়ে কেরামের আছার ও আমল

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول كبر ما كبر الإمام وأكثر من طيب الكلام.

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

আমাদের জন্য জানাযার নামাযে কোন কিরাআত কিংবা কোন বাক্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নি। ইমাম যখন তাকবীর বলে তখন তুমিও তাকবীর

বল। আর অধিক পরিমাণে তার জন্য ভাল কথা বল। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ৪১৫৩) হায়ছামী বলেছেন, হাদীসটি ইমাম আহমদ উদ্ধৃত করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী।

২. হযরত আলী রা. আমল :

عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا.

আলী রা. যখন কারো জানাযার নামায পড়তেন, তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়েন। এরপর বলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا.

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৪৯৪)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.এর আমল :

أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. জানাযার নামাযে কেরাত পড়তেন না।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২২)

ইমাম মালেক রহ. তাঁর মুয়াত্তায়ও হযরত ইবনে উমর রা.এর আছারটি বর্ণনা করেছেন। সেখানকার সনদ এমন : مالك عن نافع :أن عبد الله بن عمر অর্থাৎ ইমাম মালেক হযরত নাফে থেকে, তিনি হযরত ইবনে উমর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের মূলনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থাবলিতে এ সনদটিকে ‘সিলসিলাতুয যাহাব’ বা স্বর্ণশৃংখল বলে অভিহিত করা হয়। হাদীসটির বিশুদ্ধতা এ থেকে সহজেই অনুমেয়।

৪. হযরত আবু হুরায়রা রা.এর আমল :

আবু সাঈদ রহ. বলেন,

أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنائز فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها مع أهلها فإذا وضعوها كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم أقول

তিনি আবু হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কিভাবে জানাযার নামায পড়েন? আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর কসম , আমি তোমাকে অবশ্যই তা জানাব। মৃতব্যক্তির পরিবারের সাথে আমি যাই। যখন (নামাযের জন্য) তারা তার লাশ রাখে, তখন আমি তাকবীর বলি ও আল্লাহর হামদ পাঠ করি, তার নবীর উপর দরূদ পড়ি অতঃপর (নিম্নোক্ত দুআটি) পড়ি ....

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ اِلا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اَللّٰهُمَّ لا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৬৪২৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৩৭৭)

৫. হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর তালিম :

أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك شيئا ، أنت أعلم به ، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

তিনি সাহাবী হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা.কে জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি তোমাকে বলে দিব। তুমি তাকবীর বলে শুরু করবে, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করবে এবং পরে এই দোয়া পড়বে–

اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك شيئا ، أنت أعلم به ، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

[সুনানে কুবরা বায়হাকী, ৪ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা]

উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে যারা সূরা ফাতেহাকে জানাযার নামাজের জন্য জরুরী বলে থাকেন, তারা হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা.এর বিখ্যাত হাদীসটি দিয়েই দলিল দিয়ে থাকেন। হাদীসটির ভাষ্য : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب যে সূরা ফাতেহা পড়ে নি তার নামাযই হয় নি। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭৫৬) অথচ উপরোক্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং উবাদা ইবনে সামেত রা.ই সূরা ফাতেহা ছাড়া জানাযার নামাযের তালিম দিচ্ছেন।

তাবেয়ীগণের ফতোয়া

সাহাবায়ে কেরাম থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাবেয়ীগণের মধ্যে যারা শীর্ষস্থানীয়, বিশেষ করে তৎকালীন প্রায় প্রতিটি ইসলামী শহরের যারা বড় বড় তাবেয়ী মনীষী ছিলেন, তাদের থেকেও জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা না পড়ার ফতোয়া পাওয়া যায়। যেমন :

১. মক্কা মুকাররমার বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে আবী রাবাহ এর ফতোয়া :

عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ : سألت عطاء عن القراءة على الجنازة فقال ما سمعنا بهذا إلا حديثا.

হাজ্জাজ রহ. বলেন, আমি আতাকে জানাযার নামাযের কেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমরা তো একথা নতুন নতুন শুনছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৭)

২. মদীনা মুনাওয়ারার বিখ্যাত তাবেয়ী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন,

لا قراءة على الجنازة .

জানাযায় কোন কেরাত নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫৩২)

৩. মদীনার আরেক প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব র. বলেন,

ما نعلم في الصلاة على الميت من قراءة ولا دعاء شيئا معلوما

জানাযার নামাযে নির্দিষ্ট কোন কেরাত ও দুআ আছে বলে আমার জানা নেই। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৬৪৩৬)

৪. কুফা নগরীর বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত শাবী রহ. বলেন,

ليس في الجنازة قراءة .

জানাাযার নামাযে কোন কেরাত নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৮)

৫. কুফার-ই আরেক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন,

لا قراءة على الجنازة ولا ركوع ولا سجود ولكن يسلم عن يمينه وعن شماله إذا فرغ من التكبير. (كتاب الآثار لمحمد ، ٢٣٦)

জানাযার নামাযে কোন কিরাআত নেই, কোন রুকু-সেজদা নেই। বরং তাকবীর বলা শেষ হলে ডানে-বামে সালাম ফিরাতে হবে। (কিতাবুল আছার, হাদীস : ২৩৬)

শাবী রহ. বরং স্পষ্ট করে বলেছেন,

التكبيرة الاولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم

জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর আল্লাহর প্রশংসা, দ্বিতীয় তাকবীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়া, তৃতীয় তাকবীর মৃতের জন্য দুআ করা এবং চতুর্থ তাকবীর হচ্ছে সালাম ফিরানো।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৬৪৩৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৩৭৫, ১১৩৭৮)

ইমাম মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল আছারে ইবরাহীম নাখায়ীর অনুরূপ একটি ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন। (নং ২৩৮)

৬. মক্কার মনীষী আতা ইবনে আবী রাবাহ আর ইয়েমেনের বিখ্যাত তাবেয়ী তাউস সম্পর্কে ইবনে তাউস বলেছেন,

أنهما كانا ينكران القراءة على الجنازة .

তারা দুজন জানাযার নামাযে কেরাত অপছন্দ করতেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৯)

৭. বসরার প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত,

كان لا يقرا في شيء من التكبيرات وكان يقول ...

তিনি জানাযার তাকবীরগুলোতে কোন কেরাত পড়তেন না। বরং পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاجْعَلْ قُلُوْبَهُمْ عَلَى قُلُوْبِ اَخْيَارِهِمْ، اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمُهْتَدِيْنَ وَاخْلُفْهُ فِيْ تَرِكَتِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، اَللّٰهُمَّ لا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক,হাদীস নং ৬৪৩২)

৮. আবুল আলিয়া রহ. এর ফতোয়া :

عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب تقرأ إلا في صلاة فيها ركوع وسجود

আমি আবুল আলিয়াকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি মনে করি, সূরা ফাতেহা শুধু সে নামাযেই পড়া যাবে যেখানে রুকু ও সিজদা রয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৪)

৯. আবু বুরদা রহ. এর ফতোয়া :

عَنْ أَبِي بردة قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لاَ تَقْرَأْ.

এক লোক তাকে বলল, আমি জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ব। তিনি তাকে বললেন, তুমি (তা) পড়ো না। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫২৬।

১০. বাক্‌র ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন,

لا أعلم فيها قراءة .

জানাযার নামাযে কোন কেরাত আছে বলে আমি জানি না।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১১৫৩০)

ফিকহে মালেকীর প্রসিদ্ধ কিতাব আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা-য় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের উপরোক্ত আমলের কথাই বর্ণিত হয়েছে:

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع والقاسم بن محمد وسا لم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحي بن سعيد: أنهم لم يكونوا يقرءون في الصلاة على الميت. قال ابن وهب وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلدنا على ذلك.

অর্থ: ইবনে ওয়াহব র. উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, ফাযালা ইবনে ওবায়দ, আবু হুরায়রা, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, ইবনুল মুসায়্যাব, রবীয়া, আতা ইবনে আবী রাবাহ ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তাঁরা জানাযার নামাযে কেরাত পড়তেন না। ইবনে ওয়াহব বলেন, মালেক র. বলেছেন, আমাদের শহরে (অর্থাৎ মদীনায়) এর উপর (অর্থাৎ জানাযার নামাযে কেরাত পড়ার উপর) আমল করা হয় না। জানাযা তো

দোয়ারই নাম। আমি আমাদের শহরের অধিবাসীদেরকে এর উপরই পেয়েছি। (দ্র, খ: ১ পৃ:২৬৭)

দোয়া হিসেবে সূরা ফাতেহাও পড়া যায়

কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কেউ কেউ জানাযার নামাযের প্রত্যেক তাকবীরের পরই সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং দুআ করতেন। এ থেকেও বোঝা যায়, তারা সূরা ফাতেহা কেরাত হিসেবে নয়, বরং হামদ বা প্রশংসা হিসাবেই পড়েছেন। যেমন: মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের বর্ণনা -

عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأنس بن مالك وابن عباس أنهم كانوا يقرؤون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث ثم يكبرون الرابعة فينصرفون ولا يقرؤون.

আবু হুরায়রা, আবুদ্দারদা, আনাস ইবনে মালেক ও ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তারা প্রথম তিন তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়তেন, দুআ করতেন ও ইসতিগফার করতেন। এরপর চতুর্থ তাকবীর বলতেন। এবং কোন কেরাত না পড়েই নামায শেষ করতেন। (হাদীস নং ৬৪৩৭)

وعن الحسن كان يقرأ في التكبيرات كلها بأم القرآن

হাসান (বসরী) র. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক তাকবীরের পরই সূরা ফাতেহা পড়তেন। (হাদীস নং ৬৪৩০)

সূরা ফাতেহা পড়াকে সুন্নত বলার ব্যাখ্যা

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে,

إنه من السنة أو من تمام السنة

অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত অথবা সুন্নতের পরিপূর্ণতা। এটি যদিও বাহ্যত পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলোর বিপরীত মনে হয়, কিন্তু সবগুলো বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় করলে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, ইবনে

Contents

আব্বাস রা. দুআ হিসেবেই তা পড়তেন। আর তিনি যে এটাকে সুন্নত বলেছেন, তার অর্থ হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কখনো কখনো দুআর উদ্দেশ্যেই সেটি পড়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে যে আমল করেছেন, সাহাবীগণ সেটিকেও সুন্নত আখ্যা দিতেন। তিরমিযী শরীফে দুই সেজদার মাঝে বসার পদ্ধতি সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা.ই বলেছেন, ইকআ করা (অর্থাৎ পা খাড়া রেখে গোড়ালির উপর বসা) সুন্নত। অথচ এ আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো হঠাৎ কখনো করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তারাবী বিশ রাকাত পড়া সুন্নত

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল

[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

তারাবী বিশ রাকাত পড়া সুন্নত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তারাবী পড়েছেন। কত রাকাত পড়েছেন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কোন সহী সূত্রে জানা যায় না। তবে হযরত উমর রা. এর খেলাফতকাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ রাকাত তারাবী পড়া হয়ে আসছে। এ দীর্ঘ সময় কোথাও আট রাকাত পড়ার প্রচলন ছিল না। উম্মতের এ অবিচ্ছিন্ন কর্মধারাই প্রমাণ করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম বিশ রাকাতের তালিমই পেয়েছেন। এক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট মারফূ হাদীসও আছে। এর সনদ বা সূত্র দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য। সামনে আমরা প্রমাণসহ সে কথা তুলে ধরছি।

আট রাকাত তারাবী'র সূচনা

লা মাযহাবী আলেমরাও প্রথম প্রথম বিশ রাকাত তারাবী পড়ে গেছেন। সর্বপ্রথম ১২৮৪ হিজরী সালে ভারতের আকবরাবাদ থেকে এদের একজন আট রাকাত তারাবীর ফতোয়া দেন। তীব্র প্রতিবাদের মুখে সেই ফতোয়া টিকতে পারেনি। এরপর ১২৮৫ হিজরীতে পাঞ্জাব সীমান্তে মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী নামে এদের আরেক জন ফতোয়া দেন যে, আট রাকাত তারাবী পড়া সুন্নত। বিশ রাকাত পড়া বেদাত। বলা হয়, পাঞ্জাবের অনেক স্থানে তার মাধ্যমেই আট রাকাত তারাবী'র প্রচলন শুরু হয়। তার ফতোয়ারও তীব্র বিরোধিতা হয়। এমনকি তাদেরই একজন বিখ্যাত আলেম মাওলানা গোলাম রাসূল ঐ ফতোয়ার খণ্ডনে 'রিসালা তারাবী' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ১২৯১ সালে সেটি প্রকাশিত হয়। (দ্র. রাসায়েলে আহলে হাদীস, ২খ, ২৮ পৃ)। হাফেজ আব্দুল্লাহ গাজীপুরী ও মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী সহ এদের আরো কিছু আলেমও একই ফতোয়া প্রচার করতে থাকেন।

আরবের অবস্থা

ভারতবর্ষের পরে এখানকার লা-মাযহাবী আলেমদের প্রভাবে আরবেও দু'একজন আটের ফতোয়া দিতে শুরু করেন। হারামাইন শরীফাইন তথা বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবী অব্যাহত থাকলেও সর্বপ্রথম আরবে শায়খ নসীব রেফায়ী একটি পুস্তিকা লিখে আট রাকাতের ফতোয়াকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানীও তার সমর্থন করেন। এর খণ্ডনে আরব জাহানের কয়েকজন আলেম কলম ধরেন। একাধিক আলেমের রচনার সমষ্টি الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين والصحابة নামে প্রকাশিত হয়। সেখানে তাঁরা লিখেছেন,

ولم يشذ أحد منهم بمنعها غير هذه الشرذمة القليلة التي ظهرت في زماننا كالشيخ ناصر وإخوانه

অর্থাৎ আমাদের যুগে আত্মপ্রকাশকারী নাসিরুদ্দীন (আলবানী) ও তার সমর্থকদের ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া কেউই অনুরূপ ফতোয়া দিয়ে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেননি। (দ্র, পৃ, ৬১)

এ পুস্তিকাটির খণ্ডনে আলবানী সাহেব 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করে ১৩৭৭ হি. সালে প্রকাশ করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থেও তিনি সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণের কোন একজনকেও দেখাতে পারেননি, যিনি আট রাকাত তারাবীর কথা বলেছেন। এমনিভাবে এমন কোন ঐতিহাসিক মসজিদের নজিরও দেখাতে পারেননি যেখানে আট রাকাত তারাবী হতো।

আলবানী সাহেবের পুস্তিকাটির যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছেন সৌদি আরবের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সাবেক গবেষক মুহাদ্দিস শায়খ ইসমাঈল আনসারী। তার কিতাবটির নাম- 'তাসহীহু হাদীসি সালাতিত তারাবী ইশরীনা রাকআতান ওয়ার রাদ্দু আলাল আলবানী ফী তাযয়ীফিহী'। একইভাবে সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম, মসজিদে নববীর প্রসিদ্ধ মুদাররিস ও মদীনা শরীফের সাবেক কাযী শায়খ আতিয়্যা সালিম 'আত তারাবীহ আকছারু মিন আলফি আম' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সৌদির আরেকজন খ্যাতনামা আলেম, বহুগ্রন্থ প্রনেতা শায়খ

মুহাম্মদ আলী সাবূনী সাহেবও এ বিষয়ে 'আত তারাবী ইশরূনা রাকআতান' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। আর লা-মাযহাবী আলেম মোবারকপুরী সাহেবের খণ্ডনে কলম ধরেছেন বিগত শতকের সেরা মুহাদ্দিস মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী র. - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, মুসনাদে হুমায়দী সহ বহু হাদীসগ্রন্থ সম্পাদনাপূর্বক যিনি পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন এবং আরব বিশ্বের বড় বড় আলেম শায়খ মুসতাফা যারকা, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ, নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ যার কাছ থেকে হাদীসের ইজাযত হাসিল করেছেন। 'রাকআতে তারাবী' নামে উর্দূ ভাষায় তিনি অত্যন্ত সারগর্ভ ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সর্বপ্রথম ১৩৭৬ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়।

এখানে প্রথমত বিশ রাকাত তারাবীর প্রমাণগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অধম লেখকের নিজস্ব রুচি ভিন্ন থাকলেও লা-মাযহাবী বন্ধুদের অনূদিত বুখারী শরীফের টীকার ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রক্ষা করে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মারফূ হাদীস

ইবনে আবী শায়বা র. বলেন,

حدثنا يزيد بن هارون قال انا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر .

অর্থ: আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইবনে হারূন বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে ইবরাহীম ইবনে উসমান জানিয়েছেন হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে বিশ রাকাত তারাবী ও বেতের পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৭৪; তাবারানী, আল কাবীর, হাদীস নং ১২১০২; আল আওসাত, হাদীস নং ৭৯৮; বায়হাকী, ১/৪৯৬।

যয়ীফ না জাল?

এ হাদীসটির সনদে আবূ শায়বা ইবরাহীম ইবনে উসমান আছেন, তিনি যয়ীফ বা দূর্বল। এ কারণে বায়হাকীসহ অনেকেই এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। কিন্তু আলবানী সাহেব ও তার অনুসারী লা-মাযহাবী বন্ধুরা এটিকে 'মাওযূ' বা জাল আখ্যা দিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিসই এটিকে জাল আখ্যায়িত করেননি। জাল ও যয়ীফের মাঝে দুস্তর ব্যবধান। জাল হাদীস তো হাদীসই নয়।

যয়ীফ হাদীস কি গ্রহণযোগ্য নয়?

যয়ীফ হাদীসকে প্রায় সকল মুহাদ্দিসই শর্ত সাপেক্ষে ফযিলতের ক্ষেত্রে, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ও রিকাক বা চিত্তবিগলনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন। আর আহকাম বা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফকে দুভাগে ভাগ করেছেন। এক. এমন যয়ীফ হাদীস, যার সমর্থনে কোন শরয়ী দলিল নেই, বরং এর বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। এ ধরণের যয়ীফ আমলযোগ্য নয়। দুই. সনদের বিবেচনায় হাদীসটি যয়ীফ বটে, তবে এর সমর্থনে শরয়ী দলিল প্রমাণ আছে, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকে এ হাদীস অনুসারে আমল চলে আসছে। এমন যয়ীফ হাদীস শুধু আমলযোগ্যই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মুতাওয়াতির বা অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মানোত্তীর্ণ। 'আল আজবিবাতুল ফাযিলা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ র. এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম র. তার 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে একটি যয়ীফ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل به

অর্থাৎ এ হাদীসটি প্রমাণিত না হলেও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শহরে কোন রূপ আপত্তি ছাড়া এ অনুযায়ী আমল চালু থাকাই হাদীসটি আমলযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (দ্র, পৃ, ১৬)

ইমাম যারকাশী র. তাঁর হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'আন নুকাত' এ বলেছেন,

إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى ينزل منزلة المتواتر

অর্থাৎ যয়ীফ হাদীসকে যখন উম্মাহ ব্যাপকভাবে গ্রহন করে নেয়, তখন সঠিক মতানুসারে সেই হাদীসটি আমলযোগ্য হয়, এমনকি তা মুতাওয়াতির হাদীসের মানে পৌঁছে যায়। (দ্র, ১খ, ৩৯০ পৃ)

হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাবী তাঁর 'ফাতহুল মুগীছ' গ্রন্থে লিখেছেন,

وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث لا وصية لوارث إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية.

অর্থাৎ উম্মাহ যখন যয়ীফ হাদীসকে ব্যাপক হারে গ্রহণ করে নেয়, তখন সহীহ মত অনুসারে সেটি আমলযোগ্য হয়, এমনকি তার দ্বারা অকাট্য বিধান রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে সেটি মুতাওয়াতির দলিলের মানোত্তীর্ণ হয়। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী র. 'উত্তরাধিকারীর জন্য কোন ওসিয়ত নেই' হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন, হাদীস বিশারদগণ এটিকে সুপ্রমাণিত মনে না করলেও ব্যাপকহারে আলেমগণ এটি গ্রহণ করে নিয়েছেন, এ অনুযায়ী আমল করেছেন, এমনকি তারা এটিকে ওসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতটির বিধান রহিতকারী আখ্যা দিয়েছেন। (দ্র,১খ, ৩৩৩পৃ)

আমাদের আলোচ্য হাদীসটি এই দ্বিতীয় প্রকার যয়ীফের অন্তর্ভূক্ত। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মাহর ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন আমল এ অনুযায়ী চলে আসছে। সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে এটি অবশ্যই আমলযোগ্য বলে গণ্য হবে। এটিকে জাল আখ্যায়িত করা হাদীস শাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতি উপেক্ষা করারই নামান্তর।[১]

---

১ আলবানী সাহেব তিনটি কারণে এই হাদীসকে জাল আখ্যায়িত করেছেন। এক, এটি হযরত আয়েশা রা. ও হযরত জাবের রা. বর্ণিত হাদীসের বিপরীত।

এর জবাবে আমরা বলবো, হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, আর এটি তারাবী সম্পর্কে। সুতরাং দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই । তাছাড়া হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসে এগারো রাকাতের উল্লেখ এসেছে। তার আরেকটি বর্ণনায় তেরো রাকাতের উল্লেখ এসেছে। এই দুটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে আলেমগণ বলেছেন, এগারো রাকাত সাধারণ আমল ছিল। আর তের রাকাত মাঝে মধ্যে পড়তেন। একইভাবে বলা চলে, বিশ রাকাতও মাঝে-মধ্যে পড়া হয়েছিল। তের রাকাত যেমন এগারো রাকাতের বিপরীত নয়, তেমনি বিশ রাকাতও এগারো রাকাতের বিপরীত হবে না। আর হযরত জাবের রা. বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ। সুতরাং তার বিপরীত হওয়াতে কিছু আসে যায়না । এ সম্পর্কে আলোচনা শেষ দিকে আসছে।

দুই, আবূ শায়বাকে শো'বা মিথ্যুক বলেছেন। আর বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন, سكتوا عنه- অর্থাৎ মুহাদ্দিসগণ তাকে বর্জন করেছেন। এটা বুখারী র. এর কড়া সমালোচনামূলক শব্দ। উল্লেখ্য, লা-মাযহাবী বন্ধুরা ইমাম বুখারীর কথাটির অনুবাদ করেছেন, 'তার ব্যাপারে কেউ মত ব্যক্ত করেনি'। এটা ভুল অনুবাদ।

এই দ্বিতীয় কারণটির জবাবে আমরা বলবো, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে একমাত্র শো'বা র.ই তাকে মিথ্যুক বলেছেন। এর কারণও তিনি এই বলে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ শায়বা তার উস্তাদ হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন, সিফফীন যুদ্ধে সত্তর জন বদরী সাহাবী শরিক ছিলেন। শো'বা বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাকামের সঙ্গে আলোচনা করে শুধু একজন বদরী সাহাবী পেয়েছি। তিনি হলেন হযরত খুযায়মা রা.।

যাহাবী র. 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করে শো'বার কথাটি এই বলে খণ্ডন করেছেন,

سبحان الله أما شهدها علي أما شهدها عمار

বড়ই আশ্চর্য! সিফফীনে কি হযরত আলী রা. শরিক ছিলেন না? হযরত আম্মার রা. শরিক ছিলেন না? (দ্র, ১খ, ৪৭পৃ)

অর্থাৎ হযরত আলী রা. ও হযরত আম্মার রা. তো বদরী ছিলেন, তারাও তো সিফফীনে শরিক ছিলেন। তাহলে তো এখানেই তিনজন হয়ে গেল। খুঁজলে হয়তো এভাবে আরো অনেকের নাম বের হয়ে আসবে। খলীফা ইবনে খাইয়াত রহ. স্বীয় তারিখ গ্রন্থে এবং তার বরাতে হাফেয যাহাবী স্বীয় 'আল ইবার' গ্রন্থে (১/৩৩) বলেছেন,–

تسمية من شهد الصفين من البدريين مع علي بن أبي طالب سهل بن حنيف وخوات بن جبير وأبو أسيد الساعدي وأبو اليسر ورفاعة بن رافع الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري بخلف فيه.

বদর সাহাবীগণের মধ্যে যারা আলী রা.এর সঙ্গে সিফফীনে শরিক হয়েছিলেন, তাদের নাম : সাহল ইবনে হুনায়ফ, খাওওয়াত ইবনে জুবায়র, আবূ উসায়দ সায়েদী, আবুল ইউস্‌র, রিফাআ ইবনে রাফে আনসারী ও আবূ আইয়ূব আনসারী, তবে তার সম্পর্কে দ্বিমত আছে।

তাহলে শো'বা র. এর কথা ঠিক হলো কি করে?

তাছাড়া শো'বা র. বলেছেন, কাযাবা যার একটি অর্থ হলো, মিথ্যা বলেছে। এ অর্থ ধরেই বলা হয়, শো'বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন। অথচ এ শব্দটির এ অর্থও হতে পারে- ভুল বলেছে। এ অর্থে কাযাবা শব্দটির ব্যবহারের বহু নজির তুলে ধরা হয়েছে 'আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস' গ্রন্থে। এ অর্থটি গ্রহণ করলে 'শো'বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন' সেটা প্রমাণিত হয় না।

হযরত আনাস রা. একজন সম্পর্কে কাযাবা বলে মন্তব্য করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحا ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين بدليل روايته المتقدمة... ومعنى قوله كذب أي أخطأ وهو لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ الخ (٥٩٦/٢)

এ লোকটির নাম স্পষ্টরূপে আমি অবগত হতে পারি নি। সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন সম্পর্কে এটা বলা হয়েছে। একথার দলিল হলো তার পরবর্তী বর্ণনাটি ...। আর কাযাবা অর্থ হবে ভুল বলেছে। এটা হেজাযবাসীদের ভাষা, তারা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় রকম ভুলের ক্ষেত্রে এই কাযাবা শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। (২/৫৯৬) হাদীস নং ১০০২

আর ইমাম বুখারী র. এর মন্তব্য সম্পর্কে বলবো, এমন একাধিক নজির রয়েছে, যেখানে বুখারী র. ঐ মন্তব্য করা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তির হাদীস গ্রহন করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ আবূ কাতাদার জীবনী দেখুন। বুখারী র. তার ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনে আদী র. তার 'আল কামিল' গ্রন্থে তার সঙ্গে একমত হন নি। মুকাতিল ইবনে সুলায়মানের জীবনী দেখুন। বুখারী র. উক্ত মন্তব্য করা সত্ত্বেও ইবনে আদী র. বলেছেন, له أحاديث صالحة তাঁর কিছু ভাল হাদীসও রয়েছে। আমাদের আলোচ্য আবূ শায়বা সম্পর্কেও ইবনে আদী র. লিখেছেন,

له أحاديث صالحة وهو خير من إبراهيم بن أبي حية

অর্থাৎ তার কিছু ভাল হাদীসও রয়েছে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবূ হাইয়্যার চেয়ে ভাল। (দ্র, তাহযীব, ১খ, ১৪৫পৃ)

মোট কথা, আলবানী সাহেব আবূ শায়বা সম্পর্কে পূর্ণ ইনসাফ অবলম্বন করেননি। অন্যথায় ইবনে আদীর উপরোক্ত মন্তব্যও উল্লেখ করতেন। উল্লেখ করতেন ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. এর মন্তব্যও । ইয়াযীদ ইবনে হারূন ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও খ্যাতনামা হাফেজে হাদীস, তিনি বুখারী র. এর উস্তাদের উস্তাদও ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন,

ما قضى على الناس رجل يعني في زمانه أعدل في قضاء منه

অর্থাৎ আমাদের যুগে তাঁর চেয়ে বড় ন্যায়পরায়ন কাজি (বিচারক) কেউ হন নি। উল্লেখ্য, আবূ শায়বা যখন ওয়াসিতের কাজি ছিলেন, তখন ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. তার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। সুতরাং তাকে কাছ থেকে যাচাই করার যেমন সুযোগ তার হয়েছিল তেমনটি অন্য কারো হয়নি। সুতরাং তার উক্ত মন্তব্য আবূ শায়বার ইলম ও ন্যায়পরায়নতার ব্যাপারে উজ্জল সাক্ষী। কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে দুটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যনীয়। এক, তার দীনদারী ও ন্যায়পরায়নতা; দুই, তার মেধা ও স্মৃতিশক্তি। ইয়াযীদ র. এর সাক্ষ্যপ্রমাণে তার ন্যায়পরায়নতার বিষয়টি সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

আর ইবনে আদীর বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, তার মেধাও এত খারাপ ছিল না। তার কিছু ভাল হাদীসও পাওয়া গেছে। স্মর্তব্য, আলোচ্য হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে হারূন র. নিজেই আবূ শায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য আবূ শায়বাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়া নয়। বরং আলবানী সাহেব যে তার প্রতি পুরোপুরি ইনসাফ প্রদর্শন করেননি তা তুলে ধরা। আবূ শায়বা যয়ীফ হলেও তার হাদীসকে জাল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এমন পর্যায়ের নন। তাইতো আলবানী সাহেবের পূর্বে কেউ তার এই হাদীসকে জাল বলেন নি। বরং ইমাম বায়হাকী র. তারাবীর রাকাত সংখ্যার জন্য যে অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন তার অধীনে আবূ শায়বার এ হাদীসটিও উল্লেখ করেছেন।

তিন, আলবানী সাহেব এও উল্লেখ করেছেন, আবূ শায়বার হাদীসে বলা হয়েছে, নবী স. রমযান মাসে জামাত ছাড়া নামায পড়েছেন। এটি হযরত জাবের রা. ও হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসের বিরোধী। তার মানে হযরত আয়েশা ও হযরত জাবির রা. এর হাদীসে জামাতের সঙ্গে নামায পড়ার কথা আছে, আর আবূ শায়বা বর্ণিত এ হাদীসে জামাত ছাড়া নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যাস, তাই এটি জাল। এমন কথা কোন আলেমের মুখে শোভা পায় না। প্রথমত, ইবনে আবী শায়বা, আবদ ইবনে হুমায়দ ও তাবারানীর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে জামাত ছাড়া কথাটি নেই। শুধু বায়হাকীর বর্ণনায় একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যকথায়, ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও আলী ইবনুল জাদ দুজনই আবূ শায়বা থেকে ঐ শব্দটি ছাড়া হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শুধু মানসূর ইবনে আবূ মুযাহিম ঐ শব্দটির কথা উল্লেখ করেছেন। আর মানসূরের তুলনায় ঐ দুজন অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই তাদের

মওকুফ হাদীস

১. হযরত উমর রা. এর কর্মপন্থা

হযরত উমর রা.এর উদ্যোগে ২০ রাকাত তারাবী'র ব্যবস্থা সম্পর্কে মোট সাতটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

ক. ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার বর্ণনা

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা বর্ণনা করেন:

عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة

অর্থ: হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর আমলে সাহাবায়ে কেরাম রমযান মাসে বিশ রাকাত পড়তেন। (বায়হাকী , আসসুনানুল কুবরা ২/৪৯৬)

বর্ণনাই অগ্রগণ্য হবে। তাছাড়া হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে জামাতের কথা কোথায়? এগার রাকাত সম্পর্কিত হাদীসে তো তা নেই। তারাবীর ইতিহাস সম্পর্কিত হাদীসটিতেও রাকাতের উল্লেখ নেই। সুতরং উক্ত হাদীসকে এই হাদীসের বিরোধী আখ্যা দেওয়ার অর্থ কী? এই হাদীসে তো বলা হয় নি, ঐ তিন রাত্রির নামায বিশ রাকাত ছিল। আমরাও তো এমন দাবী করি নি। দ্বিতীয়ত, যদি জামাত ছাড়া কথাটিকে সহীহ ধরেও নেওয়া হয়, তবে এটাকে ভিন্ন ঘটনা আখ্যা দিলে তো আর কোন বিরোধ থাকে না। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে দেখা যায়, তারা কয়েকজন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারাবীতে দাঁড়িয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে নামায সংক্ষিপ্ত করে ভেতরে চলে যান। (মুসলিম, ১১০৪)। এ ঘটনাটিও হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। তাই বলে কি এটিকেও জাল বলতে হবে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. তো বলেছেন, والظاهر أن هذا في قصة أخرى

অর্থাৎ বাহ্যত এটা ভিন্ন কোন ঘটনা হয়ে থাকবে। (ফাতহুল বারী, ৩খ, ৮পৃ)

অধিকন্তু পূর্বেও বলেছি, হযরত জাবির রা. এর হাদীসটিও দুর্বল। আলবানী সাহেব এটি সম্পর্কে ধোঁকায় পড়েছেন। তাই বারবার আলোচ্য হাদীসকে হযরত জাবির রা. এর হাদীসের বিপরীত বলে এটিকে জাল আখ্যা দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছেন। হযরত জাবির রা. এর হাদীসটি শেষ দিকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এ হাদীসের দুটি সনদ :

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার নীচে বায়হাকী পর্যন্ত এই হাদীসের দুটি সনদ আছে। একটি সনদ ইমাম বায়হাকী তার 'আসসুনানুল কুবরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই সনদে ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার শিষ্য হলেন ইবনে আবূ যি'ব রহ.।

অপর সনদটি তিনি উল্লেখ করেছেন তার 'আল-মারিফা' গ্রন্থে। এই সনদে ইবনে খুসায়ফার শিষ্য হলেন মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর। প্রথম সনদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইমাম নববী, ওয়ালিউদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আয়নী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা নিমাভী র. প্রমুখ। আর দ্বিতীয় সনদে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন তাজুদ্দীন সুবকী ও মোল্লা আলী কারী প্রমুখ। তার মানে মূল হাদীসটি সাত জন বড় বড় মনীষীর দৃষ্টিতে সহীহ। (দ্র, রাকাতে তারাবী, পৃ. ৫৪)। মোবারকপুরী ও আলবানী সাহেবের পূর্বে কোন মনীষী এই হাদীসকে যয়ীফ বলেননি।

প্রথম সনদটির আলোচনা

লা-মাযহাবী বন্ধুরা তাদের সহীহ বুখারীর টীকায় প্রথম সনদটির কথা উল্লেখই করেননি। অবশ্য লা-মাযহাবী আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপুরী তার তিরমিযীর ভাষ্য তুহফাতুল আহওয়াযীতে ও মুযাফফর বিন মুহসিন তার তারাবীহ'র রাকআত সংখ্যা পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, বর্ণনাটি জাল। এটি তিন দোষে দুষ্ট। প্রথমত, এর সনদে আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুবী আদ-দায় নূরী নামক রাবী আছে। সে মুহাদ্দিসগণের নিকট অপরিচিত। রিজাল শাস্ত্রে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এজন্য শায়খ আব্দুর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ) বলেন, لم أقف على ترجمته فمن يدعي صحة هذا الأثر فعليه أن يّثْبُتَ كونه ثقة قابلا للاحتجاج. আমি তার জীবনী সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। সুতরাং যে ব্যক্তি এই আছারের বিশুদ্ধতা দাবী করবে তার উপর অপরিহার্য হবে নির্ভরযোগ্য হিসাবে দলীলের উপযুক্ততা প্রমাণ করা।

যার কোন পরিচয়ই নেই তার বর্ণনা কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? মুহাদ্দিসগণের নিকটে এরূপ বর্ণনা জাল বলে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, উক্ত বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবনু খুছায়ফাহ নামে একজন মুনকার রাবী আছে। সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী।ঠ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এজন্য তাকে মুনকার বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী তা সমর্থন করেছেন। তাছাড়া সে যে মুনকার রাবী তার প্রমাণ হ'ল, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে সে এখানে ২০ রাকআতের কথা বর্ণনা করেছে। অথচ আমরা ৮ রাকআতের আলোচনায় সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি হাদীস উল্লেখ করেছি, যার সবগুলোই সহীহ। সুতরাং এই বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত, এটি কখনো মুযত্বরাব পর্যায়ের। এই বর্ণনায় বিশ রাকআতের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় ২১ রাকআতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই শায়খ আলবানী বলেন, এটি মুযত্বারাব পর্যায়ের হওয়ায় পরিত্যাজ্য। (তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা)

এ হলো লেখকের বাগাড়ম্বর। তার লেখার মৌলিক ক্রটিগুলো তুলে ধরার পূর্বে কয়েকটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভুলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ক. তিনি লিখেছেন, আদ-দায়নূরী। শুদ্ধ হলো আদ দীনাওয়ারী।

খ. তিনি লিখেছেন, ইয়াযীদ ইবনু খুছায়ফাহ নামে একজন মুনকার রাবী আছে। এখানে মুনকার রাবী কথাটি ভুল। মুহাদ্দিসগণ রাবীর ক্ষেত্রে মুনকার (আপত্তিকর) শব্দটি ব্যবহার করেন না। করেন হাদীসের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, রাবীর ক্ষেত্রে 'মুনকারুল হাদীস' কথাটি তারা ব্যবহার করেন, যার অর্থ হলো আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। সুতরাং ইমাম আহমাদ তাকে মুনকার বলেছেন একথাটিও ভুল। আহমাদ রহ. বলেছেন, মুনকারুল হাদীস।

গ. তিনি বলেছেন, মুযত্বারাব। শুদ্ধ হবে মুযতারিব।

হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে আনাড়ি হওয়ার কারণে এসব ভুল প্রকাশ পেয়েছে।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। লেখক এ হাদীসটিকে জাল বলেছেন। শীর্ষ পাঁচজন মুহাদ্দিস যে হাদীসকে সহীহ বলেছেন, সেটাকে জাল বলে দেওয়া দুঃসাহসিকতা বৈ কি। আলবানী ও মুবারকপুরীও যে সাহস দেখাতে পারেন নি, সেই সাহস দেখিয়েছেন আমাদের দেশের

কৃতিসন্তান। লেখক হাদীসটি জাল হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো ফানজুবীর অপরিচিত হওয়া। লেখকের আলোচনা থেকে বোঝা যায় এটিই মূল কারণ। এর সমর্থনেই তিনি মুবারকপুরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ঐ বক্তব্যের অনুবাদে ভুল করেছেন। ঐ বক্তব্যে ان يثبت শব্দটি তার লাগানো যের-যবরসহ উল্লেখ করেছি, যাতে পাঠক তার এলেমের দৌড় বুঝতে পারেন। বক্তব্যটির সঠিক অনুবাদ হবে, আমি তার জীবনী সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি। সুতরাং যে ব্যক্তি এই আছারের বিশুদ্ধতা দাবী করবে তার উপর অপরিহার্য হবে তার (অর্থাৎ ফানজুবীর) বিশ্বস্ততা ও প্রমাণযোগ্য হওয়া প্রমাণ করা।

মুবারকপুরী বলেছেন, অবগত হতে পারি নি। ব্যাস! এর উপর নির্ভর করেই লেখক বলে দিয়েছেন, সে মুহাদ্দিসগণের নিকট অপরিচিত। রিজাল শাস্ত্রে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

ফানজুবী কি অপরিচিত?

ফানজুবী শুধু পরিচিতই নন, বরং বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম নাসাঈ রহ.এর বিশিষ্ট শিষ্য আবু বকর ইবনুস সুন্নী ছিলেন এই ফানজুবীর খাস উস্তাদ। ইবনুস সুন্নী সুনানে নাসাঈর রাবী। তার থেকেই সেটি বর্ণনা করেছেন ফানজুবী। ইমাম নাসাঈ থেকে যেসব সনদে নাসাঈ শরীফ বর্ণিত হয়েছে তার একজন রাবী হলেন এই ফানজুবী। মুবারকপুরী তাকে না চিনলে নাও চিনতে পারেন। কারণ তার অধ্যয়নের গণ্ডি ছিল খুবই সীমিত। তার তুহফাতুল আহওয়াযী দেখলে যে কোন পাঠকই তা আঁচ করতে পারবেন। কিন্তু এই কম্পিউটার যুগে যখন ফানজুবী লিখে সার্চ দিলেই সব নাড়ি-নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করা যায়, এসময় যদি কেউ পূর্ববর্তী কারোও অন্ধ অনুসরণ করে এমন লাফালাফি করেন তবে নিজের পা ভাঙ্গা ছাড়া কিছুই হবে না।[১]

---

[১] কম্পিউটারের কথাও এইসব বন্ধুদের খাতিরে বলা হলো। অন্যথায় আমাদের পূর্বসূরিগণ তার জীবনী পূর্ব থেকেই জানতেন। পূর্ব যুগের হাফেজে হাদীসগণের জানার পরিধি আজকালের কম্পিউটারের চেয়ে ঢের বেশি ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল।

ফানজুবীর জীবনী নিয়ে অনেক মনীষীই আলোচনা করেছেন। ইবনুল আছীর আল জাযরী রহ. করেছেন তার আল লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব গ্রন্থে, তিনি তাকে হাফেজে হাদীস উপাধিতে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী রহ. করেছেন তার সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৩/২৪৫), আল ইবার (১/৪২৬) ও তাযকিরাতুল হুফফাজ (৩/১০৫৭) গ্রন্থত্রয়ে, ও ইবনুল ইমাদ করেছেন তার শাযারাতুয যাহাব গ্রন্থে (৩/২০০)। সুয়ূতী লাআলিল মাসনূআহ গ্রন্থে বলেছেন, حافظ كبير বড় হাফেজে হাদীস। (২/৩৭) যাহাবী আল ইবার গ্রন্থে একথাও লিখেছেন যে, وكان ثقة مصنفا তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রন্থকার ছিলেন।

এমন একজন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে মুযাফফর বিন মুহসিন পূর্বোক্ত বক্তব্যের পর একথাও বলেছেন যে, যার কোন পরিচয়ই নেই তার বর্ণনা কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? মুহাদ্দিসগণের নিকটে এরূপ বর্ণনা জাল বলে পরিচিত।

এই শেষ কথাটিও তিনি ভুল বলেছেন। রাবী অপরিচিত হলে তার বর্ণনাকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলেন, জাল বলেন না। আবার যদি তার সমর্থক বর্ণনা থাকে, তখন সেটা হাসান স্তরে উন্নীত হয়। হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে লেখা প্রায় সকল কিতাবেই একথা পাওয়া যাবে। এখানে ফানজুবী তো সুপরিচিত। অপরিচিত হলেও তার বর্ণনার সমর্থনে আরেকটি সনদ বা সূত্র রয়েছে। সুতরাং এটিকে যঈফ বলারও সুযোগ নেই, জাল বলা তো দূরের কথা।

এ দীর্ঘ আলোচনার কারণ

এ দীর্ঘ আলোচনা করতে হলো তাদের দাবী যে কত অসার শুধু তা প্রমাণ করার জন্য। অন্যথায় হাদীসটির এমন সূত্র রয়েছে, যেখানে ফানজুবী, আবু উসমান ও আবু তাহির কেউ নেই। আল ফিরয়াবী তার আস সিয়াম গ্রন্থে (হা. ১৭৬) ইয়াযীদ ইবনে হারূন থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে হারূন বর্ণনা করেছেন ইবনে আবূ যিব রহ.এর সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা থেকে, তিনি সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে। এমনিভাবে আলী ইবনুল জা'দ রহ. স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে এটি বর্ণনা

করেছেন। (হা. ২৮২৫) ইমাম মালেকও সরাসরি ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (দ্র. ফাতহুল বারী, ২০১০ নং হাদীসের আলোচনা)

২য় আপত্তিটির জবাব একটু পরেই আসছে।

৩য় আপত্তিটি হলো হাদীসটি মুযতারিব। পরিভাষায় মুযতারিব ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার এক বা একাধিক রাবী বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যদি সমন্বয় করা সম্ভব হয়, কিংবা কোন একটিকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা যায় তবে হাদীসটি আর যঈফ বলে গণ্য হয় না।

আলোচ্য হাদীসটির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ২৩ রাকআতের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন। কেননা দুটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের বর্ণনা ও চারটি সহীহ মুরসাল বর্ণনা এর সমর্থনে রয়েছে, আবার এর উপর সালাফে সালেহীনের আমলও ছিল।

২১ ও ২৩ এর মধ্যে সমন্বয়

তাছাড়া ২১ রাকআতের বর্ণনাটি তো লা-মাযহাবী বন্ধুদের মতানুসারে ২৩ রাকআতের বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ তারা বলে থাকেন, বেতের এক রাকআতও পড়া যায়, তিন রাকআতও পড়া যায়। তাহলে মূল তারাবীহ ২০ রাকআতই প্রমাণিত হলো। ফলে হাদীসটি মুযতারিব থাকল না।

মুযতারিব কোনটি?

এখানে একথাও বলা অত্যন্ত যৌক্তিক হবে যে, ২১ রাকআতের বর্ণনাটি দ্বারা হাদীস মুযতারিব হলে ১১ রাকআতের হাদীসটি হবে, ২৩ রাকআতের হাদীসটি নয়। কারণ সাইব রা. এর এই ছাত্র ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার বর্ণনায় কোন বিভিন্নতা নেই। বরং তার দুই ছাত্র ইবনে আবূ যি'ব ও মুহাম্মদ ইবনে জাফর একবাক্যে ২৩ রাকআতের কথা বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে সাইব রা. এর অপর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে। তার ৬ জন ছাত্র ছয়ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

১. ইমাম মালেক । উমর রা. উবাই ইবনে কাব ও তামীম দারী রা.কে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন লোকদের নিয়ে ১১ রাকআত পড়েন। (এতে এ কথা বলা নেই যে, নির্দেশটি তামিল করা হয়েছে কি না।)

২. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান। উমর রা. উবাই ও তামীম রা.এর নিকট লোকদের একত্রিত করলেন। তারা দুজন ১১ রাকআত পড়তেন। (এতে উমর রা.এর নির্দেশ দেওয়ার কথা নেই।) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

৩. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ। আমরা উমর রা.এর যুগে ১১ রাকআত পড়তাম। (এতে উমর রা.এর নির্দেশের উল্লেখ নেই। উবাই ও তামীম রা.এরও উল্লেখ নেই) (সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর)

৪. ইবনে ইসহাক। আমরা উমর রা.এর যুগে রমযান মাসে ১৩ রাকআত পড়তাম। (এতেও নির্দেশের উল্লেখ নেই। উবাই ও তামীম রা.এরও উল্লেখ নেই। আবার এতে ১১ এর স্থলে ১৩ এর কথা এসেছে।) (কিয়ামুল লাইল লিইবনি নাসর)

৫. দাউদ ইবনে কায়স। উমর রা. ২১ রাকআতের হুকুম দিয়েছেন। (এতে ১১ এর পরিবর্তে ২১ এর কথা এসেছে।) (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক)

৬. ইসমাইল ইবনে জাফর। তারা উমর রা.এর যুগে ১১ রাকআত পড়তেন। (আহাদীসু ইসমাইল ইবনে জাফর, ৪৪০)

মূলত এ হাদীসটিই মুযতারিব। একই উস্তাদ থেকে ছয়জন ছাত্র ছয়ভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। রাকআত সংখ্যা নিয়েও তাদের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে। কেউ ১১, কেউ ১৩ আবার কেউ ২১ রাকআতের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ২১ রাকআতের বর্ণনার কারণে হাদীস মুযতারিব হলে ১১ রাকআতের হাদীসটি হবে, ২৩ রাকআতেরটি নয়।

লা-মাযহাবী বন্ধুদের মতামত

লা মাযহাবী বন্ধুরা ১১ রাকআতের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়ে ২১ রাকআতের বর্ণনাটিকে ভুল আখ্যা দিয়েছেন। মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, এটি মুনকার হিসাবে যঈফ। আব্দুর রাযযাক এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, আছারটি তিনি এই শব্দে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেন

নি। এর কারণ হল, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। (আলবানীও অনুরূপ বলেছেন।) এছাড়া এর সম্পূর্ণ সনদ নেই, মাঝে রাবী বাদ পড়ে গেছে। (পৃ. ৩১)

কিন্তু এসব বক্তব্য রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আব্দুর রাযযাক এ বর্ণনাটি তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। মুসান্নাফ রচনার সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। সুতরাং শেষ বয়সে তার অন্ধ হয়ে যাওয়া ও বর্ণনাগুলো এলোমেলো হওয়ার কোন প্রভাব মুসান্নাফের হাদীসের উপর পড়বে না। তাই এই খোঁড়া অজুহাতে তার বর্ণনাকে ভুল ও যঈফ আখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই।

মুযাফফর সাহেব শেষে যে কথা বলেছেন যে, এর সম্পূর্ণ সনদ নেই, এটা ডাহা মিথ্যা কথা। সম্পূর্ণ সনদ রয়েছে। কোন রাবী বাদ পড়ে নি।

১৩ রাকআতের ব্যাখ্যা

১৩ রাকআতের বর্ণনাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাদের কেউ বলেছেন, এতে দু'রাকআত ইশার সুন্নত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ফজরের সুন্নতসহ ১৩ রাকআত বলা হয়েছে। মুযাফফর বিন মুহসিনও আলবানীর অনুসরণে এই দ্বিতীয় মতটিই উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসব কথা নেই। এটা ১১ ও ১৩ এর গরমিলকে মিল দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। বুখারী শরীফে ১১৬৪ নং হাদীসে হযরত আইশা রা. বলেছেন, রাসূল সা. রাতে ১৩ রাকআত পড়তেন। অতঃপর যখন ফজরের আযান শুনতেন তখন হালকা দু'রাকআত পড়তেন। এই হাদীসে দেখা যায়, রাসূল সা. ফজরের সুন্নত ছাড়াই ১৩ রাকআত পড়তেন। এমনিভাবে মুসনাদে আহমাদ (২৫১৫৯) ও আবু দাউদ (১৩৬২) এর বর্ণনায় এসেছে, আইশা রা. বলেছেন, রাসূল সা. রাতের নামায পড়তেন চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন এবং দশ ও তিন রাকআত। তের রাকআতের বেশী পড়তেন না, সাতের কমও না।

ইবনে আববাস ও যায়দ ইবনে খালেদ রা.এর হাদীসেও তের রাকআতের কথা এসেছে। সুতরাং ইবনে ইসহাকের বর্ণনাটির উপরোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নয়। বিশেষত এ কারণেও যে, ইবনে ইসহাক তার বর্ণনাটি প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেছেন, وهذا أثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق

لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل এটি সর্বাধিক মজবুত বর্ণনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে আইশা রা.এর হাদীসের মোয়াফেক বর্ণনা এটি। (ইবনে নাসর, কিয়ামুল লাইল)

১১ ও ২৩ দুটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় বা ২৩ এর বর্ণনাটি অগ্রগণ্য হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নত আলেমগণের বক্তব্য একটু পরে উল্লেখ করা হচ্ছে। তাদের কেউই এভাবে সমন্বয় করেন নি যে, প্রথমে ২৩ রাকআতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরে ১১ রাকআতের। এমনটি তারা বলতেও পারেন না। কারণ বারশত বছরের ইতিহাসে কোথাও ১১ রাকআত তারাবী পড়া হয়েছে, এমন কথা কোন কিতাবে নেই। এ কারণে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রহ. যেখানে হযরত উমর রা. কর্তৃক তারাবীহ্‌র এন্তেজাম করা এবং পরবর্তীকালে এর আমল চালু হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, সেখানে ১১ রাকআতের কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন নি। তিনি বলেছেন,

فلما جمعهم عمر على أبي كان يصلي بهم عشرين ركعة ويوتر بثلاث وكان يخفف في القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعات ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله حسن سائغ.

উমর রা. যখন লোকদেরকে উবাই রা.এর ইমামতিতে একত্রিত করলেন, তখন তিনি (উবাই রা.) তাদেরকে নিয়ে বিশ রাকআত পড়তে লাগলেন। এবং তিন রাকআত বেতের পড়তেন। যত রাকআত বৃদ্ধি পেয়েছিল তিনি সে হিসাবে কিরাআত হালকা করতেন। কারণ তা মুক্তাদীদের পক্ষে রাকআত দীর্ঘ করার তুলনায় সহজ ছিল। এরপর পূর্বসূরিদের এক জামাত ৪০ রাকআত তারাবীহ ও তিন রাকআত বেতের পড়তে থাকেন। আরেক জামাত ৩৬ রাকআত তারাবীহ ও তিন রাকআত বেতের পড়তে থাকেন। এসবই ভাল ও সিদ্ধ। (আল ফাতাওয়াল কুবরা, ২/১১৯)

একইভাবে সউদী আরবের প্রথম ও প্রধান মুফতী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন,

وذهب أكثر أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أن صلاة التراويح عشرون ركعة لأن عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم عشرين ركعة وكان هذا بمحضر من الصحابة فيكون كالإجماع. (الفتاوى والرسائل)

অর্থাৎ অধিকাংশ আলেম, যেমন ইমাম আহমদ শাফেঈ ও আবু হানীফার মত হলো, তারাবীহ ২০ রাকআত। কেননা উমর রা. যখন লোকদেরকে উবাই ইবনে কাবের অধীনে একত্রিত করলেন, তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে ২০ রাকআত পড়েছিলেন। আর এটা হয়েছিল সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই। ফলে তা ইজমা বা ঐকমত্যের মতোই হয়ে গিয়েছিল। (আল ফাতাওয়া ওয়ার রাসাইল, ২/২৪৪)

দ্বিতীয় সনদটির আলোচনা

দ্বিতীয় সনদটি এনে তারা বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদের টীকায় মন্তব্য করেছেন, এই হাদীসটির সনদ যয়ীফ। হাদীসের সনদে ১.আবূ উসমান বাসরী রয়েছে, সে হাদীসের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত; ২. খালিদ ইবনে মুখাল্লাদ রয়েছে, সে যয়ীফ, তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত, তার কোন বর্ণনা দলিল হিসেবে গন্য নয়, তদুপরি সে ছিল শিয়া ও মিথ্যাবাদী (তাহযীব, ২য় খণ্ড); ৩.ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা রয়েছে, তার সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। (মিযানুল ই'তিদাল, তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খণ্ড)

কথাগুলো পড়ে আমি মাথায় হাত দিয়েছি। মনে মনে বলেছি, এদের কি আখেরাতের ভয়ও নাই? ভয় থাকলে তারা এমন ডাহা মিথ্যা কথা লিখল কিভাবে? এরা বর্ণনাকারীর নামও শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। মাখলাদকে তারা মুখাল্লাদ বানিয়েছে। আবুল হাসনা কে আবুল হাসানা লিখেছে। রুফাই কে রাফে নামে উল্লেখ করেছে। এক পৃষ্ঠায় তিনটি ভুল। এত বড় বড় ডিগ্রীধারী সম্পাদকরা এমন ভুল করবেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

খালিদ ইবনে মাখলাদ ও ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা দুজনই বুখারী ও মুসলিম শরীফের রাবী । তাদের সকল বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হলে বুখারী ও

মুসলিম শরীফে তাদের বর্ণিত হাদীসগুলোর কি দশা হবে? ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কি মিথ্যুকের হাদীসও গ্রহণ করেছেন? হায়, হায়!!

পাঠক, সত্যি বলছি, যে কিতাব দুটির বরাত তারা দিয়েছেন, তাতে এসব কথার হদিস নেই। আরবী কোন কথাটির অর্থ যে তারা লিখেছেন 'তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত' তা আমরা বুঝতে পারছি না। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় আমাদের এই বন্ধুরা মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী হাসিল করলেও তারা আরবীও বোঝেন না, বাংলাও না।

খালিদ ইবনে মাখলাদ বিশ্বস্ত ছিলেন

খালিদ কে উসমান ইবনে আবী শায়বা র., সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ র., ইবনে হিব্বান র. ও ইবনে শাহীন র. প্রমুখ মুহাদদ্দিসগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে মাঈন বলেছেন, ما به بأس অর্থাৎ তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। আবূ দাউদ ও ইবনে হাজার র. তাকে সাদূক বা সত্যবাদী বলেছেন। ইবনে আদী র. বলেছেন,

هو عندي إن شاء الله لا بأس به

অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ আমার দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী তার সরাসরি ছাত্র ছিলেন।

হ্যাঁ, ইমাম আহমাদ র. প্রমুখ বলেছেন, له مناكير অর্থাৎ তার কিছু কিছু বর্ণনা আপত্তিকর। (সম্ভবত এ শব্দটির অর্থই তারা করেছেন- প্রত্যাখ্যাত)। ইবনে আদী র. ঐ ধরণের বর্ণনাগুলো উদ্ধৃতও করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারীর ভূমিকায় তার সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন:

أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه

অর্থাৎ বাকি রইল তার শিয়া মত অবলম্বনের ব্যাপারটি । এসম্পর্কে আমরা পূর্বেই বলেছি, তিনি যখন হাদীস গ্রহণ ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে

মজবুত ছিলেন, তাই তার শিয়া মতাবলম্বন ক্ষতিকর নয়। বিশেষ করে এ কারণে যে, তিনি তার মতবাদের প্রতি কাউকে দাওয়াত দিতেন না।

এসব কথা 'তাহযীবুত তাহযীব', 'ফাতহুল বারী' ও 'মিযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি মিথ্যাবাদী ও তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত- এমন কথা কোন গ্রন্থেই নেই। কোন মুহাদ্দিসই তাঁর সম্পর্কে বলেননি। এটা তাঁর উপর লা-মাযহাবীদের জঘন্য অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

যাহোক, তাঁর কিছু কিছু বর্ণনায় আপত্তি থাকলেও আলোচ্য হাদীসটি তার অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ প্রথমত, এতে আপত্তির কিছুই নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি ছাড়াও অন্য সনদে ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা সম্পর্কে জালিয়াতি:

ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা র. সম্পর্কে তো তাদের বক্তব্য আরো জঘন্য। ইয়াযীদ ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, সিহাহ সিত্তার রাবী। বুখারী র. ও মুসলিম র. তার সূত্রে বহু হাদীস গ্রহণ ও উদ্ধৃত করেছেন। আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইবনে সাদ তাকে ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে মাঈন বলেছেন, ثقة حجة অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য। আছরাম এর বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদও তাকে ছিকাহ বলেছেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। এই শব্দটির অর্থ হয়তো তারা করেছেন প্রত্যাখ্যাত। আর তার সকল বর্ণনা কথাটি নিজেদের পকেট থেকে জুড়ে দিয়েছেন। অথচ ঐ শব্দটির সাধারণ অর্থ আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। কেউ কেউ বলেছেন, যদি এমন কোন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হন, যার নিঃসঙ্গ বর্ণনা গ্রহণ করা যায় না, তার ক্ষেত্রেই কেবল ইমাম আহমাদ ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। ফাতহুল বারীর ভূমিকা গ্রন্থে ইবনে হাজার র. ইয়াযীদের আলোচনাতেই এই কথা পরিস্কার করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসের মতো ঐ রাবীর ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার থেকে কিছু কিছু ভুল প্রকাশিত হয়েছে।

আবু উসমান প্রখ্যাত হাফেজে হাদীস ছিলেন

বাকি রয়ে গেলেন আবু উসমান। তিনি অস্বীকৃত– এমন কোন কথা কোন কিতাবে নাই। মুবারকপুরী বলেছেন, আমিও দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে তার জীবনী সম্পর্কে কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু এ ব্যর্থতা তাঁর। যারা খুঁজে পেয়েছেন তারা তো আর ব্যর্থ নন। দেখুন, যাহাবী সিয়ারু আলামিন নুবালা– গ্রন্থে তার নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন– আল ইমামুল কুদওয়া আয যাহিদ আস সালিহ আবু উসমান আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দিরহাম আন নায়সাবূরী আল গাযী আল মারূফ বিল বাসরী (১২খ. ৪৭পৃ)। তার নাম আমর ইবনে আব্দুল্লাহ (মৃত্যু ৩৩৪ হি.)। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ তাহির র., হাসান ইবনে আলী ইবনে মুআম্মাল, ইবনে মানদাহ, হাফেয আবু আলী ও আবু ইসহাক আল মুযাক্কী প্রমুখ তার কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তার বর্ণিত বহু হাদীস বায়হাকী র. তার সুনানে উদ্ধৃত করেছেন। কোন মুহাদ্দিসই তাকে যয়ীফ বলেননি। হাফেয যাহাবী র. তার 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থেও তাকে উল্লেখ করেছেন। (৩৪/১০৯) তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে হাফেয যাহাবী ৩৩৪ হি. সনে মৃত্যুবরণকারী মুহাদ্দিসগণের আলোচনায় বলেছেন, ومسند نيسابور أبو عثمان عمرو بن عبد الله بن درهم المطوعي অর্থাৎ নিশাপুরের মুসনিদ (যার নিকট উঁচু উঁচু সনদ বিশিষ্ট বহু হাদীস ছিল) আবু উসমান ...। (৩/৮৪৭)

আবু তাহির ছিলেন সুপরিচিত মুহাদ্দিস

মুবারকপুরী ও মুযাফফর বিন মুহসিন এই আবু উসমানের সূত্রে হাদীস বর্ণনাকারী আবু তাহির সম্পর্কেও একই অভিযোগ করেছেন যে, তিনি অপরিচিত ছিলেন। অথচ এই আবু তাহির হলেন ইমাম বায়হাকীর উস্তাদ। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ অগ্রণী হয়েও তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহমিশ আয যিয়াদী। ৪১০ হিজরী সনে তার ওফাত হয়। যাহাবী তার সিয়ার (১৩/১৭৩), ইবার (১/৪২০), তারীখুল ইসলাম (৯/১৫৭) ও তাযকিরাতুল হুফফাজ (৩/১০৫১) এই চারটি গ্রন্থে তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়া সামআনী তার আল আনসাব গ্রন্থে (৩/১৮৫) ও সুবকী তার তাবাকাতুশ

শাফিইয়্যাতিল কুবরা গ্রন্থে (নং ৩৪৮), হাফেজ ইবনে কাছীর তার তাবাকাতুশ শাফিইয়্যীন গ্রন্থে (১/৩৬২) ও ইবনু কাযী শুহবা তার তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ গ্রন্থে (নং ১৫৫) তার জীবনী আলোচনা করেছেন। তারা সকলেই বলেছেন, كان إمام أصحاب الحديث وفقيههم ومفتيهم بنيسابور بلا مدافعة তিনি ছিলেন নিশাপুরের অবিসংবাদিত মুহাদ্দিসকুল শিরোমনি, ফকীহ ও মুফতী।

এ বর্ণনার ভিন্ন আরেকটি সূত্র

তাছাড়া আবূ উসমানের সূত্র ছাড়াও হাদীসটির যখন অন্য আরেকটি সহীহ সূত্র আছে, তাই এই সূত্রটি নিয়ে আপত্তি করে কোন লাভ নেই। পেছনে এ সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. ইবনে আবূ যুবাবের বর্ণনা

হারিছ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু যুবাব বর্ণনা করেছেন সাইব রা. থেকে। তিনি বলেছেন, وكان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة উমর রা.এর যুগে কিয়ামে রমযান বা তারাবীহ ছিল ২৩ রাকআত। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হা. ৭৭৩৩)

এর সনদে হারিছ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু যুবাব আছেন। (মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন, আবু যুবাব নামে একজন মুনকার রাবী আছে। এটা ভুল।) তাঁর সম্পর্কে ইবনে মাঈন বলেছেন, তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আহমদ ইবনে সালিহ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবনে হিব্বান তাকে ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি ও হাকেম তার হাদীসকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী মীযান ও মুগনী গ্রন্থে তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে হাজার তাকরীব গ্রন্থে বলেছেন, صدوق يهم তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, তবে ভুলের শিকার হতেন। অথচ এই রাবী সম্পর্কে মুযাফফর বিন মুহসিন শুধু বিরূপ সমালোচনাগুলোই উল্লেখ করে গেছেন।

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হলো, হযরত উমর রা. এর আমলে তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সাহাবায়ে কেরাম -যাদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার সকলেই ছিলেন- মসজিদে নববীতে বিশ রাকাত তারাবী পড়তেন। এতে তাঁদের কেউ কোন আপত্তি করেননি। এটাকেই সাহাবীগণের ইজমা বা সম্মিলিত কর্মপন্থা বলা হয়।

গ. আবুল আলিয়ার বর্ণনা

আবুল আলিয়া বর্ণনা করেছেন,

أن عمر أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيئ لم يكن فقال: قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة.

অর্থাৎ উমর রা. উবাই রা.কে রমযানে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে আদেশ দিলেন এবং একথা বললেন যে, লোকেরা দিনভর রোযা রাখে, তারা সুন্দর ভাবে কুরআন পড়তেও পারে না। তাই যদি আপনি রাত্রে তাদের সামনে কুরআন পড়তেন। তিনি তখন বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! একাজ তো ইতিপূর্বে হয় নি। তিনি বললেন, আমি তা জানি। তবে এটা একটা উত্তম কাজ হবে। এরপর উবাই রা. লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত পড়লেন। (দ্র, আলমুখতারা, ১১৬১; কানযুল উম্মাল, ৪/২৮৪, মুসনাদে আহমাদ ইবন মানী'র বরাতে।)

এ হাদীসের সনদ হাসান।

এ হাদীসটির একজন রাবী হলেন, আবু জাফর রাযী ঈসা ইবনে আবূ ঈসা মাহান। তার কারণে আলবানী সাহেব এবং তারই অনুসরণে মুযাফফর বিন মুহসিন হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। এই রাবী সম্পর্কে বড় বড় হাদীসবিশারদগণের ভাল মন্তব্যগুলো চেপে রেখে তারা শুধু সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলো উল্লেখ করে গেছেন। তাতেও আবার কাটছাট ও অর্থ বিকৃত করার ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

তারাবীহর রাকআত সংখ্যা বইয়ের ৩৮ নং পৃষ্ঠায় মুযাফফর বিন মুহসিন লিখেছেন , ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ (রহঃ) বলেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়। অথচ তারা বলেছেন, ليس بالقوي তিনি মজবুত নন। এছাড়া ইমাম আহমদ এও বলেছেন, صالح الحديث তিনি সঠিক হাদীস বর্ননাকারী। কিন্তু তার এ মন্তব্যটিও লেখক চেপে গেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.এর মন্তব্যটি তিনি এভাবে পেশ করেছেন– স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে। অথচ তার পুরো মন্তব্য হলো, صدوق سيء الحفظ তিনি সাদূক বা সত্যনিষ্ঠ তবে দুর্বল স্মৃতির অধিকারী। এমনিভাবে হাফেজ যাহাবীর মন্তব্য এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– 'তিনি তার আল কুনা গ্রন্থে বলেন, প্রত্যেক মুহাদ্দিসই তাকে অভিযুক্ত করেছেন। অথচ যাহাবী আল কুনায় তার সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করেন নি। করবেন কী করে, তিনি নিজেই তো মুগনী গ্রন্থে বলেছেন, صدوق তিনি সত্যনিষ্ঠ। আর মীযান গ্রন্থে বলেছেন, صالح الحديث তিনি সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী। এছাড়া আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইবনে সা'দ, ইবনে আম্মার, আবু হাতেম রাযী, হাকেম ও ইবনে আব্দুল বার সকলেই তাকে ছিকাহ বা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে আদী আল কামিল গ্রন্থে বলেছেন, أحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به তার অধিকাংশ হাদীসই সঠিক, আমি মনে করি তার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। ইমাম বুখারী তার আলোচনা করেছেন আত তারীখুল কাবীর (নং ২৭৯০) ও আল আওসাত (নং ১৯৫৬) গ্রন্থদ্বয়ে। কিন্তু তিনি কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি।

ঘ. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারীর বর্ণনাঃ

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী বর্ণনা করেছেন,

إن عمر رض أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة

অর্থাৎ হযরত উমর রা. জনৈক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সাহাবীদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৬৪।

এই বর্ণাটির সনদ সহীহ। তবে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ যেহেতু হযরত উমর রা. এর যুগ পাননি, আবার কার কাছ থেকে শুনেছেন তাও বলেননি, এই কারণে এটিকে মুনকাতি’ বা সূত্র-বিচ্ছিন্ন বলা হয়। কিন্তু যেহেতু এই ধরণের তাবেয়ীগণের উস্তাদ পর্যায়ে দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলনা বললেই চলে, তাই তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। তদুপরি তিনি একা নন। আরো তিনজন তাবেয়ী একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তাই এগুলো পূর্ববর্তী সহীহ ও অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির সমর্থক ও অতিরিক্ত সাক্ষী হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কিছু আপত্তি ও তার জবাব

লা-মাযহাবী বন্ধুরা এই বর্ণনাটির ব্যাপারে সূত্রবিচ্ছিন্নতার আপত্তি ছাড়াও আরো তিনটি আপত্তি পেশ করেছেন। দুটি আলবানী সাহেবের বরাতে। অপরটি নিজেদের পক্ষ থেকে।

প্রথম আপত্তি ও তার জবাব

প্রথম আপত্তিটি হলো, এই হাদীসটি হযরত উমর রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠিত হাদীসের বিপরীত। হাদীসটি হলো- হযরত উমর রা. উবাই বিন কাব ও তামীম দারীকে (রমযান মাসে) ১১ রাকাত পড়ানোর নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ২৫৩)।

কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, ইমাম মালেক র. এই হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের সূত্রে সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বর্ণিত এ হাদীসে রাকাত-সংখ্যা নিয়ে তার ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মালেক র. ১১ রাকাতের কথা বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ১৩ রাকাতের কথা বলেছেন। আর দাউদ ইবনে কায়স ২১ রাকাতের কথা বলেছেন। দাউদ ইবনে কায়স একাই যে বলেছেন তাও নয়। আব্দুর রাযযাক বলেছেন, عن داود وغيره অর্থাৎ দাউদের সঙ্গে আরো কেউ কেউ ২১ রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লিখিত ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফার সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসটিতে এ ধরণের মতভেদ নেই। আবার দীর্ঘ বারশ’ বছরের

ইতিহাসে কোন মনীষী আট রাকাত তারাবীর প্রবক্তা ছিলেন না। এর উপর কারো আমলও ছিল না। বরং এর বিপরীতে হযরত উমর রা. এর যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিশ রাকাত বা তার বেশী তারাবীর প্রচলন চলে আসছে। এসব কারণে অনেকে এগার রাকাতের বর্ণনাকে বর্ণনাকারীর ভুল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. (মৃত্যু ৪৬৩ হি.) ইমাম মালেক র. এর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এই এগার রাকাতের বর্ণনাকে ইমাম মালেকের ভুল আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য ইমাম মালেকের ন্যায় ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান, আব্দুল আযীয দারাওয়ার্দী ও ইসমাঈল ইবনে জাফরও ১১ রাকআতের কথা বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, ভুলটি ইমাম মালেকের নয়, বরং মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের, যেমনটি মন্তব্য করেছেন কোন কোন মুহাদ্দিস। (দ্র, আওজাযুল মাসালিক, ১খ, ৩৯৪পৃ)

১১ ও ২৩ এর মধ্যে সমন্বয়

তাছাড়া দুটি বর্ণনার মধ্যে কেউ কেউ সমন্বয় সাধন করেও পরস্পর বিরোধিতা দূর করেছেন। তারা বলেছেন, প্রথম দিকে যখন কেরাত খুব দীর্ঘ পড়া হতো তখন এগারো রাকাত পড়া হতো। পরে কেরাত কিছুটা হালকা করে রাকাত বাড়িয়ে বিশে উন্নীত করা হয়েছিল। তখন থেকেই বিশ রাকাত পড়ার ধারা অব্যাহত থাকে। ইমাম বায়হাকীসহ আরো কিছু মনীষী এরূপ সমন্বয়ের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। বায়হাকীর পূর্বে হাফেজ দাউদীও এই সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, উমর রা.এর ব্যবস্থাপনায় ২০ রাকআত পড়া যখন থেকে শুরু হয় তখন থেকে মুআবিয়া রা.এর যুগ পর্যন্ত ২০ রাকআত পড়া অব্যাহত থাকে। দ্র. শারহুল বুখারী, কৃত ইবনে বাত্তাল, মৃত্যু ৪৪৯ হি. (৪/১৪৮)। দাউদী মালেকী মাযহাবের বড় আলেম ছিলেন এবং তিনি নিজেও বুখারী শরীফের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তার ওফাত হয়েছিল ৪০২ হি. সনে। তাঁর বহু পূর্বে ইবনে হাবীব মালেকীও (মৃত্যু ২৩৮ হি.) বলেছেন, إنها كانت أولا إحدى عشرة ركعة إلا أنهم كانوا يطيلون القراءة فيه فثقل ذلك عليهم فزادوا في عدد الركعات وخففوا القراءة وكانوا يصلون عشرين ركعة غير الوتر (تحفة الاخيار

Contents

(ص ١٧٢) অর্থাৎ প্রথমে ১১ রাকআত ছিল। কিন্তু তারা কিরাআত লম্বা করতেন। ফলে তা ভারী ঠেকতো। পরে তারা রাকআত সংখ্যা বাড়ালেন, আর কিরাআত হালকা করলেন। বেতের ব্যতীতই তারা বিশ রাকআত পড়তে লাগলেন। (তুহফাতুল আখয়ার, পৃ. ১৯২) ইবনে রুশদ, আবুল ওয়ালীদ আল বাজী, যুরকানী, মোল্লা আলী কারী ও আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী প্রমুখও এভাবে সমন্বয় করা পছন্দ করেছেন।

দ্বিতীয় আপত্তি ও তার জবাব

দ্বিতীয় আপত্তি হলো, বিশ রাকাতের এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধী।

এখানে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত তাহাজ্জুদের এগারো রাকাত সম্পর্কিত হাদীসটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এটি আমরা শেষ দিকে উল্লেখ করবো। সেখানেই প্রমাণিত হবে আলোচ্য হাদীসটি ঐ হাদীসের বিরোধী নয়।

তৃতীয় আপত্তি ও তার জবাব

তৃতীয় আপত্তি লা-মাযহাবী বন্ধুরা করেছেন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের ব্যাপারে। এটাকে আপত্তি না বলে জালিয়াতি বললে অত্যুক্তি হবে না।

তারা বলেছেন, তাছাড়া ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদকে কেউ কেউ মিথ্যাবাদীও বলেছেন। যেমন, ইমাম আবূ হাতিম র. বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত কোন কথাই সত্য নয়, বরং প্রত্যাখ্যাত । কারণ সে হলো মিথ্যাবাদী। (আল জারহু ওয়াত তাদীল, ৯ম খণ্ড; তাহযীবুত তাহযীব ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

হায়, হায়! ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বিখ্যাত তাবেয়ী, ইমাম মালেকের উস্তাদ। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নাকি কোন কথাই সত্য নয়, তিনি নাকি মিথ্যাবাদী। কথাগুলো পড়ে কান্না আসার উপক্রম। ইলমে হাদীস আজ কোন অযোগ্য ও অশুভ লোকদের হাতে এসে পড়েছে? দুটি বরাতের কোথাও এমন কথা নেই,

থাকতে পারে না। তাঁকে তো কেউ যয়ীফও বলেননি, মিথ্যাবাদী বলাতো দূরের কথা।

এজন্যই আমি সাধারণ আহলে হাদীস ভাইদের বলি, আপনারা কাদের অন্ধ অনুসরণ করছেন ভেবে দেখুন। যারা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে এমন ডাহা মিথ্যা তথ্য পেশ করতে পারে, তারা ইমাম আবূ হানীফা র. সম্পর্কে আপনাদেরকে কত ভুল ধারণায় ফেলে রাখতে পারে।

ঙ. তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই'র বর্ণনা :

عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث.

অর্থ: আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই (তারা লিখেছেন, রাফে) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কাব রা. রমযানে মদীনা শরীফে লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বেতের পড়তেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৬৬।

এ হাদীসটির অনুবাদে তারা জালিয়াতি করেছেন। 'পড়তেন' এর স্থলে তারা লিখেছেন 'পড়েছেন'। অথচ সাধারণ আরবী জানা লোকও বুঝেন, كان يصلي অর্থ 'পড়তেন', 'পড়েছেন' নয়। যেহেতু 'পড়তেন' কথাটি নিয়মিত পড়াকে বোঝায়, আর 'পড়েছেন' কথাটি তা বোঝায় না, তাই এই জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এর উল্টো পরবর্তী হাদীসটিতে আছে,

عن أبي بن كعب أنه صلى في رمضان ....

অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, তিনি রমযানে পড়েছেন ----। এখানে صلى অর্থ 'পড়েছেন'। অথচ তারা অর্থ করেছেন- 'আদায় করতেন'। এখানেও তারা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন।

তাইতো আমি বলি, বুখারী শরীফের পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো যদি না থাকতো তবেই দেখা যেত বাবু সাহেবরা কত হাজার ভুলের শিকার হয়েছেন।

যাহোক, হাদীসটি একজন তাবেয়ীর সাক্ষ্য। তিনি উমরী যুগ পাননি। একে মুহাদ্দিসগণ মুনকাতি’ বা মুরসাল বলে থাকেন। অর্থাৎ যার সূত্র বিচ্ছিন্ন। সূত্র-বিচ্ছিন্ন হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ এ কারণেই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, মাঝখানে কোন দুর্বল ব্যক্তি থেকে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু আব্দুল আযীয র. তাবেয়ী ছিলেন। তার উস্তাদগণের মধ্যে দুর্বল কেউ নাই বললেই চলে। তাছাড়া তিনি একা নন। তার মতো আরো তিনজন একই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অধিকন্তু এগুলো পূর্বোল্লিখিত অবিচ্ছিন্ন ও সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির অতিরিক্ত সাক্ষী ও সমর্থক। তাই এতে কোন অসুবিধা নেই।

এ হাদীসটির ব্যাপারেও তারা সূত্রবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ ছাড়া আরও দুটি অভিযোগ এনেছেন। এক. এটি হযরত উমর রা. বর্ণিত হাদীসের বিরোধী। দুই. অনুরূপ এটি হযরত উবাই রা. এর সপ্রমাণিত বর্ণনার বিরোধী।

হযরত উমর রা. এর হাদীসের বিরোধী না হওয়ার বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আর হযরত উবাই রা. এর হাদীসটি দুর্বল। তদুপরি সেটা একদিনের ঘটনা মাত্র। সুতরাং সেটির বিরোধী হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

চ. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রূমানের বর্ণনাঃ

عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة

অর্থঃ ইয়াযীদ ইবনে রূমান র. বলেন, হযরত উমর রা. এর যুগে লোকেরা রমযান মাসে ২৩ রাকাত নামায পড়তেন। (মুয়াত্তা মালেক, ৪০)

এটিও একজন তাবেয়ীর সাক্ষ্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটিকে মুনকাতি’ বা মুরসাল বলা হয়। কারণ ইয়াযীদ ইবনে রূমান হযরত উমর রা. এর যুগ পান নি। এটিকে যয়ীফ বলা উচিত নয়। কেউ যয়ীফ বলেনও নি। সকলে মুনকাতি’ বা মুরসাল বলেছেন। অথচ লা-মাযহাবী বন্ধুরা বায়হাকী, নববী, যায়লায়ী ও আইনীর বরাতে উল্লেখ করেছেন– তারা নাকি এটিকে যয়ীফ বলেছেন। এটা তাদের একটি জালিয়াতি । এ ধরণের

মুনকাতি’ বা সূত্র বিচ্ছিন্ন হাদীসকে যয়ীফ বলা হাদীসের শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্পর্কে দৈন্যতা ও অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

মুরসাল হাদীস কি গ্রহণযোগ্য নয়?

ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, وأما المراسيل فقد كان يحتج به العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه অর্থাৎ মুরসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতেন পূর্বেকার আলেমগণ, যেমন, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক ও আওযায়ী। অবশেষে শাফেঈ এসে এতে আপত্তি করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী বলেছেন, لم يزل الناس على العمل بالمرسل وقبوله حتى حدث بعد المأتين القول برده كما في جامع التحصيل অর্থাৎ আলেমগণ সর্বযুগে মুরসাল হাদীস গ্রহণ ও তদনুযায়ী আমল করে আসছেন। দুশ হিজরীর পরে এটি গ্রহণ না করার কথা ওঠে। তাবারী রহ.ও হয়তো শেষ বাক্যে ইমাম শাফেঈ রহ.এর প্রতি ইংগিত করেছেন। তবে শাফেঈ রহ.ও শর্তসাপেক্ষে মুরসাল হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। ইবনে হাজার রহ. শারহুন নুখবা গ্রন্থে লিখেছেন, وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبائن الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا অর্থাৎ গ্রহণ করা হবে যদি ভিন্ন কোন সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়ে থাকে। চাই সেই ভিন্ন সনদটি বিচ্ছিন্ন হোক বা অবিচ্ছিন্ন।

হাফেজ ইবনে তায়মিয়া র. লিখেছেন,

والمرسل الذي له ما يوافقه أوالذي عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء

অর্থাৎ যে সূত্র বিচ্ছিন্ন হাদীসের অনুকূলে অন্য কোন কিছুর সমর্থন থাকে কিংবা পূর্বসূরিগণের আমল পাওয়া যায় সেটি ফকীহগণের সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণযোগ্য। (আল ফাতাওয়াল কুবরা, ৪খ, ১৭৯পৃ)

যে সকল হাদীসবিদ মুরসাল হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে কড়াকড়ি করেছেন তাদের সম্পর্কেও হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر، وكذلك المستور والمرسل والمدلس، صار حديثه حسنا لا لذاته، بل بالمجموع অর্থাৎ দুর্বল স্মৃতির অধিকারী, মাসতূর (যার দোষগুণ অজ্ঞাত), মুরসাল ও মুদাল্লাস সনদ বা সূত্রের যদি সমর্থন (অর্থাৎ অনুরূপ বর্ণনা) পাওয়া যায় নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে, তবে তাও হাসান মানে উন্নীত হবে। (নুখবাতুল ফিকার)

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এগুলো যেন সালাফ বা মহান পূর্বসূরিগণের সম্মিলিত আমল বা কর্মপন্থার খেলাপ না হয়। কারণ এমতাবস্থায় অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসও গ্রহণযোগ্য হবে না। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

ছ. তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযীর বর্ণনা:

عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القراءة ويوترون بثلاث.

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে কাব র. বলেন, হযরত উমর রা. এর যুগে রমযানে লোকেরা বিশ রাকাত পড়তেন। তাতে তারা দীর্ঘ কেরাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বেতের পড়তেন। (ইবনে নাস্‌র মারওয়াযী, কিয়ামুল লায়ল, পৃ ৯১)

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমত

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. লিখেছেন,

وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة

অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবীই হযরত উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত। সাহাবীগণের এক্ষেত্রে কোন দ্বিমত ছিল না। (আল ইসতিযকার , ৫খ, ১৫৭পৃ)

ইমাম ইবনে কুদামা র. আল মুগনী গ্রন্থে বিশ রাকাতকে দলিল দ্বারা সুপ্রমাণিত করে বলেছেন,

ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع

অর্থাৎ উমর রা. যা করেছেন এবং তাঁর আমলে সাহাবীগণ যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সেটাই অনুসরণের অধিক উপযুক্ত। (দ্র, ২খ, ৬০৪পৃ)

আল্লামা ইবনে তায়মিয়া র. বলেছেন,

انه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر

অর্থাৎ একথা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কাব রা. রমযানে তারাবীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তেন। এবং তিন রাকাত বেতের পড়তেন। তাই বহু আলেমের সিদ্ধান্ত এটাই সুন্নত। কেননা তিনি মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই তা আদায় করেছিলেন। কেউ তাতে আপত্তি করেননি। (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৩খ, ১১২-১৩পৃ)

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী র. তার 'আলমিনহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,

ثم التراويح وهي عشرون ركعة في كل ليلة من رمضان وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رض

অর্থাৎ তারাবী রমযানের প্রত্যেক রাতেই বিশ রাকাত করে। বিশ রাকাতের নির্ণয়ণ একটি দুর্বল হাদীসে আসলেও সাহাবীগণ এর উপর সকলে একমত হয়েছিলেন। (দ্র, পৃ ২৪০)

ইমাম আবূ হানীফা র. এর চমৎকার বিশ্লেষণ:

روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر فقال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسة ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها

جماعة والصحابة متوافرون، منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك.

অর্থাৎ আসাদ ইবনে আমর র. ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা র.কে তারাবী ও এ ব্যপারে হযরত উমর রা.এর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তারাবী সুন্নতে মুয়াক্কাদা। হযরত উমর রা. অনুমান করে নিজের পক্ষ থেকে এটা নির্ধারণ করেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি নতুন কিছু উদ্ভাবন করেননি। তিনি তাঁর নিকট বিদ্যমান ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রাপ্ত কোন নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ প্রদান করেছেন। তাছাড়া হযরত উমর রা. যখন এই নিয়ম চালু করলেন এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতিতে লোকদেরকে একত্রিত করলেন, আর উবাই রা. জামাতের সাথে এই নামায আদায় করলেন, তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান, আলী, ইবনে মাসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, তালহা, যুবায়র, মুআয ও উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ ছিলেন। তাঁদের কেউই তাঁর উপর আপত্তি করেননি। বরং সকলেই তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন এবং অন্যদেরও এরই আদেশ দিয়েছেন। (আল ইখতিয়ার লি তালীল মুখতার,১/৭০)

ইমাম সাহেবের এই সারগর্ভ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২০ রাকাত তারাবী রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ নির্দেশে না হলেও তাঁর পরোক্ষ নির্দেশেই হয়েছিল। উসূলে ফিকহের পরিভাষায় এটাকে মারফূ হুকমী বলা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই কোন একজন সাহাবীর কোন কথা বা কর্ম যা ইজতিহাদের আওতাবহির্ভূত, সকল ফকীহ ও আলেমের দৃষ্টিতে মারফূ হুকমী (অর্থাৎ এর পেছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা ছিল) বলে গণ্য, তখন হযরত উমর রা. এর মতো ব্যক্তির উদ্যোগ এবং সকল সাহাবীর ঐকমত্য পোষণ কেন মারফূ হুকমী হবে না?

কোন নামাযের রাকাত সংখ্যা নির্ধারণ ইজতিহাদের আওতা-বহির্ভূত ব্যাপার। সুতরাং এর পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অবশ্যই ছিল বলতে হবে।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. তাঁর 'আততামহীদ' গ্রন্থে কত সুন্দর লিখেছেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নতুন কিছু করেননি। তিনি তাই করেছেন যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। কিন্তু শুধু এ আশংকায় যে, নিয়মিত জামাতের কারণে তারাবী উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যেতে পারে, জামাতের ব্যবস্থা করে যান নি। হযরত উমর রা. এই বিষয়টি জানতেন। তিনি দেখলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এখন আর এই আশংকা নেই, কেননা ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এবং শরীয়ত নির্ধারণের বিষয়টি চুড়ান্ত হয়ে গেছে। তখন তিনি নবী-পছন্দের অনুসরণ করে ১৪ হি. সনে এক জামাতের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা যেন এই মর্যাদা তাঁর ভাগ্যেই নির্ধারিত রেখেছিলেন। (দ্র. ৮/১০৮,১০৯) ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) তার আস সুনানুস সাগীর গ্রন্থেও অনুরূপ কথা বলেছেন। (দ্র. হা. নং ৮১৭)

লা-মাযহাবী বন্ধুরা কখনও বলেন, বিশ রাকাত তারাবী হযরত উমর রা. থেকে প্রমাণিত নয়। তিনি এগার রাকাতেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার কখনও বলেন, এটা হযরত উমর রা. এর কর্ম, যার পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ছিল না।

হযরত উমর রা. যদি এগারো রাকাতের আদেশই দিয়ে থাকেন, তবে তার আদেশ লংঘন করে কারা কখন থেকে বিশ রাকাত তারাবীর নিয়ম চালু করলো, সেটা তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু কখনোই তারা সেটা প্রমাণ করতে পারবে না।

আর হযরত উমর রা. এর কর্মের পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ছিল না, এটা কেমন কথা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি, আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত তোমরা আকড়ে ধরবে। তিনি কি বলেননি, তোমরা আমার পরে আবূ বকর ও উমরকে অনুসরণ করবে?

২. হযরত আলী রা. এর কর্মপন্থা

২০ রাকাত তারাবীর ক্ষেত্রে হযরত আলী রা. হযরত উমর রা.এর সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছিলেন। আলী রা. থেকে এক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ক. সুলামীর বর্ণনা

আবূ আব্দুর রহমান সুলামী র. হযরত আলী রা. সম্পর্কে বলেন,

دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة

قال: وكان علي يوتر بهم

অর্থ : তিনি রমযানে হাফেজদেরকে ডাকলেন এবং তাদের একজনকে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, আলী রা. নিজে তাদের নিয়ে বেতের পড়তেন। (সুনানে বায়হাকী, ২খ, ৪৯৬,৪৯৭পৃ)

এ হাদীসটির সনদ যঈফ। এতে আতা ইবনুস সাইব রয়েছেন। শেষ জীবনে তার হাদীস ওলোটপালট হয়ে গিয়েছিল। আবার তার শিষ্য হাম্মাদ ইবনে শুআইব এমনিতেও যঈফ, আবার আতা থেকে কখন হাদীস শুনেছেন, শুরুর দিকে না শেষে, তারও কোন বিবরণ নেই। তবে এর সমর্থক একাধিক বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর দ্বারা এটিও শক্তিশালী হয়। একারণেই হয়তো হাফেজ ইবনে তায়মিয়া র. 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে (২/২২৪) ও যাহাবী র. 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে (৫৪২) হাদীসটিকে দলিলরূপে পেশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, হযরত আলী রা. তারাবীর জামাত, রাকাত-সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. এর নীতিই অনুসরণ করেছিলেন।

খ. আবুল হাসনার বর্ণনা

আবুল হাসনা বলেন,

أن عليا أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة

অর্থ: আলী রা. রমযানে জনৈক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছিলেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত পড়তে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৬৩।

ইমাম বায়হাকী রহ.ও এটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর বর্ণনায় বলা হয়েছে−

إن علي بن ابي طالب أمر رجلا أن يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة

অর্থাৎ আলী রা. জনৈক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, লোকদেরকে নিয়ে পাঁচ তারবীহা বিশ রাকাত পড়তে। অতঃপর তিনি বলেছেন: وفي هذا الإسناد ضعف অর্থাৎ এ সনদে একটু দুর্বলতা আছে। (দ্র. হাদীস: ৪২৯২)

ইমাম বায়হাকী উক্ত হাদীসকে কেন যঈফ বলেছেন সেটা চিহ্নিত করতে গিয়ে আলাউদ্দীন তুরকুমানী বলেছেন, الأظهر أن ضعفه من جهة أبي سعد سعيد بن مرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره অর্থাৎ স্পষ্ট এটাই যে, তিনি আবু সাদ সাঈদ ইবনে মারযুবান আল বাক্কালের কারণেই এটাকে যঈফ বলেছেন। ব্যাপার যদি তাই হয়, তবে এক্ষেত্রে বাক্কালের সমর্থক রয়েছে। অর্থাৎ বায়হাকীর বর্ণনায় বাক্কাল হাদীসটি আবুল হাসনা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর ইবনে আবু শায়বার বর্ণনায় আবুল হাসনা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে কায়স। সুতরাং বাক্কাল ও আমর একে অন্যের সমর্থক হচ্ছেন। উল্লেখ্য, মুযাফফর বিন মুহসিন তুরকুমানীর বক্তব্যের অনুবাদ করেছেন এভাবে− 'স্পষ্ট যে, আবূ সাঈদ ইবনে মারযুবানের কারণেই হাদীছটি যঈফ। কারণ সে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত। সে যদি এমনটিই হয় তাহলে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এ কথারই অনুসরণ করেছেন।' অনুবাদ থেকে লেখকের এলেমের দৌড় সহজেই বোঝা যায়। এরপর তিনি আলবানীর অনুসরণে বলেছেন, তাছাড়া আবুল হাসানা ও আলী রা.এর মাঝে আরো দুজন রাবী রয়েছে, যা সনদে উল্লেখ নেই। এটা আলবানী ও উক্ত লেখকের ভুল। সনদে একজন রাবীও বাদ পড়ে নি। তারা মূলত মীযান ও তাকরীব গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখকৃত আবুল হাসনাকে এই আবুল হাসনা মনে করে জটিলতায় পড়েছেন। যার বিবরণ একটু পরেই আসছে।

তাছাড়া বায়হাকী রহ. এ বর্ণনা দুটি পেশ করার পূর্বে আবুল খাসীব থেকে বর্ণনা করেছেন, রমজান মাসে সুওয়াইদ ইবনে গাফালা ইমামত করতেন এবং পাঁচ তারবীহা বিশ রাকাত পড়তেন। এরপর বায়হাকী রহ. বলেছেন,

وَرُوِّينَا عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ. وَفِي ذَلِكَ قُوَّةٌ لِمَا ...

অর্থাৎ আলী রা.এর শিষ্য শুতায়র ইবনে শাকাল থেকেও আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে, রমযান মাসে তিনি বিশ রাকাত পড়াতেন এবং তিন রাকাত বেতের পড়তেন। এ দুটি বর্ণনা সামনের (সুলামী ও আবুল হাসনার) বর্ণনাদুটিকে শক্তি জোগায়।

সুতরাং লা মাযহাবী বন্ধুদের এতটুকু বলে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয় যে, বায়হাকী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আবুল খাসীবকে ইবনে হিব্বান বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী কাশিফ গ্রন্থে বলেন, وثق অর্থাৎ তাকে বিশ্বস্ত বলা হয়েছে। ইবনে হাজার তাকরীব গ্রন্থে বলেছেন, মাকবূল অর্থাৎ গ্রহণ করার মতো।

এরপর তারা লিখেছেন, আল্লামা আলবানী র. বলেন, এতে আবুল হাসানা ক্রটিযুক্ত। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী র. লিখেছেন, সে কে তা জানা যায়নি। হাফেজ র. বলেছেন, সে অজ্ঞাত। আবুল হাসানা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত। মিযানুল ই'তিদাল ১ম খণ্ড, যয়ীফ সুনানুল কুবরা ২য় খণ্ড, বায়হাকী।

এ হলো আলবানীর অন্ধ অনুসারীদের শেষ সম্বল। আলবানী ভুল করেছেন তো তারাও ভুল করেছেন। একই ভুল করেছেন মোবারকপুরীও। আসলে যাহাবী ও হাফেজ ইবনে হাজার র. যে আবুল হাসনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি আর এই আবুল হাসনা দুই ব্যক্তি। ইনি হযরত আলী রা.এর শাগরিদ আর উনি হযরত আলী রা. এর ছাত্রের ছাত্র হাকাম ইবনে উতায়বার শাগরিদ। এই আবুল হাসনার ছাত্র আমর ইবনে কায়স ও আবু সাদ আল বাক্কাল, আর ঐ আবুল হাসনার ছাত্র শারীক নাখায়ী। ঐ আবুল

হাসনাকে ইবনে হাজার র. 'তাকরীবে' ৭ম স্তরের বলে উল্লেখ করেছেন। আর এই আবুল হাসনার ছাত্র আবূ সাদ বাক্কালকে ৫ম স্তরের উল্লেখ করেছেন। তাহলে তার উস্তাদ আবুল হাসনা অবশ্যই ৩য় বা ৪র্থ স্তরের হয়ে থাকবেন। সুতরাং দুজন এক ব্যক্তি হয় কিভাবে? তাছাড়া ইবনে হাজার র. তাকরীবের ভূমিকায় লিখেছেন, যে ব্যক্তি থেকে শুধু একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর কেউ তাকে ছিকাহ বা বিশ্বস্ত বলেননি তাকেই আমি মাজহুল বা অজ্ঞাত বলে পরিচয় দেব। তার এ কথার আলোকেও বোঝা যায়, এই আবুল হাসনাকে তিনি মাজহুল বা অজ্ঞাত বলেননি। কারণ তার থেকে দুজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

জালিয়াতি কেন?

যাহোক, এতটুকু তো ছিল ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু এর পরে তারা হাফেজ ইবনে হাজার র. এর বক্তব্য হিসেবে একথা লিখেছেন, আবুল হাসানা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যাত. এটা নিঃসন্দেহে জালিয়াতি। হাফেজ ইবনে হাজার একথা বলেননি।

আমাদের আলোচ্য আবুল হাসনাকে মাসতূর বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যার একাধিক বর্ণনাকারী ছাত্র আছে, কিন্তু তার ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে সুনাম বর্ণিত হয়নি। মাসতূরের বর্ণনা অনেকেই নিঃশর্তে গ্রহণ করেছেন। এর জন্য 'আর রাফউ ওয়াত তাকমীলে'র পরিশিষ্ট দেখা যেতে পারে। কেউ কেউ শর্ত আরোপ করেছেন সমর্থক বর্ণনাকারীর। অর্থাৎ তার সমর্থনে যদি অন্য কোন ব্যক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। এখানে তাও পাওয়া যাচ্ছে। আবুল হাসনার মতো আবূ আব্দুর রহমান সুলামীও হযরত আলী রা. থেকে একই কথা উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতিটি 'শারহুন নুখবা'য়ও বিধৃত হয়েছে। হযরত আলী রা. যে বিশ রাকাত তারাবী শিক্ষা দিয়েছেন, তা এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র শুতাইর ইবনে শাকাল, আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা, সাঈদ ইবনে আবূল হাসান, সুয়াইদ ইবনে গাফালা ও আলী ইবনে রাবীআ প্রমুখ বিশ রাকাত তারাবী পড়াতেন ও পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, সুনানে বায়হাকী, ২/৪৯৮; কিয়ামুল লাইল লি ইবনে নাসর, পৃ২০০-২০২)।

বিভিন্ন শহরে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলঃ

ক. মক্কা শরীফের আমলঃ

সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে মদীনা শরীফে যেমন বিশ রাকাত তারাবী পড়া হতো, মক্কা শরীফেও তেমনি বিশ রাকাতই পড়া হতো। আতা ইবনে আবূ রাবাহ[১] (মৃত্যু ১১৪ হি)- যিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন এবং বহু সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎলাভে ধন্য ছিলেন, মক্কা শরীফেই তার নিবাস ছিল- বলেছেন,

أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر

অর্থাৎ আমি লোকদেরকে (সাহাবা ও প্রথম সারির তাবেয়ীদেরকে) পেয়েছি তারা বেতের সহ ২৩ রাকাত পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৭৭৭০।)

এমনি ভাবে ইবনে আবী মুলাইকা র.[২] মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সেখানকার কাজি (বিচারক) ও মুয়াজ্জিন ছিলেন। ১১৭ হি. সনে তার ওফাত হয়। তার সম্পর্কে নাফে' ইবনে উমর বলেন,

كان يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة

অর্থাৎ আমাদেরকে নিয়ে তিনি বিশ রাকাত পড়তেন।

ইমাম শাফেয়ী র.ও মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ২০২ হি. সালে তাঁর ওফাত হয়। তিনি বলেছেন, هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين অর্থাৎ অনুরূপ ভাবে

আমি আমাদের শহর মক্কা শরীফে পেয়েছি,তারা বিশ রাকাত নামায পড়তেন। (তিরমিযী শরীফ)

---

[১] মুযাফফর বিন মুহসিন তাকে আতা ইবনে আবুস সাইব ভেবে এ বর্ণনাটিকেও যঈফ ও মুনকার আখ্যা দিয়েছেন। এটা তার ভুল।

[২] তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা। ইনিই উল্লিখিত নাফি'এর উস্তাদ। বুখারী-মুসলিমের রাবী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। অথচ মুযাফফর বিন মুহসিন তার নাম আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ধরে যত খারাপ সমালোচনা আছে, সব এখানে উল্লেখ করে দিয়েছেন। এহলো আহলে হাদীসের হাদীসচর্চা!!

ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব

ইমাম শাফেয়ী র.ও যেহেতু বিশ রাকাত তারাবীকে অবলম্বন করেছেন[১], তাই তাঁর অনুসারীরা মক্কা ও অন্যান্য স্থানে বিশ রাকাতের উপরই আমল করতেন। মক্কার হারাম শরীফে চালু হওয়া এ আমল আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

মদীনা শরীফের আমল

সাহাবী যুগের শেষ দিকে মদীনাবাসীগণ যখন দেখলেন মক্কাবাসীগণ বিশ রাকাত তারাবী পড়েন বটে, কিন্তু তারা প্রত্যেক তারবীহার (বিশ্রামের জন্য বিরতি) সময় তওয়াফ করে অতিরিক্ত ফায়দা লাভ করছেন তখন থেকে তারা সেখানে প্রত্যেক তারবীহার সময় চার রাকাত বাড়িয়ে পড়তে লাগলেন। এভাবে সেখানে ২০+১৬=৩৬ রাকাত পড়ার প্রচলন হতে থাকে। কেউ আরো দু'রাকাত যোগ করে ৩৮ রাকাত পড়তে থাকেন। এভাবে তিন রাকাত বেতেরসহ তাদের ৩৯ বা ৪১ রাকাত হতো।

ইমাম মালেক র. মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ১৭৯ হি. সনে তার ওফাত হয়। তিনি বলেছেন, হাররার ঘটনার (যা ৬৩ হি সনে ঘটেছিল) পূর্ব থেকে একশো বছরের অধিক সময় জুড়ে মদীনা শরীফে ৩৮ রাকাত

---

[১] ইমাম শাফেঈ যে ২০ রাকআত তারাবী পছন্দ করতেন, তা তিনি নিজেই কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (দ্র. ১/১৪২) তিনি বলেছেন, وَرَأَيْتهمْ بِالْمَدِينَةِ يَقُومُونَ بِتِسْعٍ وَثَلاَثِينَ وَأَحَبُّ إلى عِشْرُونَ لأَنَّهُ روى عن عُمَرَ وَكَذَلِكَ يَقُومُونَ بِمَكَّةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ অর্থাৎ মদীনাবাসীদেরকে আমি দেখেছি ৩৬ রাকাত তারাবী পড়তে। আমার নিকট পছন্দনীয় হলো ২০ রাকাত। কারণ এটাই উমর রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে। এভাবে মক্কাবাসীগণ তারাবী পড়েন এবং তিন রাকআত বেতের পড়েন।

ইমাম শাফেঈর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম মুযানী রহ.ও তার মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফেঈ বলেছেন, وأحب إليّ عشرون আমার নিকট ২০ রাকআতই পছন্দনীয়। ইমাম বায়হাকীসহ ফিকহে শাফেঈর সকল গ্রন্থকার একই কথা লিখেছেন। সুতরাং মুযাফফর বিন মুহসিন এটা অস্বীকার করলে দ্বিপ্রহরের সূর্যকে অস্বীকার করার মতোই হবে।

তারাবী পড়া হতে থাকে। সালেহ মাওলাত তাওয়ামা র. (তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন) এর বর্ণনাও অনুরূপ।

মুআয আবূ হালীমা রা. সাহাবী ছিলেন এবং তিনি হাররার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন। তার সম্পর্কে ইবনে সীরীন র. সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ৪১ রাকাত তারাবী পড়াতেন। এ তিনটি বর্ণনা 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থেও বিধৃত হয়েছে। (দ্র, ২খ, ৭২পৃ)

নাফে র. ছিলেন হযরত ইবনে উমর রা. এর আযাদকৃত দাস। হযরত আয়েশা রা., আবূ হুরায়রা রা. ও আবূ রাফে রা. প্রমুখেরও ছাত্র ছিলেন তিনি। ১১৭ হি সনে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর বর্ণনা হলো, আমি লোকদেরকে ৩৬ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বেতের পড়তে দেখেছি ও পেয়েছি। (দ্র, প্রাগুক্ত, ২/৭৩)

দাউদ ইবনে কায়স র. বলেন, আমি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. (মৃত্যু ১০১হি) ও আবান ইবনে উসমান র. (মৃত্যু ১০৫ হি, ইনি হযরত উসমান রা. এর ছেলে ছিলেন) এর আমলে মদীনাবাসীকে ৩৬ রাকাত পড়তে দেখেছি। (দ্র, কিয়ামুল লায়ল, পৃ ৯১)।

তিনি এও বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. হাফেজদেরকে ৩৬ রাকাত পড়াতে হুকুম দিতেন। (প্রাগুক্ত, পৃ ৯০)

ইমাম মালেকের মাযহাব

ইমাম মালেক র. এর এ ব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায়। ২০ রাকাত ও ৩৬ রাকাত । মদীনা মিশর স্পেনসহ বিভিন্ন শহরে তার অনুসারীরা ২০ বা ৩৬ রাকাত তারাবী পড়তে থাকেন। ইমাম শাফেঈর ওফাত হয় ২০২ হি. সনে। তাঁর দুজন ছাত্র মুযানী ও যাআফরানী তাঁর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, ورأيتهم يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين অর্থাৎ আমি মদীনাবাসীকে বেতেরসহ ৩৯ রাকাত ও মক্কাবাসীকে ২৩ রাকাত পড়তে দেখেছি। (দ্র. মুখতাসারুল মুযানী ও ফাতহুল বারী) বোঝা গেল, তাঁর যুগে মদীনায় ৩৬ রাকাত তারাবী পড়া হতো। এমনিভাবে ইমাম তিরমিযী (মৃত্যু ২৭৯ হি) এর যুগেও মদীনায় ৩৬ রাকাতই পড়া হতো। (দ্র, তিরমিযী শরীফ)

শায়খ আতিয়া সালেম লেখেন,

مضت المأة الثانية والتراويح ست وثلاثون وثلاث وتر ودخلت المأة الثالثة وكان المظنون أن تظل على ما هي عليه تسع وثلاثون بما فيه الوتر

অর্থাৎ মদীনায় ২য় হিজরী শতকে তারাবী ৩৬ রাকাত ও বেতের তিন রাকাত পড়া হতো। তৃতীয় শতকেও তাই হয়ে থাকবে। (আততারাবী আকছার মিন আলফি আম, পৃ ৪১)

হিজরী ৪র্থ শতকে মদীনার এ আমল পরিবর্তিত হয়ে বিশ রাকাতে এসে পৌঁছেছে। শায়খ আতিয়া লেখেন,

عادت التراويح في تلك الفترة كلها إلى عشرين ركعة فقط بدلا من ست وثلاثين في السابق

অর্থাৎ এ সময়ে পূর্বের ৩৬ রাকাতের পরিবর্তে তারাবী বিশ রাকাতে ফিরে আসে। (প্রাগুক্ত পৃ, ৪২)

তখন থেকে আজ পর্যন্ত মদীনার মসজিদে নববীতে ২০ তারাবী অব্যাহত রয়েছে। এ পরিবর্তনের কারণ এ হতে পারে যে, ইমাম মালেক রহ.এর দৃষ্টিতেও তারাবী মূলত ২০ রাকাতই সুন্নত। কিন্তু যেহেতু মক্কাবাসীদের প্রত্যেক তারবীহায় (চার রাকাত পরবর্তী বিশ্রামের সময়) একটি করে তওয়াফ করার সুযোগ গ্রহণের কারণে মদীনাবাসীরাও চার রাকাত করে পড়ার নিয়ম চালু করে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত নিয়ম চালু থাকে। তাই তিনি তা ভাঙতে চাননি। ইবনে রুশদ তার বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে লিখেছেন, وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ইবনুল কাসিম (ইমাম মালেকের বিশিষ্ট ছাত্র ও তার ফিকহের প্রথম সংকলক) ইমাম মালেক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ৩৬ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বেতের পছন্দ করতেন।

ইবনুল কাসেম রহ. আরো বলেছেন যে, আমি নিজেই ইমাম মালেককে বলতে শুনেছি যে, (খলীফা) জাফর ইবনে সুলায়মান আমার নিকট লোক মারফত জানতে চেয়েছিলেন যে, তারাবীর রাকাত-সংখ্যা কমিয়ে দেব কি না? আমি তাকে নিষেধ করলাম। মালেক রহ.কে পরে

জিজ্ঞেস করা হলো– রাকাত সংখ্যা কমানো কি মাকরূহ বা অপছন্দনীয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ মানুষ এভাবে তারাবী পড়ে আসছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তারাবী কত রাকাত? বললেন, বেতেরসহ ৩৯ রাকাত। (দ্র. কিয়ামুল লাইল, পৃ. ৯২)

ইমাম মালেক রহ. যে মূলত ২০ রাকাত তারাবীকেই সুন্নত মনে করতেন তার ইংগিত তাঁর মুয়াত্তা থেকেও পাওয়া যায়। কারণ তিনি ১১ রাকাতের বর্ণনা উল্লেখ করার পর ২০ রাকাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তেমনি মালেকী ফিকহের অনেক কিতাবেই ২০ রাকাতকেই তাঁর মাযহাব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল আনওয়ারুস সাতি'আহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, وتتأكد صلاة التراويح في رمضان وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء অর্থাৎ রমযান মাসে তারাবীর নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এই নামায এশার পর বিশ রাকাত। (দ্র. আওজাযুল মাসালিক, ১/৩৯৭) এমনিভাবে আহমাদ আদ দারদের 'আশ শারহুল কাবীরে' (১/৩১৫) বলেছেন, وهي ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه عمل الصحابة والتابعين ثم جعلت في زمن عمر بن عبد العزيز ستا وثلاثين بغير الشفع والوتر لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا هو الأول অর্থাৎ তারাবী ২৩ রাকাত, বেতের তিন রাকাতসহ। সাহাবী ও তাবেঈগণের আমল এমনই ছিল। পরবর্তীকালে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর যুগে পরের তিন রাকাত ছাড়াই ৩৬ রাকাত নির্ধারণ করা হয়। তবে সালাফ ও খালাফ, পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের আমল ছিল প্রথমটিই (অর্থাৎ বিশ রাকাত)।

আবু যায়দ কায়রাওয়ানীও তার আছ ছামারুদ দানী গ্রন্থে ২০ রাকাতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালেকের সরাসরি ছাত্র ও তার মাযহাবের সংকলকদের এসব স্পষ্ট উদ্ধৃতি ও বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে যারা বলবেন, তাঁর মত ছিল ১১ রাকাত, তাদের বিবেকের উপর ক্রন্দন করা ছাড়া করার কিছুই নেই।

উল্লেখ্য, আলবানী ও মোবারকপুরী দুজনই ইমাম মালেক র. এর এগারো রাকাতের একটি মতও উল্লেখ করেছেন। এ মতটি ভুয়া । ইমাম

মালেকের কোন ছাত্র বা তাঁর মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে এ মতটি বর্ণিত হয়নি। জূরী নামক শাফেয়ী মাযহাবের জনৈক ব্যক্তি এ মতটির কথা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যক্তির জন্ম ইমাম মালেকের কয়েকশ বছর পরে।[১]

খ. কূফাবাসীর আমল:

কূফাবাসীর আমলও মক্কা ও মদীনাবাসী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমল থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। কূফা ছিল হযরত আলী রা. এর দারুল খেলাফত বা রাজধানী। তিনিই তো বিশ রাকাত পড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কূফায় বসবাস করতেন। তিনিও বিশ রাকাত পড়তেন। (কিয়ামুল লাইল, পৃ, ৯১)

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. ছিলেন শীর্ষ তাবেয়ী। হযরত উমর, ইবনে মাসউদ ও হুযায়ফা রা. প্রমুখ বড় বড় সাহাবীগণের সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। ৭৫ হি সনে তার ওফাত হয়। তিনি চল্লিশ রাকাত তারাবী পড়তেন। সুয়াইদ ইবনে গাফালা ছিলেন হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখের শীর্ষ ছাত্র । তিনি বিশ রাকাত পড়াতেন। বায়হাকী, ২/৪৯৬। হযরত আলী রা. এর শিষ্য হারেছ[২]ও বিশ রাকাত পড়াতেন।

---

[১] মুযাফফর বিন মুহসিন এই জুরীর নাম লিখেছেন মুহাদ্দিছ আবু মানসুর আল জুরী। (মৃত্যু ৪৬৯ হি:) অথচ এই জুরী হলেন হানাফী। আর আলবানী সাহেব যে জুরীর কথা বলেছেন তার সম্পর্কে সুয়ূতী বলেছেন, তিনি শাফিঈ। তার ওফাত-সন সম্পর্কে জানা যায় না।

[২] মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বা, ৭৭৬৭। হারেছ থেকে বর্ণনা করেছেন আবু ইসহাক সাবিঈ রহ.। তাঁরা দুজনই ছিলেন খুবই পরিচিত। আবু ইসহাক তো সিহাহ সিত্তার রাবী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আর হারিছ হলেন ইবনে আব্দুল্লাহ আল আ'ওয়ার। তার হাদীস সুনান চতুষ্টয়ে বিধৃত হয়েছে। হযরত আলী রা.এর বিশিষ্ট শিষ্য। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে তেমন নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। অবশ্য ইমাম তিরমিযী তার একাধিক বর্ণনাকে হাসান বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তাকরীবে বলেছেন, في حديثه ضعف তার হাদীসে দুর্বলতা আছে। এখানে তার হাদীস বর্ণনার কোন ব্যাপার নয়। বরং আবু ইসহাক বলেছেন, তাকে তিনি বিশ রাকাত পড়তে দেখেছেন। তিনি যেহেতু দীর্ঘ দিন হযরত আলী রা.এর সংসর্গ লাভ করেছেন, তাই তার এ আমল থেকেও বোঝা যায়, আলী রা.ও বিশ রাকাত পড়তেন। মুযাফফর বিন মুহসিন হারেছকে চিনতে না পেরে বলেছেন, হারিছের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলী ইবনে রাবীআ ছিলেন হযরত আলী ও সালমান ফারসী রা. এর সাহচর্য ধন্য[১]। তিনিও বিশ রাকাত পড়াতেন । সাঈদ ইবনে জুবায়ের ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস রা. সহ বহু সাহাবীর শিষ্য। তিনিও বিশ রাকাতের বেশী তারাবী পড়তেন। ৯৫ হি সনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সুফিয়ান ছাওরী (মৃত্যু ১৬১ হিজরী) ছিলেন কূফার বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ, সিহাহ সিত্তায় তার সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বুখারী র. এর উস্তাদের উস্তাদ ছিলেন। তিনিও বিশ রাকাত তারাবীর পক্ষে। ইমাম আবূ হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হি) বিশ রাকাত তারাবীকে সুন্নত বলার পর তার অনুসারীরা কূফা ও অন্যান্য শহরে বিশ রাকাতই তারাবী পড়তে থাকেন। বৃটিশ আমলে এই আহলে হাদীস ফেরকার উদ্ভবের পূর্বে উপমহাদেশের সর্বত্র বিশ রাকাত তারাবীই পড়া হতো।

ইমাম আবু হানীফার মাযহাব

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফার এ মতটি হানাফী ফিকহের সকল কিতাবেই বিদ্যমান আছে। তার সরাসরি ছাত্র হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনায়ও এটি উদ্ধৃত হয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন,

إنها سنة يصلون في مسجدهم خمس ترويحات ويؤمهم رجل ويسلم في كل ركعتين

অর্থাৎ তারাবী পড়া সুন্নত। নিজেদের মসজিদে বিশ রাকাত পড়বে। পুরুষ ইমামতি করবে। প্রতি দুরাকাতে সালাম ফিরাবে। (দ্র. খুলাসাতুল

আর ভিন্ন এক আবু ইসহাক সম্পর্কে করা মন্তব্য এই আবু ইসহাকের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন!!

[১] আলী ইবনে রাবীআ ও তার ছাত্র সাঈদ ইবনে উবায়দ আত তায়ী দুজনই বুখারী শরীফের রাবী ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। মুযাফফর বিন মুহসিন তাদেরকে চিনতে না পেরে একই নামের ভিন্ন দুজনের সমালোচনা এ দুজনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি আবুল বাখতারীর ক্ষেত্রে। তিনি বিশ্বস্ত ও সিহাহ সিত্তার রাবী। অন্য এক আবুল বাখতারী সম্পর্কে করা সমালোচনা তিনি এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন।

ফাতাওয়া, ১/৬৩) এছাড়া ইমাম তাহাবী ও তার ইখতিলাফুল আইম্মাহ গ্রন্থে বলেছেন, قال أصحابنا والشافعي يقومون بعشرين ركعة سوى الوتر وقال مالك بتسع وثلاثين ركعة بالوتر অর্থাৎ আমাদের ইমামগণ ও শাফেঈ বলেছেন, বেতের ব্যতীত বিশ রাকাত। আর মালেক বলেছেন, বেতেরসহ উনচল্লিশ রাকাত। (মুখতাসার, নং ২৭১)

গ.বসরা বাসীর আমল:

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে ইরাকের বসরা নগরী ইলম ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগামী ছিল। সেখানেও কেউ বিশ রাকাতের কম তারাবী পড়তেন না। আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা, সাঈদ ইবনে আবুল হাসান ও ইমরান আবদী ৮৩ হিজরীর পূর্বে বসরার জামে মসজিদে বিশ রাকাত তারাবী পড়াতেন। (কিয়ামুল লাইল, পৃ ৯২)

যুরারা ইবনে আবূ আওফা (মৃত্যু ৯৩ হি) শীর্ষ তাবেয়ী ছিলেন। তিনিও বিশ রাকাতের বেশী তারাবী পড়াতেন। (প্রাগুক্ত)

ঘ. বাগদাদ বাসীর আমল:

ইমাম আহমাদের মাযহাব

বাগদাদে ইমাম আহমাদ র. (মৃত্যু ২৪১ হি) বিশ রাকাত তারাবীকে সুন্নত বলেছেন।[১] ফলে তার অনুসারীরা বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে বিশ রাকাত তারাবী আদায় করতেন। হাম্বলী মাযহাবের সকল কিতাবে বিশ

---

[১] ইমাম আহমাদের এ মতটি হাম্বলী ফিকহের সকল কিতাবেই লেখা আছে। হাম্বলী ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাব আল ইকনাতে বলা হয়েছে, التراويح عشرون ركعة في رمضان يجهر فيها القراءة وفعلها جماعة أفضل ولا ينقص منها ولا بأس بالزيادة نصا. (ص ١٤٧) অর্থাৎ রমযানে তারাবী বিশ রাকাত। এতে সরবে কিরাআত পড়তে হবে। এটা জামাতে পড়া উত্তম। এ সংখ্যার চেয়ে কম পড়বে না। বেশী পড়তে দোষ নেই। ইমাম আহমদ একথা স্পষ্ট বলেছেন। (পৃ. ১৪৭) আরেকটি কিতাবের বরাত ৪৩৭ পৃষ্ঠার টীকায় খ নম্বরে আসছে।

রাকাত তারাবীকে সুন্নত বলা হয়েছে। দাউদ জাহিরীও ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। তিনিও ছিলেন বিশ রাকাত তারাবীর পক্ষে।

এমনিভাবে মার্ভের অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক র. (মৃত্যু ১৮১ হি) বিশ রাকাত কে অবলম্বন করেছেন। ইসহাক ইবনে রাহাওয়ায়হ র. ৪১ রাকাতকে অবলম্বন করেছেন।

হাফেজ ইবনে তায়মিয়ার মত :

ইবনে তায়মিয়া র. এর মতেও বর্তমানে ২০ রাকাত পড়াই উত্তম। তিনি বলেছেন,

والأفضل يختلف بإختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم إحتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك

অর্থাৎ তারাবী কত রাকাত পড়া উত্তম তা নির্ভর করবে মুসল্লীদের ধৈর্য্য-শৈর্য্যের উপর। তারা যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়, তবে ১০ রাকাত ও পরে তিন রাকাত পড়া - যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গায়রে রমযানে নিজের জন্য অবলম্বন করেছিলেন- উত্তম হবে। আর যদি তারা এর সামর্থ না রাখে তবে বিশ রাকাত পড়াই উত্তম হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এ অনুযায়ীই আমল করে আসছে। কারণ এটা ১০ ও ৪০ এর মাঝামাঝি। যদি কেউ ৪০ রাকাত বা তার কমবেশি পড়তে চায় তবে সেটাও জায়েয। এর কোনটাই মাকরূহ বা অপছন্দনীয় নয়। মাজমূউল ফাতাওয়া, ২২/২৭২।

বর্তমানে মানুষের শক্তি ও সামর্থের কথা সকলের জানা । তাই ইবনে তায়মিয়ার মতেও বর্তমানে বিশ রাকাত পড়াই উত্তম। আরেকটি কথাও তিনি স্পষ্ট করেছেন, চল্লিশ বা অন্য যে কোন সংখ্যায় তারাবী পড়া হোক না কেন, তা মাকরূহ হবে না, বরং জায়েযই হবে। অথচ আলবানী সাহেব

বলেছেন, জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত পাঁচ রাকাত পড়া যেমন, এগারো রাকাতের বেশী তারাবী পড়াও ঠিক তেমন।এমন দুঃসাহসিক কথা আলবানী ছাড়া কে বলতে পারবে? আমাদের জানামতো সমগ্র পৃথিবীর আলেমদের কেউই এমন কথা বলেননি।

এমনকি লা-মাযহাবী আলেমদের মুরুব্বী মাওলানা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও স্পষ্ট বলেছেন, বিশ রাকাতের ভেতর যেহেতু এগারো রাকাতও অন্তর্ভূক্ত, তাই বিশ রাকাত আদায়কারীও সুন্নত অনুযায়ী আমলকারী বলে বিবেচিত হবে। (দ্র, 'আল ইন্তিকাদু'র রাজীহ, পৃ ১৩৮)

আট রাকাতের দলিল : কিছু পর্যালোচনা

আট রাকাতের পক্ষে তিনটি দলিল পেশ করা হয়:

১নং দলিল: হযরত আবূ সালামা র. হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নামায কিরূপ হতো? তিনি বললেন, রমযান ও গায়র রমযানে তিনি এগানো রাকাতের বেশী পড়তেন না। তিনি চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপর চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না। এর পর তিন রাকাত পড়তেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে বেতের পড়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন? তিনি বললেন, আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় বটে, তবে আমার কল্‌ব জাগ্রত থাকে। (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীসটি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। কিন্তু আসলে এ হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবী সম্পর্কে নয়। এটিকে তারাবী সম্পর্কে মনে করা ভুল। কারণ:

ক. এ হাদীসে সেই নামাযের কথা বলা হয়েছে যা রমযান ও অন্য সময় পড়া হতো, অথচ তারাবী রমযান ছাড়া অন্য সময় পড়া হয় না।

খ. এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা ঘরে একাকী পড়তেন। অথচ তারাবী জামাতের সঙ্গে মসজিদে পড়া হয়।

গ. এখানে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। পরে ঘুম

থেকে উঠে বেতের পড়তেন। অথচ তারাবীতে নামায শেষ করে বেতের পড়া হয়। তাছাড়া এখানে যে বেতের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা তিনি একাকী পড়তেন। অথচ তারাবীতে বেতের জামাতে পড়া হয়।

ঘ. এই নামায চার রাকাত, চার রাকাত ও তিন রাকাত পড়া হয়েছিল। লা-মাযহাবী আলেম মোবারকপুরী তার তিরমিযী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন, চার রাকাত এক সালামে পড়া হয়েছিল, এমনিভাবে তিন রাকাতও এক সালামে। অথচ তারাবী দুরাকাত করে পড়া হয়।

ঙ. এই নামায যদি তারাবী সম্পর্কে হতো, তবে ফকীহগণের কেউ না কেউ এগারো রাকাতের মত পোষণ করতেন। অথচ তাদের কেউই অনুরূপ মত পোষণ করেননি।

বোঝা যায়, ফকীহগণের কেউই এই হাদীসকে তারাবীর ক্ষেত্রে মনে করেননি। অথচ ইমাম তিরমিযী র. জানায়েয অধ্যায়ে লিখেছেন,

كذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث

অর্থাৎ ফকীহগণ অনুরূপ বলেছেন, আর হাদীসের মর্ম সম্পর্কে তারাই অধিক জ্ঞাত।

চ. মুহাদ্দিসগণও এই হাদীসকে তারাবীর ক্ষেত্রে নয়, তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রেই মনে করতেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম মালেক, আব্দুর রাযযাক, দারিমী, আবূ আওয়ানা ও ইবনে খুযায়মা র. প্রমুখ সকলেই এই হাদীসকে তাহাজ্জুদ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন; তারাবী বা কিয়ামে রামাযান অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি।

এমনকি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী র. তার 'কিয়ামুল লাইল' গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب عدد الركعات التي يقوم بها الإمام للناس في رمضان

অর্থাৎ অনুচ্ছেদ: রমযানে লোকদেরকে নিয়ে ইমাম যে নামায পড়বেন তার রাকাত-সংখ্যা। উক্ত অনুচ্ছেদে তিনি তারাবীর রাকাত-সংখ্যা সম্পর্কে বহু হাদীস উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত আয়েশা রা. এর এ হাদীস উচ্চ মানের সহীহ হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখ করা তো দূরের কথা, এর প্রতি কোন ইশারা-ইংগিতও করেননি। এতে বোঝা যায়, তাঁর গবেষণায়ও এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে নয়, তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শুধু ইমাম বুখারী র. এ হাদীস তারাবী ও তাহাজ্জুদ উভয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর নীতি সকলের জানা। তিনি সামান্য সম্পর্কের কারণেই হাদীস পুনরুল্লেখ করেন। তিনি একথাও বুঝিয়ে থাকতে পারেন, রমযানে তারাবী পড়া হলেও শেষে তাহাজ্জুদও পড়ে নেয়া উচিৎ । বুখারী র. নিজেও তারাবী পড়ে শেষরাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। ফাতহুল বারীর মুকাদ্দিমা, পৃ ৬৪৫।

ছ. এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে হলে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বিশ রাকাত পড়া আদৌ সম্ভব ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর সুন্নত ও আদর্শের প্রতি তাঁদের চেয়ে অধিক মহব্বত আর কারো হতে পারে না।

জ. খোদ হযরত আয়েশা রা.ও মনে করতেননা এই হাদীস তারাবী সম্পর্কে। অন্যথায় তাঁর চোখের সামনে ৪০টি বছর মসজিদে নববীতে তাঁরই হুজরার পাশে এভাবে সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা হবে, আর তিনি প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকবেন- তা হতে পারে না।

ঝ. এ হাদীস তারাবী সম্পর্কে হলে লা-মাযহাবী আলেম শাওকানী সাহেব ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান কেন বলবেন: তারাবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই?

শাওকানী বলেছেন,

فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به سنة

অর্থাৎ তারাবী নামাযকে বিশেষ সংখ্যায় ও বিশেষ কেরাতে আবদ্ধ করার ব্যাপারে কোন হাদীস আসেনি। দ্র, নায়লুল আওতার।

নওয়াব সাহেব তো আরো স্পষ্ট করে বলেছেন,

ان صلاة التراويح سنة بأصلها ثبت أنه عليه السلام صلاها في ليالي ثم ترك شفقة على الأمة أن لا تجب على العامة أو يحسبوها واجبة ولم يأت تعيين العدد في الروايات الصحيحة المرفوعة

অর্থাৎ তারাবী মূলতঃ সুন্নত। একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক রাত এটি পড়েছিলেন। অতঃপর

উম্মতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি এটি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আশংকা ছিল সাধারণের উপর এটি ফরজ হয়ে যায় কি না, কিংবা তারাই এটিকে ফরজ মনে করে বসে কি না। তবে এর নির্দিষ্ট সংখ্যা কোন সহীহ মারফূ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। দ্র, আল ইনতিকাদুর রাজীহ, পৃ,৬১

সুবকী র.ও তার 'শারহুল মিনহাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,

اعلم أنه لم ينقل كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي هل هو عشرون أو أقل

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাতগুলোতে বিশ রাকাত না তার কম পড়েছিলেন সে কথা বর্ণিত হয়নি। দ্র, আল মাসাবীহ, পৃ ৪৪

আল্লামা ইবনে তায়মিয়াও প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد معين موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনে করবে রমযানে তারাবীর রাকাত সংখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, এতে বাড়ানো কমানো যাবে না, সে ভুল করবে। (দ্র. মাজমাউল ফাতাওয়া, ২২/২৭২)

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, এ চারজন মনীষীর দৃষ্টিতেও হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসটি তাহাজ্জুদ সম্পর্কে, তারাবী সম্পর্কে নয়।[১] ইবনে

---

[১] তারা বলেন, তারাবী ও তাহাজ্জুদ একই নামায। সারা বছর যা তাহাজ্জুদ হিসাবে শেষ রাতে পড়া হয়, সেটাই রমযান মাসে শুরু রাতে তারাবী নামে পড়া হয়। কিন্তু তাদের একথা আদৌ ঠিক নয়। তার কারণ, দুটি নামাযের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন, ক. তাহাজ্জুদের বিধান এসেছে কুরআন কারীমে, আর তারাবী সুন্নত হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নবীজী সা. বলেছেন, سننت لكم قيامه এটি সুন্নত করেছি আমি। (নাসাঈ শরীফ)

খ. শুধু হানাফী ফিকহের কিতাবে নয়, অন্যান্য ফিকহের কিতাবসমূহেও দুটি নামাযকে ভিন্ন ভিন্ন ধরা হয়েছে। হাম্বালী ফিকহের কিতাব আল মুকনিতে বলা হয়েছে,

তায়মিয়া র. যে ভুলের প্রতি ইংগিত দিয়েছেন আলবানী সাহেব সেই ভুলেই পতিত হয়েছেন।

আমরা অবশ্য বলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন-মেজায, রুচি-প্রকৃতি, আমল ও কর্ম সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম সবচেয়ে ভাল জানতেন।

সুন্নতের প্রতি তাঁদের আসক্তি, সুন্নতকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা সকলেরই জানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশই শুধু নয়, তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন তাঁদের জীবনের বড় লক্ষ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন আরো অগ্রগামী। হযরত উমর রা. সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে নবী হওয়ার সুযোগ থাকলে উমরই হতো।

ثم التراويح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده (١/١٨٤) অর্থাৎ তারাবী বিশ রাকাত। রমযানে তা জামাতে আদায় করবে, এরপর বেতেরও জামাতের সাথে পড়বে। কিন্তু যদি তাহাজ্জুদ পড়ার ইচ্ছা থাকে, তবে বেতের পরে পড়বে। (১/১৮৪)

গ. ইমাম আহমাদও দুটি নামাযকে ভিন্ন মনে করতেন। তার মতে কোন ব্যক্তি যদি তারাবী ও তাহাজ্জুদ দুটিই পড়ে এবং তারাবীতেই বেতের পড়ে, তবে তার উচিৎ হবে বেতের শেষে ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন সে যেন দাঁড়িয়ে আরেক রাকাত পড়ে সালাম ফেরায়। যাতে এক রাতে দুবার বেতের পড়া (যা হাদীসে নিষিদ্ধ) থেকে বেঁচে থাকতে পারে। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর নাতি মুকনি' এর টীকায় লিখেছেন, এ মাসআলাটি ইমাম আহমাদ স্পষ্ট করে বলেছেন।

ঘ. ইমাম বুখারীর মতেও দুটি নামায ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাঁর রীতি ছিল রাতের প্রথমাংশে ছাত্রদেরকে নিয়ে তারাবী পড়া এবং তাতে এক খতম দেওয়া। আর শেষ রাতে একাকী নামায পড়া ও প্রতি তিন রাতে এক খতম দেওয়া। (দ্র. মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারী, পৃ. ৬৪৫)

ঙ. মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী ও কাসেম নানুতুবী দুজনেই তারাবী ও তাহাজ্জুদকে ভিন্ন ভিন্ন নামায আখ্যা দিয়েছেন। এবং হযরত গাংগুহী তা অনেক দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এমনকি লা-মাযহাবী বন্ধুদের ইমাম শায়খ নযীর হুসাইনও তারাবী ও তাহাজ্জুদ পৃথকভাবেই আদায় করতেন। উভয় নামাযে পৃথক পৃথক হাফেজ ইমামও হতো এবং আলাদা আলাদা খতমে কুরআনও হতো। (দ্র. আল হায়াত বা'দাল মামাত, ১৩৮ পৃ.)

(তিরমিযী) তিনি আরো বলেছেন, আমার উম্মতে মুহাদ্দাস (যার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহাম হয়) থেকে থাকলে সে হবে উমর। তিনি আরো বলেছেন, উমর যে পথ ধরে চলে শয়তান সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ দিয়ে চলে। এই দুটি হাদীসই বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

অন্যদিকে বেদ'আত বা নব-উদ্ভাবিত আমল ও কর্মের প্রতি সাহাবীগণের ঘৃণা ও অসন্তোষ ছিল চরম পর্যায়ের। মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে পুনরায় ডাকাডাকি করতে শুনে হযরত ইবনে উমর রা. সেই মসজিদ থেকে রাগে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেকে নামাযে সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ জোরে পড়তে শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ছেলেকে সাবধান করে তিনি বলেছিলেন,

إياك والحدث في الإسلام

খবরদার ! ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করো না।

এদুটি হাদীস তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর রা.কে একথা বললেন, আপনার বাবাই তো এটা করতে নিষেধ করেছেন। এর উত্তরে তিনি বলেছেন, মনে কর একটি কাজ সম্পর্কে আমার বাবা নিষেধ করছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইকাজ করেছেন, তবে তুমি কোনটি ধরবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলটি নয়কি? (তিরমিযী শরীফ)

কুরআন সংকলনের ব্যাপারে যায়দ ইবনে ছাবেত রা.কে দায়িত্ব দিতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন,

كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেননি সে কাজ আপনি কিভাবে করবেন? কিন্তু হযরত উমর রা. তাঁকে ও আবূ বকর রা.কে বুঝিয়ে একাজটি করিয়ে নিয়েছেন।

এসব কথা বিবেচনায় রাখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসটি তারাবী সম্পর্কে হয়ে থাকলে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে ২০ রাকাত পড়ার উপর ঐকমত্য হওয়া আদৌ সম্ভব হতো না। অনুরূপ ভাবে ২০ রাকাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কোন নির্দেশনা না থাকলে তাও তাদের পক্ষে পড়া সম্ভব হতো না। কেউ না কেউ অবশ্যই প্রতিবাদ বা আপত্তি করে বসতেন। আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবেনা- নবীজীর এ বাণী কে না শুনেছেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর রা. এর আমলে সাহাবীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ হয়ে মসজিদে তারাবী পড়েছেন। উমর রা. যখন তাদের এক ইমামের পেছনে একত্রিত করতে চাইলেন, তখনই হযরত উবাই ইবনে কাব রা. আপত্তি করে বসলেন। মুসনাদে আহমদ ইবনে মানী' ও জিয়া মাকদিসীর 'আল মুখতারাহ' হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আবূল আলিয়া র. থেকে বর্ণিত হাদীসটি, যা ৪০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, জামাতে পড়ার ব্যাপারে হযরত উবাই রা. তো আপত্তি করে বসেছিলেন। কিন্তু বিশ রাকাতের ব্যাপারে তিনি কোন আপত্তি না করে বিনা দ্বিধায় বিশ রাকাত পড়িয়ে দিয়েছিলেন। অথচ প্রথম বিষয়টি ছিল ব্যবস্থাপনাগত এবং শরীয়তের রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর দ্বিতীয় বিষয়টি শরীয়তের একটি বিধান। কোন নামাযের রাকাত সংখ্যা নিজের থেকে নির্ধারণ করার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে যদি ৮ রাকাত পড়া নির্ধারিত থাকতো তাহলে তিনি স্বেচ্ছায়ও বিশ রাকাত পড়াতেন না। অন্য কেউ পড়াতে বললেও তিনি আপত্তি করে বলতেন, এ কাজ তো ইতিপূর্বে হয়নি, আমি কিভাবে করবো?

২নং দলিল

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত:

أنه صلى في رمضان بنسوة في داره ثمان ركعات

অর্থ: তিনি রমযানে তার ঘরের মহিলাদের নিয়ে আট রাকাত পড়েছেন।

অনুরূপ আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত জাবির রা. এর হাদীস: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন,

جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كان مني الليلة شيئ يعني في رمضان قال: وماذا يا أبي؟ قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك قال : فصليت بهن ثمان ركعات ثم أوترت

উবাই ইবনে কাব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে – তার উদ্দেশ্য হলো রমযানে- আমার থেকে একটি ব্যাপার ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উবাই! সেটা কি? তিনি বললেন,আমার ঘরের নারীরা বললো যে, আমরা তো কুরআন পড়তে পারিনা (অর্থাৎআমাদের কুরআন মুখস্থ নেই)। তাই আমরাও তোমার পেছনে নামায পড়বো। আমি তাদের নিয়ে আট রাকাত পড়লাম। এবং পরে বেতেরও পড়লাম।

এ হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে বন্ধুদের কয়েকটি ভুল তুলে ধরছি। হাদীসটির অনুবাদে তারা ৩টি ভুল করেছেন। এক, 'রমযানের রাত্রিতে' কথাটি তারা জুড়ে দিয়েছেন, যা মূল হাদীসে নেই। দুই, ব্র্যাকেটে তারা 'তারাবী' কথাটি জুড়ে দিয়েছেন, এটিও মূল হাদীসে নেই। তিন, এর পরের ভুলটিতো পুরো জালিয়াতি। 'পড়েছেন' স্থলে তারা লিখেছেন, 'আদায় করতেন'। 'পড়েছেন' বললে বোঝা যায় কোন একবারের ঘটনা। আর 'পড়তেন' বা 'আদায় করতেন' বললে বোঝা যায়, এটা তার নিয়মিত আমল ছিল। ৫ম ভুল করেছেন এই বলে যে, 'আব্দুল্লাহ বলেন'। সঠিক হবে 'জাবির রা. বলেন'।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা র. তার মুসনাদে (১৭৯৫) , মুহাম্মদ ইবনে নাসর র. তার 'কিয়ামুল লাইলে' (পৃ ৯০) , তাবারানী তার 'আওসাতে' (৩৭৩১) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ তার 'যাওয়ায়েদে মুসনাদে আহমদে' (৫/১১৫ – ২১৪১৫) উদ্ধৃত করেছেন। হায়ছামী র. আবূ ইয়ালার শব্দে মাজমাউয যাওয়ায়েদে (২/১৭৯) এটি উল্লেখ করেছেন। সকলে একই সনদে বা সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীস যয়ীফ, এটি প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ:

ক. এর সনদে ঈসা ইবনে জারিয়া আছেন, তিনি যয়ীফ। তার হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। তার সম্পর্কে ইবনে মাঈন র. বলেছেন, ليس حديثه بذاك অর্থাৎ তার হাদীস মজবুত নয়। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেছেন, ليس بشيئ অর্থাৎ তিনি কোন বস্তুই নন। অপর এক বর্ণনায় আছে عنده مناكير অর্থাৎ তার কিছু কিছু আপত্তিকর বর্ণনা আছে। ইমাম নাসায়ী ও আবূ দাউদ র. বলেছেন, منكر الحديث অর্থাৎ তিনি আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। অপর এক বর্ণনায় ইমাম নাসায়ী বলেছেন متروك الحديث অর্থাৎ তার হাদীস বর্জনযোগ্য। ইবনে আদী বলেছেন, أحاديثه غير محفوظة অর্থাৎ তার হাদীস সঠিক নয়। সাজী র. ও উকাইলী র. তাকে যয়ীফদের কাতারে গণ্য করেছেন। ইবনুল জাওযী র.ও তাকে যয়ীফ বলেছেন। (দ্র. তাহযীব ও মীযানুল ইতিদাল)

এই সাতজনের সমালোচনার বিপরীতে শুধু আবূ যুরআ র. বলেছেন, لا بأس به অর্থাৎ তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। আর ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুসারে ব্যাখ্যা সম্বলিত জারহ বা সমালোচনা অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।[১] ফলে ঈসা যয়ীফ প্রমাণিত হন। বিশেষত নাসায়ী ও আবূ দাউদ র. যে বলেছেন 'মুনকারুল হাদীস'- এটি সম্পর্কে খোদ মোবারকপুরী সাহেব সাখাবী র. এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به ترك حديثه অর্থাৎ 'মুনকারুল হাদীস' হওয়া ব্যক্তির এমন একটি দোষ যার কারণে তার হাদীস বর্জনযোগ্য হয়ে যায়। (দ্র, আবকারুল মিনান)

এসব কারণেই ইবনে হাজার 'তাকরীবে' তার সম্পর্কে বলেছেন, فيه لين তার মধ্যে দুর্বলতা আছে। সুতরাং হায়ছামী ও আলবানী সাহেব হাসান বললেই এটা হাসান হয়ে যাবে না। একইভাবে মীযানুল ইতিদাল

---

১ যদি সেই জারহে অন্য কোন ত্রুটি না থাকে।

গ্রন্থে যাহাবী রহ. এর সনদকে ওয়াসাত বা মধ্যম স্তরের বলে যে মন্তব্য করেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মন্তব্যগুলো সামনে রাখলে সেটিও সঠিক বলে মনে হয় না।

খ. এ হাদীসের কোথাও তারাবীর কথা নেই। সুতরাং এর দ্বারা আট রাকাত তারাবী প্রমাণ করার চেষ্টা হবে ব্যর্থ চেষ্টা । মহিলাদের নিয়ে ঘরে নামায পড়া থেকে তাহাজ্জুদ পড়ার কথাই সাধারণভাবে বুঝে আসে।

গ. তারাবী সংক্রান্ত ঘটনা হওয়া তো দূরের কথা, এটাকে রমযানের ঘটনা প্রমাণিত করাও মুশকিল। কারণ এই হাদীস মুসনাদে আহমাদে ও তাবারানীর আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে রমযানের কোন কথাই নেই। আর মুসনাদে আবূ ইয়ালায় বলা হয়েছে, يعني في رمضان অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো, রমযানে। একথাটি নিশ্চয়ই হযরত জাবির রা. বা ঈসা ইবনে জারিয়া কিংবা অন্য কেউ বলেছেন। এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটি মুদরাজ বলে বিবেচিত হবে, যার উৎস বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় নি। অবশ্য 'কিয়ামুল লাইলে'র বর্ণনায় আছে, جاء أبي بن كعب في رمضان فقال يا رسول الله الخ অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কাব রমযানে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ----। উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে অনুমিত হয় যে, ঈসা ইবনে জারিয়া কখনও রমযানে আসার কথা বলেছেন; কখনও বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো রমযানে; আবার কখনও তিনি রমযানের প্রসঙ্গই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এতে করে তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাই বেশী করে প্রমাণিত হয়। কেননা হাদীসটি কেবল তার সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিয়ামুল লাইলের সনদে মুহাম্মদ ইবনে হুমায়দ রাযী আছেন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেছেন فيه نظر অর্থাৎ তার ব্যাপারে আপত্তি আছে। ইবনে হাজার বলেছেন, حافظ ضعيف অর্থাৎ দুর্বল হাফেজে হাদীস। যাহাবী র. 'কাশেফ' গ্রন্থে বলেছেন, الأولى تركه অর্থাৎ তাকে বর্জন করাই শ্রেয়। সুতরাং 'রমযানে আসলেন' কথাটি তার বৃদ্ধিও হতে পারে।

ঘ. হাদীসটি যে প্রমাণযোগ্য নয় তার একটি প্রমাণ এও হতে পারে, এটি সহীহ হয়ে থাকলে হযরত উমর রা. এর আমলে হযরত উবাই রা. যখন তারাবীর ইমাম হলেন, তখন তিনি আট রাকাতই পড়াতেন। অথচ পেছনে বহু সূত্রে আমরা প্রমাণ করে এসেছি, তিনি বিশ রাকাতই পড়িয়েছেন।

৩নং দলিল

হযরত জাবির রা. বলেন,

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة رمضان ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل فيه حتى أصبحنا إلى آخر الحديث

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে রমযানে আট রাকাত ও বেতের পড়লেন। পরের রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম তিনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসবেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত আমরা মসজিদে (অপেক্ষা করতেই) থাকলাম। (অর্থাৎ তিনি আর বের হননি)।

এ হাদীসটিও যয়ীফ, প্রমাণযোগ্য নয়। কেননা এর সনদেও ঐ পূর্বোক্ত ঈসা ইবনে জারিয়া আছেন। তাছাড়া এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, এটা কেবল এক রাতের ঘটনা ছিল। যেহেতু সে সময় তারাবী নামায জামাতের সঙ্গে পড়ার প্রচলন ছিল না, তাই এই হাদীসকে সহীহ ধরে নিলেও এই সম্ভাবনা থাকে যে, অবশিষ্ট নামায জামাত ছাড়া একাকী পড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এটা নিছক অনুমান নয়। মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা. এর এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তারাবীতে শরীক হওয়ার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন,

ثم صلى صلاة لم يصلها عندنا

অর্থাৎ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুজরায় গিয়ে) কিছু নামায পড়েছেন যা আমাদের নিকট পড়েননি। মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১১০৪

ঈসা ইবনে জারিয়া বর্ণিত হাদীসটি সঠিক না হওয়ার আরো একটি কারণ এই যে, সহীহ হাদীস সমূহে একাধিক সাহাবী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারাবী পড়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা রা. এর বর্ণনা বুখারী (৯২৪) ও মুসলিমে (৭৬১) উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত আনাস রা. এর বর্ণনা মুসলিম শরীফে (১১০৪), হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রা. এর বর্ণনা বুখারী (৭৩১) ও মুসলিমে (৭৮১) উদ্ধৃত হয়েছে। আবূ যর রা. এর বর্ণনা আবূদাউদ (১৩৭৫) ও তিরমিযী শরীফে (৮০৬) উদ্ধৃত হয়েছে এবং নুমান ইবনে বাশীর রা. এর বর্ণনা নাসায়ী শরীফে (১৬০৬) উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের কারো বর্ণনাতেই রাকাত-সংখ্যার উল্লেখ আসেনি। এসেছে শুধু হযরত জাবির রা. এর বর্ণনায়। তাও ঈসা ইবনে জারিয়ার মতো দুর্বল বর্ণনাকারীর সূত্রে।

কিছু গ্রন্থের বরাত প্রসঙ্গে

আলোচনার এ পর্যায়ে লামাযহাবী বন্ধুদের আরেকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। তারা আমাদের হানাফী ও অন্যান্য কিছু আলেমের মতামত উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন, এঁরাও তাদের সঙ্গে একমত। সর্বপ্রথম তারা আব্দুল হক দেহলভী র. এর কথা এনেছেন, কিন্তু তাঁর কোন গ্রন্থের বরাত দেননি। অথচ তিনি তার 'মা সাবাতা বিসসুন্নাহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

والذي استقر عليه الأمر واشتهر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو العشرون

অর্থাৎ ২০ রাকাত তারাবীই সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তী আলেমগণ থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এটাই শেষ পর্যন্ত বহাল হয়েছে।

২য় নম্বরে তারা ইবনুল হুমাম র. এর নাম উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি বলেছেন, ২০ রাকাত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, যার অনুসরণের তাগিদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিয়ে গেছেন। ২০

রাকাতের আমল হযরত উমর রা. এর যুগ থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসছে।

৩য় নাম এসেছে কাশ্মীরী র. এর 'আল আরফুশ শাযী' (তারা লিখেছেন, উরফুশ শাযী, এটা ভুল) গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। এটি কাশ্মীরী র. রচিত কোন কিতাব নয়। বরং তাঁর ক্লাসের আলোচনা এক ছাত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে এতে কিছু ভুল-ভ্রান্তিও ঘটে গেছে। কাশ্মীরী র. বুখারী শরীফের দরসী বয়ান 'ফায়যুল বারী' যা আল আরফুশ শাযী থেকে অনেক নিখুঁত, যার সংকলক আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী কাশ্মিরী রহ.এর নিকট অনেকবার বুখারী শরীফের পাঠ গ্রহণ করেছেন, তাতে বলেছেন, আহলে হাদীস নামধারীদের উচিৎ সেহরী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, এমন সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ সারারাত) তারাবী পড়া। কেননা এটাই নবীজীর সর্বশেষ আমল ছিল। কিন্তু যারা আট রাকাত পড়ে উম্মতের 'সাওয়াদে আযম' বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এমনকি তাদের উপর বেদআতের দোষ আরোপ করে, তাদের উচিৎ নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা। (দ্র, ৩খ, ১৮১পৃ)

৪র্থ নাম উল্লেখ করা হয়েছে মোল্লা আলী কারী র. এর । কিন্তু যে বক্তব্যটি পেশ করা হয়েছে সেটি মূলতঃ ইবনুল হুমাম র. এর । কারী সাহেব এর পূর্বে ইবনে তায়মিয়া রা. এর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, যারা মনে করে এগারো রাকাতের বেশী পড়া যাবে না, তারা ভুল করবে। আবার ইবনুল হুমাম র. এর বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর কারী সাহেব ইবনে হাজার মক্কী র. এর একথাও উদ্ধৃত করেছেন যে, ২০ রাকাত তারাবীর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এসব বাদ দিয়ে তারা শুধু নিজেদের মতলবের কথাটিই উল্লেখ করেছেন।

কিছু জালিয়াতি

পঞ্চম উদ্ধৃতি তারা দিয়েছেন ইবনে হাজার আসকালানীর। তিনি নাকি বলেছেন, ২০ রাকাতের হাদীস সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় তা বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়। এ হলো লা-মাযহাবীদের আরেক জালিয়াতি । ইবনে হাজার র. আবূ শায়বা বর্ণিত মারফূ হাদীসে যে বিশ রাকাতের উল্লেখ

এসেছে, সে সম্পর্কে বলেছেন, এটা হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিরোধী। 'তা বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়' কথাটি বন্ধুরা নিজেদের পকেট থেকে যোগ করেছেন। (দ্র, ফাতহুল বারী, ৪/৩১০- হাদীস নং ২০১৩) এর পূর্বে ইবনে হাজার র. ৩০৮ পৃষ্ঠায় ১১,১৩ ও ২০ রাকাত তারাবী সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে বলেছেন বিশ রাকাত শেষ আমল ছিল।

ইবনে হাজার র. এর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর তারা লিখেছেন, একই ধরণের মন্তব্য করেছেন ইমাম নাসায়ী 'যু'আফা' গ্রন্থে, আল্লামা আইনী হানাফী র. 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে, আল্লামা ইবনে আবেদীন 'হাশিয়া দুররে মুখতার' গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু মনীষীগণ।

এ হলো তাদের জালিয়াতির আরেকটি দৃষ্টান্ত। নাসায়ী র. যু'আফা গ্রন্থে অনুরূপ কোন কথাই বলেননি। তিনি শুধু ২০ রাকাতের মারফূ হাদীস বর্ণনাকারী আবূ শায়বাকে মাতরূক বলেছেন। এতেই যদি ঐ বক্তব্য অনিবার্য হয়, তবে আমরাও তো বলতে পারি হযরত জাবির রা. এর আট রাকাতের হাদীসটি সম্পর্কে নাসায়ী র. বলেছেন, এটি বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়। কেননা তিনি এর বর্ণনাকারী ঈসা ইবনে জারিয়া সম্পর্কেও মাতরূক বলেছেন।

আল্লামা আইনীও উমদাতুল কারী গ্রন্থে অনুরূপ কোন বক্তব্য দেননি। তিনি বরং বিশ রাকাতকেই দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি হযরত উমর রা. এর যুগে ২০ রাকাত তারাবীর উপর সাহবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্য হওয়ার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন।

সর্বশেষ ইবনে আবেদীন র. এর হাশিয়া দুররুল মুখতারের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, এটা তো রীতিমত তার উপর মিথ্যারোপ। তিনি বরং স্পষ্ট বলেছেন,

(وهي عشرون ركعة) هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شرقا وغربا .

وعن مالك ست وثلاثون . وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية والباقي مستحبا ، وتمامه في البحر ، وذكرت جوابه فيما علقته عليه . ٤٩٥/٢

অর্থাৎ তারাবী বিশ রাকাত। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটাই। পূর্ব-পশ্চিমে এ অনুসারেই মানুষের আমল। ইমাম মালেক র. এর মত হলো ৩৬ রাকাত। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, দলিল প্রমাণের দাবী হলো ৮ রাকাত মাসনূন হওয়া ও বাকী রাকাতগুলো মুস্তাহাব হওয়া। এর পূর্ণ বিবরণ 'আল বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের টীকায় (অর্থাৎ মিনহাতুল খালেক- এ) আমি এ কথার জবাব লিপিবদ্ধ করেছি। (দ্র, ২খ, ৪৯৫পৃ)

তার মানে যিনি এত মজবুত ভাবে ২০ রাকাত তারাবী প্রমাণ করছেন, এমনকি ইবনুল হুমামের মতটিও খণ্ডন করছেন, তার প্রতিই তারা এমন কথা আরোপ করছেন যে, তিনি বলেছেন, বিশ রাকাত বিনা দ্বিধায় বর্জনীয়।

একই ভাবে আলবানীর অনুসরণে তারা ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম তিরমিযী র. সম্পর্কে বলেছেন, তারা নাকি হযরত উমর রা. এর বিশ রাকাত তারাবীর হাদীসকে দুর্বল বর্ণনা বলেই নির্দেশনা দিয়েছেন।

অথচ তারা কোথাও অনুরূপ নির্দেশনা দেন নি। এ আজব তথ্যটি আলবানী সাহেব আবিষ্কার করেছেন তাঁদের একটি কথা থেকে। তাঁরা বলেছেন, روي عن عمر অর্থাৎ হযরত উমর থেকে বর্ণিত। ব্যাস, এটাকেই তিনি ধরে নিয়েছেন দুর্বল বলেই নির্দেশনা দেওয়া। অথচ স্বয়ং তিরমিযী র. সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রেও ঐ روي শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দ্র, হাদীস নং ১২৪, ১৭৮, ১৮৪।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মহিলাদের নামায-পদ্ধতি পুরুষের নামাযের মত নয়

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

মহিলাদের নামায-পদ্ধতি পুরুষের নামাযের মত নয়

নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন, সক্ষমতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা বিষয়ে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে ইবাদতসহ শরীয়তের অনেক বিষয়ে। যেমন, সতর। পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, পক্ষান্তরে পরপুরুষের সামনে মহিলার প্রায় পুরো শরীরই ঢেকে রাখা ফরয। নারী-পুরুষের মাঝে এরকম পার্থক্যসম্বলিত ইবাদতসমূহের অন্যতম হচ্ছে নামায। তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানো, হাত বাধা, রুকু, সেজদা, ১ম ও শেষ বৈঠক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে পুরুষের সাথে নারীর পার্থক্য রয়েছে। তাদের সতরের পরিমান যেহেতু বেশী, তাই যেভাবে তাদের সতর বেশী রক্ষা হয় সেদিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে এ ক্ষেত্রগুলোতে। মুসলিম উম্মাহর প্রায় দেড় হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন আমলের ধারা তাই প্রমাণ করে। বিষয়টি প্রমাণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের ফতোয়া ও আছারের মাধ্যমেও।

প্রথমে আমরা এ সংক্রান্ত মারফূ' হাদীস, এবং পরে পর্যায়ক্রমে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের ফতোয়া ও আছার উল্লেখ করবো।

মারফূ' হাদীস

১. তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব র. বলেন,

.... أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مر على امرأتين تصليان، فقال: اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (كتاب المراسيل للإمام أبو داود)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সেজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে।

কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়।" (কিতাবুল মারাসীল, ইমাম আবু দাউদ, হাদীস ৮০)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলেম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আওনুল বারী" (১/৫২০) তে লিখেছেন, 'উল্লিখিত হাদীসটি সকল ইমামের উসূল অনুযায়ী দলীল হিসেবে পেশ করার যোগ্য।'

মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী 'সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম' গ্রন্থে (১/৩৫১,৩৫২) এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলার সেজদার পার্থক্য করেছেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–: « إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الأُخْرَى ، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِى فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ : يَا مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا ». رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢٢٣/٢ في كتاب الصلاة (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود)، وفيه أبو مطيع البلخي وقال العقيلي فيه : كان مرجئا صالحا في الحديث.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সেজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে) বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২৩, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: মহিলার জন্য রুকু ও সেজদায় এক অঙ্গ অপর অঙ্গ থেকে পৃথক না রাখা মুস্তাহাব। আমাদের দৃষ্টিতে এটি হাসান হাদীস। আবু মুতী আল বালখীর ব্যাপারে দলিলের আলোকে উকায়লীর মন্তব্যই অগ্রগণ্য।

৩. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন,

جئت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فساق الحديث. وفيه: يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. (رواه الطبراني في الكبير جـ ٢٢ صـ ١٩-٢٠)

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বলেছিলেন: হে ওয়াইল ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর। (আলমুজামুল কাবীর, তাবারানী ১৯-২০/২২, এই হাদীসটিও হাসান)

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, কিছু কিছু হুকুমের ক্ষেত্রে মহিলার নামায আদায়ের পদ্ধতি পুরুষের নামায আদায়ের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। বিশেষত ২নং হাদীসটি দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মহিলার নামায আদায়ের শরীয়ত নির্ধারিত ভিন্ন এই পদ্ধতির মধ্যে ওই দিকটিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা তার সতর ও পর্দার পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী।

উল্লেখ্য, এই সব হাদীসের সমর্থনে মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতির পার্থক্য ও ভিন্নতাকে নির্দেশ করে এমন আরো কিছু হাদীস রয়েছে। পক্ষান্তরে এগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ একটি হাদীসও কোথাও পাওয়া যাবেনা যাতে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই; বরং উভয়ের নামাযই এক ও অভিন্ন।

সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া

১. হযরত আলী রা. বলেছেন,

إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها. رواه عبد الرزاق في المصنف واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف أيضا وإسناده جيد، والصواب في الحارث هو التوثيق.

" মহিলা যখন সেজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সেজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।”

(মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৮, অনুচ্ছেদ: মহিলার তাকবীর, কিয়াম, রুকু ও সেজদা; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৩০৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/২২২) এ সনদটি উত্তম।

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ফতোয়া:

عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال : "تجتمع وتحتفز"(رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, মহিলা কীভাবে নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায় আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২) এর রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত।

উপরে মহিলাদের নামায আদায় সম্পর্কে দু'জন সাহাবীর যে মত বর্ণিত হল, আমাদের জানামতে কোন হাদীসগ্রন্থের কোথাও একজন সাহাবী থেকেও এর বিপরীত কিছু বিদ্যমান নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম যে দীন শিখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে তা শিখেছেন তাবেয়ীগণ। তাঁদের ফতোয়া থেকেও এ কথাই প্রতীয়মান হয়- মহিলাদের নামায পুরুষের নামায থেকে ভিন্ন। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের ফতোয়া উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ র. কে জিজ্ঞেস করা হল,

كيف ترفع يديها في الصلاة قال حذو ثدييها .

নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে? তিনি বললেন, বুক বরাবর। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

২. ইবনে জুরাইজ র. বলেন,

قلت لعطاء تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل قال لا ترفع بذلك يديها كالرجل وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جدا وقال إن للمرأة هيئة ليست للرجل وإن تركت ذلك فلا حرج

আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা তাকবীরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে? তিনি বললেন, মহিলা পুরুষের মত হাত উঠাবে না। এরপর তিনি (মহিলাদের হাত তোলার ভঙ্গি দেখালেন এবং) তার উভয় হাত (পুরুষ অপেক্ষা) অনেক নীচুতে রেখে শরীরের সাথে খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

৩. মুজাহিদ ইবনে জাবর র. থেকে বর্ণিত:

عن مجاهد بن جبر أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة .

তিনি পুরুষের জন্য মহিলার মতো উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সেজদা করাকে অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

১. যুহরী র. বলেন,

ترفع يديها حذو منكبيها .

মহিলা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/২৭০)

৫. হাসান বসরী ও কাতাদা র. বলেন,

إذا سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت ولا تتجافي لكي لا ترفع عجيزتها

মহিলা যখন সেজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সেজদা দিবেনা; যাতে কোমর উচু হয়ে না থাকে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭)

৬. ইবরাহীম নাখায়ী র. বলেন,

إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها ولتضع بطنها عليهما

মহিলা যখন সেজদা করবে তখন যেন সে উভয় উরু মিলিয়ে রাখে এবং পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)

৭. ইবরাহীম নাখায়ী র. আরো বলেন,

كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا سجدت ، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل ، لكي لا ترفع عجيزتها

মহিলাদের আদেশ করা হত তারা যেন সেজদা অবস্থায় হাত ও পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে। পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাঁকা না রাখে; যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/১৩৭)

৮. খালেদ ইবনে লাজলাজ র. বলেন,

كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشئ .

মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষদের মত না বসে। আবরণযোগ্য কোন কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৩)

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো ছাড়াও আয়িম্মায়ে তাবেয়ীনের আরো কিছু বর্ণনা এমন আছে যা মহিলা-পুরুষের নামাযের পার্থক্য নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে একজন তাবেয়ী থেকেও এর বিপরীত বক্তব্য প্রমাণিত নেই।

চার ইমামের ফিকহের আলোকে:

ফিকহে ইসলামীর চারটি সংকলন মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচলিত- ফিকহে হানাফী, ফিকহে মালেকী, ফিকহে হাম্বলী ও ফিকহে শাফেয়ী। এবারে আমরা এই চার ফিকহের ইমামের মতামত উল্লেখ করছি।

১. ফিকহে হানাফী

ইমাম আবূ হানীফা র. এর অন্যতম প্রধান শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন,

أحب إلينا أن تجمع رجليها في جانب ولا تنتصب انتصاب الرجل.

আমাদের নিকট মহিলাদের নামাযে বসার পছন্দনীয় পদ্ধতি হলো- উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের মত এক পা দাঁড় করিয়ে রাখবে না।

কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ, ১/৬০৯

২. ফিকহে মালেকী

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস আলকারাফী র. ইমাম মালেক র. এর মত উল্লেখ করেন,

وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك تضع فخذها اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل

নামাযে মহিলা পুরুষের মতো কিনা এ বিষয়ে ইমাম মালেক র. থেকে বর্ণিত, মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। রুকু, সেজদা ও বৈঠক কোন সময়ই প্রশস্ততা অবলম্বন করবে না, পক্ষান্তরে পুরুষের পদ্ধতি ভিন্ন। আযযাখীরা , ইমাম কারাফী, ২/১৯৩।

৩. ফিকহে হাম্বলী

ইমাম আহমদ র. এর ফতোয়া উল্লেখ আছে ইমাম ইবনে কুদামা র. কৃত 'আল মুগনী'তে:

فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا قال أحمد رفع دون الرفع والثانية لا يشرع لأنه

في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها

তাকবীরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না এ বিষয়ে কাজী (আবু ইয়ায) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী হাত তুলবে। কেননা, খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা এবং হযরত হাফসা বিনতে সীরীন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন, তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তাই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে। যেমন পুরুষ করে থাকে এ হিসেবে মহিলা হাত উঠাবে, তবে সামান্য। আহমাদ র. বলেন, তুলনামূলক কম উঠাবে। দ্বিতীয় মত এই যে, মহিলাদের জন্য হাত উঠানোরই হুকুম নেই। কেননা, হাত উঠালে কোন অঙ্গকে ফাঁক করতেই হয় অথচ মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্য নিয়ম হল রুকু সেজদাসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে। আলমুগনী, ইবনে কুদামা, ২/১৩৯।

৪. ফিকহে শাফেয়ী

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন,

وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها.

আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দনীয় হল, সেজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে। পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সেজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত হয়। অনুরূপ

রুকু, বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাযত হয়। কিতাবুল উম্ম, শাফেয়ী, ১/১৩৮

দেখা যাচ্ছে, হাদীসে রাসূল, সাহাবা ও তাবেয়ীনের ফতোয়া ও আছারের মতই চার মাযহাবের চার ইমামের প্রত্যেকেই পুরুষের সাথে মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের কথা বলেছেন। মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত উপরোক্ত কেউ-ই বলছেন না, মহিলাদের নামায পুরুষের নামাযের অনুরূপ। বরং সকলেই বলছেন, পুরুষের নামায থেকে মহিলার নামায কিছুটা ভিন্ন।

নারী-পুরুষের নামাযের এ পার্থক্য শুধু যে এ চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ও অনুসারীগণ-ই স্বীকার করেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং আমাদের যে আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ভাইয়েরা এ পার্থক্যকে অস্বীকার করেন, তাদেরও কোন কোন অনুসৃত আলেম এপার্থক্যকে স্বীকার করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ দাউদ গযনবী রহ. এর পিতা আল্লামা আব্দুল জাব্বার গযনবী র. কে জিজ্ঞেস করা হল, মহিলাদের নামাযে জড়সড় হয়ে থাকা কি উচিত? জবাবে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করে লেখেন, এর উপরই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চার মাযহাব ও অন্যান্যদের মাঝে আমল চলে আসছে।

এরপর তিনি চার মাযহাবের কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করার পর লেখেন, মোট কথা, মহিলাদের জড়সড় হয়ে নামায পড়ার বিষয়টি হাদীস ও চার মাযহাবের ইমামগণ ও অন্যান্যের সর্বসম্মত আমলের আলোকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী হাদীসের কিতাবসমূহ ও উম্মতের সর্বসম্মত আমল সম্পর্কে বেখবর ও অজ্ঞ।

ফাতওয়া গযনবিয়্যা, ২৭ ও ২৮; ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস, ৩/১৪৮-১৪৯; মাজমুআয়ে রাসায়েল, মাওলানা আমীন সফদর উকারবী, ১/৩১০-৩১১।

মাওলানা আলী মুহাম্মদ সাঈদ 'ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস ' গ্রন্থে এই পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। মাজমুআয়ে রাসায়েল, ১/৩০৫।

মাওলানা আব্দুল হক হাশেমী মুহাজিরে মক্কী র. তো এই পার্থক্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকাই রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম :

نصب العمود في تحقيق مسألة تجافي المرأة في الركوع والسجود والقعود.

মুহাদ্দিস আমীর ইয়ামানী র. 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থে এবং স্বসময়ের আহলে হাদীসদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান 'আউনুল বারী' তে নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের পক্ষেই তাদের মত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে সহীহভাবে বিষয়টি অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উমরী কাযা
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

উমরী কাযা : কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতের আলোচনার পর কুরআনে সর্বাধিক গুরুত্ব নামাযের প্রতি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত শরীয়তে ঈমানের পরেই নামাযের স্থান এবং তা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. رواه الترمذى في سننه ٢/٨٩ وقال : هذا حديث حسن صحيح.

"সব কিছুর মূল হল ইসলাম আর নামায হল এর খুঁটি; জিহাদ এর উচ্চতা।" জামে তিরমিযী ২/৮৯ হা.২৬১৬

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু দারদা রা. কে বলেন:

ولا تترك صلاة مكتوبة معتمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة.

"তুমি ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব ওঠে যায়।" সুনানে ইবনে মাযাহ হা.৩০১

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. তাঁর গভর্ণরদের নিকট ফরমান লিখে পাঠান যে–

أن اهم امركم عندى الصلاة فمن حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.

"নিঃসন্দেহে তোমাদের সকল কর্মের মধ্যে নামাযই আমার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করল, সে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা নষ্ট করল সে অপর বিষয়াবলীকে আরো অধিক বিনষ্ট করল।" এরপর তিনি নামাযের সময়ের বিবরণ উল্লেখ করেন।– মুয়াত্তা ইমাম মালেক পৃ.৩

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে শরীয়তে নামাযের মান ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং নামায ছেড়ে দেওয়ার পরিণতি যে কত ভয়াবহ হতে পারে তাও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

নামাযের সময় নির্ধারিত

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে– إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا "নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রতি নামায অপরিহার্য রয়েছে, যার সময়সীমা নির্ধারিত।"(সূরা নিসা ১০৩) পবিত্র কুরআনে নামাযের সময়সীমা নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি নির্ধারিত সময়ে তা অনাদায় থেকে গেলে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করার বিষয়টিও পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সহীহ হাদীস ও আছারে সাহাবাতে বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

'আদা ' ও 'কাযা'র বিবরণ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যদি নামায আদায় করা হয় তবে তাকে 'আদা' বলা হয় এবং পরে আদায় করা হলে 'কাযা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এক হাদীসে ইবাদতের 'কাযা'র দর্শনটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে বুঝিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার মা মান্নত করেছিলেন যে, তিনি হজ্জ করবেন। কিন্তু তা পূর্ণ করার আগেই তিনি মারা গেছেন। (এখন আমার করণীয় কী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন–

حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

তুমি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ কর। বল তো যদি তোমার মা কারো নিকটে ঋণী হতেন তুমি কি তার ঋণ পরিশোধ করতে? মহিলাটি বলল,হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে

তোমরা আল্লাহর ঋণও পরিশোধ কর। কেননা তিনি তাঁর প্রাপ্য পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।” সহীহ বুখারী, ১৮৫২; সুনানে নাসায়ী ২/২, ২৬৩৪।

অপর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল ! আমার পিতা মারা গেছেন । কিন্তু তিনি হজ্জ করতে পারেননি । আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم, قال :فدين الله احق.

বলতো তোমার পিতা যদি কারো নিকট ঋণী হতেন তবে কি তুমি তার ঋণ পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–আল্লাহর ঋণ অধিক আদায়যোগ্য। সুনানে নাসায়ী ২/৩, নং ২৬৩৯

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– فاقضواالله ‘তোমরা আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর’, فدين الله احق ‘আল্লাহর ঋণ আদায়ের অধিক উপযুক্ত’, এসব থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, যে ইবাদতটি বান্দার উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য, তা থেকে দায়মুক্তির পথ হল তা আদায় করা। নির্ধারিত সময় পার হওয়ার ফলে যেমন মানুষের ঋণ থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না, তেমনি আল্লাহ তাআলার ঋণ থেকেও দায়মুক্ত হওয়া যায় না।

শরীয়তে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের ব্যাপারেও এই মূলনীতি প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের ‘আছার’ এ প্রমাণই বহন করে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

১.এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সফর করছিলেন। শেষ রাতে তাঁরা বিশ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করলেন এবং হযরত বিলাল রা. কে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে হযরত বিলাল রা.ও তন্দ্রাভিভূত হয়ে গেলেন এবং সবার ফজরের নামায কাযা

হয়ে গেল। ঘুম থেকে জাগার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। এর পর ইরশাদ করেন ঘুম বা বিস্মৃতির কারণে যার নামায ছুটে গেল, যখন সে জাগ্রত হবে তখন যেন তা আদায় করে।"

প্রসিদ্ধ সকল হাদীসগ্রন্থেই বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, সেই দুই রাকাত (যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা হিসেবে আদায় করেছেন) আমার নিকট সমগ্র দুনিয়ার মালিকানা লাভ করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।" মুসনাদে আহমদ ৪/১৮১ হা.২৩৪৯ মুসনাদে আবূ ইয়ালা ৩/২২-২৩ হা.২৩৭১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবরে আব্বাস রা. এর খুশির কারণ হল, এই ঘটনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচরবৃন্দ, যাঁরা আগামী দিনে শরীয়তের বিধি-বিধান পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের সামনে (এ মূলনীতি) স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নামায নির্ধারিত সময়ে আদায়যোগ্য ইবাদত হলেও যদি তা সে সময়ে আদায় করা না হয়, তবে সময়ের পরে হলেও আদায় করা অপরিহার্য। আল-ইসতিযকার ১/৩০০

২.খন্দকের যুদ্ধে শত্রুবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। তাঁরা রাতের বেলায় তা আদায় করেন। সহীহ বুখারী ১/৮৩, ৮৪, ৮৯, ৪১০, ২/৫৯০ সহীহ মুসলিম ১/২২৬,২২৭

৩.খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফেরার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন–

لايصلين احد العصر الا فى بنى قريضة "তোমাদের কেউ বনী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের নামায পড়বে না।" সহীহ বুখারী ১/১২৯ ২/৫৯০ সহীহ মুসলিম ২/৯৬

সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হলেন। পথে আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার উপক্রম হলে কতক সাহাবী পথেই নামায পড়ে নেন। আর কতক সাহাবী বনী কুরায়যায় পৌঁছে পরে আসরের কাযা পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা শুনেছেন। কিন্তু পরে

কাযা আদায়কারী সাহাবীদের একথা বলেননি যে, নামায শুধু নির্ধারিত সময়েই আদায়যোগ্য; সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর কোন কাযা নেই।

এসব দৃষ্টান্তের বিপরীতে কোন একটি হাদীসে একথা উল্লিখিত হয়নি যে, নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া না হলে তা আর পড়তে হবে না। ইস্তেগফার করে নেওয়াই অপরাধ মোচনের জন্য যথেষ্ট।

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি দলীল হল, ইজমায়ে উম্মত। মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময়ের পরে হলেও তা আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা বা ওযরবশত নামায কাযা হয়ে যাওয়া উভয়টাই সমান। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. বিনাওযরে কাযাকৃত (ছেড়েদেয়া) নামায আদায় করা অপরিহার্য হওয়ার স্বপক্ষে শরয়ী প্রমাণাদি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله عليه السلام. . .

الاستذكار ١/٣٠٢–٣٠٣

"ফরয রোযার মত ফরয নামাযও সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে কাযা করতে হয়। এ ব্যাপারে যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট দলীল, যার অনুসরণ করা ঐ সব বিচ্ছিন্ন মতের প্রবক্তাদের জন্যও অপরিহার্য ছিল– তারপরও কিছু দলিল উল্লেখ করা হল। যথাঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী . . .। আল ইসতিযকার ১/৩০২, ৩০৩

পঞ্চম হিজরী শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোন কোন বাহ্য-অনুসারী ব্যক্তি এই মত প্রকাশ করে যে, ফরয নামায সময় মত পড়া না হলে তা আর কাযা করতে হবে না। তখনকার এবং পরবর্তীযুগের ইমামগণ এই মতটি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. (মৃত.৪৬৩ হি.) তাঁর রচনা আল ইসতিযকারে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপি (১/২৯৯-৩১১) শুধু এই বিষয়েই আলোচনা করেছেন। এবং সহীহ হাদীসের আলোকে উপরোক্ত মতটির ভ্রান্তি সুপ্রমাণিত করেছেন। একে

'সাবীলুল মুমিনীন' তথা সকল মুমিনের পথ থেকে বিচ্যুত মত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (১/৩০২) অন্যান্য ইমামগণও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেছেন। যার কিছু উদ্ধৃতি আমাদের এ আলোচনায় রয়েছে। উলামায়ে কেরামের ভূমিকার কারণে এই মতটি একদম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তা শুধু পাওয়া যেত বইয়ের পাতায়, বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ইদানিং কোন কোন মহল থেকে এই পরিত্যক্ত মতটি নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে দেখা যাচ্ছে।

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক বিনষ্ট করা হলে শুধু অনুতপ্ত হওয়া ও ইসতিগফার করাই তাওবার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং হকদারের প্রাপ্য আদায় করাও তাওবার অপরিহার্য অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক সহীহ হাদীসে 'আল্লাহর হক্ব'কে বান্দার হক্বের সাথে তুলনা করে বলেন– دين الله احق بالوفاء 'আল্লাহর হক্ব বিনষ্ট হলে তা আদায় করা (বান্দার হক্বের চেয়ে) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।' অতএব আলোচ্য মাসআলাতে নামাযের কাযা আদায় করা 'তাওবা'রই অংশ। কৃতকর্মের উপর অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা , আগামীতে এ কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া এবং ছুটে যাওয়া নামাযসমূহ আদায় করা– এসব মিলেই ব্যাক্তির তাওবা পূর্ণ হবে। অতএব তাওবাই যথেষ্ট কথাটি ঠিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে তওবার মধ্যে কাযা হয়ে যাওয়া নামাযসমূহ আদায় করাও অন্তর্ভুক্ত । শরীয়তের দলীলসমূহ থেকে তাই প্রমাণ হয় এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমাও হয়েছে।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার র. এই বিষয়টিকেই নিম্নোক্ত শব্দে ব্যক্ত করেছেন–

وأجمعوا على أن على العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه واعتقاد ترك العودة إليه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون النور ٣١ ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه.الاستذكار ١/٣٠٧

আর একথাও ঠিক নয় যে, হাদীস শরীফে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার বিষয়টিকে ঘুম বা বিস্মৃতি এ দুই অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসের বক্তব্য দেখুন–

من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذاذكرها.

'যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে থাকে, তার কাফফারা হল যখন তার নামাযের কথা স্মরণ হবে তখন তা আদায় করা।' সহীহ বুখারী হা.৫৯৭, সহীহ মুসলিম হা.৬৮৪/৩১৫

উপরোক্ত হাদীসে ঘুম ও বিস্মৃতি এ দুই অবস্থায় কাযা হয়ে যাওয়া নামায আদায় করার আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু নামায আদায়ের বিষয়টিকে এ দুই অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি এবং বলা হয়নি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে যে নামায পরিত্যাগ করা হয়েছে তা আর আদায় করার প্রয়োজন নেই, বা সময়ের পরে আদায় করা হলে তা কোন নামাযই নয়; বরং একটি অর্থহীন কাজ।

উসূলে ফিকহের সাথে সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিমাত্রই বুঝবেন যে, এ হাদীসে 'দালালাতুন নস এর নীতি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তির জন্যও নামায আদায় করার বিধানটি সুপ্রমাণিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– ولا تقل لهما اف 'পিতামাতার সামনে 'উফ' (বিরক্তিসূচক) শব্দটি উচ্চারণ করো না।' এই আয়াতে শুধু 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এ আয়াত থেকে পিতামাতাকে প্রহার করার অবৈধতাও সুপ্রমাণিত। যে নীতিতে শেষোক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হল উসূলে ফিকহের পরিভাষায় তা 'দালালাতুন নস' এর অন্তর্ভুক্ত । আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রেও এ একই নীতি কার্যকর হয়েছে।

শুধু তাই নয় হাদীসটির অন্যান্য বর্ণনা এবং পূর্বাপর বক্তব্যের প্রতি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

« إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى ».

“যখন তোমাদের কেউ নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায থেকে গাফেল হয়ে যায় তো যখন তার বোধোদয় হবে তখন সে যেন তা আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 'আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় কর।' সহীহ মুসলিম, হা. ৬৮৪/৩১৬

অন্য হাদীসে এসেছে–

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: كفارتها أن يصليها اذا ذكرها.

যে ব্যক্তি নামায রেখে ঘুমিয়ে গেছে বা নামায থেকে গাফেল রয়েছে তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এর কাফফারা হল যখন তার নামাযের কথা স্মরণ হবে তখন তা আদায় করে নেওয়া। হা.৬১৪

উপরোক্ত হাদীসসমূহে সামান্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোন নামায সময় মত আদায় না করা হলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করা অপরিহার্য। নামাযটি ভুলক্রমে কাযা হোক, নিদ্রার কারণে হোক অথবা গাফলতি বা অবহেলার কারণে হোক। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে কারীমের যে আয়াতাংশটি – أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي উদ্ধৃত করেছেন তা খুবই মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করা উচিত। কেননা এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত আয়াতে নামাযের কাযা আদায় করার বিধানটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তা তখনই হবে যখন আয়াতের অর্থ এই হবে 'আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় কর।' অর্থাৎ যখন এই ফরয দায়িত্বটির ব্যাপারে মানুষের বোধোদয় ঘটবে তখন তা আদায় করা অবশ্যকর্তব্য।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু নামায পরিত্যাগ করেছে এমন ব্যক্তির যখন তাওবার তাওফীক হয় এবং গাফলতি ও অবহেলা থেকে জাগ্রত হয় তখন নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার হুকুমের কথা তার স্মরণ হয় এবং এর গুরুত্বের ব্যাপারে তার বোধোদয় ঘটে। অতএব উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী এ ব্যক্তির কাযাকৃত নামাযসমূহ আদায় অপরিহার্য।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া নামাযকে সময়চ্যুত করা অনেক বড় কবীরা গোনাহ, এ থেকে খালেস হৃদয়ে তাওবা ও ইস্তেগফার করা অপরিহার্য । কিন্তু সময় পার হওয়ার পর নামায পড়া হলে এতে কোন লাভ নেই– এমন কথা নিঃসন্দেহে শরীয়তের উসূল ও নীতিমালা এবং সহীহ হাদীসের পরিপন্থি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি বিষয় অপরিহার্য প্রমাণিত হওয়ার পর তা অনর্থক হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আর ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগকারীর জন্য কাযা আদায় করা যে অপরিহার্য তা তো আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনায় উল্লেখিত শরয়ী দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি তো সবাই জানেন, যাতে পরবর্তী যুগের আমীরদের ব্যাপারে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নামায আদায় করবে। সে সময় দীনদারদের করণীয় ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

صل الصلاة لوقتها فإن ادركتها معهم فصل فإنها لك نافلة

“তুমি সময় মত নামায পড়ে নাও, এরপর যদি সেইসব আমীরের সাথে নামায আদায়ের পরিস্থিতি আসে (অর্থাৎ তখন যদি তুমি মসজিদে থাক) তবে তাদের সাথেও নামায পড়ে নিবে। এটা তোমার জন্য নফল হবে। (সহীহ মুসলিম হা.৬৪৮/২৩৮-২৪৪ সুনানে আবু দাউদ হা.৪২৭-৪২৮)

এসব আমীর যারা সময় পার হওয়ার পর নামায পড়েছিল তাদের নামায নিঃসন্দেহে কাযা ছিল। কিন্তু তাদের এই নামাযকে অনর্থক সাব্যস্ত করা হয়নি, তাদের পেছনে আদায় করা নামাযটিকে নামায হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। যদি সময়ের পরে নামায পড়া অনর্থকই হত তবে না ইক্তেদা শুদ্ধ হত, না আদায়কৃত নামাযটি শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য হত।

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, নির্ধারিত সময় থেকে নামায বিলম্বিত করার কারণে হাদীস শরীফে সেই সব আমীরের অবশ্যই নিন্দাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু (সময়ের পরে হলেও) তাদের নামায পড়াকে নিন্দার চোখে দেখা হয়নি বা একে একটি অর্থহীন কাজ হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়নি। – আল আসতিযকার ১/৩০৪-৩০৫

সূরা মারয়াম (আয়াত ৫৯) এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., মাসরূক র., উমর ইবনে আব্দুল আযীয র., কাসেম ইবনে মুখাইমিরা সহ মুফাসসির সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, এখানে নামায বিনষ্ট করার অর্থ হল, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নামায আদায় করা। তাঁরা বলেছেন–

أخروها عن مواقيتها ولو كان تركا لكان كفرا

অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতে যে শাস্তির কথা এসেছে তা নির্ধারিত সময়ের পরে পড়ার কারণে। অন্যথায় একদম নামায ছেড়ে দেওয়া তো কুফরী। আল ইসতিযকার ১/৩১০ তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/১৪২

এ থেকে বোঝা গেল, ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করা কবীরা গোনাহ হলেও সময়ের পরে নামায পড়ে নেওয়া অনর্থক কাজ নয়। একেবারে ছেড়ে দেওয়া থেকে তা অনেক ভাল। এতে একটি কুফরী কাজে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আরো দেখুন, আফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৫৬, সূরা মাউন ৪-৫

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের পালনকর্তা কী বলেন? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এভাবে তিন বার প্রশ্নোত্তরের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ বলেন–

عزتي وجلالى لا يصليها لوقتها إلا أدخلته الجنة ومن صلاها لغير وقتها إن شئت رحمته وإن شئت عذبته . رواه الطبرانى فى الكبير ١:٣٢٨ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد :فيه يزيد بن قتيبة ذكره ابن ابى حاتم وذكر له راويا واحدا ولم يوثقه ولم يجرحه انتهى.وله شاهد من حديث كعب بن عجرة عند

الطبرانی فی الكبير والأوسط وعند احمد فی المسند وفيه عيسى بن المسيب البجلی وهو ضعيف.راجع المجمع ٢:٣٩

"আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কসম! যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, আর যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর তা আদায় করবে আমি তাকে অনুগ্রহও করতে পারি এবং আযাবও দিতে পারি"। -আল মুজামুল কাবীর ১০/২২৮, হাদীস ১০৫৫৫) হাদীসটি 'হাসান'।

সামান্য চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই হাদীসে নামাযকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ নামাযটিকে অনর্থক বা মূল্যহীন সাব্যস্ত করা হয়নি।

কাযা নামায সমূহ সুন্নতসহ আদায় করতে হবে কিনা এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. বলেন–

المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال بالنوافل ، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها أحسن.

"যদি কাযা নামাযের পরিমাণ অনেক বেশী হয় তবে সুন্নত নামাযে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ফরয নামাযসমূহ আদায় করাই উত্তম। আর যদি কাযা নামাযের পরিমাণ কম হয় তবে ফরযের সাথে সুন্নত নামায আদায় করলে তা একটি উত্তম কাজ হবে।" –ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া রহ., ২২/১০৪

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ কথা হল, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর বালেগ হওয়ার পর থেকে নামায ফরয হয়। এ ফরয শরীয়তের সকল ফরযের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বলাবাহুল্য, যে বিষয়টি শরীয়তের অকাট্য দলীলসমূহের ভিত্তিতে প্রমাণিত, তা কারো উপর থেকে রহিত করার জন্য অনুরূপ মানের অকাট্য দলীল প্রয়োজন। কোন দলীল প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার বিধানকে রহিত করার দুঃসাহস কার হতে পারে? আলোচ্য বিষয়ে কোন অকাট্য দলীলতো দূরের কথা, অতি দুর্বল কোন দলীলের ভিত্তিতেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে , যে নামায মানুষের উপর ফরয হয়েছিল তা ব্যক্তির অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণে রহিত হয়ে

গেছে। এর বিপরীতে বুদ্ধিমান মাত্রই স্বীকৃত এবং শরীয়তের সুস্পষ্ট ভাষ্যও যে, ঋণ আদায় করা ছাড়া তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া যায় না।' এ মৌলিক নীতিটি ছাড়াও বহু শরয়ী দলীল প্রমাণ দ্বারা কাযা নামাযসমূহ আদায় করা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। এসব শরয়ী দলীলের বিরোধিতা করা এবং 'সাবীলুল মুমিনীন' থেকে বিচ্যুত হওয়া কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আলেমের কাজ হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং সিরাতে মুসতাকীমের উপর অটল-অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১.আলোচ্য মাসআলার শিরোনামটি 'উমরী কাযা' সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধির নিরিখেই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যথায় এর সঠিক নাম হবে قضاء الفوائت 'কাযাউল ফাওয়াইত'। এ নামটিই বিষয়বস্তুর অধিক উপযুক্ত । কেননা 'উমরী কাযা' নামে কোন কোন অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বইয়ে অন্য একটি নামাযের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন মহলে তা বেশ প্রসিদ্ধও বটে। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এ সংক্রান্ত যে হাদীসটি সেসব পুস্তক-পুস্তিকায় উল্লেখিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বাতিল। যথা: 'জুমআতুল ওয়াদা' বা রমযান মাসের শেষ জুমায় এক নামায পড়ে নিলে তা সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে।' এ রেওয়ায়াত এবং এ জাতীয় অন্য সকল রেওয়ায়াত মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুসারে 'মওযূ'। মোল্লা আলী ক্বারী র. মওযূ হাদীস সংক্রান্ত তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাবে লেখেন:

حديث – من قضى صلاة من الفرائض فى آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره إلى سبعين سنة– باطل قطعا. لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا تقوم مقام فائتة سنوات.

"রমযান মাসের শেষ জুমায় একটি ফরয নামাযের কাযা আদায় করা হলে তা জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাযের জন্য যথেষ্ট হবে" এ

রেওয়ায়াতটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কেননা এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা রয়েছে যে, কোন ইবাদত কয়েক বছরের ছুটে যাওয়া নামাযের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।” আল-মওযূআতুল কুবরা ১২৫

অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এব্যাপারে একমত। অতএব এজাতীয় ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহ থেকে প্রতারিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। বরং নামাযের ব্যাপারে পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য। যেভাবে আল্লাহ তাআলা তা ফরজ করেছেন ঠিক সেভাবেই সময় মত আদায় করা জরুরি। যদি অবহেলাবশত কোন নামায কাযা হয়ে যায় তবে যে পরিমাণ নামায কাযা হয়েছে সবই আদায় করতে হবে। এক নামায আদায় করে সকল নামাযই আদায় হয়ে গিয়েছে ; এ ধারণা করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়।

২.এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করাও অনুচিত হবে না যে, যারা মনে করেন, ঘুমন্ত অবস্থায় নামায কাযা হয়ে গেলে তাতে কোন অপরাধ নেই। এ জন্য তারা সকাল ৮/৯ টায় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করে নিয়েছেন। ঘুম থেকে ওঠার পর ফজরের নামায পড়েন বা একে কাযা নামাযের ফিরিস্তিতে যোগ করে দেন যে, পরবর্তী সময়ে কাযা করে নেব।

এ জাতীয় কর্মকাণ্ড নামাযের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস শরীফে অনিচ্ছাকৃতভাবে কখনও ঘুমন্ত অবস্থায় নামায ছুটে গেলে তা কাযা করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের কোথাও মানুষকে নিদ্রার ব্যাপারে এতটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি যে, সময় মত জাগ্রত হওয়ার কোন ফিকিরই তাকে করতে হবে না। শরীয়তে ইশার পরে গল্পগুজব করতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, এতে ফজরের নামায কাযা হয়ে যেতে পারে। অনুরূপ কোন ওযরবশত ঘুমুতে বিলম্ব হলে যদি এই আশংকা হয় যে, সময় মত ঘুম ভাঙ্গবে না এবং নামায কাযা হয়ে যেতে পারে তাহলে সামর্থ অনুযায়ী ঘুম থেকে জাগার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও জরুরি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জিহাদের সফর থেকে ফেরার পথে এরূপ বিলম্বে ঘুমুতে যাওয়ার সময় হযরত বিলাল রা. কে সময় মত জাগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী হা.৫৯৫ সহীহ মুসলিম ৬৮০-৬৮১

যারা শোয়ার সময় জাগ্রত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা তো দূরের কথা, সঠিক সময়ে জাগার নিয়তও রাখে না এবং নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন তাদের সতর্ক হওয়া উচিত এবং এ জাতীয় মনগড়া

বাহানা পরিত্যাগ করে এই মহান ইবাদতটির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

৩.আলোচ্য মাসআলাতে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, 'কাযা' আল্লাহ তাআলার ঋণ পরিশোধের একটি পন্থা মাত্র । এটা কখনও 'আদা'র বিকল্প নয়। অতএব পরে কাযা করে নেব এই অজুহাতে কখনও নামাযকে সময়চ্যুত করা যাবে না। যদি 'কাযা' নামাযটি 'আদা'র পূর্ণ বিকল্পও হত তবুও নামাযকে বিলম্বিত করা কোনক্রমেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতো না। কেননা কাযা আদায় করা পর্যন্ত বেঁচে থাকারই বা কী নিশ্চয়তা রয়েছে ? যখন নামাযকে নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করাই একটি মারাত্মক কবীরা গোনাহ এবং শুধু কাযা করে নিলেই অপরাধ ক্ষমা হয়ে যায় না, তো আগামীতে কাযা করার অনিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে নামাযের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করা কোন মুমিনের কাজ হতে পারে না।

প্রসিদ্ধ ফিকহী মাযহাবসমূহের কয়েকটি কিতাবের উদ্ধৃতি নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে–

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. বলেন–

فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنْ الْوَقْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفَوَائِتُ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً

যে নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় হয়নি তার কাযা আদায় করা অপরিহার্য, তা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা হোক অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে বা ঘুমন্ত অবস্থায় কাযা হোক, কাযা নামাযের সংখ্যা বেশি হোক বা কম হোক। (আলবাহরুর রায়েক, ২/৭৯)

ইমাম মালেক রহ. বলেন–

من نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته. وليذهب إلى حوائجه، فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك

ভুলে যাওয়ার কারণে যার অনেক নামায কাযা হলো বা ইচ্ছাকৃত কাযা করল, সে প্রয়োজনাদি সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সামর্থ্য অনুযায়ী তা আদায় করতে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হওয়ার পর কাযা হওয়া সকল নামায আদায় করবে। (আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/১২৩)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার মালেকী রহ. বলেন–

وإذا كان النائم والناسي للصلاة – وهما معذوران – يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها... وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول

ঘুম বা বিস্মৃতির কারণে যার নামায কাযা হয়েছে, ওযর থাকা সত্ত্বেও যখন তাকে ঐ নামায আদায় করতে হয়, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে যে মহা অপরাধ করেছে তার নামায মাফ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তার এই অপরাধের তওবা হল নামাযটি আদায় করে অপরাধের ভার লাঘব করা এবং নির্ধারিত সময়ে আদায় না করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। এ বিষয়ে জনৈক 'জাহেরী' মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য আলিমের বিরোধিতা করে 'সাবীলুল মুমিনীন' থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তার বক্তব্য, ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময়ে নামায না পড়লে ঐ নামায আর আদায় করতে হবে না। এই মত অবলম্বন করে তিনি সকল মুসলিম জনপদের আলেমগণের জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং তার দাবির সপক্ষে যুক্তিসংগত কোন প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হন নি। (আলইসতিযকার, ১/৩০১)

ইবনে বাত্তালের বক্তব্য

বুখারী শরীফের প্রথম ভাষ্যকার ইবনে বাত্তাল (মৃত্যু ৪৪৯ হিজরি) বলেন,

وفى هذا الحديث رد على جاهل ، انتسب إلى العلم وهو منه برىء ، زعم أنه من ترك الصلاة عامدًا أنه لا يلزمه إعادتها . واحتج بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) ، ولم يذكر العامد ، فلم يلزمه القضاء ، وإنما يقضيها الناسى والنائم فقط ، وهذا ساقط من القول يئول إلى إسقاط فرض الصلاة عن العباد ، وقد ترك الرسول يوم الخندق صلاة الظهر والعصر قاصدًا لتركها لشغله بقتاله العدو ، ثم أعادها بعد المغرب . ويقال له : لما أوجب النبى (صلى الله عليه وسلم) على الناسى النائم الإعادة ، كان العامد أولى بذلك ؛ لأن أقل أحوال الناسى سقوط الإثم عنه ، وهو مأمور بإعادتها ، والعامد لا يسقط عنه الإثم ، فكان أولى أن تلزمه إعادتها ، ولا يوجد فى شىء من مسائل الشريعة مسألة : العامد فيها معذور ، بل الأمر بضد ذلك لقوله عليه السلام : (إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان) ، فإذا تجاوز الله عن الناسى إثم تضييعه ، وأمر بأداء الفرض ، فكان العامد المنتهك لحدود الله غير ساقط عنه الإثم ، بل الوعيد الشديد متوجه عليه ، كان الفرض أولى ألا يسقط عنه ويلزمه قضاؤه ، وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه ، فكذلك الصلاة ، ولا فرق بين ذلك ، والله الموفق .(ابن بطال في شرح البخاري باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى)

এ হাদীসে ঐ মূর্খের মত খণ্ডিত হয়েছে, যে নিজেকে ইলমের প্রতি সম্পর্কিত করে, অথচ সে ইলম থেকে সম্পর্কহীন। এ ব্যক্তি (ইবনে

হাযমের প্রতি ইংগিত–অনুবাদক) মনে করে 'ইচ্ছাকৃত যে নামায ত্যাগ করে তার উপর কাযা জরুরি নয়। আর দলিল এই পেশ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমন্ত রইল, বা নামাযের কথাই ভুলে গেল, সে যেন স্মরণ হতেই নামাযটি আদায় করে নেয়। এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত ত্যাগকারীর কথা বলেন নি। তাই তাকে কাযাও করতে হবে না। শুধু ঘুমন্ত ও বিস্মৃত ব্যক্তিই কাযা করে নেবে।

এটা একটা বাজে কথা। এর ফলে বান্দাদের উপর থেকে ফরজ নামায রহিত করা হচ্ছে। অথচ রাসূল সা. খন্দক যুদ্ধের সময় ইচ্ছা করেই জোহর ও আসর নামায ছেড়ে দিয়েছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার কারণেই তিনি তা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে মাগরিবের পর সেই নামায আদায় করে নিয়েছিলেন।

এ ব্যক্তিকে বলা যায়, নবী সা. যখন বিস্মৃত ও ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর নামায পড়ে নেওয়া আবশ্যক করেছেন, তখন তো ইচ্ছাকারীর উপর আরো বেশি আবশ্যক হওয়ার কথা। কেননা বিস্মৃত ব্যক্তির ন্যূনতম অবস্থা হলো, তার উপর থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে নামায পড়ে নিতে বলা হয়েছে। আর ইচ্ছাকারীর উপর থেকে তো গুনাহও রহিত হয় না। তাহলে তো তার জন্য পড়ে নেওয়া আরো বেশি উচিত হবে। গোটা শরিয়তে এমন কোন মাসআলা নেই, যেখানে ইচ্ছাকৃত কর্মকারীকে মাযুর ধরা হয়েছে। বরং ব্যাপার তার উল্টো। কারণ রাসূল সা. বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল ও বিস্মৃতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যখন বিস্মৃত ব্যক্তির নামায নষ্ট করার গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাকে ফরজটি আদায় করে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তাহলে ইচ্ছা করে যে ব্যক্তি নামায তরক করল, এবং আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করে ফেলল, তার উপর থেকে গুনাহর ভারও রহিত হচ্ছে না, বরং তার প্রতি কঠোর হুমকি আরোপিত হচ্ছে, তার উপর থেকে ফরজ রহিত না হওয়াই তো অধিক সঙ্গত, এবং কাযা করা তার উপর আবশ্যক হওয়াই তো অধিক যুক্তিযুক্ত। এদিকে উম্মাহর ঐক্যমতে উযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি রমযান মাসের এক দিনের রোযা ছেড়ে দিল, তাকে সেটি অবশ্যই কাযা

করতে হবে। নামাযের বেলায়ও তাই। এ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (অনুচ্ছেদ, নামাযের কাযা ক্রমানুসারে করা।)

ফিকহে শাফেয়ী ও হাম্বলী

ফিকহে শাফেয়ীর অন্যতম কিতাব 'ফাতহুল জাওয়াদ'-এ বলা হয়েছে–

(من فاتته)... (مكتوبة) فأكثر (قضى) ما فاتته بعذر أو غيره نعم غير المعذور يلزمه القضاء فورا. ويظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه.

যে ব্যক্তির এক বা একাধিক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়েছে, ওযরবশত হোক বা বিনা ওযরে, তাকে সকল নামায আদায় করতে হবে। তবে বিনা ওযরে ত্যাগকারী অনতিবিলম্বে কাযাকৃত সকল নামায আদায় করবে এবং অতি প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছাড়া পূর্ণ সময় এই কাজে ব্যয় করবে। (ফাতহুল জাওয়াদ, ১/২২৩)

সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম নববী রহ. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها হাদীসটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে শরহে মুসলিমে (৫/১৮৩) বলেন,

فِيهِ : وُجُوب قَضَاء الْفَرِيضَة الْفَائِتَة سَوَاء تَرَكَهَا بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَان أَوْ بِغَيْرِ عُذْر ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ فِي الْحَدِيث بِالنِّسْيَانِ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَب ، لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاء عَلَى الْمَعْذُور فَغَيْره أَوْلَى بِالْوُجُوبِ ، وَهُوَ مِنْ بَاب التَّنْبِيه بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى

অর্থাৎ এ হাদীসে ছুটে যাওয়া ফরয নামায আদায়ের অপরিহার্যতাও প্রমাণিত হয়। নামাযটি কোন ওযরবশত যথা, ঘুম বিস্মৃতি ইত্যাদির কারণে কাযা হোক বা বিনা ওযরে। হাদীস শরীফে শুধু বিস্মৃতির উল্লেখ এজন্য হয়েছে যে, তা একটি ওযর। আর ওযরের কারণে কাযা হওয়া নামায যদি আদায় করা অপরিহার্য হয় তবে বিনা ওযরে কাযা হওয়া

নামায যে আদায় করা অপরিহার্য তা তো বলাই বাহুল্য। (শরহে মুসলিম, ৫/১৮৩)

হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ইমাম আল্লামা মারদাভী রহ. বলেন–

قوله: "ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور". هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم... قوله: "لزمه قضاؤها على الفور" مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية

যার অনেক নামায কাযা হয়েছে তার অনতিবিলম্বে আদায় করা অপরিহার্য। এটাই মাযহাব, ইমাম আহমদ রহ. একথা স্পষ্ট বলেছেন। আমাদের হাম্বলী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এমতের উপরেই আছেন এবং তাদের অনেকেই এটা নিশ্চিত করেছেন। তবে অনতিবিলম্বে যে কাযা করার কথা বলা হয়েছে, তা কেবল তখনকার জন্য, যখন সে শারীরিকভাবে বা প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনে ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। যদি হয় তাহলে অনতিবিলম্বে আাদায় করা অপরিহার্য থাকবে না। (আল ইনসাফ, ১/৪৪২-৪৪৩)

বিশেষ জ্ঞাতব্য

সকলের অবগতির জন্য একটি কথা বলে দিচ্ছি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতামতের বাইরে যারা ফতোয়া দেন যে, ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া নামায কাযা করতে হবে না, বরং তওবা-ইস্তিগফার করে নেবে। এবং তারাও বলে না যে, তাদের মতে ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। তাই তওবার অর্থ এখানে নতুন করে ঈমান আনা। অন্যথায় তারা বলেন, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর যেহেতু কাফের অবস্থায় তার নামাযগুলো ছুটেছে, তাই সেগুলো কাযা করতে হবে না। এখানে শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আলউসাইমীন রহ.কৃত ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (বাংলা অনুবাদ) থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি–

'আর যদি বিবাহের প্রস্তাবক এমন ব্যক্তি হয়, যে না জামাতের সাথে সালাত আদায় করে, না একাকী সালাত আদায় করে তবে সে কাফের,

ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। তার তওবা করা জরুরি। যদি খালেছভাবে তওবা নাসূহা করে সালাত আদায় শুরু করে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তওবা না করলে তাকে কাফেও ও মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করতে হবে। গোসল না দিয়ে কাফন না পরিয়ে জানাযা না পড়িয়ে দাফন করতে হবে। মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।' (পৃষ্ঠা:৩২৬)

'অতএব কোন অভিভাবক যদি নিজ মেয়ে বা অধীনস্থ কোন মেয়ের বিবাহ বেনামাযী ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন করে, তবে সে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। এই বিবাহের মাধ্যমে উক্ত নারী তার জন্য বৈধ হবে না।' (পৃ.৩৩১)

'অতএব স্বামী যদি সালাত পরিত্যাগ করার পর তওবা করে সালাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামে ফিরে না আসে, তবে তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে।' (পৃ.৩৩১)

'বে নামাযীর যবেহ করা প্রাণীর গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে না। কেননা এটা হারাম।' (পৃ.৩৩৩)

'বেনামাযীর কোন নিকটাত্মীয় মারা গেলে সে তাদের মীরাছ লাভ করবে না।' (পৃ.৩৩৩)

অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় না। তাই তার বিবাহ ভঙ্গ হয় না। তার জানাযাও পড়তে হয়। সে মীরাছও লাভ করে এবং তার যবেহকৃত প্রাণীর গোস্তও হালাল।

খোদ উসাইমীন রহ.ই আশশারহুল মুমতি' গ্রন্থে লিখেছেন-

وقوله: «يجب فوراً قضاء الفوائت»، ظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عُذر، أو يدعها لعُذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب، سواء تركها لعُذر أم لغير عُذر، أي: حتى المتعمِّد الذي تعمَّد إخراج الصَّلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم الخ

অর্থাৎ গ্রন্থকার যে বলেছেন, ছুটে যাওয়া নামায তড়িঘড়ি আদায় করা জরুরি, গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে এটাই স্পষ্ট যে, উযর ছাড়া ইচ্ছাকৃত

নামায ছেড়ে দেওয়া এবং উযরের কারণে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত যে, ছুটে যাওয়া নামায পড়ে নেওয়া জরুরি, চাই উযরের কারণে ছুটে যাক বা বিনা উযরে। এমনকি যে ইচ্ছা করেই নামায ত্যাগ করল, তাকে বলা হবে, তুমি গুনাহগার। তবে তোমাকে অবশ্যই কাযা করে নিতে হবে। এটাই চার মাযহাবের ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিতর নামায পড়ার তরীকা

দলিলসহ নামাযের মাসায়েল
[বর্ধিত সংস্করণ]

মাওলানা আব্দুল মতিন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
ইমাম ও খতীব, বায়তুল আযীয জামে মসজিদ, উলন, রামপুরা, ঢাকা

বিতর নামায পড়ার তরীকা

ক. বিতর নামায তিন রাকাত

১. আবু সালামা (রহ) হযরত আয়েশা (রা) কে জিজ্ঞেস করেন–

كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، **ثم يصلي ثلاثا**. قالت عائشة فقلت يارسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.[١]

وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا فى الاستذكار (٢/١٠٠) في معنى قوله في حديث هذا الباب: «أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا» وجه رابع: وهو أنه كان ينام بعد الأربع ثم ينام بعد الأربع ثم يقوم فيوتر بثلاث.

অর্থ: 'রমযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল? হযরত আয়শা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে এবং রমযানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না! এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কেও প্রশ্ন করো না! এরপর তিন রাকাত (বিতর) পড়তেন'। [সহীহ বুখারী হা.১১৪৭ সহীহ মুসলিম হা.৭৩৮]

এ হাদীসের বিশ্লেষণ করে ইমাম ইবনু আব্দিলবার রহ. বলেন– "তিনি চার রাকাত পড়ে ঘুমাতেন। তারপর আবার চার রাকাত পড়ে ঘুমাতেন। অতঃপর উঠে তিন রাকাত বিতর পড়েতন"। [আল ইস্‌তিয্‌কার ২/১০০]

---

١. رواه البخارى (رقم ١١٤٧) ومسلم (رقم ٧٣٨) ومحمد فى الحجة على أهل المدينة (١/١٣٣)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস বলেন আমি হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম– 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরে কত রাকাত পড়তেন? তিনি উত্তরে বলেন– চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন এবং দশ ও তিন। তিনি বিতরে সাত রাকাতের কম এবং তেরো রাকাতের অধিক পড়তেন না'। হাদীসের আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

بكم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. [١]

[সুনানে আবী দাউদ ১/১৯৩ হা.১৩৬২ শরহু মা'আনিল আসার ১/২০১ মুসনাদে আহমদ ৬/১৪৯ হা.২৫১৫৯ আয়নী ও শুআইব আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন]

ইমাম বুখারী রহ. এর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ্ বলেন 'এ ধরণের হাদীসগুলোতে বিতরসহ রাতের পুরো নামাযকেই বিত্র শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে'। [সুনানে তিরমিযী হা. ৪৫৭ নং হাদীস পরবর্তী বক্তব্য দ্রষ্টব্য]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উপরোল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে লেখেন–'আমার জানামতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ রেওয়ায়াত। এবিষয়ে হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এর দ্বারা সে সবের মাঝে সমন্বয় করা যায়'। [ফাতহুল বারী ৩/২৫] [২]

আর এ হাদীসে সর্বাবস্থায় তিন রাকাত পৃথকভাবে পড়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে, সুতরাং স্পষ্টতই বুঝা যায় এটিই প্রকৃত বিত্র।

---

[১]. رواه أبوداود في السنن (رقم ١٣٦٢) وأحمد في المسند (رقم ٢٥١٥٩) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠١/١) وقال العيني في نخب الأفكار (٢٤١/٣) إسناده صحيح.

[২]. ইবনে হাজারের আরবী বক্তব্য– (وهذا أصحُّ ما وقفتُ عليه من ذلك، وبه يُجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم،)

৩. সা'দ ইবনে হিশাম হযরত আয়েশা সূত্রে বর্ণনা করেন–

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل، ثم صلى ركعتين، ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما، **ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن**، ثم صلى ركعتين وهو جالس يركع وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس.[١]

অর্থ: 'ইশার নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর আরো দুই রাকাত পড়তেন যা পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হত। তারপর তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। তাতে মাঝে (অর্থাৎ দুই রাকাত শেষে) সালাম ফেরাতেন না। [মুসনাদে আহমদ হা.২৫২২৩] এর সনদ হাসান।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

كَان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من اللَّيْلِ ثَمَان رَكَعَاتٍ **ويُوتِرُ بِثَلاثٍ**، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ.[٢]

---

[١]. رواه أحمد في المسند (رقم ٢٥٢٢٣) ورجاله ثقات رجال الشيخين ما خلا محمد بن راشد ويزيد بن يعفر، أما محمد بن راشد فثقةٌ وثَّقه أحمد وابن معين وابن المديني وابن المبارك والنسائي، وقال يعقوب ابن شيبة : صدوق، وقال أبو حاتم : كان صدوقا حسن الحديث، وفي "تحرير تقريب التهذيب" : ثقة، وأما يزيد بن يعفر فمن رجال "التعجيل"، ذكره ابنُ حبان في الثقات وقال البرقاني قلت للدارقطني يزيد بن يعفر عن الحسن؟ قال: بصري معروف يعتبر به (رقم ٥٥٦)، وقد ذكره البخاري في تاريخه الكبير (رقم ٣٣٦٦) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٩٦/٩ رقم ١٢٦٠) ولم يذكرا فيه جرحا، وتؤيده رواية عائشة لا يسلم إلا في آخرهن، راجع كشف الستر عن صلاة الوتر ص ٨٩-٩٠

[2]. رواه النسائي في السنن (٢٤٩/١ رقم ١٧٠٧) والطحاوي (٢٠٢/١) وقال العيني في نخب الأفكار (٢٥٢/٣) على شرط مسلم.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে আট রাকাত নামায পড়তেন। অতপর তিন রাকাত বিত্র পড়তেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করতেন'। [সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯ হা.১৭০৭ তহাবী ১/২০২ আল্লামা আয়নী রহ. বলেন– এটি সহীহ মুলিমের মানোত্তীর্ণ, নুখাবুল আফকার ৩/২৫১]

৫. শা'বী রহ. বলেন– আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে জিজ্ঞেস করেছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কত রাকাত ছিল?

سألتُ عبدَ الله بن عباس وعبدَ الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالا ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان، **ويوتر بثلاث**، وركعتين بعد الفجر. [১]

'তাঁরা উভয়ে বলেন: (তিনি রাতে) মোট তের রাকাত (নামায পড়তেন)। প্রথমে আট রাকাত। অতঃপর তিন রাকাত বিত্র পড়তেন। আর ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নত) আদায় করতেন। [সুনানে নাসায়ী আল-কুবরা হা. ৪০৮, ১৩৫৭ সুনানে ইবনে মাজাহ হা.১৩৬১ তহাবী ১/১৯৭ এর সনদ সহীহ, নুখাবুল আফকার ৩/২১১ সালাতুল বিত্র পৃ.২৬০]

৬. আলী ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন–

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّه قَامَ من اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ، ثم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثم تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثم **أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ** وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [১]

---

[১]. رواه ابن ماجة فى السنن (رقم ١٣٦١) وابن نصر فى صلاة الوتر كما فى مختصرالمقريزى (٢٦٠) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١٩٧/١) وقال العينى فى نخب الأفكار (٢١١/٣): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয্যা থেকে উঠলেন। এরপর মিসওয়াক করলেন অযু করলেন এবং দুই রাকাত নামায পড়লেন। এভাবে দুইদুই করে ছয় রাকাত পূর্ণ করলেন। অতঃপর তিন রাকাত বিত্র পড়লেন। সবশেষে আরও দুই রাকাত নামায পড়লেন। [সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯ হা.১৭০৪ মুসনাদে আহমদ ১/৩৫০ হা.৩২৭১ তহাবী শরীফ ১/২০১-২০২ শুআইব আরনাউত বলেন– এর সনদ শক্তিশালী, মুসলিম শরীফের শর্ত অনুযায়ী]

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে–

ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات **ثم أوتر بثلاث.**

‘অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে তিন বারে ছয় রাকাত নামায আদায় করলেন। প্রতি বারই মিসওয়াক ও অযু করেছেন এবং উপরিউক্ত আয়াতগুলো পড়েছেন। সবশেষে তিন রাকাত বিত্র পড়েছেন। [সহীহ মুসলিম ১/২৬১ হা.৭৬৩ সহীহ আবু আওয়ানা ২/৩২১]

সা‘দ ইবনে হিশাম হযরত ইবনে আব্বাসকে বিত্র নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে আয়েশা রা. এর কাছে পাঠান। আর বলে দেন– তিনি কি বলেন আমাকেও জানাবে। অতঃপর সা‘দ ইবনে হিশাম ফিরে এসে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরলেন। ইবনে আব্বাস রা. বললেন– তুমি সত্যি বলেছ। সুযোগ থাকলে আমি সরাসরি হযরত আয়েশা রা. এর কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনে আসতাম। [সহীহ মুসলিম হা.৭৪৬] এতে স্পষ্ট হয়ে গেল রাসূলের বিত্র নামাযের বিবরণে হযরত আয়শা ও ইবনে আব্বাস উভয়ে একমত। হযরত আয়শা রা. এর বর্ণনায় যে অস্পষ্টতা

---

[১]. رواه النسائى فى السنن (رقم ١٧٠٤) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١/٢٠١-٢٠٢) وأحمد فى المسند (رقم٣٢٧١) وقال شعيب : إسناده قوي على شرط مسلم.

রয়েছে তা ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ নয় রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত হল বিতর এবং আয়শা থেকে বর্ণিত সাদ ইবনে হিশামের হাদীসে অষ্টম রাকাতে বসা ও সালাম না ফিরিয়ে উঠে পরা, এটি মূলত তিন রাকাত বিতরের দ্বিতীয় রাকাত।

তিনটি সূরা দিয়ে তিন রাকাত বিতর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিত্‌র পড়তেন এবং তিন রাকাতে তিনটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। যা সহীহ সনদে দশো সাহাবী থেকে হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন–

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان **يوتر بثلاث ركعات**، كان يقرأ في الأولى بـ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بـ قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بـ قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. وفي رواية (رقم ١٧٠١) : ولا يسلم إلا فى آخرهن ويقول يعنى بعد التسليم : سبحان الملك القدوس ثلاثا، (١)

---

[1]. رواه النسائى فى السنن (١٩١/١ رقم ١٦٩٩، ١٧٠١ وكذا في السنن الكبرى له (رقم ٤٤٥) والطحاوى فى شرح مشكل الآثار (٣٦٨/١١) وقال شعيب: إسناده صحيح. وابن ماجة (رقم ١١٨٢) وأبو على ابن السكن فى الصحيح كما ذكره الحافظ فى التلخيص (١٨/٢)، والدارقطني في سننه (رقم ١٦٤٣) والمقدسى في الأحاديث المختارة (١١٣٣) والطوسى في مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (رقم ٤٣٩) والبيهقي في الكبرى (رقم ٥٠٥٩) وأبو نعيم فى مسند أبي حنيفة (١٣٨) وقال ابن القطان فى الوهم والإيهام : صححه أبو محمد عبد الحق، ووافقه فيه ابن القطان أيضا، وقال العينى فى العمدة (١٩/٧):

অর্থ: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। এবং রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন। ...'। একই হাদীসের অপর বর্ণনায়– 'আর কেবল শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন'।

[সুনানে নাসায়ী ১/১৯১ হা.১৬৯৯ মুশকিলুল আছার ১১/৩৬৮ হাদীসটি সহীহ – আল্লামা আইনী, ইবনুল কাত্তান ও শায়খ শুআইব আরনাউত দ্র. আলওয়াহামু-ওয়াল ঈহাম ৩/৩৮৩। স্বয়ং আলবানী সাহেবও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন– ইর্ওয়াউল গালীল ২/১৬৭]

২. সায়ীদ ইবনে জুবাইর রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاثٍ، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد.[১]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিত্র পড়তেন। প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। [সুনানে নাসায়ী ১/২৪৯ হা.১৪২৭ সুনানে তিরমিযী হা. ৪৬২ সুনানে দারিমী হা.১৫৮৯ ইবনে আবীশাইবা

إسناده صحيح. وقال الألباني فى إرواء الغليل (١٦٧/٢) قلت : وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن ميمون وهو ثقة كما في التقريب انتهى.

[1]. رواه النسائى فى السنن (٢٤٩/١ رقم ١٤٢٧) والترمذى (٦١/١) رقم٤٦٢) والدارمى (رقم ١٥٨٩) وابن أبي شيبة (٥٥٢/٤ رقم ٦٩٥١) وأحمد فى المسند (رقم ٢٧٧٦) وقال شعيب: إسناده صحيح، وقال الشيخ محمود سعيد ممدوح فى «التعريف بأوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف» (٤٣٩/٤) :إسناده صحيح كما قال الإمام النووى وغيره. وقال أيضا (٤٤٤/٤) : صحيح الإسناد رجاله حفاظ ثقات.

৪/৫১২ হা.৬৯৫১ মুসনাদে আহমদ হা.২৭৭৬ শুআইব আরনাউত বলেন– হাদীসটি সহীহ, ইমাম নববী বলেছেন, এ হাদীস সহীহ]

৩. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্‌যা রা.বর্ণনা করেন–

أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الوترَ، فقرأ في الأولى بـ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمدُّ صوته بالثالثة.(١)

'তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিত্‌র পড়েছেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়েছেন। ...।

[তহাবী ১/২০৫ হফেজ বদরুদদীন আইনী রহ. বলেছেন– এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, নুখাবুল আফকার ৩/২৭১, মুসনাদে আবীহানীফা–জামেউল মাসানীদ ১/৪১৪ সুনানে নাসায়ী হা.১৭৩৩ মুসনাদে আহমদ হা. ১৫৩৫৪ ইবনে আবী শাইবা ৪/৫১০ হা. ৬৯৪৪ কিতাবুলআছার ১/৩২৬ শুআইব আরনাউত ও শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা

---

١. رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (١/٢٠٥) وقال العينى فى نخب الأفكار (٣/٢٧١) : رجاله ثقات. وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ٤/١٩٥ : ورجاله ثقات، ورواه النسائي في الكني، ورواه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد للخوارزمي (١٤١٤) وهذا لفظهما،

وأصل الحديث رواه النسائى فى السنن (رقم ١٧٣٣) وأحمد (رقم ١٥٣٥٤) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن الحسن في كتاب الآثار (٣٢٦/١) وابن أبي شيبة (رقم٦٩٤٣) وقال الحافظ فى التلخيص (١١١/٢) : وحديث عبد الرحمن بن أبزى رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن، وقال الشيخ محمد عَوّامة :إسناد المصنِّف (ابن أبي شيبة) صحيح.

এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী র. আত-তালখীছুল হাবীরে বলেন– إسناده حسن 'এই সনদ হাসান']

উপরিউক্ত তিনটি বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতে সহীহ। তাতে এ বিষয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা নেই যে, নবীজী তিন রাকাত বিতর পড়তেন। আর রাকাতগুলোর বিবরণে স্পষ্টই উল্লেখ আছে– প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়। অতঃপর অধিকাংশ সাহাবা-তাবেয়ীন এভাবেই তিন রাকাতে বিতর পড়তেন। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. সুনানে তিরমিযীতে সুস্পষ্টভাবে বলেন–

والذي اختاره أكثرُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أن يقرأ : بـ سبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، **يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورةٍ.**

"সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী জ্ঞানীদের অধিকাংশই (বিতরে) সূরা আ'লা' কাফিরুন ও এখলাছ পড়াকেই গ্রহণ করেছেন। (তিন রাকাতের) প্রতি রাকাতে একটি করে সূরা পড়বে।" [সুনানে তিরমিযী-বিতরে কেরাত পাঠ অধ্যায়]

অনুরূপ ১৯ জন সাহাবী থেকে তিন রাকাত বিতরে তিন সূরা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। [কাশফুস সিতর পৃ. ৪৭ আল হিদায়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল বিদায়া ৪/১৪৮]

সাহাবা-তাবেয়ীদের তিন রাকাত বিতর

সাহাবা-তাবেয়ীগণও তিন রাকাত বিত্র পড়তেন। নিম্নে কিছু আছার তুলে ধরা হল–

১. হযরত উমর রা. বলেন–

ما أحب أنى تركتُ الوتر بِثَلاَثٍ وأنَّ لي حُمر النَّعم. [1]

'আমি তিন রাকাতে বিত্র পড়া ছাড়তে কখনোই পছন্দ করি না, যদিও এর বিপরীতে আমাকে লাল উট উপহার দেওয়া হয়'। [কিতাবুল আছার –জামেউল মাসানীদ ১/৪১৭ মুয়াত্তা মুহাম্মদ পৃ.১৪৯ কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ ১/১৩৫]

২. যাযান রহ. বলেন–

أَنَّ عليا كان يُوتِرُ بثلاثٍ. [2]

হযরত আলী রা. তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৯১৪ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/৩৪ হা.৪৬৯৯]

৩. আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর রহ. বলেন–

كان ابن مسعود يُوتِرُ بِثَلاَثٍ. [3]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯৪ আল মুজামুল কবীর–মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৫০৩]

৪. হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ র. বলেন–

أن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث. [4]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। এর সনদ সহীহ [মুসাননাফে আব্দুর রাযযাক ৩/২৬ হা.৪৬৬১]

৫. সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন–

---

[1]. رواه أبو حنيفة فى كتاب الآثار ومحمد فى الموطأ (ص ١٤٩) وفى كتاب الحجة على أهل المدينة (١٣٥/١) وذكره الخُوارزمى فى جامع المسانيد (٤١٧/١).

[2]. رواه ابن أبى شيبة في المصنف (رقم ٦٩١٤) وعبد الرزاق فى المصنف بمعناه (٣٤/٣)

[3]. رواه ابن أبى شيبة (رقم ٦٨٩٤) والطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد (٥٠٣/٢)

[4]. رواه عبد الرزاق (رقم ٤٦٦١) وإسناده صحيح.

لما أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب أن يقوم بالناس في رمضان، كان يوتر بهم فيقرأ في الركعة الأولى : إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة : قل هو الله أحد.[١]

হযরত উমর রা. যখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. কে রমযানে (তারাবীহ ও বিত্র এর) ইমামতির আদেশ করলেন, তখন তিনি বিত্র নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা কাদর, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ। [সালাতুল বিত্র লিল মারওয়াযী–পৃ.২৭৯]

৬. হুমাইদ রহ. বলেন–

عن أنس رضي الله عنه قال: الوتر ثلاث ركعات، وكان يوتر بثلاث ركعات.[٢]

হযরত আনাস রা. বলেছেন– বিত্র নামায তিন রাকাত। তিনি নিজেও তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯৩ তহাবী ১/২০২ সালাতুল বিত্র লিল মারওয়াযী– পৃ.২৬৪ এর সনদ সহীহ– আদদিরায়াহ, নুখাবুল আফকার ৩/২৮১]

৭. আবু গালিব রহ. বলেন–

كان أَبو أُمامة يُوتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ.[٣]

হযরত আবু উমামা রা.তিন রাকাতে বিত্র পড়তেন। [ইবনে আবী শাইবা ৪/ ৪৯১হা.৬৮৯৬ তাহাবী শরীফ ১/২০২]

৮. আবু মানসূর বলেন–

---

[١]. رواه ابن نصر المروزى فى صلاة الوتر (ص ٢٧٩)

[٢]. رواه ابن أبي شيبة (رقم٦٨٩٣) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢٠٢/١) وابن نصر فى صلاة الوتر (ص ٢٧٠) وقال الحافظ فى الدراية : إسناده صحيح. وقال العينى فى نخب الأفكار (٢٨١/٣) أخرجه من طريقين صحيحين.

[٣]. رواه ابن أبي شيبة (رقم ٦٨٩٦) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢٠٢/١)

قال : سألتُ عبدَ الله بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر، فقال: ثلاثٌ.[1]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করেছি– বিত্র কয় রাকাত? তিনি বললেন– তিন রাকাত। [তহাবী ১/২০৩]

অনুরূপ তাবেয়ীদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে যুবাইর, আলকামা, ইবরাহীম নাখায়ী, জাবের ইবনে যায়েদ, হাসান, ইবনে সীরীন, কাতাদাহ, বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আলমুযানী, মুয়াবিয়া ইবনে কুররা, ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া প্রমুখ থেকেও তিন রাকাত বিত্র পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি হযরত সুফ্ইয়ান ছাউরী র. তাঁর অনুসরণীয় পূর্বসূরি মহা মনীষীদের তিন রাকাত বিত্র পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন– 'তাঁরা তিন রাকাত বিত্রে তিনটি সুনির্দিষ্ট সূরা পড়াকে মুস্তাহাব মনে করতেন। [দ্রষ্টব্য- আমাদের এ কিতাবের বিত্র অধ্যায় (খ) অংশে ৯ নং আছার]

খ. এক সালামে তিন রাকাত বিতর ও দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহ্হুদ

১. সা'দ ইবনে হিশাম বলেন–

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه أخذه أهل المدينة .[2]

---

[1]. رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢٠٣/١)

[2]. رواه الحاكم فى المستدرك (٣٠٤/١ رقم ١١٣٩) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١٩٣/١) والنسائى فى السنن (٢٢٨/١ رقم ١٦٩٨) وابن أبي شيبة (رقم ٦٩١٣) ومحمد فى كتاب الحجة فى أهل المدينة (١٣٧/١) وقال العينى فى نخب الأفكار(٢١٤/٣) : صحيح على شرط الشيخين. وقال محمود سعيد فى التعريف (٤٤٠/٤) : الحديث صحيح حجة لا تفردَ فيه ولا شذوذ، وقال النووي في المجموع (١٧/٤) : حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

'আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন এবং শেষ রাকাতের পূর্বে সালাম ফেরাতেন না'। মুসতাদরাকে হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে– 'আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রা.ও বিত্‌র এভাবে পড়তেন এবং তাঁর কাছ থেকেই মদীনাবাসী এ আমল গ্রহণ করেছে'।

ইমাম হাকেম, যাহাবী, আইনী, নববী ও আনওয়ার শাহ কাশমীরী প্রমুখ হাদীসটি সহীহ বলেছেন। [বিস্তারিত পর্যালোচনা অংশ দ্রষ্টব্য] [আলমুসতাদরাক ১/৩০৪ হা.১১৮১ তহাবী ১/১৯৩ নাসায়ী ১/২২৮ হা.১৬৯৮ ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩-৪৯৪ হা.৬৯১৩ কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা ১/১৩৭ ৩/২১৪ বিখ্যাত অনেক হাদীসবিশারদই এটিকে সহীহ বলেছেন– আত্তা'রীফ ৪/৪৪০]

উল্লেখ্য যে, হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম যাহাবী ও ইবনে হাযম জাহেরী রহ. প্রমুখ বলেন– **এ হাদীস থেকে বুঝা যায় নবীজীর বিত্‌র নামায ছিল তিন রাকাত এক সালামে। তবে তাতে মাগরিবের নামাযের মত মাঝে বৈঠক করতেন।** [আত্‌তানকীহ লিয্ যাহাবী ১/৩২৬ আল-মুহাল্লা ২/৮৯ আত্তাহকীক ফী মাসায়িলিল খিলাফ ও আততানকীহ লি ইবনে আব্দীল হাদী]

ورواه النسائي بإسناد حسن، ورواه البيهقي في السنن الكبير بإسناد صحيح، وقال الكشميرى :سند الحديث فى غاية القوة. وراجع كشف الستر ص ٨٩-٩٠.

وقال الذهبي فى التنقيح (١/٣٢٦) : بعد هذاالحديث - قلنا: يجوز هذا أن يوتر بثلاث بسلام واحد، **لكن يتشهد بينهم كالمغرب**. وقد قال قبله الإمامُ ابن الجوزي في التحقيق : وهذا لا حجة لهم فيه (أي للمالكية في التسليم بين الركعتين والثالثة)، فإنه جائز عندنا أنه يوتر بثلاث بسلام واحد، **ولكن يجلس عقيب الثانية**، وكذا قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى ٨٩/٢ حيث قال: والثاني عشر: **أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في الثانية، ثم يقوم دون تسليم** ويأتي بالثالثة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، كصلاة المغرب، وهو اختيار أبي حنيفة لما حدثناه ... عن سعد بن هشام بن عامر: أن عائشة أم المؤمنين حدثته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

২. তিন রাকাতে তিন কেরাত পড়ার আলোচনায় হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর উল্লিখিত বর্ণনায় সহীহ সনদে রয়েছে–

«كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف» [1]

'তিনি তিন রাকাতে বিতর পড়তেন। আর তিন রাকাত পূর্ণ করেই সালাম ফেরাতেন'। সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে– «ولا يسلم إلا في آخرهن» 'তিন রাকাত পূর্ণ করেই সালাম ফেরাতেন'। [শরহু মুশকিলিল আছার ১১/৩৬৮ হা.৪৫০১ নাসায়ী হা. ১৭০১ শুআইব বলেছেন– এর সনদ সহীহ]

৩. ছাবেত আল বুনানী র. বলেন– হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.আমাকে বলেছেন, হে আবু মুহাম্মাদ! (ছাবেত এর উপনাম) আমার কাছ থেকে শিখে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি। আর তিনি আল্লাহ তা'আলা থেকে গ্রহণ করেছেন। তুমি শেখার জন্য আমার থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য অন্য কাউকে পাবে না। ছাবেত বলেন–

ثم صلى بي العشاءَ، ثم صلى ست ركعات يُسلم بين الركعتين، ثم أوتر بثلاث يسلم في آخرهن. [2]

---

[1]. رواه الطحاوى فى مشكل الآثار (٣٦٨/١١) قال شعيب: إسناده صحيح، والنسائي فى السنن (رقم ١٧٠١) والبيهقي في الكبرى (رقم ٥٠٥٩)

[2]. رواه ابن عساكر فى التاريخ (٣٦٣/٩) فى ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه، وروى الترمذى نفس هذا الحديث مقتصرا على بعض متنه بهذالإسناد فى مناقب أنس (رقم٣٨٣١) وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، قال الكشميرى :سنده قوى كما فى معارف السنن (٢٠٩/٤)، وقال السيوطي: رواه الروياني وابن عساكر ورجاله ثقات، كذا في كنز العمال (رقم ٢١٩٠٢)

قلت : ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ٦٩١٠) وإسناده صحيح ، ورواه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار (٢٠٦/١)

অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামায পড়লেন। এর পর ছয় রাকাত নামায পড়লেন এবং এর প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরান। তারপর তিন রাকাতে বিত্‌র পড়লেন এবং সবশেষে সালাম ফেরান।

[তারীখে দিমাশ্‌ক লি ইবনে আসাকির ৯/৩৬৩ আনাস ইবনে মালেক অধ্যায়। সুনানে তিরমিযী হা.৩৮৩১। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. বলেন– এ হাদীসের সনদ শক্তিশালী, মা'আরিফুস সুনান ৪/২০৯ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য– কানযুল উম্মাল হা.২১৯০২ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন– তাহাবী ১/২০৬ ও ইবনু আবী শাইবা হা.৬৯১০ এর সনদ সহীহ]

অন্য বর্ণনায় ছাবেত আল বুনানী বলেন–

صليت مع أنس وبت عنده قال : فرأيته يصلى مثنى مثنى، حتى إذا كان في آخر صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب. [1]

আমি হযরত আনাস রা. এর ঘরে রাত্রি যাপন করেছি এবং তাঁর সাথে নামায পড়েছি। তাঁকে দেখেছি রাতে দুই রাকাত করে নামায পড়েছেন। এবং সব শেষে মাগরিবের নামাযের মত তিন রাকাত বিত্‌র পড়লেন। [মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৪৬৩৬ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী- পৃ. ১২৩]

৪. হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخصْ رأسَه ولم يصوِّبْه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما، وكان إذا

---

[1]. رواه عبد الرزاق (رقم ٤٦٣٦، ٤٦٦٢، ٤٦٦٣) وابن نصر فى صلاة الوتر (ص ٢٧٠)

رفع رأسه من السجدة لم يسجدْ حتى يستوى جالسا، وكان يقول **فى كلِّ ركعتين التحية** ... [১]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতেন তাকবীর দিয়ে এবং কেরাত শুরু করতেন ‘আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ দিয়ে। রুকুতে মাথা উপরেও উঠাতেন না আবার নিচেও নামাতেন না। বরং মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন। রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাড়িয়ে সেজদায় যেতেন না। এক সেজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে না বসে আরেক সেজদায় যেতেন না। আর তিনি বলতেন– **নামাযের প্রতি দুই রাকাতেই একবার আত্তাহিয়্যাতু পড়বে। ...** [সহীহ মুসলিম হা.১১৩৮]

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত। তবে দুই রাকাতে অবশ্যই তাশাহহুদ পড়তে হবে। এ বিষয়ক আরো বর্ণনা সামনে আসছে। আর দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ ব্যতিত তিন রাকাত বিতর পড়ার কোন দলিল নেই। এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্ট অংশে করা হয়েছে।

সাহাবা-তাবেয়ীনও একই নিয়মে বিত্‌র পড়তেন। এখানে কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরা হল:

১. মাকহুল র. বলেন–

عن عمر بن الخطاب أنه أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لم يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلامٍ. [২]

হযরত উমর রা. তিন রাকাতে বিত্‌র পড়লেন। এবং দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফেরাননি। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯২ হা.৬৯০১]

২. মিস্‌ওয়ার ইবনে মাখরামা রা. বলেন–

دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر انى لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن. [১]

---

[1]. رواه مسلم فى الصحيح (رقم ١١٣٨)

[2]. رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٩٠١)

আমরা রাতের বেলা হযরত আবু বকর রা.এর দাফন সম্পন্ন করলাম। তখন হযরত উমর রা. বলেন– আমি বিত্র পড়িনি। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছনে কাতার বাঁধলাম। তিনি তিন রাকাত নামায পড়লেন এবং সবশেষে সালাম ফিরালেন। [তহাবী ১/২০৬ ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯১ হা.৬৮৯১ মুসান্নাফে আব্দুররায্যাক ৩/২০ সালাতুল বিত্র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭০ কাশমীরী রহ. বলেন– এর সনদ সহীহ]

৩. হাবীব আল-মুআল্লিম বলেন–

قيل للحسن: إن ابن عمر كان يُسلم في الركعتين من الوتر؟ فقال : كان عمرُ أفقه منه – كان ينهض في الثالثة بالتكبير. [২]

অর্থ: হাসান বসরী কে জিজ্ঞেস করা হল– আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. (তিন রাকাত) বিত্রের দুই রাকাতের পর সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাত পৃথক পড়তেন? তিনি বলেন হযরত উমর রা. তাঁর থেকে বেশী প্রজ্ঞাবান ছিলেন– তিনি (দ্বিতীয় রাকাতে স্বাভাবিক নিয়মে বৈঠক শেষে সালাম না

---

[১]. رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم٦٨٩١) والطحاوي (٢٠٦/١) وعبد الرزاق (٢٠/٣) ومحمد بن نصر المروزى فى صلاة الوتر (ص٢٧٠) وقال الكشميري في العرف الشذي (١٠٥/١) : إسناده صحيح.

[২]. رواه الحاكم فى المستدرك (رقم ١١٤١) والبيهقى فى السنن الكبرى (رقم ٥٠٠٣) ومحمد بن نصر فى صلاة الوتر (ص ٢٧٠) ورجاله ثقات ما خلا شيخ الحاكم –أحمد بن محمد السمرقندى (هو أبو يحيي أحمد بن محمد بن صالح الحافظ السمرقندي) وهو ثقة، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٦٥٩) وقد روى عنه الحاكم فى مواضع من صحيحه وصحَّح له (رقم ٧١٥٧) ووافقه الذهبيُّ فيه فى التلخيص، ووَصَفَه الحاكم –بـ"الحافظ" فى إسناد عند البيهقى فى شعب الإيمان (رقم ٩٥٦٤) وذكرحديثَه الحافظ فى فتح الباري (٥٥٨/٢) وسكت عنه، بل رضيه وأورده في مقام الإحتجاج، فالإسناد لا يقل عن الحسن.

ফিরিয়ে) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। [আলমুসতাদরাক হা. ১১৪১; সুনানে কুবরা– বাইহাকী হা. ৫০০৩; সালাতুল বিত্‌র- মারওয়াযী পৃ.২৭০ । এ হাদীসের সনদ সহীহ । হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও মৌনভাবে এর সমর্থন করেছেন– ফাতহুল বারী ২/৫৫৮]

৪. আবু ইসহাক বলেন–

كان أصحاب على وأصحاب عبد الله لاَ يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيَ الْوِتْرِ. (١)

হযরত আলী রা. ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্যগণ বিত্‌রের দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরাতেন না। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯১১ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭১]

৫. হিশাম ইবনুল গায্ র. বলেন–

عن مكحول أنه كان يُوتِرُ بِثَلاَثٍ، لا يُسَلِّمُ إلا فِي آخِرِهِنَّ. (٢)

অর্থ: হযরত মাকহুল র. তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন। সালাম ফিরাতেন তিন রাকাত পূর্ণ করেই। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৬ এর সনদ সহীহ]

৬. হাম্মাদ (ইবনে আবী সুলাইমান) র. বলেন–

نهاني إبراهيم أَنْ أُسَلِّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ. (٣)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী র. বিত্‌রের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফিরাতে নিষেধ করেছেন। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৮]

৭. কাতাদাহ রহ. বলেন–

عن سعيد بن المسيب قال : لا يُسَلَّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ. (١)

---

[1] . رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٩١١) ومحمد بن نصر (ص٢٧٠) إسناده صحيح.

[2] . رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٩٠٦) وإسناده صحيح.

[3] . رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٩٠٨) وإسناده صحيح.

হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন– বিত্র নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সালাম ফিরাবে না। [ইবনে আবী শাইবা ৪/৪৯৩ হা.৬৯০৭ এর সনদ সহীহ]

৮. আবুয-যিনাদ রহ. বলেন–

عن السبعة، سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، والقَاسِم بن محمدٍ، وَأَبِي بَكْر بن عبد الرَّحمنِ، وخَارِجَةَ بن زَيْدٍ، وعُبَيْدِ اللَّهِ بن عبد اللَّهِ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ – فِي مَشْيَخَةٍ سِوَاهُمْ أَهْلِ فِقْهٍ وصلاحٍ وَفَضْلٍ، وَرُبَّمَا اختَلَفوا في الشَّيْءِ فَأُخذَ بِقَوْلِ أَكثرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ رَأْيًا، فَكَانَ مِمَّا وَعَيْتُ عنهم عَلَى هذه الصِّفَةِ : أَنَّ الْوِتْرَ ثلاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، **(قال الطحاوي:) فهذا مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَائِهِمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.** [২]

অর্থ: আমি মদীনার বিখ্যাত 'সাত ফকীহ' অথাৎ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, উরওয়া ইবনে যুবাইর, আবু বকর ইবনে আব্দুররহমান, খারিজা ইবনে যায়েদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার– এর যুগ পেয়েছি। তাছাড়া আরো অনেক শায়খের যামানা পেয়েছি– যারা ইলম ও তাকওয়ায় অনন্য ছিলেন। কখনো তাদের মধ্যে মতভেদ হলে তাদের অধিকাংশের মত অনুযায়ী কিংবা প্রাজ্ঞতার বিচারে যিনি অগ্রগণ্য তার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হত। এই মূলনীতি অনুসারে তাদের যে সব সিদ্ধান্ত আমি ধারণ করেছি তন্মধ্যে

---

[১]. رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٩٠٧) وإسناده صحيح.

[২]. رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢٠٧/١) وقال العينى فى نخب الأفكار (٢٨٩/٣) : رجاله ثقات، وقال النيموى فى آثار السنن (ص ٢٠٤) ويوسف البنُورى فى معارف السنن (٢٢٧/٤) وأبو الوفا الأفغانى فى التعليق على كتاب الآثار (٣٢٢/١): إسناده حسن. ويؤيده آثر الحسن الآتي بقوله : أجمع المسلمون أن الوتر ثلاث.

একটি হচ্ছে– তাঁরা সকলে একমত হয়েছেন– বিত্র নামায তিন রাকাত; আর শেষ রাকাতেই কেবল সালাম ফিরাবে। (ইমাম তাহাবী রহ. বলেন– সুতরাং বুঝা যায় মদীনার যে সকল ফকীহ ও আলেমের নাম উল্লেখ করা হল তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, বিতর তিন রাকাত এবং সালাম হবে তিন রাকাত পূর্ণ করেই। [তাহাবী ২/২০৭ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

৯. আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস– সুফ্ইয়ান ছাউরী র. তাঁর পূর্বসূরি তাবেয়ীদের বিত্র নামাযের বিবরণে বলেন–

كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى : سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون، **ثم يتشهَّد، وينهَضُ**، ثم يقرأ في الثالثة : قل هو الله أحد. [1]

অর্থ: তাঁরা তিন রাকাত বিত্রের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন পড়তেন। **তারপর বসে তাশাহহুদ পড়ে আবার উঠে দাঁড়াতেন** এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়তেন। [সালাতুল বিত্র– মারওয়াযী পৃ. ২৭৯ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন– এর সনদ সহীহ– নাতাইযুল আফ্কার ২/১১৪, ৫০৩]

গ. বিতর নামায মাগরিবের মত দুই বৈঠক ও এক সালামে

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلاَثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. [2]

---

[1]. رواه محمد بن نصر فى صلاة الوتر (ص ٢٧٩) وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني فى نتائج الأفكار (٢/١١٤ و ٢/٥٠٣) : أخرج محمد بن نصر بسندٍ صحيحٍ عن سفيان الثورى به.

[2]. رواه الدارقطني فى السنن (رقم ١٦٧٢) رجاله ثقات إلا يحي بن زكريا، فضعَّفه بعضهم ولم يصب، قال الحافظ فى اللسان: يحيي بن زكريا بن أبي الحواجب عن الأعمش، قال الدارقطني

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– দিনের বিত্‌র মাগরিব এর মত রাতের বিত্‌রও তিন রাকাত। [দারাকুতনী হা.১৬৭২]

হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। তবে অনেকে এটিকে ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য হিসেবে সহীহ বলেছেন। [বিস্তারিত দেখুন পর্যালোচনা অংশে]

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন–

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. [১]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– দিনের বিত্‌র হল মাগরিবের নামায। তোমরা রাতের নামাযকেও অনুরূপ বিত্‌র করে পড়। [মুসনাদে আহমদ হা.৪৮৪৭ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য– শুয়াইব আরনাউত। ইবনে আবী শাইবা ৪/৪ হা.৬৭৭৩, ৬৭৭৮ আব্দুর রাযযাক হা.৪৬৭৫ তাবারানী– সগীর ও আওসাত। হাফেজ ইরাকী রহ. বলেন– এর সনদ সহীহ, আত্তা'লীকুল মুমাজ্জাদ পৃ.১৪৭ শরহুয্ যুরকানী আলাল মুয়াত্তা]

ضعيف، قلت : يحتمل أن يكون الذي قبله انتهى. قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات، وأجاب الحافظ ابن حجر عن قول الدارقطني بأن المراد به غيره، فالإسناد حسن.

[১] . رواه أحمد فى المسند (رقم ٤٨٤٧)، وقال شعيب : رجاله ثقات رجال الشيخين ...، وقال برقم ٥٥٤٩ صحيح دون قوله : صلاة المغرب ...، ورواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٧٧٣) وعبد الرزاق (رقم ٤٦٧٥) والطبراني في الصغير (رقم ١٠٨١) والأوسط (رقم ٨٤١٤)، وقال الحافظ العراقي : **إسناده صحيح** كذا في التعليق الممجد (ص ١٤٧) وكذا نقله الزُّرْقاني في شرح الموطأ في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.

وقد رواه بعضهم موقوفا على ابن عمر بإسنادٍ صحيحٍ كما رواه مالك في الموطأ، وهو في حكم المرفوع كما هو ظاهر. (قلت: تشبيهه بصلاة المغرب فقد فسره ابن مسعود والحسن وابن عبد البر والبيهقي والذهبي في التنقيح وغيرهم)

মুয়াত্তা মালেকসহ কোন কোন কিতাবে অন্য সহীহ সনদে একই কথা হযরত ইবনে উমরের বক্তব্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত বর্ণানাদুটিই (মারফু ও মাউকুফ) আপন আপন স্থানে সঠিক। আর যদি একে 'মউকুফ' তথা ইবনে উমরের বক্তব্যই বলা হয় তবু তা 'মরফু' হুক্মী বলে বিবেচিত হবে। কেননা একজন সাহাবী নামাযের মত একটি স্বতসিদ্ধ বিধানের ক্ষেত্রে না জেনে নিজের পক্ষ থেকে এরূপ বক্তব্য দিতে পারেন না। তাই ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন–

وبهذا نأخذ، وينبغي لمن جعل المغربَ وترَ صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وترُ صلاةِ الليل مثلَها لا يفصل بينهما بتسليم كما لا يفصل في المغرب بتسليم وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله.

আমরা এ বর্ণনাটি গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি ইবনে উমরের বক্তব্য অনুসারে বিতরকে মাগরিবের নামাযের অনুরূপ মনে করে, তার উচিত মাগরিবের মতই বিতর পড়া। যাতে দুই রাকাতের পর সালাম ফিরাবে না। এটিই ইমাম আবুহানীফা রহ. এর মত। [মুয়াত্তা মালেক– ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা পৃ.১৪৯] বর্ণনাদুটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্টে করা হয়েছে।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন–

الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ. [1]

অর্থ: দিনের বিত্র মাগরিব এর মত রাতের বিত্রও তিন রাকাত । [ইবনে আবী শাইবা ৪/ হা.৬৭৭৯ আল মু'জামুল কাবীর হা.৯৪২১-৯৪২২ এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের মানোত্তীর্ণ, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ– হা.৩৪৫৫ বাইহাকী রহ. বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। আস সুনানুল কুবরা ৩/৩০]

---

[1]. رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٧٧٩) ومحمد في الموطأ وقال فى مجمع الزوائد (٣٤٥٥) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: صحيح من حديث ابن مسعود من قوله.

ইমাম বাইহাকী র.তাঁর সুনানে কুবরায় এর শিরোনাম দিয়েছেন– (باب مَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَوْصُولَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَسْلِيمٍ.) “দুই বৈঠক ও এক সালামে এক সাথে তিন রাকাত বিত্‌র অধ্যায়।” এটি বিতর নামাযের সেই পদ্ধতিই যা আমরা এখানে আলোচনা করছি।

৪. উক্‌বা ইবনে মুসলিম বলেন–

سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر؟ فقال : أَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ قَالَ : صَدَقْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ . [১]

অর্থ: আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলাম– বিত্‌র নামায পদ্ধতি সম্পর্কে। তিনি বললেন– তুমি দিনের বিত্‌র চেন না? বললাম হাঁ, মাগরিবের নামায। বললেন, ঠিক বলেছ। (রাতের বিত্‌রও ঠিক এরকমই)। [তহাবী ২/১৯৭]

৫. হাসান বছরী র. বলেন–

كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب. [২]

অর্থ: হযরত উবাই ইবনে কা‘ব রা. তিন রাকাতে বিত্‌র পড়তেন এবং তাতে মাগরিবের মতই তৃতীয় রাকাতের আগে সালাম ফিরাতেন না। [মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৪৬৫৯-৪৬৬০ এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

---

[১]. رواه الطحاوی فی شرح معانی الآثار (١٩٧/١) وإسناده صحيح.

[২]. رواه عبد الرزاق (رقم ٤٦٥٩، ٤٦٦٠) ورجاله ثقات، ورواه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ٢٧٠).

فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أنَّ ذلك هو السنة، لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، كذا فى الفتاوى الكبرى (٢/٢٤٥)

অর্থ: বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. তাঁর ইমামতিতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবীহ, অতঃপর **তিন রাকাত বিতর** পড়তেন। তাই অনেক উলামা মনে করেন তারাবীহর এটিই প্রকৃত সুন্নত। কারণ তিনি অনেক মুহাজির-আনছারের সামনে এ নামায পড়েছেন। তাঁদের কেউই এর বিরোধিতা করেননি বা একে ভুল আখ্যা দেননি। [আল-ফাতাওয়াল কুব্‌রা–২/২৪৫]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

الوتر كصلاة المغرب. [١]

অর্থ: বিত্‌র নামায মাগরিবেরই অনুরূপ। [মুয়াত্তা মুহাম্মদ পৃ.১৫০ কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ ১/১৩৬]

৭. যিয়াদ ইবনে আবী মুসলিম র.বলেন–

سألتُ أبا العالية وخِلاساً عن الوتر؟ فقالا: اَصْنَع فِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ. [٢]

অর্থ: আমি (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) আবুল'আলীয়া ও খিলাসকে জিজ্ঞেস করলাম– বিত্‌র নামায কিভাবে পড়ব? তাঁরা উভয়ে বললেন– মাগরিবের নামাযে যা যা কর বিত্‌র নামাযেও তাই করবে। [ইবনে আবী শাইবা হা.৬৯০৯]

---

[1] . رواه محمد فى الموطأ (ص١٥٠) وفى كتاب الحجة على أهل المدينة (١/١٣٦)

[2] . رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٩٠٩)

৮. আবুখাল্‌দা আবুল ‘আলীয়াকে বিত্‌র নামাযের তরীকা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন–

عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَلَّمُونَا أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ، فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ، وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ. [১]

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন– বিত্‌র নামায মাগরিবের নামাযের মতই; পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আমরা বিত্‌রের তৃতীয় রাকাতে কেরাত পড়ি (যা মাগরিবে নেই)। এটি রাতের বিত্‌র, আর মাগরিব হল দিনের বিত্‌র। [তাহাবী- ১/২০৬ সালাতুল বিত্‌র লিল মারওয়াযী পৃ.২৭৯। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য– নুখাবুল আফকার ৩/২৭৯ এর সনদ সহীহ– আফগানী]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু আব্দিল বার রহ. বলেন–

ومعلوم أن المغرب ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن فكذلك وتر صلاة الليل.

আর এ কথা সর্বজনজ্ঞাত যে, মাগরিবের নামায তিন রাকাত। তিন রাকাত পূর্ণ করেই তবে সালাম ফিরানো হয়। ঠিক তেমনি রাতের বিতরও। [আল-ইসতিযকার ৫/২৮৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ বলে থাকেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের মত বিত্‌র পড়তে নিষেধ করেছেন, তাই বিত্‌র এক রাকাত পড়বে। আর তিন রাকাত পড়লেও দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে, অথবা দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক না করে সোজা দাড়িয়ে তিন রাকাত পূর্ণ করেব।

---

[১] . رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢٠٦/١) وقال العينى فى نخب الأفكار (٢٧٩/٣) رجاله ثقات، قال المحدث البنُورى فى معارف السنن (٢٢١/٤) والأفغانى فى تعليق الآثار (٣٢٣/١) : إسناده صحيح. وأخرجه ابن نصر فى صلاة الوتر (٢٧٩)

বিত্‌রের দুই রাকাতে মাগরিবের মতই বৈঠক হবে তবে সালাম ফিরাবে না; এর দলিল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিত্‌রকে মাগরিবের নামাযের মত পড়তে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে যথার্থ বক্তব্য হল– বিত্‌রের ক্ষেত্রে শরীয়তের কাম্য এই যে, তা কিছু নফল নামায পড়ার পর আদায় করা। এজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب و لكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك. [১]

অর্থাৎ তোমরা শুধু তিন রাকাত বিত্‌র পড়ো না, এতে মাগরিবের মত হয়ে যাবে; বরং পাঁচ, সাত, নয়, এগার বা এরও অধিক রাকাতে বিত্‌র পড়ো। [আলমুসাতদরাক ১/৩০৪ হা.১১৩৭ সুনানে কুবরা-বাইহাকী ৩/৩১, ৩২]

অর্থাৎ বিত্‌র এর আগে কিছু নফল অবশ্যই পড়– দুই, চার, ছয়, আট, যত রাকাত সম্ভব হয় পড়ে নাও। (বিত্‌র অধ্যায়ের (ক) এর দ্বিতীয় হাদীসে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন, এবং দশ ও তিন– বিভিন্ন সংখ্যায় রাতের নামায পড়তেন, যেখানে তিন রাকাত ছিল বিত্‌র)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিত্‌র নামায সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত হযরত আয়েশা রা. বলেন–

لا تُوتر بِثَلاَثٍ بُتْرٍ، صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا. [২]

---

[১]. رواه الحاكم فى المستدرك (رقم ١١٣٧) والبيهقى فى السنن الكبرى (٣/٣١-٣٢)

وقال البيهقي في المعرفة (رقم ١٤٠٣) : وهذا يخالف قول من جعلها ثلاثا كالمغرب في الظاهر، والمراد من الخبر الزيادة فيها وترك الإقتصار فيها على ثلاث كما اختاره الشافعي.

[২]. رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (رقم ٦٨٩٨)، ورجاله ثقات.

অর্থাৎ শুধুই তিন রাকাত বিত্‌র পড়ো না। এটি অপূর্ণাঙ্গ নামায। বরং এর পূর্বে দুই বা চার রাকাত পড়ে নাও। [ইবনে আবী শাইবা, হা.৬৮৯৮ এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত]

নবীজীর বিত্‌র নামাযের প্রত্যক্ষদর্শী অপর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا، وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا. [1]

অর্থাৎ রাতে শুধুই তিন রাকাত নামায পড়া আমি পছন্দ করি না। বরং অন্তত পাঁচ থেকে সাত রাকাত পড়া উচিত। [হাফেজ আইনী রহ. এটিকে সহীহ বলেছেন] ইমাম তহাবী র. এই বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন–

فهذا عندنا على أَنَّه كَرِه أَنَّه يُوتِرُ وِتْرًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ تطوُّع، وأَحَبَّ أَنْ يكون قَبْلَهُ تَطَوُّعٌ، إِمَّا رَكْعَتَانِ وَإِمَّا أَرْبَعٌ.

অর্থাৎ তিনি আগে কোন নফল নামায না পড়ে কেবলই তিন রাকাত বিত্‌র পড়াকে অপছন্দ করেন। তাঁর মতে বিত্‌রের পূর্বে অন্তত দুই বা চার রাকাত নফল নামায পড়া উচিত। [তহাবী ১/২০৩]

ঘ. রুকুর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় রাকাতে কেরাত সমাপ্ত করার পর রুকু করার পূর্বে দুআয়ে কুনূত পড়তেন।

১. আসিম আহ্‌ওয়াল বলেন–

سألتُ أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قُلْتُ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْك أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ؟ قَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ

---

[1]. رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار بطرق (٢٠٣/١) وصحح العيني إسناده في نخب الأفكار (٨٠/٥).

الرُّكُوعِ شَهْرًا أَنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ – وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا – إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ – وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ – قِبَلَهُمْ، فَظَهَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ[1].

অর্থ: আমি হযরত আনাস রা. কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ কুনূত আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন– রুকুর আগে। বললাম একজন আমাকে বলল– আপনি রুকুর পরে কুনূত পড়ার কথা বলেছেন? তিনি বললেন– সে ভুল বলেছে। রুকুর পরে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক মাস কুনূত পড়েছেন। (যা ছিল মূলত কুনূতে নাযেলা)। [সহীহ বুখারী হা.৪০৯৬]

অনুরূপ সাহাবায়ে কেরামও বিত্‌র নামাযে রুকুর পূর্বে দুআ কুনূত পড়তেন; যা সহীহ সনদে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে লা-মাযহাবীদের আস্থাভাজন আলেম স্বয়ং নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব বলেন–

وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتي بعد حديثٍ، ويشهدُ له أثار كثيرة عن كِبار الصحابة كما سنُحققه في الحديث الآتي بإذن الله تعالى. والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع في الوتر وهو الموافق للحديث الآتي، انتهى من إرواء الغليل للألباني (٢/١٦٦)

অর্থ:... সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়েছেন। যার আলোচনা একটি হাদীস পরেই আসবে। উপরন্তু বিশিষ্ট্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত অনেক আছার

---

[1]. رواه البخارى فى الصحيح (رقم ٤٠٩٦)

এর বিশুদ্ধতার জন্য দলিল। ... সারকথা হল, সাহাবীদের থেকে সহীহ সূত্রে এটিই প্রমাণিত যে, বিত্‌রের কুনূত রুকুর পূর্বে। [ইরওয়াউল গালীল ২/১৬৬]

কেরাত সমাপ্তির পর তাকবীর বলে দূ'আ কুনূত পড়বে

মাসরূক, আসওয়াদ ও ইবনে মাসউদ রা. এর আরো কতিপয় শিষ্য বলেন–

كان عبد الله «لا يقنت إلا في الوتر ، وكان يقنت قبل الركوع، يكبر إذا فرغ من قراءته حين يقنت» [১]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. শুধু বিত্‌র নামাযেই কুনূত পড়তেন। আর তা পড়তেন রুকুর পূর্বে। কেরাত সমাপ্ত করার পর তাকবীর বলে কুনূত শুরু করতেন। [মুশকিলুল আছার ১১/৩৭৪ ইবনে আবী শাইবা হা.৭০২১] এর সনদ সহীহ।

ইবনে মাসউদ রা. -এর শিষ্যবর্গও এরূপই আমল করতেন। হযরত আলী রা. থেকেও এরূপ আমল বর্ণিত হয়েছে। [ইবনে আবী শাইবা হা.৭১১৩]

ইমাম তহাবী র. বর্ণনাদুটি উল্লেখপূর্বক বলেন–

فكان هذا مما يعلم أن عليا وعبد الله لم يقولاه استنباطا، ولا استخراجا، إذ كان مثله لا يقال بالاستنباط ولا بالاستخراج، وإنما يقال بالتوقيف الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. [২]

"এ থেকে বুঝা যায় হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রা. এর এক কথা নিজ গবেষণাপ্রসূত নয়। কেননা ইবাদতের এধরণের বিষয়গুলো নিজ থেকে

---

[১]. رواه الطحاوى فى مشكل الآثار (١١/٣٧٤) وابن أبي شيبة (رقم ٧٠٢١) (وكذا ثبت عن أصحابه أيضا، وإسناده صحيح، وكذاروى عن على عند ابن أبي شيبة ٣٩/٥ (رقم٧١١٣) وغيره.

[২]. شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٧٤)

বলারও নয়। বরং এগুলো কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জেনেই বলা যায়”। [মুশকিলুল আছার ১১/৩৭৪]

তাকবীর বলে হাত তোলা ও হাত বাঁধা বিষয়ক বর্ণনাগুলি পর্যালোচনা অংশে দ্রষ্টব্য।

দু‘আয়ে কুনূত

হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে একাধিক দু‘আ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে

ক.“আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তা‘ঈ নুকা ...”

১. ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. বলেন–

وجاء في الحديث عن عمر بن الخطاب أنه كَانَ يقول في **القنوت في الوتر**: «اللهم اغفر للمؤمنين، والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين قلوبهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين،

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك ويكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار يلحق»

وكان عبيد بن عمير، وهو راوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب يقول : « بلغني أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود، وأنه يوتر بهما كل ليلة » حدثناه إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا عطاء، أنه سمع عبيد بن عمير، يأثر عن عمر بن الخطاب، أنه قال ذلك. (قلت: رجاله ثقات)

ثم قال: وممن روينا عنه، أنه قنت بالسورتين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وقد رويت في القنوت أخبارا، وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل.

অর্থ: হাদীসে এসেছে হযরত উমর রা. বিতরের কুনূতে বলতেন (اللهم اغفر للمؤمنين، والمؤمنات) "আল্লাহুম্মাগফির লিল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাত...", (**اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك،**) "..আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈ নুকা ..."।

হযরত উমর রা. থেকে এ হাদীসের বর্ণনাকারী উবাইদ ইবনে উমাইর বলতেন– (**اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك،**) এ দুটি দুআ ইবনে মাসউদ রা. এর মুছহাফে কুরআনের সূরা রূপে ছিল (যা পরে রহিত হয়ে গেছে)। তিনি দুআ দুটি দিয়ে প্রতি রাতে বিতর পড়তেন। [আল-আউসাত লি ইবনিল মুনযির ৫/২১৪)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাছর আল-মারওয়াজী বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর বলেন– অন্য বর্ণনায় বর্ধিতাংশে রয়েছে, 'বিতরে এ দুআ রুকুর পূর্বে পড়তেন' ...। [মুখতাছারু কিয়ামিল্লাইল পৃ. ৩২১-৩২২] [১]

২. আবু-আব্দুর রহমান (আসসুলামী) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন কুনূতে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ি–

---

[১]. رواه الإمام ابن المنذر في الأوسط في باب ذكر الدعاء في قنوت الوتر (٥/٢١٤) وقد رواه ابن نصر المروزي في صلاة الوتر في باب ما يدعى به في قنوت الوتر عن عبيد بن عمير به غير أن فيه : "يؤثر عن عمر في القنوت"، ثم قال: وزاد هنا : "**يقول هذا في الوتر قبل الركوع**، وفي الصبح قبل الركوع" (مختصر قيام الليل ص ٣٢١-٣٢٢)، وقد روى أصل هذا الحديث الإمام البيهقي في الكبرى ٢/٢١١ وعبد الرزاق في المصنف (رقم ٤٩٦٩).

علمنا ابن مسعود رضي الله عنه أن نقرأ في القنوت : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. (১)

শব্দের সামান্য ব্যতিক্রম সহ অন্যান্য বর্ণনায়ও এ দুআ এসেছ। যেমন: এক বর্ণনায়– ونؤمن بك ونتوكل عليك -এ বাক্য দুটি বর্ধিত এসেছে। [ইবনে আবী শাইবা ১৫/৩৪৪] তহাবীর এক বর্ণনায় ونشكرك -শব্দটিও রয়েছে। [তহাবী ১/১৭৭] এর সনদ সহীহ]

এই বর্ণনাগুলির আলোকে পূর্ণ দু'আটি এভাবে পড়া যায়–

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، ونؤمن بك ونتوكل عليك، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، ونشكرك وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রতিদিন বিতর নামাযে এ দুআই পড়তেন। [মুছান্নাফে আব্দুল রাযযাক হা.৪৯৬৯ আল-আউসাত ৫/২১৪ মুখতাছারু কিয়ামিল্লাইল পৃ.২৯৭]

৩. সুনানে বায়হাকীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত জিব্রীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুনূত শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর শব্দের সামান্য তারতম্যসহ উপরোক্ত দুআটি উল্লেখিত হয়েছে। (২) [বাইহাকী

---

[1]. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ٦٩٦٥)

[2]. لفظه (٣٢٦٧) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال قرئ على ابن وهب أخبرك معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران قال : بينا رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت ، فسكت فقال : يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا،

২/২১০ আল-মুদাওয়ানা ১/১০১] বর্ণনাটি মুরসাল এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। [নাতাইযুল আফকার লি ইবনে হাজার ২/১১১]

৪. বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নাখাঈ নিজে বিতরের কুনূতে এ দুআ পড়াকে পসন্দ করতেন এবং অন্যকে পড়তে আদেশ করতেন। [আব্দুর রাযযাক ৩/১২১, ইবনে আবী শাইবা ৪/৫১৮]

৫. আমর বলেন– তাবেয়ী হাসান বসরী র. বিতর ও ফজরের কুনূতে এ দুআটিই পড়তেন। তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করল, এই দুআর অতিরিক্ত আর কিছু পড়া যাবে কি? তিনি উত্তরে বললেন–

لا أنهاكم ولكنى سمعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لايزيدون على هذا شيئا، ويغضب إذا أرادوه على الزيادة. [1]

অর্থাৎ তোমাদেরকে আমি নিষেধ করব না; তবে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে এর অতিরিক্ত কিছু পড়তে দেখিনি। ...। [মুছান্নাফে আব্দুর্‌রায্‌যাক ৩/১১৬]

তাই হানাফী ফকীহগণ ও ইমাম মালিক র. এই দুআকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম ইবনে আব্দিল বার র. বলেন–

قال الكوفيون ومالك: وليس فى القنوت دعاء موقت، ولكنهم يستحبون ألا يقنت إلا بقولهم: اللهم إنا نستعينك...انتهى [2]

অর্থ: কুফার অধিবাসী আহলে ইলমগণ ও ইমাম মালেক বলেন– দুআ কুনূত সুনির্দিষ্ট নয়। তবে তাঁরা এই দুআটি পড়া উত্তম মনে করেন।

وإنما بعثك رحمة ، ولم يبعثك عذابا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ، ثم علمه هذا القنوت : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونخضع لك ، ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا مرسل.

[1]. رواه عبد الرزاق فى المصنف (١١٦/٣)

[2]. الاستذكار (٣٠٢/٦)

খ. আল্লাহুম্মাহদিনা ফীমান হাদাইতা ...

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিত্‌রে পড়ার জন্য কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন :

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [১]

[সুনানে আবু দাউদ: ১/৫২৬; সুনানে নাসায়ী ১/২৫২ জামে তিরমিযী ১/১০৬ হা.৪৬৪ সুনানে ইবনে মাজা ১/১৮৫ মুসনাদে আহমদ হা.১৭১৮]

তাই অনেকেই উভয় দুআ একত্রে পড়তেন। সুফ্‌ইয়ান ছাউরী বলেন–

كانوا يستحبون أن يجعلوا ، في قنوت الوتر هاتين السورتين : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق، وهذه الكلمات : اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت، ويدعو بالمعوذتين. [২]

অর্থ: আমি আমার পূর্বসূরিদের দেখেছি তাঁরা বিত্‌রে উপরোক্ত দুটি দুআ পড়াকেই উত্তম মনে করতেন। [সালাতুল বিত্‌র পৃ.৩০১] মুসান্নাফ গ্রন্থকার

---

[১]. رواه وأبو داود فى السنن (٥٢٦/١) والترمذى فى السنن (رقم ٤٦٤) والنسائى (٢٥٢/١) وابن ماجة (١٨٥/١) وأحمد فى المسند (رقم ١٧١٨) وقال شعيب : إسناده صحيح.

[২]. رواه ابن نصر فى صلاة الوتر (ص ٣٠١) وقال الحافظ فى نتائج الأفكار (١١٤/٢، ٥٠٣): أخرجه ابن نصر بسند صحيح... انتهى.

ইমাম আব্দুর রাযযাকও তাই করতেন। [আল মুসান্নাফ ৩/১১৬]। শাফেয়ী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী র. বলেন– "আমাদের অনেকেই বলেন– উভয় দুআ একত্রে পড়াটাই উত্তম"। [শরহুল মুহায্যাব ৩/৪৭৫-৪৭৮]

পরবর্তী হানাফী ফকীহদের অনেকেই উভয় দুআ একত্রে পড়াকে পছন্দ করেছেন। [দেখুন, মাবসূতে সারাখসী ১/১৬৫ বাদায়েউস সানায়ে ২/২৩২]

এক রাকাত বিতর পড়া

ইমাম ইবনুছ ছালাহ বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলই এক রাকাত বিতর পড়েছেন এর কোন প্রমাণ নেই। [আততালখীছুল হাবীর ২/৩১ কাশফুস সিতর পৃ.৩৮][১] ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুধু এক রাকাত বিতর বিষয়ে কিছু বর্ণিত হয়নি। [শরহু মাআনিল আসার হা.১৬০৯] ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. শুধু এক রাকাত বিতর পড়াকে মাকরুহ বলেছেন। [আল-আউসাত–ইবনুল মুনযির ৫/১৮৪, মাসাইলে আহমদ–ইবনে হানী ১/৯৯]

কেবল হযরত আবু আইয়ুব আনছারী রা. এর একটি বর্ণনায় রয়েছে– "যে চায় এক রাকাতও বিতর পড়তে পারবে"। ইমাম নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেই বলেন– এ ক্ষেত্রে মওকুফ বর্ণনাটিই সঠিক হওয়ার অধিক উপযুক্ত। [সুনানুল কুবরা হা.১৪০৬] বরং অধিকাংশ ইমাম এটিকে মউকুফ্ তথা সাহাবীর কথা বলে আখ্যায়িত করেছেন। [আততালখীছুল হাবীর ২/৩৭]

তাছাড়া এ হাদীসের একটি বর্ণনায় রয়েছে– ومن شاء أومأ إيماء 'যার ইচ্ছা এক রাকাত পড়ে নেবে, আর যার ইচ্ছা ইশারা করে নেবে'। [সুনানে নাসায়ী হা. ১৭১৩ এর সনদ সহীহ, সুনানে নাসায়ী কুবরা হা. ১৪০৬, সহীহ ইবনে হিব্বান হা.২৪১১ আসসুনানুল কুবরা ও সুনানে সগীর–বাইহাকী হা. ৪৭৭৯-৮০ ও মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৪৬৩৩]

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্ট গ্রন্থকার- ৯ এর অধিনে আসছে।

তাহলে কি এক রাকাতও না পড়ে কেবল ইশারা করে নিলে বিতর আদায় হয়ে যাবে? এ কারণে আমাদের ধারণামতে এ বর্ণনাটি মুতাশাবিহ (রহস্যাবৃত) এবং আমলযোগ্য নয়। এর প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

সাহাবীগণের এক রাকাতে বিতর পড়া বিষয়ক কয়েকটি বর্ণনা–

১ . হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছের এক রাকাত বিতর পড়ার কথা শুনে ইবনে মাসউদ রা. বলেন– "এক রাকাত বিতর কখনো যথেষ্ট হবে না"। [কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা, ১/১৯৩, ১৯৭ তাবারানী– মাজমাউজ যাওয়াইদ, হা. ৩৪৫৭ হাইছামী বলেন– এর সনদ হাসান মুয়াত্তা মুহাম্মদ হা.২৬৪]

ইমাম মালেক সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ ও উসমান রা. এর এক রাকাত বিতর প্রসঙ্গে বলেন– (وقال مالك بن انس ومن اخذ بقوله ليس العمل عندنا على ان يوتر بواحدة ليس قبلها شفع) : যে তাঁর কথা গ্রহণ করে তার জানা দরকার যে, আমাদের এতদঅঞ্চলে তথা মদীনায় দুই রকাত যুক্ত করা ছাড়া শুধু এক রাকাতে বিতর আদায় করার উপর কোন আমল নেই। [কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলুল মদীনা. ১/১৯৩]

২. হযরত মু'আবিয়া রা. এক রাকাত বিতর পড়লে এক বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে আব্বাস রা. এর কড়া সমালোচনা করেন। [তহাবী হা.১৭৫০] তাছাড়া উপরোক্ত উভয় বর্ণনাতেই হঠাৎকরে এক রাকাত বিতর পড়তে দেখে উপস্থিত তাবেয়ীগণ বিস্মিত হয়ে সাথে সাথে প্রশ্ন তুলেছেন। এতেও প্রমাণ হয়– এভাবে কেবল এক রাকাত বিতর সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন না ।

৩. হযরত উসমান রা. এক রাকাত বিতর পড়ার বিষয়টি ছিল অনিচ্ছাকৃত। এখানেও ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত আব্দুর রহমান আত্তাইমী রা. একরাকাত বিতর পড়তে দেখে অবাক হন। পরক্ষণেই বলেন– (أوهم الشيخ) তিনি হয়ত ভুলে গেছেন। [তহাবী পৃ.২০৬]

৪. আর ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের যে 'মরফু' রেওয়ায়াতে– একরাকাত পড়তে হুকুম করা হয়েছে মূলত সেগুলোতে শুধুই এক রাকাতকে পৃথক পড়তে বলা হয়নি। একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন– "নবীজীর "صل ركعة واحدة" "একরাকাত পড়ে নাও" -ধরণের আদেশ দ্বারা তিন রাকাত বিতরকে সালামের মাধ্যমে পৃথক করে পড়া এক সাথে পড়ার চেয়ে উত্তম হওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু এধরণের শব্দ থেকে মাঝের বৈঠকে সালাম ফেরানোর বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। এও সম্ভাবনা আছে– "এক রাকাত পড়ে নাও" কথার মর্ম হলো– পূর্ববর্তী দুই রাকাতের সাথে মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পড়ে নাও। [ফাতহুলবারী ২/৫৯৩ বাবু মা জাআ ফিল বিতরি]

তাই হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল ইমাম মালেক রহ. তাঁর সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছের এক রাকাত বিতর পড়ার কথা উল্লেখপূর্বক বলেন– وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث

"আমাদের মদীনায় এর উপর আমল নাই। বরং সর্বনিম্ন বিতর তিন রাকাত"। [মুয়াত্তা মালেক–বাবুল আমরি বিল বিতরি হা.৪০৭]

দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক ছাড়া তিন রাকাত বিতর

কোন কোন ভায়েরা বলে থাকেন– বিতর তিন রাকাত পড়লেও দুই রাকাতের পর বসবেই না। অথচ একেত এর পক্ষে সহীহ ও স্পষ্ট কোন বর্ণনাই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত তিন রাকাত বিতরের উল্লিখিত সকল দলিল থেকেই একথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক হবে কিন্তু সালাম ফেরাবে তিন রাকাত পূর্ণ করে। কিছু কিছু দলিল এ বিষয়ে একেবারেই সুস্পষ্ট।

তবে শুধু হযরত আয়শা থেকে সা'দ ইবনে হিশামের বর্ণনার একটিতে রয়েছে– "يوتر بثلاث **لا يقعد** إلا في آخرهن" "নবীজী তিন রাকাত বিতর পড়তেন, শেষ রাকাতের আগে **বসতেন না**"। মুসতাদরাকে হাকেমের এ বর্ণনা থেকে মনে হয় তিন রাকাত বিতর-এ মাঝে বৈঠক করবে না।

বাহ্যত এটি এক বৈঠকে তিন রাকাত বিতর পড়ার একটি স্পষ্ট দলিল মনে হলেও মূলত এটি কেবলই বিভ্রান্তি মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্টে করা হয়েছে।

বিতর সালাত: পরিশিষ্ট

মুযাফফর বিন মুহসিন তার 'জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছালাত' বইয়ে বিতর নামায সম্পর্কেও অনেক জালিয়তি ও ভুল তথ্য পেশ করেছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন একথা প্রমাণ করার যে, বিতর ছালাত এক রাকাত অথবা তিন রাকাত হলে দুই সালামে কিংবা দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক ব্যতিত এক সালামে। এখানে সে সম্পর্কে কিছু পর্যালোচনা তুলে ধরা হল। সামনের আলোচনায় 'গ্রন্থকার' বলে সাধারণত মুযাফফর বিন মুহসিনকেই বুঝানো হয়েছে।

পর্যালোচনা: বিতর ছালাত অধ্যায়

গ্রন্থকার - ১

গ্রন্থকার বলেন– *"একাদশ অধ্যায় বিতর ছালাত: ... কিন্তু এক রাক'আত বলে কোন ছালাতই নেই এ কথাই সমাজে বেশি প্রচলিত। উক্ত মর্মে কিছু* **উদ্ভট** *বর্ণনাও উল্লেখ করা হয়–" (পৃ.৩২৫)*

পর্যালোচনা

(ক) এক রাকাত বলে কোন নামায নেই

ইমাম ইবনুছ ছালাহ (র.) বলেন, নবীজী থেকে কেবলই এক রাকাত বিতর পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। [আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩৯]

(খ) গ্রন্থকার বলেন– "উক্ত মর্মে কিছু উদ্ভট বর্ণনাও উল্লেখ করা হয়": অতঃপর গ্রন্থকার একটি মারফু ও একটি মওকুফ বর্ণনা উল্লেখ করে দুটোকেই যঈফ বলার চেষ্টা করেছেন! অভিধানে 'উদ্ভট' শব্দের অর্থ– আজগুবি কোন কথা যার কোনই বাস্তবতা নেই। গ্রন্থকারের উল্লিখিত দুটি বর্ণনাকে কোন মুহাদ্দিস জাল, ভিত্তিহীন বা উদ্ভট বলেছেন এমন কোন উদ্ধৃতি তিনি দিতে পারেননি। তিনি নিজেও সাহস করে বর্ণনা দুটির সাথে

জাল বা উদ্ভট শব্দ যোগ করতে পারেননি। বরং তিনি শুধু 'যঈফ' বলেছেন। তবে কেন 'কিছু উদ্ভট' না বলে 'কিছু যঈফ' বর্ণনা বলা হল না? আর যদি 'যঈফ'কেই তিনি 'উদ্ভট' বলে থাকেন তাহলে তা চরম অন্যায়। কারণ, হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যঈফ' (দুর্বল) ও 'মউজু' (জাল) দুটি ভিন্ন পরিভাষা। দুটোর ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। দুটোকে একাকার করে ফেলা একটি পরিভাষাকে নষ্ট ও বিকৃত করে ফেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রন্থকার - ২ (প্রথম বর্ণনা)

গ্রন্থকার 'উদ্ভট' বর্ণনার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রথমে উল্লেখ করেন– *"(ক) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছা.) এক রাক'আত বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন। তাই কোন ব্যক্তি যেন এক রাক'আত ছালাত আদায় করে বিজোড় না করে" (পৃ.৩২৫)*

পর্যালোচনা : ভুল তরজমা

এখানে তিনি হাদীসের ভুল তরজমা করেছেন। সঠিক তরজমা হল– 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বুতাইরা' থেকে নিষেধ করেছেন– (বুতাইরা হল) যে, ব্যক্তি শুধু এক রাকাত পড়বে বিতর হিসেবে'। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেন এক রাকাত বিতর না পড়ে। আর গ্রন্থকারের তরজমায় এসেছে– '*কোন ব্যক্তি যেন এক রাক'আত ছালাত আদায় করে বিজোড় না করে*'। এর অর্থ দাড়ায় ইবনে মাসউদ রা. বলতে চাচ্ছেন দুই রাকাত ছালাত আদায় করে জোড় করে নিলেই হয়!

হাদীসের আরবী পাঠটি – (أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها)

গ্রন্থকার - ৩

গ্রন্থকার আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীসটির মান নিয়ে আলোচনা করে বলেন–

১. *"আব্দুল হক বলেন– উক্ত বর্ণনার সনদে উসমান বিন মুহাম্মদ বিন রবীআ রয়েছে"*

পর্যালোচনা :

বর্ণনাকারী সম্পর্কে আব্দুল হক ইশবীলীর আপত্তি গ্রন্থকার টীকায় আরবীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– 'তার হাদীসে ভুলের সংখ্যাই বেশি'।

অন্যদিকে 'আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে (হা.২৩৪৫) উক্ত উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রাবীআর একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা (لا ضرر ولا ضرار) উল্লেখপূর্বক হাকিম আবু আব্দিল্লাহ বলেন– হাদীসটি মুসলিম শরীফের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সমর্থন করে বলেন– এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। উসমান ইবনে মুহাম্মদ এর হাদীসকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। তাই উসমান সম্পর্কে আব্দুল হকের সিদ্ধান্তই একক সিদ্ধান্ত নয়। **সুতরাং হাকেম ও যাহাবীর বক্তব্যের আলোকে আলোচ্য বর্ণনাটি সহীহ।**

আব্দুল হক ইশবীলীর মন্তব্যকে যদি সঠিক ধরেও নেয়া হয়। আর এ কারণে এ হাদীসকে যঈফ বলা হয়– তবু এর পক্ষে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে শক্তিশালী সহীহ 'মওকুফ' বর্ণনা রয়েছে যার বিবরণ সামনে আসছে। আর এ বিষয়ক মওকুফ বর্ণনাও সাধারণ নিয়মে 'মারফু হুকমী' তথা পরোক্ষ মরফু এর অন্তর্ভুক্ত, যা শাস্ত্রীয় জ্ঞান সম্পন্ন সকলেরই জানা।

গ্রন্থকার - ৪

এ হাদীস সম্পর্কে গ্রন্থকার আরো বলেন– *"ইমাম নববী বলেন এক রাকাত বিতর নিষেধ মর্মে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব -এর হাদীছ মুরসাল ও যঈফ" (পৃ.৩২৫)*

পর্যালোচনা

(ক) এক হাদীস বিষয়ক আপত্তি অন্য হাদীসে জুড়ে দেয়া

ইমাম নববীর এ বক্তব্যটি আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বর্ণনার বিষয়ে নয়। বরং বরাত হিসেবে উল্লিখিত কিতাব 'খুলাছাতুল আহকামে' (হা.১৮৮৮) ইমাম নববী আবু সাঈদ রা. বর্ণনা উল্লেখও করেননি। এবং এ বিষয়ে কোন মন্তব্যও করেননি। তিনি যা বলেছেন– তা মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (তাবেঈ) থেকে ভিন্ন সনদে বর্ণিত স্বতন্ত্র আরেকটি মুরসাল বর্ণনা সম্পর্কে! যা হানাফীদের কেউ দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

আশ্চর্য! গ্রন্থকার এক হাদীসের তাহকীকের নামে অন্য হাদীস সম্পর্কিত বক্তব্য উল্লেখ করে দিলেন!

(খ) নববী (রহ) কর্তৃক উদ্ধৃত বর্ণনাটি আবু সাঈদ (রা) এর বর্ণনার সমর্থক

উদ্ধৃত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাজী এর মুরসাল বর্ণানাটি কোন কিতাবে সনদসহ আছে তা নববী (রহ.)ও উল্লেখ করেননি। এবং তাকে কেন যঈফ বলেছেন– তার কারণও তিনি বলেননি। এতে কোন বর্ণনাকারী আছেন যার কারণে তাকে যঈফ বলতে হয় তাও তিনি চিহ্নিত করেননি। আবার তিনিই এ বর্ণনাটি তাঁর 'আল-মাজমূ' কিতাবে (৪/২২) উল্লেখ করেছেন। সেখানে এর পরবর্তী হাদীস বিষয়ে মন্তব্য করলেও এ হাদীস সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি।

আর যদি এটি যঈফও হয়ে থাকে তবুও এটি পূর্ববর্তী আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর বর্ণনার সমর্থক। এতে আবু সাঈদ (রা) এর পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাটি আরো শক্তিশালী হয়।

রয়ে গেল বর্ণনাটি 'মুরসাল' হওয়ার বিষয়। তো এটি পরিত্যাগযোগ্য মুরসাল নয়। কারণ মুহাম্মদ ইবনে কা'ব সরাসরী সাহাবী বা প্রথম স্তরের প্রবীণ তাবেঈ। ইমাম তিরমিযী রহ. কুতায়বা সূত্রে উল্লেখ করেছেন– মুহাম্মদ ইবনে কাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিবদ্দশায়ই জন্ম গ্রহণ করেছেন। [সুনানে তিরমিযী হা.২৯১০] এজন্য অনেকেই তাঁকে সাহাবীদেরও দলভুক্ত করেছেন। বরং ইবনুস সাকানের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নবীজীকে পেয়েছেন এবং একটি হাদীসও শুনেছেন। [দেখুন আল-ইসতী'আব, ২৩৪২] আর সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। তাবেঈদের মুরসালও অনেক ইমাম ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অসংখ্য অনুসারী ইমাম ও ফকীহ, ইমাম মালেক ও তাঁর অসংখ্য অনুসারী মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং ইমাম শাফেঈ ও তাঁর অনুসারী অসংখ্য মুহাদ্দিসও শর্ত সাপেক্ষে মুরসালকে গ্রহণ করেন। (আত-তামহীদ –এর ভূমিকা ১/৫-৬)

স্বয়ং নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবও মুরসালকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন– ইরওয়াউল গালীল ২/৭১)

গ্রন্থকার - ৫ (দ্বিতীয় বর্ণনা)

গ্রন্থকার 'উদ্ভট' বর্ণনার আলোচনায় উল্লেখ করেন–

عن حصين قال : بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة قال : ما أجزأت ركعة قط

(খ) হুছাইন (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসউদ (রাঃ) -এর কাছে যখন এই কথা পৌছল যে, সা'দ এক রাকআত বিতর পড়েন। তখন তিনি বললেন, আমি এক রাকআত ছালাতকে কখনো যথেষ্ট মনে করিনি। অন্যত্র সরাসরি তার পক্ষ থেকে বর্ণনা এসেছে – (عن ابن مسعود ما أجزأت ركعة قط) ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এক রাক'আত ছালাত যথেষ্ট মনে করি না"। [১] (পৃ.৩২৫-৩২৬)

পর্যালোচনা

(ক) হাদীসের তরজমায় সুস্পষ্ট ভুল

গ্রন্থকার (أَجْزَأَتْ) শব্দের অর্থ করেছেন– *'যথেষ্ট মনে করিনি/করিনা'* এটি ভুল। এর সঠিক অর্থ হল– 'যথেষ্ট হয় না বা হবে না'। আসলে গ্রন্থকার শব্দটিকে পড়েছেন– (أَجْزَأْتُ) 'আজ্‌যা'তু' যা এখানে সঠিক নয়। বিশুদ্ধ হল– (أَجْزَأَتْ) 'আজ্‌যা'আত্'। আর এ ভুলের কারণেই তিনি পরবর্তী শব্দটিকে (رَكْعَةً) 'রাক্'আতান্' – তা-এ যবর দিয়ে পড়ে আরেকটি ভুলের শিকার হয়েছেন। অথচ এখানে হবে (رَكْعَةٌ) 'রাক'আতুন্' –তা-এ পেশ।

ব্যাকরণের পরিভাষায় (رَكْعَةٌ) 'রাক'আতুন' শব্দটি (أَجْزَأَتْ) 'আজ্‌যা'আত্' এর কর্তা। কিন্তু এখানে গ্রন্থকার কর্তা ধরেছেন ইবনে মাসউদকে। অথচ আরবী ভাষা এর সমর্থন করে না। কেননা (أَجْزَأَتُ) 'আজ্‌যা'তু' শব্দটি নির্গত হয়েছে – (إِجْزَاء) 'ইজ্‌যা' (মূলে– ج، ز، ي জা-যা-ইয়া) থেকে। আর শব্দটি (لازم) অকর্মক ক্রিয়া (ওহ ঃৎধহংরঃরাব) এর অর্থ হওয়া বুঝায়। একে (متعدي) সকর্মক ক্রিয়া (ঞ্রৎধহংরঃরাব) করতে হলে পরবর্তী শব্দে (باء) 'বা' বর্ণটি যোগ করতে হয়। এখানে শব্দটি (باء) 'বা' ব্যতীতই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর দ্বারা 'যথেষ্ট মনে করা' অর্থ নেয়া সুস্পষ্ট ভুল।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রন্থকার এ হাদীসের তাহক্বীকের বরাত দিয়েছেন– (টীকা নং ১২৫৮) তাহক্বীক মুওয়াত্তা মুহাম্মদ। অর্থাৎ ড. তকীউদ্দীন নদবীর তাহক্বীক যার গ্রন্থকারের টীকা (নং ১২৫২) থেকে স্পষ্ট। আর তকীউদ্দীন নদবী তার কিতাবে (২/১৭-১৮) হাদীসটিতে হরকত দেওয়া রয়েছে এভাবে (أجزأتْ) 'আজ্‌যা'আত্' ও (ركعةٌ) 'রাক'আতুন'। গ্রন্থকারের বরাত দেওয়া থেকে বুঝা যায় এ কিতাবটিও তার কাছে ছিল। কিন্তু তার পরও কেন এত বড় ভুল এর রহস্য আল্লাহ তাআলাই ভার জানেন।

গ্রন্থকার - ৬

গ্রন্থকার বর্ণনাদুটি উল্লেখপূর্বক লেখেন– *"তাহক্বীক: ইমাম নববী উক্ত আছার উল্লেখ করার পর বলেন– এটি যঈফ ও মাউকুফ। ইবনু মাসউদের সাথে হুছাইনের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।" (পৃ.৩২৬)*

পর্যালোচনা

(ক) গ্রন্থকারের তাহক্বীক!

গ্রন্থকার ইমাম নববীর বক্তব্যের কোন বরাত উল্লেখ করেননি। আমি ইমাম নববীর এবক্তব্যটি পেয়েছি– তার 'খুলাছাতুল আহকাম' গ্রন্থে (হা. ১৮৮৯)। কিন্তু এতে তিনি উক্ত বর্ণনাকে যঈফ বলার কোন কারণ উল্লেখ করেননি। আর এটাকেই গ্রন্থকার 'তাহক্বীকের' নামে চোখ বুজে মেনে নিয়েছেন।

(খ) বর্ণনাটি কি যঈফ?

বর্ণনাটি পেয়েছি– 'আল মু'জামুল কাবীর– তাবারানী (হা.৯৪২২), মুআত্তা মালেক– ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা (হা.২৬৪) কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা (১/১৯৭) এ তিনটি কিতাবে।

তিন কিতাবে বর্ণিত বর্ণনাটির সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাই একে যঈফ বলার সুযোগ নেই (দেখুন– তাবারানীর সনদ– ১. আলী ইবনে আব্দিল আযীয (সিয়ার) ২. আবূ নুআইম ফাযল ইবনে দুকাইন (তাহ্যীব) ৩.ক্বাসেম ইবনে মা'ন (সিয়ার) ৪.হুছাইন ইবনে আব্দির রহমান (তাহ্যীব)। মুয়াত্তা ও কিতাবুল হুজ্জার সনদ– ১.আবু ইউসূফ ২.হুছাইন ইবনে আব্দুর রহমান ৩.ইবরাহীম আন নাখাঈ। নূরুদ্দীন হাইসামী তাবারানীর বরাত দেওয়ার পর বলেন– এর সনদ হাসান। (মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৪২ হা.৩৪৫৭)

অতঃপর গ্রন্থকার বলেছেন– "এটি মওকুফ"। তাতো বটেই। কিন্তু এটি মওকুফ তথা সাহাবীর কথা হলেও– এ অধ্যায়ে 'মারফুয়ে হুকমী' তথা পরোক্ষ মারফূ। (নছবুর রায়া– বরাতে মুয়াত্তা মুহাম্মদের টীকা– তাকী উদ্দীন নদবী ২/২২) আবার গ্রন্থকার নিজেও তার গ্রন্থের বিতর অধ্যায়েই (পৃ.৩৩২ ও ৩৩৩) একটি মওকুফ বর্ণনা ও দুটি তাবেঈর আমল দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন!

(গ) রয়ে গেল গ্রন্থকারের কথা *–"ইবনু মাসউদের সাথে হুছাইনের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি"*

গ্রন্থকার এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন– বর্ণনাকারী হুছাইন হযরত ইবনে মাসউদকে পাননি। তাই এটি সূত্রবিচ্ছিন্ন। নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর

মাজমাউয যাওয়াইদ (২/২৪২) গ্রন্থে কেবল তাবারানীর বর্ণনা সম্পর্কেই এ সূত্র বিচ্ছিন্নতার আপত্তি করেছেন।

কিন্তু মুয়াত্তা ও কিতাবুল হুজ্জার বর্ণনায় রয়েছে হুছাইন বর্ণনাটি ইবরাহীম নাখাঈ থেকে শুনেছেন। সুতরাং হুছাইন ইবনে মাসউদের সাক্ষাৎ পাওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। এমনকি 'নছবুর-রায়া' ও 'আদ্-দিরায়া' গ্রন্থে উদ্ধৃত তাবারানীর বর্ণনাতেও রয়েছে– হুছাইন বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম থেকে ।

কারো প্রশ্ন হতে পারে, নুরুদ্দীন হাইসামীও এ কথা বলেছেন? তাহলে বলবো তিনি শুধু তাবারানীর বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন। হয়ত তাঁর কাছে সংরক্ষিত তাবারানীর কপিতে এমনই ছিল। কিন্তু ইমাম যাইলাঈ হাইসামীল আগের এবং ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর পরের। তাদের দুজনের কপিতে ছিল এর ব্যতিক্রম। তাছাড়া হাইসামী সকল বর্ণনাকে অনির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি। এবং সাথে সাথে তিনি বলেছেন– 'এর সনদ হাসান'। গ্রন্থকার যদি হাইসামীল বক্তব্যই উদ্ধৃত করে থাকেন– তাহলে 'এর সনদ হাসান' –এ কথাটি বাদ দিলেন কোন উদ্দেশ্যে?

আর ইবরাহীম নাখাঈ (রহ.) হযরত ইবনে মাসউদ থেকে সরাসরি হাদীস না শুনলেও মুহাদ্দিসগণের নিকট স্বীকৃত যে, ইবনে মসউদ থেকে তাঁর সকল বর্ণনা মুরসাল হলেও গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণ্য। ইবরাহীম নাখাঈ (রহ.) বলেন– 'ইবনে মাসউদ থেকে যখন কোন বর্ণনা এক ব্যক্তি সূত্রে শুনি তখন তার নাম উল্লেখ করি। আর যখন একাধিক ব্যক্তি থেকে শুনি তখন তাদের নাম বাদ দিয়ে সরাসরি ইবনে মাসউদ থেকেই বর্ণনা করি'। [দেখুন সুনানে দারা কুতনী– ৪/২২৬ হা.২৯৩৬ কিতাবুল ইলাল- তিরমিযী]

তদুপরি কিতাবুল হুজ্জাহ এর পরবর্তী বর্ণনাটিতেই ইবরাহীম নাখাঈ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এ কথাটিই ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন– আলকামার সূত্রে। সুতরাং বুঝা যায় পূর্বের বর্ণনাটিও ইবরাহীম আলকামাসহ অন্যদের সূত্রেই শুনেছেন। আর আলকামা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শিষ্য। সুতরাং

বাহ্যিকভাবেও বর্ণনাটি সূত্রবিচ্ছিন্ন রইল না। [দেখুন, মাহদী হাসান শাহজাহানপুরীর বক্তব্য– কিতাবুল হুজ্জার টীকা ১/১৯৭-১৯৮]

গ্রন্থকার বলেছেন– *"ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।"* কিন্তু এর কোন বরাত তিনি উল্লেখ কনেনি। আবার 'তাই' বলতে গ্রন্থকার কি 'যঈফ ও মওকুফ' বুঝিয়েছেন, না 'ইবনে মাসউদ (রা.) এর সাথে হুছাইন এর সাক্ষাত হয়নি' সেকথা বুঝিয়েছেন তাও পরিস্কার করেননি। যাই হোক – 'আদ-দিরায়া' (১/১৯২) গ্রন্থে ইবনে হাজার (রহ.) বর্ণনাটি তাবারানী ও মুয়াত্তাসূত্রে উল্লেখ করে তাতে কোন মন্তব্যই করেননি। তাই আমি যথেষ্ট সন্দিহান ইবনে হাজার এ ধরণের কোন একটি মন্তব্য এ বর্ণনার উপর করবেন! তাছাড়া এতে ইবনে হাজার 'তাবারানীর' বর্ণনায়ও 'হুছাইন ইবরাহীম থেকে' বলেছেন। সুতারাং হুছাইনের সাক্ষাত বিষয়ে তিনি কোন আপত্তি করতেই পারেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর এ জাতীয় একাধিক বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বলেই ইবনু আব্দিল বার মালেকী (মৃত.৪৬৩) বলেন– (وكره ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء.) ইবনে মাসউদ পূর্বে কোন নামায ব্যতিত এক রাকাতে বিতরকে অপসন্দ করেছেন এবং একে 'বুতাইরা' নাম দিয়েছেন। [আল ইসতিযকার ৫/২৮৫]

(ঘ) একটি ধোঁকা

বরং আমার মনে হয় *"(ইবনে মাসউদের সাথে হুছাইনের কোন সাক্ষাতই হয়নি। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তাই বলেছেন।"* এ কথাটি গ্রন্থকারের একটি ধোঁকা মাত্র। কারণ তিনি এর বরাত দিয়েছেন (টীকা-১২৫৮) তাহক্বীক মুওয়াত্তা মুহাম্মদ ২/২২। এর দ্বারা তিনি ড. তকীউদ্দীন নদবীর তাহক্বীককৃত মুওয়াত্তার নসখাটিই বুঝিয়েছেন যার বরাত তিনি পূর্ববর্তী টীকা নং ১২৫২ এ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত এখানে তিনি (১) পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েছেন ২/২২। এটি মূলত আল-মাকতাবাতুশ শামেলার পৃষ্ঠা। মূল কিতাবে রয়েছে ২/১৭-১৮ পৃষ্ঠায়। (২) মুওয়াত্তার বর্ণনাটি হুছাইন হযরত ইবনে মাসউদ থেকে নয় বরং ইবরাহীম নাখাঈ থেকে নিয়েছেন। তাই

ইবনে মাসউদের সাথে হুছাইনের সাক্ষাতের কোন প্রয়োজনই নেই। (৩) উল্লিখিত বরাতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর এরূপ কোন বক্তব্যই নেই। সুতরাং ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি ও টীকার বরাত সবই একটি ধোঁকামাত্র।

গ্রন্থকার - ৭

গ্রন্থকার *"এক রাক'আত বিতর পড়ার ছহীহ হাদীছ সমূহ:"* শিরোনামে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে চারটি এবং আবু আইয়্যুব আনছারী ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে একটি করে মোট ছ'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমি এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মৌলিক কথা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।

গ্রন্থকার এখানে শব্দ ব্যবহার করেছেন– *'হাদীছ সমূহ'*। অথচ তার উদ্ধৃত ইবনে উমর (রা) এর চারটি বর্ণনা মূলত একই হাদীস যা গ্রন্থকারও ভালরকম জানেন বলেই মনে হল। অথবা বলা যেতে পারে এখানে দুটি বর্ণনা। আর পঞ্চম ও ষষ্ট বর্ণনা দুটি এক রাকাতের কোন দলিল হয় না। সুতরাং ছটি বর্ণনার সবকটি মিলে হাদীস একটিই- হযরত উবনে উমর (রা.) থেকে। একেই তিনি, *'হাদীছ সমূহ'* বলে ব্যক্ত করেছেন।

পর্যালোচনা

ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনার কি উদ্দেশ্য

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বিতর বিষয়ক বর্ণনাটি– হযরত নাফে, আবু সালামা, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্বীক, সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ, হুমাইদ ইবনে আব্দির রাহমান, আলী ইবনে আব্দিল্লাহ আল বারিকী, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ, আবু মিজলায, আতিয়্যা ইবনে সা'দ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দির রাহমান, উকবা ইবনে হুরাইস, তাউস, আনাস ইবনে সীরীন প্রমুখ (১৫ জন) তাবেয়ীগণ বর্ণনা করেছেন। (দেখুন– আলমুসনাদুল জামে' হা.৭৪১৪-৭৪২৯ ১০/১৯৫-২০৮ কাশফুসসিত্‌র–আন সালাতিল বিতর–কাশমিরী পৃ.২৬)

আনাস ইবনে সীরীন ব্যতীত অবশিষ্ট চৌদ্দজনের বর্ণনা মূলত একই ঘটনার বিবরণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মিম্বরে থেকেই এর জবাবে হাদীসটি ইরশাদ করেন। সুতরাং হাদীসটি 'কওলী' তথা নবীজীর বক্তব্য। সবগুলোই মূলত একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা। শুধু আনাস ইবনে সীরীনের বর্ণনায় এসেছে– ইবনে উমর (রা) বলেন– নবীজী এভাবে নামায পড়তেন –যা গ্রন্থকার প্রথম নম্বরে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় হাদীসটি 'ফে'লী' তথা কর্মবিষয়ক বিবরণ। এবং এটি ভিন্ন হাদীস। সুতরাং এতে বুঝা যায় ইবনে উমর থেকে এ বিষয়ের হাদীস দুটি।

ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

(ويوتر بركعة/ والوتر ركعة من آخر الليل/ فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى/ والوتر ركعة واحدة)

– এ জাতীয় শব্দগুলো মূলত একটি বর্ণনার বিভিন্ন শব্দ। তাই মুসনাদে বায্যার সংকলক বলেন– (وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ أَوْ قَرِيبٌ) –এ হাদীসটি ইবনে উমর রা. থেকে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তবে সবগুলি বর্ণনার অর্থ একই বা কাছাকাছি। (দেখুন, আল-বাহরুয যাখ্‌খার হা.৬১৫৪)।

আর এ জাতীয় শব্দ থেকে এক রাকাত বিতর এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল হয় না। কেননা এর একটি শব্দে আছে– (ويوتر بركعة) যার অর্থ যেমন হতে পারে– 'এক রাকাত বিতর পড়তেন' তেমনি এও হতে পারে– 'এক রাকাতের মাধ্যমে বিতর করতেন' অর্থাৎ পূর্বের দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত যোগ করে বিতর (বেজোড় তথা তিন) করে নিতেন। অন্য শব্দে আছে– (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) –এক রাকাত পড়ে নিবে যা পূর্বের সব নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে। অর্থাৎ বিতর এক রাকাত নয় বরং এই এক রাকাত পূর্বের নামাযকেও বিতর বানিয়ে দেবে। **তাই ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মৌখিক বর্ণনা থেকে এক রাকাত বিতর পড়ার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।** বরং এতে বিতর তিন রাকাত দুই

সালামে বা তিন রাকাত এক সালাম ও দুই বৈঠকে হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা–

(ক) ইবনে উমর (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এসেছে– (صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) –"এক রাকাত পড়ে নেবে যা পূর্বের আদায়কৃত নামাযকে বিতর বানিয়ে দেবে"। অর্থাৎ বিতর এক রাকাত নয় বরং পূর্বের নামাযও বিতর হয়ে গেল। দেখুন– গ্রন্থকারের উদ্ধৃত বর্ণনা (পৃ.৩২৭)

(খ) ইবনে উমর (রা.) যখন বিতর পড়তেন তখন তিন রাকাত বিতর পড়তেন। তবে দুই সালামে। যার বিবরণ গ্রন্থকার (পৃ.৩৩৩) দিয়েছেন এভবে– "জ্ঞাতব্য: তিন রাক'আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক'আত পড়া যায়। তিন রাক'আত বিতর পড়ার এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি। (টীকায়–বুখারী হাদীস/৯৯১ ইরওয়াউল গালীল ২/১৪৮" বর্ণনাটি হল–

[رواه مالك (١/١٢٥/٢٠) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر حتى يأمر ببعض حاجته]

সুতরাং ইবনে উমর (রা.) নিজেই বর্ণনা থেকে বুঝেছেন– বিতর তিন রাকাত। সাহাবী বর্ণিত অস্পষ্ট হাদীসের জন্য সাহাবীর নিজস্ব আমলই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। তাই ইবনে উমরের আমলই বলে দেয়– এ হাদীসে বর্ণিত বিতর নামায তিন রাকাত।

(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে– (صلاة المغرب وتر النهار) (মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ৬৭৭৩) গ্রন্থকারের মতাদর্শী আলেম আব্দুল্লাহ আল-কাফি স্বরচিত 'বিতর ছালাতে' এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এবং তিনি বলেছেন– **"এখানে রাকাতের সংখ্যার দিক থেকে বিতরকে মাগরিবের মত বলা হয়েছে।" (পৃ.৩২-৩৩)** এ হাদীসে মূলণীতিরূপে ইবনে উমর বলেছেন– মাগরিব হল দিনের বিতর। সুতরাং রাতের বিতরকেও মাগরিবের অনুরূপ করে পড়। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে উমর (রা) এ বক্তব্যই প্রমাণ করে

তিনি মনে করতেন বিতর নামায তিন রাকাত। আর তাই এখানে আলোচ্য হাদীসের সঠিক ব্যখ্যার ইঙ্গিত বহন করে।

(ঘ) ইমাম শা'বী সূত্রে একটি সহীহ বর্ণনায় ইবনে আব্বাস এর মত ইবনে উমর (রা)ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন– **'তিনি তিন রাকাতে পড়তেন'**। [সুনানে ইবনে মাজা হা. ১৩৬১, আরো দ্রষ্টব্য বিতির নামায তিন রাকাত অধ্যায়]

(ঙ) তাবেয়ী আবু–মিজ্‌লায্ হাদীসটি ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস দুজন থেকেই বর্ণনা করেছেন। যা সহীহ মুসলিমের বরাতে গ্রন্থকার –(والوتر ركعة من آخر الليل) শব্দে উল্লেখ করেছেন [হা.১৭৯৩]। এতে বুঝা যায় মূল বর্ণনাটি ইবনে আব্বাস (রা.)ও শুনেছেন। তথাপি ইবনে আব্বাস রা. বিতর এক সালামে তিন রাকাতই পড়তেন এবং এক রাকাত পড়াকে অপসন্দ করতেন। [আরো দেখুন– সুনানে ইবনে মাজা হা.১২৩১ আল মু'জামুল কাবীর– তাবারানী হা.১০৯৬৩ আননুকাতুত তারীফা পৃ. ১৮৬ কাশফুস সিতর পৃ. ৩২]

(চ) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী: 'এক রাকাত পড়ে নাও'– বাক্যে এক রাকাত বিতর পড়ার বর্ণনাটি সম্পর্কে বলেন, (এতে এক রাকাত বিতর এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল নেই বরং) 'দুই সালামে তিন রাকাত বিতর পড়া' (অর্থাৎ দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে আরেক রাকাতযোগে মোট তিন রাকাত বিতর) এর পক্ষে স্পষ্ট দলিল হয় না। হতে পারে এতে উদ্দেশ্য হল– 'পূর্বের পড়া দুই রাকাতের সাথে মিলিয়ে এক সালামে মোট তিন রাকাত বিতর পড়'। অথচ তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী একজন বিখ্যাত হাফেজে হাদীস। তাঁর মতে বিতর

দুই সালামে তিন রাকাত। তবুও তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। (১)

সম্ভবত এ কারণেই এক রাকাত বিতর নামাযের ইঙ্গিত বহনকারী এ ধরণের হাদীস বর্ণনা করার পরও ইমাম আবু-হানীফাসহ অনেক ইমামের মতই 'মুয়াত্তা' সঙ্কলক ইমাম মালেক, 'মুসনাদ' সঙ্কলক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমুখ এক রাকাত বিতর পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন। (কিতাবুল হুজ্জা আলা আহলিল মদীনা ১/১৯৩ আল-ইশরাফ ২/২৬২ ও আল-আউসাত ৮/১৬০, মাসাইলে আহমদ– ইবনে হানী পৃ. ১/৯৯ ফাতহুল বারী – ইবনে রাজাব ৬/১৯৯, এমনকি ইমাম আহমদ বলেন, বিতর ছুটে গেলে তিন রাকাতই কাযা করবে। ফাতহুল বারী –ইবনে রাজাব ৬/২২৭)

গ্রন্থকার - ৮

গ্রন্থকার পঞ্চম নম্বরে হযরত আবু-আইয়ুব আনছারী (রা.) এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন– *"রাসূল (ছাঃ) বলেছেন– ... সুতরাং যে পাঁচ রাক'আত পড়তে চায় সে যেন তাই পড়ে। আর যে তিন রাক'আত পড়তে চায় সে যেন তা পড়ে* ***এবং যে এক রাক'আত পড়তে চায় সে যেন তাই পড়ে*"।**

পর্যালোচনা

(ক) বর্ণনাটি মওকুফ তথা সাহাবীর কথা

প্রথমত বর্ণনাটিকে গ্রন্থকার 'মারফূ' তথা নবীজীর কথারূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম ইবনু আব্দিল বার বলেন– ইমাম নাসায়ী (রহ)

---

১. তাঁর বক্তব্যটি নিম্নরূপ:

[قال الحافظ في الفتح ٤٨١/٢ : واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صل ركعة واحدة على أن فصل الوتر أفضل من وصله **وتعقب بأنه ليس صريحا فى الفصل** فيحتمل أن يريد بقوله صل ركعة واحدة أي مضافة إلى ركعتين مما مضى]

বর্ণনাটি 'মওকুফ' তথা সাহাবীর বক্তব্য হওয়াকে বিশুদ্ধ মনে করেন (আততামহীদ ১৩/২১৯)। ইমাম দারা কুতনীও 'মওকুফ' হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। [দেখুন-কিতাবুল ইলাল, দারাকুতনী হা.১০০৫ সুনানে দারাকুতনী হা.১৬৩০ মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার হা.১৩৯৪]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন– **ইমাম আবু-হাতেম, যুহলী, দারাকুতনী, বাইহাকী** এবং আরো একাধিক ইমাম এটিকে মওকুফ বলেছেন। **আর এটিই সঠিক**। [আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩৬-৩৭]

(খ) হাদীসের অংশবিশেষ গোপন করা

এ হাদীসেরই একটি অতিরিক্ত অংশ বিশুদ্ধ সনদে সুনানে নাসায়ী (হা.১৭১৩) তে রয়েছে। যার শব্দটি হল – (وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً ، ...) অর্থ: '...আর যার ইচ্ছা এক রাকাত পড়ে নেবে, আর যার ইচ্ছা একটি ইশারা করে নেবে'। [মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক হা.৪৬৩৩ আস-সুনানুল কুবরা- বাইহাকী ৩/২৪ হা.৪৭৭৯-৪৭৮০ সহীহ ইবনে হিব্বান হা.২৪১১] তাহলে এ বর্ণনার আলোকে বিতর এর নামায ইশারা করে নিলেই আদায় হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার হাদীসের শেষ অংশটি উল্লেখ করেননি। আমার যতদূর মনে হয় তিনি ইচ্ছাকরেই এ অংশটুকু এড়িয়ে গেছেন। কেননা তিনি টীকায় বরাত দিয়েছেন *"ছহীহু ইবনে হিব্বান হ?২৪১১"*। আর ইবনে হিব্বান এ নম্বরে হাদীসটির এ অংশটুকুসহই আছে।

গ্রন্থকার - ৯

গ্রন্থকার ছয় নম্বরে এক রাকাত বিতরের দলিল হিসেবে ইবনে মাসউদ (রা.) এর একটি বর্ণনা এভাবে পেশ করেন– *"রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ বিজোড়। তিনি বিজোড়কে পসন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীরা! **তোমরা বিতর পড়**"*। গ্রন্থকার এখানে বলেন– *"হাদীছটিতে সরাসরি আল্লাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ এক বিজোড় না তিন বিজোড় না পাঁচ বিজোড় তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?" (পৃ.৩২৮)*

পর্যালোচনা

(ক) ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনাও এক রাকাত বিতর এর দলিল নয়

উল্লেখযোগ্য কোন মুহাদ্দিস বা ফকীহ এ হাদীস দিয়ে এক রাকাত বিতর এর পক্ষে দলিল পেশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

হাদীসের বক্তব্য হল–'আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়কে পসন্দ করেন। (বিতর নামাযও যেহেতু বেজোড়) তাই বিতর নামায আদায় কর/ বিতরকেও বেজোড় করে পড়'। এখানে শুধু বিতর নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাই ইমাম নববীসহ অনেক মুহাদ্দিসই হাদীসটিকে 'বিতর নামাযে উৎসাহ প্রদান' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। (খুলাছাতুল আহকাম– হা.১৮৫৪)

ইবনুল আছীর নিহায়া গ্রন্থে বলেছেন– "হাদীসে 'বেজোড় কর' দ্বারা উদ্দেশ্য বিতর পড়তে আদেশ করা। আর তা হল, ব্যক্তি দুই দুই রাকাত নামায পড়বে। অতঃপর সবশেষে এক রাকাত পৃথক আদায় করবে অথবা পূর্বের রাকাতসমুহের সাথে মিলিয়ে আদায় করবে। এ অর্থেই অন্য হাদীসে রয়েছে – 'ইসতিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করার সময়ও তা বিতর করবে' অর্থাৎ যে ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে তা বেজোড় হবে। হয়ত এক বা তিন কিংবা পাঁচ। হাদীসে এ ধরণের শব্দ বারবার এসেছে"। [১]

(খ) বর্ণনাকারী সাহাবীগণ হাদীস থেকে এক সংখ্যা বুঝেননি

এ হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও আতা ইবনে আবী রাবাহ সকলেই বুঝেছেন– 'আল্লাহ বেজোড় তাই তিনি বেজোড়কে পসন্দ

---

[১]. ইবনুল আছীরের বক্তব্য–

[قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: وقولُه أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ثم **يُصَلِّي في آخرها رَكْعة مُفرَدة أو يُضِيفَها إلى ما قَبْلَها من الرَّكَعات ومنه الحديث إذا اسْتَجْمَرتَ فأوْتِر أي اجْعَل الحِجارَة التِّي تَسْتَنْجي بها فَرْدا إمَّا واحدةً أو ثلاثا أو خَمْسا** . وقد تكرر ذكره في الحديث]

করতেন'। **এর দ্বারা আল্লাহর সাথে তুলনা করে এক সংখ্যা বুঝানো হয়নি**। বরং এক তিন পাঁচ সব বেজোড় সংখ্যাই আল্লাহর কাছে প্রিয়। দেখুন–

১. ইবনে উমর থেকে এ হাদীস বর্ণনা করার পর– নাফে বলেন, ইবনে উমর সব কাজই বেজোড় করতেন। (মুসনাদে আহমদ হা.৫৮৪৬)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করার পর অনেকগুলো বেজোড় বস্তুর সাথে আসমানকেও বেজোড় হিসেবে গুণলেন। অতঃপর বলেন– যে, মিসওয়াক করবে, ইস্তিঞ্জায় ঢেলা ব্যবহার করবে ও যে কুলি করবে তারা যেন বেজোড় করে। (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৯০৮৩) বলা বাহুল্য ঢেলা ব্যবহার ও কুলি করার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম হল তিনবার করা। একবার করা নয়।

৩-৪. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর উপস্থিতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– আল্লাহ তা'আলা নিজে বেজোড় এবং বেজোড়কে পসন্দ করেন। অতঃপর অনেকগুলো বেজোড় বস্তুর কথা উল্লেখ করেন। যেমন– আসমান ও যমীন সাতটি। সপ্তাহে সাত দিন। সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা সাত যাকে কুরআনে বলা হয়েছে– 'সাবআন মিনাল মাসানী'। সাফা-মারওয়া ও কাবার তাওয়াফ সাত বার। প্রস্তর নিক্ষেপ সাত বার। সিজদা করার হুকুম করেছেন সাত অঙ্গের উপর ইত্যাদি। [দেখুন–আত-তাম্হীদ ২/২১০ হিলয়াতুল আউলিয়া- আবু নূআঈম হা.১১৫৭ জুযউ আবিল আব্বাস ইউনুস ইবনে কুদাইম আল-বাছরী]

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) লাইলাতুল কদর তালাশ করার হুকুম করে বলেন– " তোমরা একে শেষ দশকের 'বিতর' তথা বেজোড় সংখ্যায় তালাশ কর। কেননা আল্লাহ 'বিতর' এবং তিনি 'বিতর' তথা বেজোড়কে পসন্দ করেন। (মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালীসী হা.১২৮০)

৬. নাফে বলেন– সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাওয়াফ সমাপ্ত করতেন বেজোড় সংখ্যায় আর বলতেন– 'আল্লাহ তা'আলা 'বিতর' এবং তিনি 'বিতর'কে পসন্দ করেন। (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৯৮০০)

৭. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এ হাদীসের কারণে সব কিছুকেই বেজোড় করে করতেন। এমনকি কোন কিছু খেলেও তা বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। (মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা.৯৮০১)

৮. এ হাদীসের কারণেই হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেন– তিন আঙ্গুল (অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যা) আমার কাছে চার আঙ্গুল (জোড় সংখ্যা) থেকে প্রিয়। (মুছান্নাফে আব্দির রাযযাক– হা.৯৮০৩)

(গ) গ্রন্থকারের উল্লিখিত এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)। আর তিনি এ হাদীস থেকে এক রাকাত বিতর বুঝবেন দূরের কথা তিনি এক রাকাতকে নামাযই মনে করেন না। যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(ঘ) সর্বোপরি হাদীসে এ অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করেছেন। তিনি বলেন– আল্লাহর রয়েছে নিরান্নব্বইটি নাম। যে তা আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ 'বিতর' (তথা বেজোড়)। তিনি 'বিতর' (তথা বেজোড়কে) পসন্দ করেন। [সহীহ মুসলিম হা.২৬৭৯ বুখারী হা.৬৪১০]

(ঙ) শুধু এক রাকাত বিতর পড়া যদি এ হাদীসের উদ্দেশ্য হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করতেন। অথচ শুধু এক রাকাত বিতর পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক বারের জন্যও প্রমাণিত নয়, যা স্পষ্ট বলেছেন ইবনছ ছালাহ রহ.। [আত-তালখীছুল হাবীর ২/৩১] ইবনে হাজার সহীহ ইবনে হিব্বানের যে বর্ণনা দ্বারা আপত্তি করেছেন এটি মুলত একটি বর্ণনার সংক্ষিপ্তরূপ। সহীহ ইবনে হিব্বানে একই হাদীসের বিশদ বর্ণনায় পূর্ণ নামাযের বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, শায়খ শুআইব সম্পাদিত হা. ২৫৯২, ২৬২৬ ও হা. ২৪২৪ এর টীকা]

সুতরাং বিতরের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অধিকাংশ সাহাবী থেকে প্রমাণিত নেই। বরং তাদের আমল এর বিপরীত। সে পদ্ধতিকেই হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থ সাব্যস্ত করা এবং এ দাবী করা যে, এটিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত; এ যে কত সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এক সালাম ও দুই বৈঠকে তিন রাকাতে বিতর

গ্রন্থকার - ১০

গ্রন্থকার *'তিন রাক'আত বিতর পড়ার সময় দুই রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ পড়া'* শিরোনামে বলেন– *"তিন রাক'আত বিতর একটানা পড়তে হবে। মাঝখানে কোন বৈঠক করা যাবে না। **এটাই সুন্নত**। (পৃ.৩৩০)*

পর্যালোচনা

দুই তাশাহ্হুদ ও এক সালামে তিন রাকাত বিতর বিষয়ে নবীজী থেকে, সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে সহীহ ও সুস্পষ্ট অনেক দলিল পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার - ১১

(এক) ইবনে মাসউদ (রা) এর মওকুফ বর্ণনা

গ্রন্থকার তিন রাকাত বিতর এর দলিল পর্যালোচনায় বলেন–*"(ক) ইবনে মাসউদ বলেন, মাগরিবের ছালাতের ন্যায় বিতরের ছালাত তিন রাক'আত।" (পৃ.৩৩০-৩৩১)*

পর্যালোচনা : মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে সহীহকে যঈফ সাব্যস্ত করা

(ক) টীকায় গ্রন্থকার শুধু আল-মুজামুল কাবীরের বরাত দিয়েছেন। অথচ হাদীসটি রয়েছে– মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (হা.৬৭৭৯) মুয়াত্তা মালেক– মুহাম্মদের বর্ণনা (হা.২৬২) শরহু মা'আনিল আসার (হা.১৬১৩) আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী (৩/৩০ হা.৫০০৭)।

(খ) তাহকীকের নামে গ্রন্থকার বলেন–*" ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়।"*। কিন্তু এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল জাওযীর এ বক্তব্য আমি খুঁজে পাইনি। টীকায় গ্রন্থকার এর যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন– (هذا حديث لا يصح – তানক্বীহ, পৃঃ ৪৪৭) তার রহস্য আমি খুঁজে পেলাম না। কারণ–

১. তানক্বীহ নামে ইবনুল জাওযীর কোন গ্রন্থ নেই।

২. অনেক তালাশ করে গ্রন্থকারের টীকায় উল্লিখিত 'আপত্তিটি' ইবনুল জাওযী (রহ.) এর 'আল ইলালুল মুতানাহিয়া' কিতাবে পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানে তিনি এ মন্তব্যটি ইবনে মাসউদ এর মরফূ বা মওকুফ কোন হাদীসের উপরই নয় বরং হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত এ ধরণের ভিন্ন একটি 'মরফূ' বর্ণনা সম্পর্কে করেছেন।

(গ) ইবনে মাসউদ (রা) এর উল্লিখিত বর্ণনাটি সহীহ:

১. নূরুদ্দীন হাইছামী (মৃত.৮০৭) বলেন– (ورجاله رجال الصحيح) –এর সকল বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর মানে উত্তীর্ণ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ হ.৩৪৫৫)

২. ইমাম বাইহাক্বী বলেন– (هذا صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله): আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বক্তব্য হিসেবে এটি সহীহ। (আস-সুনানুল কুবরা ৩/৩০) **বাইহাকী (রহ.) এ বক্তব্যটি গ্রন্থকারের জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার ইঙ্গিতও করেননি– যার প্রমাণ সামনে পেশ করা হবে।**

৩. বিশেষত মুয়াত্তা ও ইবনে আবী শাইবার সকল বর্ণনাকারী বুখারী ও মুসলিমের রাবী। শুধু মালিক ইবনুল হারিস মুসলিমের রাবি। (দেখুন, মুয়াত্তা-ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা, তাহক্বীক–তাক্বী উদ্দীন নদবী হা. ২৬২)।

গ্রন্থকার - ১২

ইবনে উমরের বর্ণনা

গ্রন্থকার দুই নম্বরে বলেন– *"(খ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, মাগরিবের ছালাত দিনের বিতর ছালাত। তাহক্বীক্ব: অনেকে উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বিতর ছালাত মাগরিব ছালাতের ন্যায় প্রমাণ করতে চান। **অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ**। বর্ণনাটি কখনো মারফূ' সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে। **তবে এর সনদ যঈফ**। মুহাদ্দিস শুআইব আরঊত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।"*

পর্যালোচনা

(ক) বিভ্রান্তিপূর্ণ তাহক্বীক

এখানেও তিনি তাহকীকের নামে কি পরিমাণ গোলমাল করেছেন তা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি–

(১) গ্রন্থকারের বক্তব্য *"অথচ তা ত্রুটিপূর্ণ"* – কোন কথাটিকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তিনি কি বলতে চাচ্ছেন বর্ণনাটি ত্রুটিপূর্ণ? প্রকৃতপক্ষে তার বক্তব্যই ত্রুটিপূর্ণ!

(২) তিনি বলেছেন– *"বর্ণনাটি কখনো মারফু সূত্রে এসেছে, কখনো মাওকুফ সূত্রে এসেছে"*

মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে–

(ক) একটি 'মরফু' তথা নবীজীর বক্তব্য, আর একটি 'মওকুফ' তথা ইবনে উমরের বক্তব্য।

(খ) একটি বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) (মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য) আর অপরটি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (মুয়াত্তা মালেক)।

(গ) দুটি বর্ণনার বক্তব্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মরফু বর্ণনা–

عَن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَن ابْنِ عُمَر عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ.

ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মাগরিবের নামায দিনের বিতর। সুতরাং তোমরা রাতের নামাযকেও বিতর করে পড়।

মওকুফ বর্ণনা–

عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বলেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন – মাগরিবের নামায দিনের নামাযের বিতর।

(ঘ) বর্ণনা দুটিতে কোন বিরোধও নেই বরং আপন আপন স্থানে দুটি বর্ণনাই সঠিক।

সুতরাং দুটিকে এক বর্ণনা বানিয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। এ কারণে ইমাম ইবনু আব্দিল বার (মৃ.৪৬৩) দুটি বর্ণনাকেই উল্লেখ করে যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। (আল-ইসতিযকার ৫/২৮৩)

(৩) গ্রন্থকার চরম দুঃসাহসিকতার সাথে 'মরফু' ও 'মওকুফ' পার্থক্য না করেই বলেন– ***"তবে এর সনদ যঈফ"***! ফলে বুঝা যায় মওকুফ বর্ণণাটিও যঈফ!

(খ) মওকুফ বর্ণনাটি কি যঈফ?

পূর্বেই বলেছি– এখানে দুটি বর্ণনার দুটি ভিন্ন ভিন্ন সনদ। কোন সনদটি যঈফ? কে বলেছেন যঈফ এবং কেন যঈফ? –এর কিছুই গ্রন্থকার বলেননি। এর জন্য কোন বরাতও গ্রন্থকার দেননি। তাহলে কি এটি তার 'নিজস্ব' ভিত্তিহীন বক্তব্য! যা অনুসরণ করতে তিনি পাঠককে বাধ্য করতে চান?! কোন ইমাম বা মুহাদ্দিস কি এ মওকুফ বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন এর প্রমাণ গ্রন্থকার দিতে পারবেন?

দেখুন– গ্রন্থকার যে বর্ণনাটি উল্লেখ করে টীকায় মুয়াত্তা (হা/২৫৪) এর বরাত দিয়েছেন– এটি ইমাম মালেক তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে। আর তিনি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে ইমাম মালেক ও সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বাদ দিলে থাকে কেবল– আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার। তিনি বুখারী মুসলিমসহ ছয় কিতাবের রাবি। ইমাম আহমদ, ইবনে মাঈন, আবু–যুরআ, নাসায়ী, (ইবনে হিব্বান, ইজলী,) ইবনে সা'দ প্রমুখ সকল ইমামই তাঁকে সিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল) ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম ও হুজ্জাহ উপাধী দিয়েছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা) ইবনে হাজার আসকালানী (তাকরীবে) ও সয়ূতী (ইস'আফে) তাঁকে সিকাহ বলেছেন। এমন বর্ণনাকারীকে 'যয়ীফ' বলার সাধ্য কি গ্রন্থকারের আছে?! তাহলে এ বর্ণনায় কাকে তিনি যঈফ সাব্যস্ত করছেন– এই আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারকে নাকি মালেক বা সাহাবী ইবনে উমরকে?

(গ) মরফু বর্ণনা

আর মারফু বর্ণনা সম্পর্কেও একই কথা, কে একে যঈফ বলেছেন এবং কেন বলেছেন?

ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– ইয়াযীদ ইবনে হারূন-হিশাম ইবনে হাসসান-মুহাম্মদ ইবনে সীরীন সূত্রে ইবনে উমর (রা.) থেকে। এরা প্রত্যেকেই বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনাকারী ও নির্ভরযোগ্য। এদের কাকে গ্রন্থকার যঈফ সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন এবং কিভাবে?

মুসনাদে আহমদে বর্ণনাটি একাধিকবার এসেছে। এবং কিতাবের মুহাক্কিক শায়খ শুআইব আরনাউত বলেছেন– এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং বুখারী মুসলিমের 'রাবী'। (দেখুন–হা.৪৮৪৭, ৪৯৯২) গ্রন্থকার শুআইব আরনাউতের যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তা বিভ্রান্তিকর। এর আলোচনা সামনে আসছে ইনশাল্লাহ।

বর্ণনাটিকে যারা সহীহ বলেছেন–

১. হাফেজ আলাউদ্দীন মারদীনী (মৃত.৭৫০) বলেন– (وهذا السند على شرط الشيخين) : বর্ণনাটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (আল-জাওহারুননাকী ৩/৩১)

২. হাফেজ ইরাকী (মৃত.৮০৪) (আল-মুগনী আন হামলিল আসফার-তাখরীজুল ইহইয়া-২/৬৯)

৩. মুহাদ্দিস যুরকানী (মৃত.১১৬২) ইরাকীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন (শারহুয যুরকানী আলাল মুয়াত্তা-ছালাতুননাবী ফিল বিতরি অধ্যায়)

৪. মুহাদ্দিস আহমদ গুমারী (মৃত. ১৩৮০) বলেন: (هذا سند رجاله رجال الصحيح) – এ সনদের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মানোত্তীর্ণ। (আল-হিদায়া ফি তাখরীজি আহাদীসিল বিদায়া ৪/১৪২)

৫. আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী ইরাকীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। (আত্তা'লিকুল মুমাজ্জাদ পৃ.১৪৭)

৬. শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী (মৃ.১৪২১)। (ছহীহুল জামেইছ ছাগীর হা.১৪৫৬/৩৮৩৪, ৬৭২০)

৭. **গ্রন্থকারের মতাদর্শী আহলে হাদীস আলেম আব্দুল্লাহ আল-কাফী একই উদ্দেশ্যে প্রণিত** ‘ছহীহ সুন্নাহর আলোকে বিতর ছালাত’ পুস্তকে (পৃ.৩২) বর্ণনাটি উল্লেখ করেন এভাবে– **ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে, ...** ।
৮.শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন– “এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং বুখারী মুসলিমের ‘রাবী’।” (দেখুন–মুসনাদে আহমদের টীকা হা.৪৮৪৭) অন্যত্র এ বর্ণনার মতন বিষয়ে শায়খের বক্তব্য সামনে আসছে।

এর সমর্থনে আরো দুটি হাদীস

১. হযরত ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন– “আমি নবীজীর সাথে সফরে-হজরে নামায পড়েছি। ...মাগরিবের নামায সফরে-হজরে সর্বদাই তিন রাকাত। সফরে-হজরে এতে (রাকাত সংখ্যায়) কোন হ্রাস পায় না। **এটি হল দিনের বিতর**। এর পর আরো দুই রাকাত আছে।” **ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন**। [সুনানে তিরমিযী হা.৫৫২]

আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহামন মুবারকপূরী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর উদ্ধৃতিতে একে গ্রহণযোগ্য ও হাসান গণ্য করে এর ব্যাখ্যা করেছেন– নবীজীর বক্তব্য – **“মাগরিব দিনের বিতর”** – এখানে মাগরিবের নামায সরবে কেরাত বিশিষ্ট রাতের নামায হওয়া সত্ত্বেও একে দিনের বিতর বলার কারণ এটি দিনের নিকটবর্তী নামায। [১]
[তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩৭৫, ৩/১২০ ফাতহুলবারী ৪/১২৬] এ বর্ণনাকে গ্রহণ করে ইবনে হাজারের আরো বক্তব্য দেখুন– [ফাতহুল বারী ২/৪৯ ৩/২১]

২. হযরত আয়শা রা. এর বর্ণনা

হযরত আয়শা (রা.) বলেন– “আর মাগরিবের নামায (সফরেও তাতে কসর নেই), কেনানা তা দিনের বিতর”। (عن عائشة قالت : فرضت

---

[১]. মুবারকপুরী বলেন–

ونظيره قوله عليه السلام: **المغرب وتر النهار**، أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كونها وتر النهار لقربها منه قاله الحافظ

صلاة السفر والحضر ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار) [সহীহ ইবনে হিব্বান, হা.২৭৩৮ শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন– এর সনদ হাসান, ফাতহুলবারী ১/৪৬৪]

হাদীস দুটিতে মাগরিবকে দিনের বিতর বলা তখনি সঠিক হবে যখন একথা মেনে নেওয়া হবে যে রাতের নামাযেরও একটি বিতর আছে। সুতরাং উভয় হাদীস থেকেই একথা বুঝা যায় যে, বিতর নামায হল রাতের বিতর।

গ্রন্থকার - ১৩

(ঘ) গ্রন্থকার শেষে বলেন– ***"তবে এর সনদ যঈফ। মুহাদ্দিস শুআইব আরনাউত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়।"*** (পৃ.৩৩০)

পর্যালোচনা

গ্রন্থকার এখানে শায়খ শুআইব -এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে যেয়ে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি করেছেন–

১. *"তবে এর সনদ যঈফ"* কথাটি গ্রন্থকারের নিজস্ব বক্তব্য, কারো থেকে উদ্ধৃত নয়।

২. শায়খ শুআইব এর পূর্ণ বক্তব্য এখানে গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। কেননা পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করলে আসল তথ্য ফাঁস হয়ে যেত। কারণ শায়খ শুআইব– এর আগে বলেছেন– (صحيح) – অর্থাৎ– **'এ হাদীসটি সহীহ'**। আর এর পরই বলেছেন, (... وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.) –'... এ সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও বুখারী মুসলিমের 'রাবী'। কেবল হারুন ইবনে ইবরাহীম ব্যতিত। আর তিনিও নাসায়ীর 'রাবী' এবং বিশ্বস্ত'। (হা.৫৫৪৯)

৩. শায়খ শুআইব এর এ বক্তব্যটি মূলত আলোচ্য হাদীসের বিষয়ে নয়। বরং ইবনে সীরীন সূত্রে ইবনে উমরের ভিন্ন আরেকটি বর্ণনা সম্পর্কে। ভিন্ন হাদীস। সম্পর্কে তোলা আপত্তিকে এ হাদীসে লাগিয়ে দিয়ে শায়খ শুআইবের তাহকীকের অপব্যবহার করেছেন।

শায়খ শুআইব -এর পূর্ণ বক্তব্য ও তার ব্যাখ্যা

গ্রন্থকারের বক্তব্য– *'মুহাদ্দিস শুআইব আরন্ডত বলেন, ঐ অংশটুকু ছহীহ নয়'* -এর মানে কি? 'ঐ' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন বিষয়টি অস্পষ্ট?

আসলে শায়খ শুআইব বলেছেন–

صحيح دون قوله: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل" ، فقد سلف الحديث عنه في الرواية (٤٨٤٧) بأنه رواه عدة موقوفا، وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن إبراهيم الأهوازي، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

অর্থ: "**(হাদীসটি মরফুরূপেই) সহীহ,** শুধু এ কথাটি ব্যতিত যে, 'মাগরিবের নামায দিনের বিতর, তোমরা রাতের নামাযকেও বিতর কর'। (কারণ) পূর্বে ৪৮৪৭ নং বর্ণনায় (টীকায়) এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, একাধিকজন হাদীসটি মওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। **এ হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) ও বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী**। কেবল হারুন বিন ইবরাহীম ব্যতিত। তিনি সুনানে নাসায়ীর রাবী ও সিকা।" (মুসনাদে আহমদ হা.৫৫৪৯)

শায়খ শুআইবের বক্তব্য স্পষ্ট যে, **তিনি হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেননি বরং সহীহ বলেছেন**। বক্তব্য সম্পর্কে সহীহ নয় বলে মারফূরূপে (অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যরূপে) বর্ণিত হওয়াকে সহীহ নয় বুঝিয়েছেন। **মওকুফ বা সাহাবীর বক্তব্যরূপে বর্ণিত হওয়া তার দৃষ্টিতেও সহীহ**।

গ্রন্থকার - ১৪

Contents

হযরত ইবনে মাসউদ এর 'মারফূ' বর্ণনা

গ্রন্থকার বলেন– *"ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রাত্রির তিন রাক'আত বিতর দিনের বিতররের ন্যায় যেমন মাগরিবের ছালাত। তাহক্বীক: ইমাম দারাকুৎনী বর্ণনা করেন বলেন, ইয়াইইয়া ইবনু যাকারিয়া যাকে ইবনু আবীল হাওয়াজিব বলে,* ***সে যঈফ। সে আ'মাশ ছাড়া আর কারো নিকট থেকে মারফূ হাদীছ বর্ণনা করেনি।*** *ইমাম বয়হাক্বী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া* ***ইবনু হাযিব*** (সঠিক হল– ইবনু আবিল হাওয়াযিব!) *কুফী আ'মাশ থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছে। কিন্তু সে যঈফ।* ***তার বর্ণনা আ'মাশ থেকে মারফূ অন্যান্য বর্ণনার বিরোধিতা করে।*** *এছাড়া ইমাম দ্বারাকুৎনী উক্ত বর্ণনার পূর্বে তার বিরোধী ছহীহ হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে মাগরিবের মত করে বিতর পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন– ..." (পৃ.৩৩০)*

পর্যালোচনা

ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনাটি 'মারফূ' ও 'মাওকুফ' উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মাওকুফ হিসেবে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এটি প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই। আর দলিলের জন্য 'মওকুফ' বর্ণনাটিই যথেষ্ট। সাথে রয়েছে ইবনে উমর (রা.)-এর পূর্বোল্লেখিত মারফূ ও মাওকুফ বর্ণনা এবং অন্যান্য দলিল।

ইবনে মাসউদ (রা.) এর মারফূ বর্ণনা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল– **এটি হাসান** যা সর্বসম্মতিক্রমে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এখানে গ্রন্থকার তাহক্বীকের নামে কি 'কীর্তি'টা আঞ্জাম দিয়েছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।

(ক) ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া কি যঈফ?

গ্রন্থকার দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন– ***'সে যঈফ'***।

ইমাম দারাকুতনী (রা.) 'সুনানে' তাঁকে যঈফ বলেছেন। অনেকেই তার বিষয়ে দারাকুতনীর সঙ্গে একমত হননি। যেমন:

১. ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁকে 'সিকাহ' (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (কিতাবুছছিকাত)

২. ইমাম হাকেম নিশাপুরী– তার একটি হাদীসকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। (মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন হা.৩০৪৫)

৩. ইমাম যাহাবী রহ. হাকিমের মন্তব্যকে সমর্থন করে বলেন– এটি সহীহ। (তালখীছুল মুসতাদরাক)

(খ) মারাত্মক ভুল তরজমা

গ্রন্থকার বলেন, *“ ইমাম দারাকুৎনী ... সে আ'মাশ ছাড়া আর কারো নিকট থেকে মারফূ হাদীছ বর্ণনা করেনি।”*

এ তরজমায় তিনি হাস্যকর ভুল করেছেন! সহীহ তরজমা হল– (ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره) ‘আ'মাশ থেকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ হাদীসটি মরফূরূপে বর্ণনা করেনি’।

(গ) তরজমায় মারাত্মক ভুল

গ্রন্থকার যে বলেছেন– *“ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ... **তার বর্ণনা আ'মাশ থেকে মারফূ অন্যান্য বর্ণনার বিরোধিতা করে।**”*

বাইহাকী'র বক্তব্যের এটিও মারাত্মক ভুল তরজমা। আরবীতে কথাটি এমন : (وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش) – এর সঠিক তরজমা হল– ‘আ'মাশ থেকে তাঁর বর্ণনা অন্যান্য একাধিক রাবীর বর্ণনার বিরোধী’।

(ঘ) তাহলে কি এটি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে?!

গ্রন্থকার এখানে বাইহাকী'র পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ না করে আংশিক এনেছেন। টীকায় (নং ১২৭৭) বরাত দিয়েছেন, আস-সুনানুল কুবরা (৩/৩১)। ঠিক এ পৃষ্ঠাতেই বাইহাকী (রহ.) উপরিউক্ত মন্তব্য করার পূর্বে বলেছেন, **“হাদীসটি মওকুফ তথা ইবনে মাসউদ (রা.) এর বক্তব্য হিসেবে সহীহ।”** সুতরাং তিনি তার এ বক্তব্যটি অবশ্যই দেখেছেন। কিন্তু গ্রন্থকার এখানে তা উল্লেখ করেননি। আর ৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠায় ইবনে মাসউদের মওকুফ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, সেখানেও এ বক্তব্য উল্লেখ করেননি। বরং অন্যায়ভাবে অন্য আরেকটি হাদীসের ক্ষেত্রে করা আপত্তি এ হাদীসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন !

দুই রাকাতে বৈঠকের দলিল

গ্রন্থাকার - ১৫

সবশেষে তিনি মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে ও নবীজীর নামায বই দুটির উপর অন্যায় আপত্তি করে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলেন– উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী (রহ.) বলেন, "*তিন রাক'আত বিতরের দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করার পক্ষে আমি কোন মারফূ ছহীহ দালীল পাইনি*"। *(পৃ.৩৩১)*

পর্যালোচনা

এ বিষয়ে কয়েকটি কথা:

১. গ্রন্থকার বলেছেন, **'মরফু ছহীহ দলিল'** পাননি। দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক শরঈ দলিলের আলোকেই করা হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করেন না এমন অনেক বড় বড় ইমাম, হাফিজুল হাদীস ও মুহাদ্দিসই এর দলিল পেয়েছেন। যেমন ইমাম ইবনে আব্দিল বার, ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম যাহাবী, ইবনে হাযম জাহেরী প্রমুখ।

২. এ বিষয়ে অনেক মরফূ সহীহ হাদীসে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা পূর্বে বিতর নামাযের মূল আলোচনায় গত হয়েছে। এখানেও পূর্বোল্লেখিত ইবনে উমর (রা.) এর মরফু বর্ণনাটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সহীহ দলিল।

৩. 'দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে তৃতীয় রাকাত পড়বে' এর পক্ষে কোন মরফু সহীহ ও ছরীহ (স্পষ্ট) দলিল আছে কি? গ্রন্থকারতো তার এ গ্রন্থে দেখাতে পারেননি! আর 'দুই রাকাতে বৈঠক না করেই তিন রাকাত পড়বে' এ বিষয়ে মরফু নয় কোন মওকুফ সহীহ বর্ণনাও তারা পেশ করতে পারবেন না।

৪. মুবারকপুরী সাহেব বলেছন– 'মরফু' দলিল পাননি। তার মানে মওকুফ দলিল পেয়েছেন। আর মওকুফ তথা সাহাবীদের বক্তব্যতো অনেক আছে এর পক্ষে। তাহলে কি তিনি যেখানে মরফু পাওয়া যায় না সেখানেও মুওকুফ তথা সাহাবীর বক্তব্যকে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না? গ্রন্থকারও কি তার সাথে একমত? অথচ তিনি তার গ্রন্থের ৩৩২ ও ৩৩৩ পৃষ্ঠার টীকায় তিনটি মওকুফ বর্ণনা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন! তাহলে কি নিজের বেলায় চলে কিন্তু অন্যের বেলায় না!

৫. এখানে তিনি মরফু দলিল তালাশ করেন, অথচ কুনূত পড়ার সহীহ নিয়ম শিরোনামে তিনি আলবানী সাহেবের 'ইরওয়াউল গালীল [২/৭১] পৃষ্ঠার বরাত দিয়েছেন, যেখানে তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিস ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ রহ. এর আমল বর্ণিত হয়েছে। তাহলে তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসের বক্তব্য বা ফতোয়াও নয়, বরং তার একটি আমল দলিল হয়ে যায়, অথচ এখানে 'কেবল মরফু দলিল তলব করতে হয় এটা কেমন কথা!

তিন রাকাত বিতরের প্রথম পদ্ধতি: এক সালামে এক বৈঠকে তিন রাকাত?

গ্রন্থকার - ১৬

গ্রন্থকার বলেন: *"এক সঙ্গে তিন রাকআত পড়ার ছহীহ দলীল:*

*عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث **لا يقعد** إلا في آخرهن.*

*হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাক'আতে ব্যতীত **বসতেন না**।" [টীকা:১২৮১. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০; বায়হাক্বী হা/৪৮০৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ৪১; সনদ ছহীহ, তা'সীসুল আহকাম ২/২২৬ –(২/২৯৭] (পৃ. ৩৩১)*

পর্যালোচনা

(ক) গ্রন্থকার উল্লিখিত হাদীসের যে বরাত দিয়েছেন তন্মধ্যে আমি প্রথমটিতে (অর্থাৎ মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০) হাদিসটি এ শব্দে পাইনি। তিনি বলেছেন– " لا يقْعُد (বসতেন না)" আর মুস্তাদরাকের মুদ্রিত কপিতে আছে– **"لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)"**। আর **(সালাম ফিরাতেন না)** শব্দ দিয়ে দুই রাকাতের পর তাশাহহুদ পড়তেন না এর পক্ষে দলিল হয় না। বরং এ হাদীস থেকেত একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিতরের দুই রাকাতে বসতে হয়, কিন্তু সালাম ফিরাতে হয় তিন রাকাত পূর্ণ করে। কেননা এর অর্থ যদি দুই রাকাতে না বসা হত, তাহলে " لا

Contents

يُسَلِّم (শেষ না করে সালাম ফিরাতেন না)"– এ কথার কোন অর্থই হয় না। কারণ সালামত আর দাড়ানো অবস্থায় হয় না যে, 'সালাম ফিরাতেন না' বলে দিতে হবে।

মোট কথা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত মুসতাদরাকের মোট পাঁচটি কপিতে আমি হাদীসটি **(সালাম ফিরাতেন না) শব্দে** এভাবেই পেয়েছি। দেখুন–

১. আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ১/৪৪৭ হা.১১৪০ তাহক্বীক– আব্দুল ক্বাদের আতা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বাইরুত, লেবানন।

২.আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন– ১/৪৩৭ হা.১১৪১, প্রকাশক– দারুল হারামাইন, মিশর, প্রথম প্রকাশ –১৯৯৭।

৩. আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ১/৩০৪ তাহক্বীক– ইউসুফ আব্দুর রহমান, বাইরুত, লেবানন।

৪. আল-মুসতাদরাক, হা. ১/৪১৪ দারুল ফিকর, বাইরুত, লেবানন।

৫. আল-মুসতাদরাক, ১/৩০৪ দাইরাতুল মা'আরিফিল উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, ভারত, প্রকাশকাল–১৩৩৪ হি.) এমনকি নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবও ইরওয়াউল গালিলে (১/১৫১) এ শব্দেই উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু গ্রন্থকার মুস্তাদরাকের কোন কপিতে " لا يقْعُد (বসতেন না)" পেলেন তা বলেননি। পরবর্তীতে তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তিনিও কোন মুদ্রিত কপিতে " لا يقْعُد (বসতেন না)" শব্দটি পাননি। কারণ তিনি বলেছেন– *"মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত لا يقْعُد (বসতেন না) শব্দকে* ***পরিবর্তন করে*** *পরবর্তী ছাপাতে لا يُسَلِّم (সালাম ফিরাতেন না)* ***করা হয়েছে।***" আবার কোন মাখতূতা বা পাণ্ডুলিপিতে এ শব্দটি তিনি দেখেছেন তাও বলেননি। তার কথা 'পরবর্তী ছাপা' দ্বারা বুঝা যায় পূর্ববর্তী ছাপাতে لا يقْعُد (বসতেন না) শব্দ ছিল। কিন্তু সেটি পূর্ববর্তী কোন ছাপা তা তিনি কিছুই বলেননি!

তবুও কেন তিনি হাদীসটি "<u>*لا يَقْعُد*</u> (বসতেন না" শব্দে এনে মুস্তাদরাকের বরাত উল্লেখ করলেন আমার বুঝে আসে না? যদি তার কাছে এ শব্দটি ভুল মনে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কিতাবের মূল শব্দটি উল্লেখ করার পর তা ভুল প্রমাণ করে দেখাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে নিজ থেকে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। পরে জোড়াতালি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত দলিল না দিয়ে কতগুলো অযৌক্তিক কথা বলে শাস্ত্রীয় লোকদের জন্য কিছু হাসির যোগান দিলেন।

গ্রন্থকারের সমচিন্তার লেখক আব্দুল্লাহ আল-কাফি এখানে তারচেয়েও মারাত্মক অন্যায় কাজ করেছেন। তিনি বিতর ছালাত বইয়ে (পৃ.৩১) লেখেন– <u>*"এর মধ্যে **তাশাহুদের জন্যে** বসতেন না"*</u>। অর্থাৎ তিনি বসতেন না শব্দের সাথে **'তাশাহুদের জন্যে'** কথাটি নিজের থেকে জুড়ে দিলেন, যার আরবী হবে– (للتشهد)। টীকায় বলেন– <u>*"হাদীছটি বর্ণনা করেন ইমাম হাকেম, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ বলেন।"*</u> এতে তিনি কোন খণ্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া আর কোন বরাতও উল্লেখ করেননি। তাহলে কোথায় পেলেন তিনি এ শব্দ? এভাবেই তাহলে নবীজীর নামাযকে জাল হাদীস থেকে মুক্ত করতে গিয়ে জাল হাদীস যুক্ত করে দেওয়া হয়!

(খ) কোন শব্দটি সহীহ– " لا يَقْعُد" নাকি " لا يُسَلِّم"?

এখানে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার হওয়া দরকার–

এক. মুস্তাদরাকে হাকেমে এ হাদীসটি কোন শব্দে এসেছে?

দুই. এ হাদীসের অন্যান্য সকল সনদ বিবেচনায় কোন শব্দটি বিশুদ্ধ–" لا يَقْعُد (বসতেন না)" নাকি " لا يُسَلِّم (সালাম ফিরাতেন না) "?

তিন. " لا يَقْعُد (বসতেন না)" শব্দের অর্থের মধ্যে কি– 'তাশাহুদের জন্য' বসতেন না, এটি সুস্পষ্ট? নাকি 'সালাম ফিরানোর জন্য বসতেন না, এ অর্থেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে?

চার. হাদীস বর্ণনাকারী ইমাম বাইহাকী (রহ.) নিজে এ হাদীস থেকে কোন তরীকার বিতর বুঝেছেন?

পাঁচ. হাদীসটি বর্ণনাকারী ইমাম বাইহাকী (রহ.) বর্ণনাটির কি মান উল্লেখ করেছেন?

(এক) হাদীসের শব্দ " لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)" ই সঠিক

আমার অনুসন্ধানে মনে হয়, মুসতাদরাকে হাকেমে মূলত " لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)" শব্দটিই ছিল। অর্থাৎ হাকেম এ শব্দেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর " لا يقْعُد (বসতেন না)" শব্দটি সঠিক নয়। হাকেম এ শব্দে বর্ণনা করেননি। কারণ–

১. আমার দেখা 'মুসতাদরাকের' পাঁচটি মুদ্রিত কপিতেই হাদীসটি " لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)" শব্দে এসেছে – যা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশকদের কাছে এ কিতাবের যে কটি পাণ্ডুলিপি ছিল তাতে হাদীসটি এ শব্দেই এসেছে।
২. কিতাবটি মুদ্রিত হয়ে আসার বহু আগে, যখন হস্তলিখিত কপি প্রচলিত ছিল তখনও বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের অনেক মুহাদ্দিস 'মুসতাদরাক' থেকে হাদীসটি এ শব্দে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় তাদের কাছে থাকা মুসতারাকের কপিগুলোতেও হাদীসটি এ শব্দেই ছিল। যেমন:

- হাফেজ জামালুদ্দীন যাইলাঈ (মৃত.৭৬১) নছবুর রায়া গ্রন্থে
- হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনে আব্দিল হাদী (মৃ.৭৪৪) তানক্বীহুত তাহক্বীক গ্রন্থে (২/৪২১)
- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (মৃ.৮৫২) 'আদদিরায়া' গ্রন্থে (১/১৯১ হা.২৪২)
- হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃ.৮৫৫) উমদাতুলকারী, শরহু আবিদাউদ ও আল বিনায়া গ্রন্থে
- ইবনুল হুমাম (মৃ.৮৬১) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে,

- হাফেজ ক্বাসেম ইবনে কুতলুবুগা (মৃ.৮৭৯) 'আততা'রীফ ওয়াল ইখবার ফি তাখরীজুল ইখতিয়ার' (১/৩৭৯ হা.২১৭) গ্রন্থে
- মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃ.১০১৪) শরহু মুসনাদি আবিহানীফা গ্রন্থে
- মুরতাজা যাবীদী (মৃ.১২০৫) উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা গ্রন্থে।
- এমনকি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম শাওকানী রহ. নিজেও 'নাইলুল আওতারে' (৩/৪২) হযরত আয়শা (রা.) এর হাদীসটিতে মুসনাদের আহমদের পাশাপাশি মুসতাদরাকের বরাতও উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদের বর্ণনার শব্দ হল– (لا يفصل بينهن) 'তিনি রাকাতসমূহকে (সালামের মাধ্যমে) বিভক্ত করতেন না'। এটি উল্লেখের পর শাওকানী বলেন– (أما حديث عائشة فأخرجه أيضا البيهقي والحاكم بلفظ أحمد) : "আয়শার হাদীসটি বাইহাকী ও হাকেম (মুসনাদে) আহমদের (অনুরূপ) শব্দেই উল্লেখ করেছেন"। আর আহমদের অনুরূপ শব্দ হল– "সালাম ফিরাতেন না" – অর্থাৎ সালামের মাধ্যমে বিভক্ত করতেন না।

উপরোল্লিখিত পৃথিবী বিখ্যাত হাফেজে হাদীসগণ বিভিন্ন যুগে মুসতাদরাকের বিভিন্ন হস্তলিখিত কপি থেকে হাদীসটি এ শব্দেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এ নয় অঞ্চলের নয় জন হাফেজে হাদীস ও মুহাদ্দিসের কাছে মুস্তাদরাকের যে কপিগুলো ছিল, তাতে এ শব্দটিই ছিল। বলাবাহুল্য তখন মুদ্রণের যুগ ছিল না যে, একজন ভুল ছেপে দিলে সবার কাছেই ভুলটা চলে যাবে। বরং সবগুলোই ছিল হস্তলিখিত কপি। আর এতগুলো কপিতে এক সাথে ভুল শব্দ থাকবে এটা হওয়ার কথা নয়।

অবশ্য ইবনে হাজার আসকালানীর ফাতহুল বারী মুদ্রিত কপিতে, হাদীসটি "বসতেন না" শব্দে এসেছে। হতে পারে তিনি অন্য কোন কপিতে এ শব্দেই পেয়েছেন। আবার এও হতে পারে যে, এটি ফাতহুল বারী কিতাবের মুদ্রণের ভুল। কিন্তু ইবনে রজব ফাতহুল বারীতে, ইবনুল মুলাক্কিন আল বাদরুল মুনীরে এবং ইবনু আব্দিল হাদী তানকীহুত তাহকীকে (لا يقعد) শব্দে উল্লেখ করেছেন। তাই এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে,

হয়ত মুসতাদরাকের কোন পাণ্ডুলিপিতেই لا يَقْعُد শব্দ রয়েছে। কিন্তু যেমনটি আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেছেন–

"আমার প্রবল ধারণা (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকে হাকেমের পাণ্ডুলিপিতেও থাকবে। কেননা যাইলাঈ কারো উদ্ধৃতি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এতটা (মুতাসাব্বিত) নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে থাকেন যে, হাফেজ (ইবনে হাজার আসকালানী)ও অতটা করেন না। তাঁর একটি রীতি হল, তিনি যখন কারো বক্তব্য কোন মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তখন মাধ্যম উল্লেখ করে দেন। নতুনা নিজ চোখে দেখেই সেখান থেকে হুবহু বক্তব্যটিই উল্লেখ করেন। আর এখানে (لا يسلم) বলেছেন। সুতরাং (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকের পাণ্ডুলিপিতে অবশ্যই থাকবে।"[1] [আরফুশ শাযী- তিরমিযীর সাথে যুক্ত পৃ. ১০৪-১০৫]

৩. বিশেষত হাকেম এ হাদীসটি উল্লেখের পূর্বে একই সনদে আরেকটি হাদীস এনেছেন (নং ১১৩৯), যার শব্দ হল– (لا يسلم في ركعتي الوتر) সালাম ফিরাতেন না"। অতঃপর বলেন– "এ হাদীসের আরো শাওয়াহেদ তথা সমর্থক হাদীস আছে"। এবং সমর্থক হিসেবেই আলোচ্য হাদীসটি (হা.১১৪০) এনেছেন। তাই দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের সমর্থক হওয়ার জন্য প্রথম হাদীসের মত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৪. মুসতাদরাকের এ বর্ণনার সাথেই উল্লেখ আছে, "এটিই উমর রা. এর বিতর। তাঁর কাছ থেকেই **মদীনাবাসী** এ পদ্ধতির বিতর শিখেছে"।

- বলাবাহুল্য ইমাম মালেক রহ. মদীনাবাসীর বিতরকে অনুসরণ করতেন, কিন্তু কোন মদীনাবাসী থেকে তিনি দুই রাকাতে বৈঠক ছাড়া

---

[1]. وظني الغالب أن لفظ لا يسلم لا بد من أن يكون في مستدرك الحاكم ، فإن الزيلعي متثبت في النقل مثل ما ليس الحافظ متثبتاً ومن عادته أنه إذا نقل عبارة أحد بواسطة يذكر الواسطة وإلا فينظر المنقول عنه بعينه ويذكر لفظ المنقول عنه بعينه ، وهاهنا غير بهذا لفظه فلا بد من كون اللفظ لا يسلم في مستدركه.

তিন রাকাত বিতরের কোন বিবরণ উল্লেখ করেনও নি এবং তিনি নিজেও এভাবে বিতর পড়ার কথা বলেননি।

আবার হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ.৮০৪) রহ. হাকেমের এ বিবরণ উল্লেখ করেছেন, "তাঁর কাছ থেকেই (মদীনাবাসী– এর স্থলে) '*কুফাবাসী*' এ পদ্ধতির বিতর শিখেছে"। (আল-বাদরুল মুনীর ৪/৩০৮ দারুল হিজরাহ)। যদি 'মদীনাবাসী'র পরিবর্তে 'কুফাবাসী' শব্দটি সহীহ হয় তাহলে, এ থেকে বুঝা যায় মুসতাদরাক সঙ্কলক হাকেম আবু আব্দুল্লাহ এ হাদীস থেকে দুই তাশাহহুদ ও এক সালামের বিতরই বুঝেছেন। বিশেষত হাকেমের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাইহাকী রহ.। তিনিও হাদীসটির শিরোনাম দিয়েছেন– 'দুই তাশাহ্হুদ ও এক সালামে তিন রাকাত বিতর'।

(দুই) হাদীসের সবগুলো সূত্র সামনে রাখলে– দুই রাকাতে 'বসতেন না' কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না–

হযরত আয়শা রা. এর সূত্রে হাকেম ও বাইহাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ– শাইবান ইবনে ফাররুখ আবান ইবনে ইয়াযিদ থেকে এবং আবান ইবনে ইয়াযিদ কাতাদা থেকে। অতঃপর সনদটি এরূপ– যুরারাহ-সা'দ ইবনে হিশাম-হযরত আয়শা রা.।

কাতাদাসূত্রে হযরত আয়শা রা. এর বর্ণনাটি হাদীসের বহু কিতাবে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে (কাশফুস সিতর পৃ.৮৯-৯০)। যেমন–

১. (يوتر بثلاث لا يسلم /لا يقعد إلا في آخرهن – رواه الحاكم والبيهقي)

২. (كان لا يسلم في ركعتي الوتر– رواه النسائي)

৩. (أوتر بثلاث لا يفصل فيهن – رواه أحمد في المسند)

৪. (الوتر بتسع أو بسبع – رواه مسلم (٧٤٦) وغيره)

নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম মনে করেন– সবগুলো মূলত একই হাদীসের বিভিন্ন শব্দ। বর্ণনাকারী বিভিন্ন সময়ে হাদীসের মূল বক্তব্য ঠিক রেখে বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো

বিস্তারিত। সুতরাং এ হাদীস থেকে বিতর নামাযের পদ্ধতি বের করতে হলে, সবগুলো বর্ণনাকে সামনে রেখেই তবে করতে হবে। যে সকল মুহাদ্দিস শব্দের সামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও সবগুলোকে একই হাদীস বলে গণ্য করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন–

১. এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাকেম স্বয়ং– তার মুসতাদরাকে উপরোক্ত দ্বিতীয় নম্বরে উল্লিখিত শব্দের সমর্থক হিসেবে প্রথম নম্বরে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। (মুসতাদরাক হা.১১৪০, ১১৪১)

২. এ হাদীসে অপর বর্ণনাকারী বাইহাকী রহ. স্বষ্ট ভাষায় বলেছেন, সা'দ ইবনে হিশাম সূত্রে হযরত আয়শা রা. থেকে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত বিতর বিষয়ক হাদীস মূলত একটি হাদীসেরই বিভিন্ন চিত্র। (وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اخْتِصَارًا مِنَ الْحَدِيثِ) [আসসুনানুল কুবরা ৩/৩১]
অবশ্য বাইহাকী রহ. এর মত হল, সাদ ইবনে হিশামের আলোচ্য বর্ণনায় রাকাত সংখ্যা ছিল নয়। এ কথা মারওয়াযী ও তার অনুসরণে আলবানীও বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ মতের পক্ষে যথাযথ কোন দলিল পাওয়া যায় না।

৩. ইমাম নববী বাইহাকীর মন্তব্যটি সমর্থনপূর্বক উল্লেখ করেন। (আল-মাজমূ–৪/১৮)

৪. হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন (মৃ.৮০৪)। (আল-বদরুল মুনীল ৪/৩০৮)

৫. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.। (ইতহাফুল মাহারা বিল ফাওয়াইদিল মুবতাকারাহ ১৬/১০৮৬ হা. ২১৬৭১)

৬. ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ ও শাওকানী রহ.। (নাইলুল আওতার ৩/৩৫)

৭. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. (কাশফুস সিতর পৃ.৮৯-৯০)
৮. খোদ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও স্পষ্ট ভাষায় দুটি হাদীসকে এক গণ্য করে বলেন– (قلت لا مخالفة بين قوله **لا يسلم في الركعتين الأولين من الوتر** وقوله **لا يقعد** إلا في آخرهن) – দুই হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। [তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৫৩]

এ ছাড়াও আরো অনেকেই এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। বিশেষত প্রথমোক্ত দুটি শব্দ হযরত কাতাদা সূত্রে একই সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সবগুলো বর্ণনাকে সামনে রাখলে স্পষ্ট যে, আলোচ্য হাদীসের শব্দ অন্যগুলোর মতই – “لا يقْعُد (বসতেন না)” না হয়ে “ لا يُسَلم (সালাম ফিরাতেন না)” হওয়াটাই যক্তিযুক্ত।

আর যদি এ হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে প্রথমোক্ত মুসতাদরাকে হাকেম ও বাইহাকীর (لا يقعد / لا يسلم) শব্দ সম্বলিত বর্ণনাটিই অধিকতর দূর্বল প্রমাণিত হয়। এর তুলনায় দ্বিতীয় নাম্বারে উল্লিখিত (لا يسلم في ركعتي الوتر) – শব্দটিই প্রাধান্য পায়, যার সুস্পষ্ট অর্থ হল, বিতরের দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করতেন হয়, কিন্তু সালাম ফিরাতেন না। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দটি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন **শাইবান** ইবনে ফাররুখ আবান সূত্রে। আর দ্বিতীয়টি বর্ণনা করেছেন, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আতা সাঈদ ইবনে আবী আরুবা সূত্রে। তন্মধ্যে শাইবান সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনায় ভুল করতেন, (صدوق يهم– تقريب التهذيب)। তাই কারো বর্ণনার সাথে বিরোধ লাগলে তার বর্ণনা যাচাই করা জরুরী। বিপরীতে আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আতা সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন– (كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سَعِيد بن أَبِي عَرُوبَة) : আব্দুল ওয়াহহাব সাঈদের হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন (তাহযীবুল কামাল)। তাই সাঈদের বর্ণনায় তার ভুল হবার কথা নয়। আর ইমাম আবু হাতিম, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও আবু দাউদ তায়ালিসী প্রমুখ বলেন– “(كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة/ أعلم الناس بحديث قتادة) : অর্থাৎ কাতাদার হাদীস সম্পর্কে কাতাদার শিষ্যদের মধ্যে সাঈদ সবচেয়ে বেশি জানেন।” (সিয়ারু আলামিন নুবালা) সুতরাং স্বভাবতই তার বর্ণনা শাইবানের বর্ণণার উপর

অগ্রগণ্য হবে। [আরো দেখুন– নছবুর রায়াহ টীকা, তাহক্বীক শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ ২/১১৮]

(তিন) " لا يقْعُد" অর্থ 'সালাম ফেরানোর জন্য বসতেন না'

যদি ধরে নেয়া যায় এ হাদীসে " لا يقْعُد (বসতেন না)" শব্দটিই সঠিক। তাহলে প্রশ্ন হয়– শব্দের অর্থের মধ্যে কি 'তাশাহুদের জন্য' বসতেন না এটি সুস্পষ্ট; নাকি 'সালাম ফিরানোর জন্য' বসতেন না এ অর্থেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে? এ পশ্নের উত্তর খুঁজে দেখা যায়, দুটো অর্থের সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে 'সালাম ফিরানোর জন্য বসতেন না' অর্থটিই এখানে যথোপযুক্ত মনে হয়। কারণ একই হাদীসের অন্য বর্ণনায়– " لا يفصل فيهن" –"নামায বিভক্ত করতেন না"। (মুসনাদে আহমদ হা. ২৫২২৩) আরেক বর্ণনায় – (لا يسلم في ركعتي الوتر) "বিতরের দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন না" বলা হয়েছে। (সুনানে নাসায়ী হা.২৫২২৩)
যারা সা'দ ইবনে হিশাম সূত্রে হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাগুলোকে এক হাদীস গণ্য করেন তারা সকলেই হাদীসের এ ব্যাখ্যাই করে থাকবেন। এবং (لايسلم) বা (لا يقْعُد) যে শব্দই হোক তারা এ হাদীস থেকে এক সালাম ও দুই বৈঠকের তিন রাকাত বিতরই বুঝেছেন।

উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, ইমাম ইবনুল জাওযী (মৃ.৫৯৭), ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল হাদী (মৃ.৭৪৪) ও ইমাম যাহাবী (মৃ.৭৪৮) প্রত্যেকেই কাতাদাসূত্রে হাদীসটি উল্লেখকরে বলেছেন– এ হাদীস থেকে এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়া প্রমাণিত হয়। তবে দুই রাকাতে বৈঠক অবশ্যই করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁরা দুই রাকাতে বৈঠক না করার সম্ভাবনাটকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন দৃঢ়তার সাথে। তাদের তিনজনেরই ভাষ্য প্রায় কাছাকাছি এবং তিনজনের কেউই ফিকহে হানাফীর অনুসরণ করতেন না। তন্মধ্যে ইমাম

যাহাবী রহ. ভাষ্য হল– (قلْنَا : يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب) – 'আমরা বলি, এ পদ্ধতিতে এক সালামেও (তিন রাকাত) বিতর পড়া সম্ভাবনা আছে। তবে মাগরিবের নামাযের মত মাঝে তাশাহহুদ পড়বে।' [দেখুন–তানকীহু কিতাবিত তাহকীক, ইমাম যাহাবী ১/২১৬, আত্তাহকীক ফি মাসায়িলিল খিলাফ ১/৪৫৬ তানকীহুত তাহক্বীক, ইবনু আব্দিল হাদী ২/৪২১]

বরং তারও পূর্বে ইমাম ইবনে হাযম জাহেরী (মৃ.৪৫৬) বিতর নামাযের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনায় বলেন– (والثاني عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في الثانية، ثم يقوم دون تسليم ويأتي بالثالثة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، كصلاة المغرب وهو اخْتِيَارُ أبي حَنِيفَةَ.) : 'দ্বাদশ পদ্ধতি: তিন রাকাত নামায পড়বে। তাতে দুই রাকাত শেষে বসে সালাম না ফিরিয়েই আবার দাড়িয়ে যাবে এবং তৃতীয় রাকাত পড়বে। অতঃপর মাগরিবের নামাযের মতই বসে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। আর এ মতটাই গ্রহণ করেছেন আবু হানীফা"। অতঃপর তিনি দলিল হিসেবে সা'দ ইবনে হিশামের এ বর্ণনাটিই উল্লেখ করেছেন, (لا يسلم في ركعتي الوتر)। (আল-মুহাল্লা বিল আসার ৩/৪৭)
আলোচ্য হাদীসের এ অর্থটা খুব স্বাভাবিক। এ কারণেই গায়রে মুকাল্লিদ আলেম শাওকানী (রহ.) ও শামসুল হক আজীমাবাদী রহ. উভয়েই সাদ ইবনে হিশাম সূত্রে হযরত আয়শার এ হাদীসের একটি বর্ণনায়– "لا يقْعُد (বসতেন না)" শব্দের ঠিক একই ব্যাখ্যা করেছেন। শাওকানী রহ. নবীজী থেকে বর্ণিত হাদীস– (صلى سبع ركعات **لا يقعد** إلا في آخرهن) 'সাত রাকাত পূর্ণ করার আগে **বসতেন না**' এর ব্যাখ্যায় বলেন– (الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة والرواية الثانية تدل على نفيه ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه

(التسليم) – “প্রথম বর্ণনা থেকে বুঝা যায় ষষ্ট রাকাতে ‘বসতেন’। আর দ্বিতীয় বর্ণনা থেকে বুঝা যায় ‘বসতেন না’। এ দুয়ের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য হবে যে, তিনি **‘বসতেন না’** দ্বারা বোঝানো হয়েছে – **‘সালাম ফেরানোর জন্য বসতেন না’**।” [নাইলুল আওতার ৩/৪৭ ছালাতুল বিতরি ওয়াল কিরাআতি ওয়াল কুনূত অধ্যায়, আওনুল মা‘বুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ ৪/২২১]

(চার) ইমাম বাইহাকী রহ. নিজেই এ হাদীস থেকে ‘এক সালাম ও দুই তাশাহুহুদে তিন রাকাত বিতর’ বুঝেছেন।

আলোচ্য বর্ণনাটি এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে মৌলিকভাবে কেবল হাকেমের মুসতাদরাক কিতাবে। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি হাকেমের সূত্রেই ‘আস-সুনানুল কুবরা’ ও ‘মা‘রিফাতুস সুনান’ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। **আর বর্ণনাকারী ইমাম বাইহাকী নিজেই এ হাদীস থেকে ‘এক সালাম ও দুই তাশাহহুদে তিন রাকাত বিতর’** বুঝেছেন। তিনি ‘আসসুনানুল কুবরায়’ (৩/৩১) যে অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করে এর শিরোনাম দিয়েছেন– (باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم) –“অধ্যায় ঃ যারা দুই তাশাহহুদ ও এক সালামে একত্রে মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পড়েন”। আর ‘মা‘রিফাতুসসুনান’ গ্রন্থে (৪/৭১) আরো স্পষ্ট বলেছেন– (الوتر بثلاث ركعات موصولات بتشهدين ويسلم من الثالثة) –“বিতর নামায দুই তাশাহুহুদে একত্রে তিন রাকাত, এবং তৃতীয় রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে”। এখানে বাইহাকী রহ. হাদীসটি থেকে কি বুঝে আসে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তদ্রূপ হাকেম নিজেও এ হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের সমর্থক বলে দিয়েছেন। যাতে ‘বসতেন না’ কথাটি নেই।

গ্রন্থকার - ১৭

গ্রন্থকার বলেন, *“**বিশেষ সতর্কতা:** মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত لا يَقْعُد (বসতেন না) শব্দকে **পরিবর্তন করে** পরবর্তী ছাপাতে لا يُسَلِم (সালাম*

*ফিরাতেন না) **করা হয়েছে**। কারণ পূর্ববর্তী **সকল মুহাদ্দিছ** لا يَقْعُدُ দ্বারাই উল্লেখ করেছেন।* টীকায় বরাত দিয়েছেন– *"হাকেম হা/১১৪০ ফৎহুল বারী হা/৯৯৮ আল-আরফুশ শাযী ২/১৪"* (পৃ.৩৩১)

পর্যালোচনা

এক. গ্রন্থকারের দাবি মুসতাদরাকের মুদ্রিত কপিতে হাদীসের শব্দ পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে পরিবর্তন করেছে তিনি তা বলেননি। আর যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহলে অনুমান ভিত্তিক এমন অপবাদ কারো উপর দেয়া ঠিক নয়। পূর্বে বলা হয়েছে কিতাবটি ছাপার বহুকাল আগেই হাদীসটি এ শব্দে বিভিন্ন জনের কিতাবে ছিল। মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব যে বলেছেন, পরবর্তী ছাপায় পরিবর্তন করা হয়েছে; তিনি কি দেখাতে পারবেন যে পূর্ববর্তী কোন ছাপায় তা *لا يَقْعُدُ* শব্দে ছিল?

দুই. তিনি পরিবর্তনের দলিল হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন তা একদিকে যেমন ভিত্তিহীন অপরদিকে হাস্যকরও বটে। কেননা

- তিনি বলেন– "*কারণ পূর্ববর্তী **সকল মুহাদ্দিছ** لا يَقْعُدُ দ্বারাই উল্লেখ করেছেন*"। কিন্তু এ দাবি যে সঠিক নয় পূর্বের আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কিতাব মুদ্রণের যুগ শুরু হওয়ার বহু যুগ আগেই অনেক সংখ্যক মুহাদ্দিস বর্ণনাটি– (لا يسلم) শব্দে উল্লেখ করেছেন। যদিও কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনাটি দ্বিতীয় শব্দেও উল্লেখ করেছেন তবুও অনেকগুলো পার্শ্বকারণ সামনে রাখলে (لا يسلم) শব্দটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়। সুতরাং মুদ্রণের বহু আগে থেকেই এ শব্দ ছিল।
- আর "*পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস*" কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। যা পূর্বে দেখানো হয়েছে।

তিন. গ্রন্থকার টীকায় বরাত দিয়েছেন, *"হাকেম হা/১১৪০ ফৎহুল বারী হা/৯৯৮ আল-আরফুশ শাযী ২/১৪"* এখানে হাকেমের বরাত দেয়াটা হাস্যকর। কারণ, মতপার্থক্যই হল হাকেমের শব্দ নিয়ে। হাকেমের কিতাব থেকে মুহাদ্দিসগণ দুই শব্দেই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাই এক্ষেত্রে

হাকেমের বরাত দেয়াটা সত্যিই হাস্যকর। আবার হাকেমের মুদ্রিত কপিতেতো রয়েছে– (لا يسلم) শব্দ। তিনি যে হাদীস নাম্বার দিয়েছেন (হা.১১৪০) মুসতাদরাকের কোন কপিতেতো এখানে (لا يقْعُد) শব্দে হাদীসটি নেই। আর ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার এ শব্দে আনলেও তাঁর আদদিরায় কিতাবে তিনি (لا يسلم) শব্দে এনেছেন।

গ্রন্থকার - ১৮

অতঃপর গ্রন্থকার বলেন– *"আরো দুঃখজনক হল, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) নিজে স্বীকার করেছেন যে, আমি মুস্তাদরাক হাকেমের তিনটি কপি দেখেছি কিন্তু কোথাও لا يُسَلِم (সালাম ফিরাতেন না) পাইনি। তবে হেদায়ার হাদীছের* ***বিশ্লেষক*** *আল্লামা যায়লাঈ উক্ত শব্দ উল্লেখ করেছেন।* ***আর যায়লাঈর কথাই সঠিক।*** *সুধি পাঠক! ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫) নিজে হাদীছটি সংকলন করেছেন আর তিনিই সঠিকটা জানেন না! বহুদিন পরে এসে যায়লাঈ (মৃত.৭৬২) সঠিকটা জানলেন? অথচ ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮হিঃ) ও একই সনদে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে একই শব্দ আছে। অর্থাৎ* لا يقْعُد *(বসতেন না) আছে।* ***একেই বলে মাযহাবী গোঁড়ামী। অন্ধ তাকলীদকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।"(পৃ.৩৩২)***

গ্রন্থকারের বক্তব্যের খোলাসা কথা হল– ১.হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে (لا يقْعُد) 'বসতেন না' শব্দে। আর যাইলাঈ কয়েকশত বছর পর এসে বলছেন হাদীসের শব্দ হল– (لا يسلم) 'সালাম ফিরাতেন না'। ২.কাশ্মীরী রহ. মাযহাবের গোঁড়ামির কারণে বলছেন– যাইলাঈর কথাই সঠিক।

পর্যালোচনা

(ক) বক্তব্য বিকৃত করে অপবাদ আরুপ

গ্রন্থকার এখানে রীতিমত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর বক্তব্যকে কেটে ছেটে বিকৃত করে তার উপরে দোষ চাপিয়ে দিলেন। দেখুন তিনি বলেন, "***আর যায়লাঈর কথাই সঠিক"!*** অতঃপর বিস্ময়করভাবে যাইলাঈকে হাকেম ও বাইহাকীর মোকাবেলায় দাড় করালেন?!

বস্তুত গ্রন্থকারের দুটি কথাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। দেখুন কাশ্মীরী রহ. বক্তব্য হল, “আমার প্রবল ধারণা (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকে হাকেমের পাণ্ডুলিপিতেও থাকবে। কেননা যাইলাঈ কারো উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সময় এতটা (মুতাসাব্বিত) নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে উল্লেখ করেন, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও অতটা করেন না। তাঁর একটি আদত হল, তিনি যখন কারো বক্তব্য কোন মাধ্যমে পেয়ে থাকেন তখন তার বরাত উল্লেখ করে দেন। নতুবা নিজ চোখে দেখেই সেখান থেকে হুবহু বক্তব্যটিই উল্লেখ করেন। আর এখানে শব্দ পরিবর্তন করে (অর্থাৎ (لا يقْعُد) না বলে (لا يسلم) বলেছেন। (এবং এর কোন বরাতও উল্লেখ করেননি। তাই বুঝা যায় তিনি মসতাদরাকে (لا يسلم) শব্দটি নিজ চোখে দেখেই তবে উল্লেখ করেছেন।) সুতরাং (لا يسلم) শব্দটি মুসতাদরাকের পাণ্ডুলিপিতে অবশ্যই থাকবে।

অর্থাৎ যাইলাঈ রহ. হাকেম রহ এর মুসতাদরাক গ্রন্থ থেকে হাদীসটি لا يقْعُد শব্দে নয় বরং لا يسلم শব্দেই উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীরির কথা হল, মুসতাদরাকের কোন পাণ্ডুলিপিতে যদি হাদীসটি لا يسلم শব্দে আমি না পাই, তবুও প্রবল ধারণা হয় যে, এটি মুসতাদরাকের কোন না কোন কপিতে থাকবেই। কারণ, যাইলাঈ নিজের চোখে না দেখে কোন বরাত দেন না। সুতরাং হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীসটি কোন শব্দে বর্ণনা করেছেন, তাতো আর আমরা হাকেমকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারব না। বরং মুসতারাকের কপিতে যা পাই তাই বিশ্বাস করতে হবে। তাছাড়া যাইলাঈ ছাড়াও আরো অনেকেই মসতাদরাকের বরাতে হাদীসটি لا يسلم শব্দে উল্লেখ করেছেন। এতেও কাশ্মীরীর রহ. এর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

সাধারণ পাঠকও এখান থেকে একথা বুঝবে না যে, হাকেম বলতেছেন, হাদীসের শব্দ হল– (لا يقْعُد) ‘বসতেন না’, আর যাইলাঈ এটা অস্বীকার করে বলছেন হাদীসের শব্দ – (لا يسلم) ‘সালাম ফিরাতেন না’।

বরং এখানে মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেব মুসতাদরাকের কপিতে হাদীসটি (لا يقْعُد) 'বসতেন না' শব্দে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। যদিও কোন কপিতে পেয়েছেন তার কোন উল্লেখ তিনি করেননি। বিপরীতে যাইলাঈ মুসতাদরাকের বরাতে হাদীসটি (لا يسلم) 'সালাম ফিরাতেন না' শব্দে উল্লেখ করেছেন। আমরাও বহু সংখ্যক মুদ্রিত কপিতে হাদীসটি এ শব্দেই পেয়েছি। তাই একথা বলা যায়, মুসতাদরাকে হাদীসটি কোন শব্দে রয়েছে এ বিষয়ে জনাব মুযাফ্ফর সাহেব এর কথা বিশ্বাস করব, নাকি ইমাম যাইলাঈর কথা?! সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে মুযাফফর সাহেব কোন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিতেই (لا يقْعُد) 'বসতেন না' শব্দটি দেখেছেন বলে প্রমাণ হয়নি। তবুওকি যাইলাঈর কথাকে সঠিক বললে দোষ হবে?

বরং মুযাফফর সাহেব কোন কপিতে সরাসরি না দেখে 'সালাম ফিরাতেন না' শব্দটি পরিবর্তন করে 'বসতেন না' উল্লেখ করে মহা অন্যায় করেছেন।

বিষয়টি বুঝে থাকলে এবার গ্রন্থকারের পরবর্তী কথাগুলো পড়ে হাসিও আসবে, আবার কান্নারও জোগাড় হবে যে, এমন লোক এভাবে ইমামদের ও উলামাদের উপরে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন কত দুঃসাহসিকাতার সাথে! দেখুন তিনি বলেন– "*সুধি পাঠক! ইমাম হাকেম (৩২১-৪০৫) নিজে হাদীছটি সংকলন করেছেন আর তিনিই সঠিকটা জানেন না! বহুদিন পরে এসে যায়লাঈ (মৃত.৭৬২) সঠিকটা জানলেন? অথচ ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮হিঃ)ও একই সনদে উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। সেখানে একই শব্দ আছে। অর্থাৎ لا يقْعُد (বসতেন না) আছে।*" আফসোস, গ্রন্থকার যে বোঝেন না একথাটা যদি তিনি বুঝতেন!

অথচ এমন পরিপক্ক! বুঝ নিয়েই গ্রন্থকার মুখস্ত করা গালি ছুড়ে মারলেন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর মত একজন প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদকে বিনা অপরাধে অপরাধী ও প্রতিপক্ষ বানিয়ে, "***একই বলে মাযহাবী গোঁড়ামী। অন্ধ তাকলীদকে প্রাধান্য দেয়ার জন্যই হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে।***" ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন!

মোটকথা এ পদ্ধতির বিতরের সপক্ষে কোন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস নেই। তাই ইবনে হাযম জাহেরী রহ. বিতর বিষয়ক যত বর্ণনা পাওয়া যায় সবগুলোকেই

বিতর নামাযের একেকটি তরীকা বলে মোট ১৩ পদ্ধতিতে বিতর পড়ার বৈধতা দিয়েছেন। আশ্চর্য, সেখানেও এ পদ্ধতির বিতরের কোন উল্লেখ নেই। আর তিনি ছাড়া যারাই বিতরের এমন একটি পদ্ধতির সম্ভাবনা ও বৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের কেউ এ ভুল বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করেননি।

আরেকটি ভুল

গ্রন্থকার যাইলাঈকে বলেছেন– ‘হেদায়ার হাদীছের **বিশ্লষক’**। এটিও গ্রন্থকারের একটি ভুল। কারণ বিশ্লেষক বলা হয় ব্যাখ্যাকারকে। আসলে যাইলাঈ হেদায়ার হাদীসের ‘তাখরীজ’ করেছেন। ‘তাখরীজ’ মানে হাদীসের উৎস ও সূত্র উদ্ধার করা। পাশাপাশি কেউ কেউ হাদীসের মান নির্ণয়ের কাজও করে দেন। যে এ কাজ করে পরিভাষায় তাকে ‘মুখার্‌রিজ’ বলে। বাংলায় সূত্র উদ্ধারক বলা যেতে পারে।

(খ) একই হাদীস কি একবার সহীহ হয় আরেকবার দূর্বল

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রন্থকার এখানে হযরত আয়শা রা. এর যে হাদীস দিয়ে বিশেষ প্রকারের বিতর প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, যার পক্ষে এ বর্ণনাটি ছাড়া আর কোন দলিল নেই, তার বইয়ের ৩৩৩ পৃষ্ঠার টীকায় এটিকেই আবার জোর দিয়ে যঈফ ও দূর্বল সাব্যস্ত করেছেন! দেখুন– গ্রন্থকার ৩৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, *“ তিন রকাআত বিতরের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ”।* টীকায় লেখেন– *“১২৯০. ইরওয়াউল গালীল হা.৪২১ ২/১৫০”*

পর্যালোচনা

গ্রন্থকারের উল্লিখিত বরাতে (ইরওয়াউল গালীল হা.৪২১ ২/১৫০) শায়খ আলবানী রহ. বলেন, (وكأنه من أجله ضعف الإمام أحمد إسناده كما نقله المجد ابن تيمية في المنتقى (٢/ ٢٨٠ . بشرح الشوكاني) – “হয়ত একারণেই ইমাম আহমদ **হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন,** যেমনটি ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ তার মুনতাকায় উল্লেখ করেছেন। নায়লুল আওতার ২/২৮০”। অর্থাৎ ইমাম আহমদ, ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ, শাওকানী, আলবানী প্রমুখ এ বর্ণনাটিকে যঈফ বলেছেন। কেউ তাদের এ বক্তব্য গ্রহণ নাও করতে

পারেন, যদি তার কাছে দলিল থাকে। কিন্তু এক স্থানে তাদের কথা গ্রহণ করবেন, আবার একই হাদীসের বিষয়ে অন্য স্থানে গ্রহণ করবেন না, হাদীসের ক্ষেত্রে এমন দ্বিমুখী নীতি কেন? মাযহাবী গোঁড়ামী ধরতে গিয়ে এমন গোঁড়ামীর জালেই আটকা পরে গেলেন না তো আবার?

গ্রন্থকার - ১৯

এক বৈঠকে তিন রাকাতের পক্ষে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় দলিল:

(ب) عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن.

*“(খ) **ইবনু ত্বাউস** তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (ছাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। মাঝে বসতেন না। (টীকা– মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৬৬৯ ৩য় খণ্ড, পৃ.২৭)”* (পৃ.৩৩২)

পর্যালোচনা

এক. তাবেয়ীর আমলকে নবীজীর আমল বানিয়ে দিলেন

গ্রন্থকার এখানে একজন তাবেয়ীর আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বানিয়ে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। তিনি লিখেছেন “রসূল ছাঃ তিন রাকাত ..”। অথচ এটি হবে “তাউস তিন রাকাত ...”। মূলত এ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উল্লেখও নেই ইঙ্গিতও নেই। বিষয়টি যে কোন হাদীসের পাঠকেরই বোধগম্য হওয়ার কথা।

দুই. আবার এখানে শব্দ এসেছে– (لا يقعد) ‘তিনি বসতেন না’; একথা বলেননি– (لا يتشهد) ‘তিনি দুই রাকাতে তাশাহহুদ পড়তেন না’। তাই এখানে (لا يقعد) এর এ অর্থ খুবই যুক্তিসঙ্গত যে তিনি ‘সালাম ফিরানোর জন্য বসতেন না’। সুতরাং এ আসারটিও দুই রাকাতে তাশাহহুদের জন্য না বসা বিষয়ে স্পষ্ট নয়।

তিন. গ্রন্থকার এর পূর্বের পৃষ্ঠায় (পৃ.৩৩১) দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করার বিষয়ে ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যার অর্থ: *“তিন*

রাকাত বিতর পড়ার সময় দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করার বিষয়ে কোন মরফু-সহীহ-সরীহ তথা সহীহ ও সুস্পষ্ট নবীজীর কোন হাদীস পাইনি। (لم أجد حديثا مرفوعا صحيحا صريحا في إثبات الجلوس في الركعة الثانية عند الإيتار بالثلاث) ".

দেখুন দুই রাকাতে বৈঠক প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার দাবি করলেন– হাদীসটি হতে হবে ১. মরফু তথা নবীজীর কথা বা কাজ ২. হতে হবে সহীহ ৩. হতে হবে সরীহ তথা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

আর এখানে গ্রন্থকার যে দলিল পেশ করলেন তা ১. নবীজীর কথা বা কাজতো নয়ই, সাহাবীরও নয়; বরং তাবেয়ীর কর্ম মাত্র। ২. সনদ সহীহ কি সহীহ না সে বিষয়ে গ্রন্থকার কিছুই বলেননি। ৩. আবার বর্ণনাটি সরীহ বা সুস্পষ্ট নয়। বরং এর বিপরীত অর্থের প্রবল সম্ভাবনা রাখে।

অন্যের কাছে দলিল চাওয়ার সময় যে যে বিষয়গুলোর শর্ত করলেন এর কোনওটি কি আছে এখানে তার উল্লিখিত দলিলে? যদি না থাকে তাহলে এমন দ্বিমুখী নীতি কেন? অথচ নামাযের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সহীহ মুসলিমে শরীফের বর্ণনানুযায়ী 'প্রতি দুই রাকাত পর তাশাহহুদ আছে'। আর এর ব্যতিক্রম কোন নামাযে পাওয়া যায় না। সুতরাং দুই রাকাতে তাশাহহুদ না পড়ার সুস্পষ্ট দলিল না পাওয়া পর্যন্ত দলিল ছাড়াই নামাযের স্বাভাবিক নিয়মেই তাশাহহুদ পড়া আবশ্যক হওয়ার কথা। তার উপর আবার শক্তিশালী দলিলও রয়েছে। তারপরও কেন দলিল ছাড়া এ নতুন নিয়মের বিতর আবিস্কার করে দলিল বিশিষ্ট সহীহ নিয়মকে ভুল আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

চার. আমাদের আলোচনায় এসেছে যে, গ্রন্থকার একাধিক স্থানে সাহাবীর কথা বা কাজ সংক্রান্ত বর্ণনাকে মওকুফ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আর এখানে তিনি তার চেয়েও নিচে তথা তাবেয়ীর কথাও নয় বরং অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক আমলকে পুঁজি করে নিজের মতটাকেই একমাত্র সঠিক সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন।

গ্রন্থকার - ২০

গ্রন্থকারের তৃতীয় দলিল

عن قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن

"(গ) ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। শেষের রাক'আতে ছাড়া তিনি বসতেন না।" (টীকা. মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার হা/১৪৭১ ৪/২৪০, ইরওয়াউল গালীল হা/৪১৮ এর আলোচনা)

পর্যালোচনা :

এটি মূলত কাতাদা থেকে আবান ইবনে ইয়াযিদের বর্ণিত হযরত আয়শার রা. মারফু-মুত্তাসিল হাদীসটিই, যা নিয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করে আসলাম। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম ও বাইহাকী রহ.। এটিকে ভিন্ন কোন হাদীস হিসেবে কেউই বর্ণনা করেননি। আমার জানা মতে গ্রন্থকারই এটিকে প্রথম ভিন্ন হাদীস হিসেবে রূপ দিয়েছেন। বাইহাকীর দুই কিতাব থেকেই তার বক্তব্য তুলে ধরছি। যে কোন সাধারণ পাঠকই বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ।

বাইহাকী তাঁর 'মারিফাতুস সুনান' গ্রন্থে কাতাদাসূত্রে বর্ণিত হযরত আয়শার মরফু-মুত্তাসিল হাদীস সম্পর্কে আলোচনায় বলেন: (**ورواه أبان (بن يزيد، عن قتادة وقال فيه :**) –'এ হাদীসটিই আবান বর্ণনা করেছেন কাতাদা থেকে, যাতে তিনি বলেন, ...'। অর্থাৎ ইমাম বাইহাকী রহ. পূর্বের বর্ণনা থেকে এ বর্ণনাটির কেবল শব্দের পার্থক্যটাই কেবল দেখাতে চেয়েছেন। সনদে বা সূত্রে কোন পার্থক্য নেই। বরং এটিও পূর্বের সনদেই বর্ণিত। তাহলে এর সনদ হল– কাতাদা-যুরারাহ-সাদ ইবন হিশাম-আয়শা ...। অতঃপর বাইহাকী রহ. বলেন, (وهو بخلاف رواية ابن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي ، ومعمر ، وهمام عن قتادة) –'কাতাদা থেকে বর্ণনাকারী আবানের হাদীসের শব্দ কাতাদা থেকে অপর বর্ণনাকারী ইবনে আবী আরূবা, হিশাম, মা'মার ও হাম্মাম সকলের বর্ণনার বিরোধী।' অর্থাৎ সনদে কোন ভিন্নতা নেই, ভিন্নতা কেবল শব্দে। এ বিষয়টি তিনি তার 'আস-

সুনানুল কুবরায়' আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এবং সব শেষে বলেছেন— **আবানের বর্ণনাটি ভুল**।

গ্রন্থকার এখানে –

১. টীকায় দুটি বরাত উল্লেখ করেছেন। (এক) মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার–বাইহাকী। আর সেখানে— (ورواه أبان بن يزيد **عن قتادة وقال فيه** : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) –বর্ণনার এ শব্দের শুরু থেকে (ورواه أبان بن يزيد) – **'আর এ বর্ণনাটি আবান কাতাদাসূত্রে বর্ণনা করেছেন'** কথাটি এবং মাঝখান থেকে (**وقال فيه**)– **'এবং তাতে তিনি (আবান) বলেছেন'** শব্দটি ইচ্ছাকৃত বাদ দিয়েছেন। দেখুন– **'এ বর্ণনাটি'** এবং **'তাতে'** শব্দ দুটি দ্বারা কোন বর্ণনাকে বুঝানো হয়েছে, জিজ্ঞেস করলে স্বাভাবিক উত্তর আসবে– পূর্বে উল্লিখিত বর্ণনাটি। আর পূর্বে হযরত আয়শা থেকে কাতাদাসূত্রে বর্ণিত বিতর বিষয়ক মুরফু-মুত্তাসিল বর্ণনাটি। এটি ভিন্ন কোন বর্ণনা নয় যে আবার আরেকটি নাম্বার দিয়ে তাকে উল্লেখ করতে হবে।

(দুই) তিনি টীকায় বলেছেন বিস্তারিত ইরওয়াউল গালীলের আলোচনা দ্রষ্টব্য। আমি শায়খ আলবানীর ইরওয়াউল গালীলের পূর্ণ আলোচনায় যা পেলাম তাতে শব্দ আছে– (فأخرجه الحاكم (١/٣٠٤) وعنه البيهقي (٣/٢٨) من طريق شيبان بن فروخ أبي شيبة حدثنا أبان **عن قتادة به بلفظ**: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم)। অর্থাৎ আলবানী সাহেব বলেন–'**হাদীসটি** (অর্থাৎ পূর্বোক্ত হযরত আয়শার মারফু হাদীস) বর্ণনা করেছেন হাকেম এবং হাকেম থেকে বাইহাকী– শাইবান ইবনে ফাররুখসূত্রে। (শাইবান বলেন) আবান কাতাদা থেকে **'এ সনদেই'** আমাদেরকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন **'এ শব্দে'** যে, ...।' লক্ষ করুন এখানে – (أبان **عن قتادة به بلفظ**:) : আবান কাতাদা থেকে **'এ সনদেই'** **'এ শব্দে'** বর্ণনা করেছেন ...। এখানে (**به**) **'এ সনেদেই বা এ সূত্রেই'** কথার মানেই হল– পূর্ববর্তী সূত্রে। অর্থাৎ কাতাদা যুরারাহ থেকে, তিনি সাদ ইবনে

হিশাম থেকে, তিনি হযরত আয়শা রা. থেকে। হাদীসের যে কোন ছাত্রই বুঝে পূর্ববর্তী কোন সূত্র উল্লেখের পর যখন অন্য আরেকটি সূত্র উল্লেখ করা হয় আর তাতে বলা হয়– (بِهِ) 'এ সূত্রেই', তার দ্বারা বুঝা যায় এ হাদীসটিও পূর্ববর্তী সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে কখনো পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে (بِهِ) শব্দ ছেড়ে দেওয়া হয়, উদ্দেশ্য হয় যে, এটি পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু হাদীসের কিতাবের রীতি ও পরিভাষা সম্পর্কে যিনি অজ্ঞ তিনি তা কি করে বুঝবেন!

মোট কথা বিষয়টি বাইহাকী ও আলবানী সাহেবের বক্তব্যে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এটি কাতাদাসূত্রে হযরত আয়শার সেই হাদীস যা গ্রন্থকার (ক) শিরোনামে এক নাম্বারে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন!

সুতরাং আমরা বলতে পারি তিনি একটি হাদীসকেই নিজ হাতে কাট ছাটের পর দুটি হাদীস বানানোর চেষ্টা করলেন!

২. হাদীসটিকে পূর্বে (ক) শিরোনামে এক নাম্বারে উল্লেখের পর আবার দ্বিতীয়বার একেই উল্লেখ করলেন সামান্য পরিবর্তন করে ভিন্ন দলিল হিসেবে দেখানোর জন্য।

৩. এভাবে তিনি একটি মুত্তাসিল বর্ণনাকে মুরসাল বানিয়ে পেশ করলেন।

গ্রন্থকার – ২১

গ্রন্থকারের চতুর্থ দলিল-

عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن.

"(ঘ) উবাই ইবনু কা'ব হতে বর্ণিত– রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। প্রথম রাক'আতে সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে কুল হুওয়াল্লাহুল আহাদ পড়তেন। এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি শেষ করতেন তখন শেষে তিনবার বলতেন সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস। শেষ বার টেনে বলতেন"

অতঃপর বলেন– *“উক্ত হাদীছও প্রমাণ করে রাসূল (ছঃ) একটানা তিন রাক‘আত পড়েছেন, মাঝে বৈঠক করননি।”*

পর্যালোচনা

এ হাদীস কিভাবে প্রমাণ করে যে তিনি মাঝে বৈঠক করতেন না বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যজনক। গ্রন্থকার হয়ত বলবেন যে, এতে তিন রাকাত নামাযের কথা এসেছে, কিন্তু মাঝে দুই রাকাত শেষে বৈঠকের কথা বলা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে তিনি বৈঠক করেননি। কিন্তু গ্রন্থকার বলবেন কি যে, এ হাদীসে সূরা ফাতিহা, রুকু-সিজদা, শেষ বৈঠকের কথা, এমনকি সালামের কথা বলা হয়নি, তাহলে কি এ থেকে বুঝা যায় নবীজী এসবের কোনটিই করেননি?!

গ্রন্থকার - ২২

গ্রন্থকারের পঞ্চম ও শেষ দলিল

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ " **يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلا يَتَشَهَّدُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ**

“(ঙ) আত্বা (রাঃ) তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না। এবং শেষ রাক‘আত ব্যতীত তাশাহহুদ পড়তেন না।” (টীকা.মুসতাদরাকে হাকেম হা/১১৪২)

পর্যালোচনা

এখানেও গ্রন্থকার খিয়ানত করেছেন–

১. বর্ণনাটি মরফু বা মওকুফও নয়; বরং একজন তাবেঈর আমল মাত্র।

২. যেখানে সাহাবীর মওকুফ বর্ণনাকেও তিনি দলিল মানতে নারাজ, সেখানে তিনি তাবেঈর আমলকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে যাচ্ছেন।

৩. বর্ণনাটির হুকুম তথা মান কী গ্রন্থকার বলেননি। টীকায় তিনি কেবল হাকেমের বরাত উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত রয়েছেন। অথচ এর সনদে– (الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ) হাসান ইবনে ফজল রয়েছেন যিনি মুসলিম ইবনে ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনাকারী। উক্ত হাসান মাতরুক ও ‘মুত্তাহাম বিল কাযিব’

(মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত)। (আল-মুগনী ফিয-যুআফা, মীযানুল ইতিদাল ও লিসানুল মীযান)। শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব (যঈফা হা.৩৮৭০) উপরোক্ত হাসান বর্ণিত একটি বর্ণনাকে সুস্পষ্ট জাল আখ্যায়িত করেন এবং জাল হওয়ার কারণ হিসেবে তাকেই চিহ্নিত করে বলেন,

(قلت : وهذا موضوع ظاهر الوضع؛ آفته البواصرائي هذا؛ واسمه الحسن بن الفضل بن السمح الزعفراني، وهو متروك الحديث؛ كما في "الأنساب" و "اللباب" وغيرهما .)

সুতরাং এ বর্ণনটি কোন ধরণের দলিলযোগ্য নয়। এমন একজন বর্ণনাকারী থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থকার এখানে কোন কিছু না বলে একে দলিল হিসেবে পেশ করে গেলেন, বিষয়টি তার আমানদারীকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

গ্রন্থকার - ২৩

গ্রন্থকারের অতিরিক্ত আরেকটি দলিল

*গ্রন্থকার বলেন– "এমন কি পাঁচ রাক'আত পড়লেও রাসূল (ছাঃ) এক বৈঠকে পড়েছেন। – (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن) – পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন কিন্তু শেষ রাক'আত ছাড়া **বসতেন না**।"*

পর্যালোচনা

সূত্রের সামান্য পার্থক্যে একই হাদীস এসেছে ভিন্ন শব্দে যেখানে– (لا يجلس) **'বসতেন না'** কথাটি নেই। বরং শব্দ এসেছে– (لا يسلم) **'সালাম ফিরাতেন না'**। দেখুন বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরার (হা.৭৮১) বর্ণনায় শব্দ এসেছে–

(يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلا يُسَلِّمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ وَيُسَلِّمَ – رواه البيهقي في الصغرى والكبرى وأبو عوانة في مستخرجه وابن المنذر في الأوسط)

গ্রন্থকার - ২৪

গ্রন্থকার বলেন–"*জ্ঞাতব্য: তিন রাক'আত বিতর পড়ার ক্ষেত্রে দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক'আত পড়া যায়। তিন রাক'আত বিতর পড়ার এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি।*"

পর্যালোচনা

বিতরের এ পদ্ধতি বিষয়ে গ্রন্থকার মূল বইয়ে কোন হাদীস উল্লেখ না করে টীকায় কিছু বরাত ও একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাই "*এটিও একটি উত্তম পদ্ধতি*" কথাটি যাচাই করার জন্য টীকার বরাতগুলো যাচাই ও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

(এক) ইবনে উমর রা. এর বর্ণনা

টীকায় গ্রন্থকার মূলত দুটি বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমে যে বরাতটি উল্লেখ করেছেন তা হল– "*১২৮৯. বুখারী হা/৯৯১ ১ম খণ্ড পৃ.১৩৫ (ইফাবা হ/৯৩৭২/২২৫) সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬২ সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২০ এর আলোচনা দ্রঃ ২/১৪৮ পৃঃ; দেখুনঃ আলবানী, কিয়ামু রামাযান, পৃঃ২২;...*"

পর্যালোচনা:

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. সহীহ বুখারীর বর্ণনাটি এরূপ– (وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته) – হযরত নাফে বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বিতর সালাতে দুই রাকাত ও এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাতেন। এমনকি তার কোন প্রয়োজনের কথাও বলতেন'। (সহীহুল বুখারী হা.৯৯১)

২. সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর ব্যক্তিগত আমল, যাকে পরিভাষায় 'মওকুফ' বলে। **এটি নবীজীর কথা বা কাজ নয়।** গ্রন্থকার তার বইয়ে বারবার বিভিন্ন দলিলে 'মওকুফ' হওয়াকে দোষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এখানে মওকুফকেই প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করলেন।

৩. এ বইয়ে গ্রন্থকার একটি দলিলকেই একাধিক বানিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে বারবার উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এখানে মূল বইয়ে তার দাবীর পক্ষে কোন দলিলই উল্লেখ করেননি। তবে টীকায় একটি 'মরফু' বর্ণনার আরবী বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে উমরের এ 'মওকুফ' বর্ণনাটি তার পক্ষে প্রধান দলিল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা মূল আলোচনা ও টীকা কোথাও উল্লেখ না করে বরং আরবী ও বাংলা বুখারীর কেবল বরাত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত রইলেন কেন? এটা কি এ কারণে যে, উল্লেখ করলে ধরা পড়ে যাবেন– এটি মরফু নয় বরং মওকুফ? তাহলে কি বুখারীর বরাত উল্লেখ করে তিনি পাঠককে ধাঁধায় ফেলতে চেয়েছেন?

৪. গ্রন্থকার এ হাদীসের আরো দুটি বরাত দিয়েছেন (আলবানী সাহেবের 'সিলসিলা' (হা/২৯৬২) ও 'ইরওয়াউল গালীল' (২/১৪৮)। আর কিতাব দুটির বর্ণনা থেকে বাহ্যত বুঝা যায়,

> **(ক) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এক রাকাত বিতর পড়তেন।** তাই যদি হয়, তাহলে গ্রন্থকার কিতাবদুটি দেখার পরও কেন 'তিন রাকাত বিতর এর দলিল হিসেবে' এর বরাত উল্লেখ করলেন? আবার বর্ণনার শব্দও উল্লেখ করেননি?!
>
> কেননা কিতাবদুটিতে বর্ণনাটির শব্দ যথাক্রমে–
>
> **এক.** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এক রাকাতে বিতর পড়তেন। আর দুই রাকাত ও এক রাকাতের মাঝে কথা বলতেন। আরবী শব্দ– (كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة) (সিলসিলা হা.২৯৬২)
>
> **দুই.** আব্দুল্লাহ ইবনে উমর দুই রাকাত নামায পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন, অমুকের বাবাকে নিয়ে আস। অতঃপর দাড়ালেন **এবং এক রাকাতে বিতর পড়লেন।** আরবী

শব্দটি– (أن ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم، ثم قال: ادخلوا إلى (بأبي فلانة)، ثم قام فأوتر بركعة (ইরওয়াউল গালীল ২/১৪৮) আলবানী সাহেব বলেন, এটি 'আবু দাউদ' তার 'সুনানে' এ শব্দে বর্ণনা করেছেন– (مثنى مثنى، **والوتر ركعة** من آخر الليل) অর্থাৎ 'রাতের নামায দুই দুই রাকাত, আর বিতর হল শেষ রাতের ***এক রাকাত***'।

(খ) যদি গ্রন্থকার উপরোক্তকিতাব দুটির বরাত থেকে তিন রাকাত বিতর পড়ার কথা বুঝে থাকেন এভাবে যে, (أوتر بركعة) অর্থ হল– 'পূর্বের (দুই) রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে (তিন রাকাত) বিতর পড়েছেন', তাহলে সবকিছু সহজ হয়ে যায়। অর্থাৎ যত বর্ণনায় (يوتر بركعة/أوتر بركعة) ' এক রাকাতে বিতর পড়া' শব্দে নবীজীর বিতরের কথা এসেছে, সবগুলোতেই উদ্দেশ্য পূর্বের দুই রাকাতের সাথে মিলিয়ে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। এক রাকাত বিতর পড়ার হাদীসকে আমরা যেভাবে বুঝেছি, হযরত ইবনে উমরের বর্ণনাটিকে গ্রন্থকার ঠিক সেভাবেই ব্যাখ্যা করলেন। তাই এ ধরণের হাদীস দ্বারা এক রাকাত বিতর প্রমাণ করার আর কোন সুযোগ গ্রন্থকারের বাকী থাকছে না। এখানে গ্রন্থকারকে দুটির একটি পথ অবশ্যই ধরতে হবে। কেননা, দুটি বর্ণনাকেই আলবানী সাহেবও সহীহ বলেছেন এবং গ্রন্থকার এ মত গ্রহণপূর্বক তার বরাত দিয়েছেন।

৫. সবশেষে যদি বলি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. দুই সালামে তিন রাকাত বিতর পড়তেন, তবুও নবীজীর আমল কি ছিল এর দ্বারা তা বুঝা যায় না। কারণ তাঁর চেয়েও বড় ফকীহ ও রাসূলের নিকটতম সাহাবীরা এক সালামে তিন রাকাত বিতর পড়েছেন। তাই বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল– (قيل للحسن: إن ابن عمر كان يُسلم في

الركعتين من الوتر؟ فقال : كان عمرُ أفقه منه – كان ينهض في الثالثة بالتكبير)

–'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. (তিন রাকাত) বিত্‌রের দুই রাকাতে সালাম ফেরান? তিনি উত্তরে বললেন, উমর রা. তাঁর থেকে বেশী প্রজ্ঞাবান ছিলেন। তিনি (দ্বিতীয় রাকাতে স্বাভাবিক নিয়মে বৈঠক শেষে সালাম না ফিরিয়েই) তাকবীর বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।
[বরাত সহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]

৬. শেষে গ্রন্থকার বলেন– "*দেখুনঃ আলবানী, কিয়ামু রামাযান, পৃঃ২২*"; কিন্তু কিয়ামু রামাযান কিতাবের এ পৃষ্ঠায় আলবানী সাহেব কোন হাদীস উল্লেখ না করে কেবল তিন রাকাত বিতরের দুটি তরীকা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থকারের উল্লিখিত পন্থা। তিনি এ পদ্ধতির স্পষ্ট কোন দলিল উল্লেখ করেননি। বরং মাগরিবের নামাযের সাথে সাদৃশ্য করতে নিষেধাজ্ঞা মর্মে বর্ণিত হাদীস থেকে এটি তিনি 'বের' করেছেন। একেই বলে 'ইজতিহাদ'। প্রশ্ন হয় আলবানী সাহেবের ইজতিহাদকে কি গ্রন্থকার হাদীসের মর্যাদা দিচ্ছেন? আলবানী সাহেবের ইজতিহাদ অনুসরণ করলে তাকলীদ হয় না, হয় 'হাদীসের অনুসরণ'?

(দুই) আয়শার রা. এর বর্ণনা

গ্রন্থকার টীকার দ্বিতীয় অংশে ইবনে আবী শাইবার বরাতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এভাবে– "... *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৬৮৭১, ৬৮৭৪ – (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة.)*"

পর্যালোচনা

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়–

১. হাদীসটি হুবহু একই সনদে ইবনে আবী শাইবা সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনে মাজাহ তার 'সুনানে' দুই স্থানে– (হা.১১৭৭ ও হা. ১৩৫৮)। তদ্রূপ হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী যীব্‌ থেকে বর্ণিত হয়েছে–

Contents

মুসনাদে আহমদ (হা.২৫১০৫) আবু দাউদ (হা.১৩৩০, ১৩৩১) সুনানে নাসায়ী (হা.১৬৪৯) সহীহ ইবনে হিব্বান (হা.২৪২২)। এবং যুহরী থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুয়াত্তা মালেক (হা. ১২০) ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে (হা. ১৭৫২)। অর্থাৎ এ বর্ণনাটি হদীসের প্রসিদ্ধ ৭টি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও হাদীসটি এভাবে নেই। এমনকি ইমাম ইবনে মাজা তাঁর 'সুনানে' খোদ ইবনে আবী শাইবা থেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেখানে বর্ণনাটি এসেছে এভাবে– (يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة) অর্থাৎ 'নবীজী প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়তেন'। আর শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেব (রহ.) তার 'সিলসিলাতুস সহীহায়' ইবনে আবী শাইবার বর্ণনাটি উল্লেখ করে এর সমর্থনে এ শব্দে একটি বর্ণনাও দেখাতে পারেননি।

২. সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনাটি শায্ ও দলবিচ্ছিন্ন। ফলে সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও এটি সহীহ নয়। কারণ এটি একই হাদীসের আরো আট-দশটি বর্ণনার বিরোধী।

৩. এটিকে সহীহ বলতে হলে এর ব্যাখ্যা করতে হবে এ হাদীসের অন্য সকল বর্ণনার আলোকে। আর তা হলে তিন রাকাত বিতরে দুই রাকাতে সালাম ফিরানোর বিষয়টি অন্তত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

৪. গ্রন্থকার নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহেবের যে বরাত উল্লেখ করেছেন, সেখানে শায়খ আলবানী বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন,

قلت : و هذا إسناد عزيز صحيح على شرط الشيخين، وأصله في " صحيح مسلم " (٢/ ١٦٥) من طريق أخرى عن الزهري به أتم منه دون قوله : " و كان يتكلم .. " . و كذلك رواه ابن حبان (٢٤٢٢/٦٩/٤) ، و غيره ، وهو مخرج في صلاة التراويح (ص ١٠٦). و روى ابن حبان (٦٦/٤ و ٦٧ و ٦٦٨) من طريق ابن أبي ذئب و غيره الطرف الأول منه . و الحديث شاهد قوي لما رواه نافع : ...

অর্থাৎ, "এ সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, মূল বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমে (২/১৬৫) অন্য সূত্রে যুহরী থেকে আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে। তবে মুসলিমে **'তিনি দুই ও এক রাকাতের মাঝে কথা বলতেন' অংশটি নেই**। তদ্রূপ ইবনে হিব্বান প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান ইবনে আবী-যীব সূত্রেও হাদীসটির কেবল প্রথম অংশটি (অর্থাৎ (كان يوتر بركعة) নবীজী এক রাকাতে বিতর পড়তেন) উদ্ধৃত করেছেন। ..."

অর্থাৎ মুসলিম ও ইবনে হিব্বানের কোন বর্ণনায়ই দ্বিতীয় অংশটি নেই। তবুও আলবানী সাহেব এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন।

একই হাদীসে একদিকে ইবনে আবী শাইবায় এসেছে, **'দুই রাকাত ও এক রাকাত (তিন রাকাত বিতরে) এর মাঝে কথা বলতেন'**; আর মুসলিম, ইবনে হিব্বানসহ অন্যান্য কিতাবে এসেছে, **'এক রাকাতে বিতর পড়তেন'**। মুসলিমের যে বর্ণনার বরাত তিনি উল্লেখ করেছেন এর শব্দ হল– (إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة) **'... প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফিরাতেন, আর এক রাকাতে বিতর পড়তেন'** (মুসলিম হা.১৭৫২)। অর্থাৎ ইবনে আবী শাইবার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিন রাকাত বিতর পড়তেন, আর মুসলিমসহ অন্যদের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়, এক রাকাত বিতর পড়তেন। এক হাদীসের দুটি বর্ণনায় এমন পরস্পর বিপরীতমুখী বক্তব্য থাকার পরও দুটি একই সাথে সহীহ, নাকি দুটির একটি? বিষয়টি আলবানী সাহেব পরিস্কার করেননি।

৫. শায়খ আলবানী যদি দুটি দ্বারা একই অর্থ বুঝে থাকেন, অর্থাৎ উভয় বর্ণনায় 'নবীজী তিন রাকাত বিতর পড়তেন', তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। তখন যত বর্ণনায় 'এক রাকাত' বিতরের কথা এসেছে সবগুলি দ্বারাই তিন রাকাত বিতর পড়া প্রমাণ হয়ে যাবে । আলবানী সাহেব হয়ত তাই বুঝেছেন। কেননা তিনি এখানে এ বর্ণনাটিকে ইবনে উমরের আমলের সমর্থক ধরেছেন। ইবনে উমরের আমল দিয়েই তিনি তার 'কিয়ামু রামাযান' কিতাবে দুই সালামে তিন রাকাত বিতর প্রমাণ করেছেন। কিন্তু যদি তিনি একটি দিয়ে এক রাকাত বিতর, আর অপরটি

দিয়ে তিন রাকাত বিতর প্রমাণ করতে চান তাহলে আপত্তি থাকবে একই হাদীসের বিপরীতমুখী দুটি বর্ণনা এক সাথে সহীহ্ হয় কি করে?

৬. আলবানী সাহেব বর্ণনাটির বরাতে মুসলিম, ইবনে হিব্বান ও অন্যান্য কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হুবহু ইবনে আবী শাইবার সনদে তার থেকেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ তার 'সুনানে' (হা.১১৭৭ ও হা. ১৩৫৮)। কিন্তু তিনি কুতুবে সিত্তার অংশ ইবনে মাজার বরাত উল্লেখ করেননি কেন? অথচ ইবনে মাজা এটি ইবনে আবী শাইবা থেকেই বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী শাইবায় এসেছে এক শব্দে, আর একে আলবানী সাহেব বলেছেন– এ সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ঠিক এ সনদটিতেই ইবনে মাজায় বর্ণনাটি এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দে এভাবে–" (يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة) অর্থাৎ 'নবীজী প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফেরাতেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়তেন"। যেহেতু সনদ হুবহু এক, তাই এখানেও আলবানী সাহেবকে বলতে হবে– এ সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

৭. এখানে আলবানী সাহেবের তাহকীক মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বা একেবারেই অসম্পূর্ণ। আর এ অপূর্ণাঙ্গ বা ত্রুটিপূর্ণ তাহকীকের তাকলীদ করেই গ্রন্থকার এমন বেড়াজালে আটকা পড়েছেন। কোন বর্ণনার কি অর্থে ধরবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না।

৮. আবার গ্রন্থকার টীকায় ইবনে আবী শাইবার দ্বিতীয় যে নম্বরটি দিয়েছেন (হা.৬৮৭৪) সেখানেও ইবনে উমর (রা.) এর নিজস্ব আমলের বিবরণ এসেছে, (ثم قام فأوتر بركعة) 'অতঃপর ইবনে উমর দাড়ালেন এবং এক রাকাতে বিতর পড়লেন'। এতে কি তিন রাকাত বিতরের কথা আছে না এক রাকাতের কথা? গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের সাথে এ বর্ণনা এবং পূর্বের বর্ণনাটির কি আদৌ কোন সামঞ্জস্য আছে? এটিকি দলিলের নামে ধোঁকা নয়?

গ্রন্থকার - ২৫

গ্রন্থকার বলেন– *"উল্লেখ্য যে, তিন রাক'আত বিতরের মাঝে সালাম দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে **তা যঈফ**।"* টীকা. *১২৯০. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২১, ২/১৫০ পৃঃ; আহমদ হা/২৫২৬৪"*

পর্যালোচনা

এক স্থানে সহীহ বলে নিজেই আবার হাদীসটিকে যঈফ বললেন!

বর্ণনাটিকে যঈফ প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার আলবানী সাহেবের 'ইরওয়াউল্‌গালীলে'র বরাত দিয়েছেন। আলবানী সাহেব তার 'ইরওয়াউলগালীল' গ্রন্থে বলেন– ইমাম আহমদ এটিকে যঈফ বলেছেন যা 'আল-মুনতাকা' ও 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে এসেছে। এটি মূলত সেই হাদীস যা দিয়ে গ্রন্থকার 'এক সালামে ও একই বৈঠকে তিন রাকাত বিতর' প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন এবং সহীহ সাব্যস্ত করে এসেছেন (পৃ.৩৩১)। আলবানী, শাওকানী, ইবনে তাইমিয়া আল-জাদ্দ ও ইমাম আহমদের মতে দুটি একই বর্ণনা। তাই তাদের মতে দুটোই যঈফ। গ্রন্থকার এ হাদীসকেই এক স্থানে সহীহ বলে এসে এখানে আবার যঈফ সাব্যস্ত করছেন! এ কেমন বৈপরিত্য।

কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর বলা ও হাত উত্তোলন করে হাত বাঁধা

গ্রন্থকার - ২৬

গ্রন্থকার বলেন– *"বিতর ছালাতে কিরাআত শেষ করে **তাকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বাঁধার** যে নিয়ম সমাজে চালু আছে **তা ভিত্তিহীন**।"* (পৃ.৩৩৪)

পর্যালোচনা

তাকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বাঁধার এ নিয়ম ভিত্তিহীন নয়, বরং সুন্নাহ সম্মত। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থকারের কথাই বাতিল ও ভিত্তিহীন। বিষয়টি স্পষ্ট করতে আগে গ্রন্থকারের কুনূত পড়ার সহীহ নিয়ম কি ও এর দলিল কি তা পর্যালোচনা করে নেয়া দরকার।

গ্রন্থকার বলেন– *"কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়ম':* শিরোনামে লেখেন– *"বিতরের কুনূত দুই নিয়মে পড়া যায়। শেষ রাক'আত শেষ করে **হাত***

বাঁধা অবস্থায় দু'আয়ে কুনূত পড়া। অথবা ক্বিরাআত শেষে হাত তুলে দু'আয়ে কুনূত পড়া।" (পৃ. ৩৩৬)

প্রথম নিয়মের দলিল

গ্রন্থকার উপরোক্তনিয়মে কুনূত পড়ার কোন দলিল উল্লেখ না করে প্রথম পদ্ধতি আলোচনার পর টীকায় কেবল একটি বরাত উল্লেখ করেছেন এভাবে– *"আলবানী, **ইরওয়াউল গালীল** ২/৭১ পৃঃ, ২/১৮১ পৃঃ"।* অর্থাৎ এ বরাতেই তার দলিল রয়েছে। বরাত অনুযায়ী তালাশ করে দেখা গেল সেখানে কুনূত পড়ার নিয়ম সম্পর্কে কোন হাদীসও নেই, কোন সাহাবী, তাবেয়ীর কোন বক্তব্য বা আমলের উল্লেখও নেই। এতে কেবল ইস্হাক ইবনে রাহুয়াহ'র (জন্ম-১৬১ মৃত্যু-২৩৮) আমলের উল্লেখ রয়েছে। শায়খ আলবানীর বক্তব্য:

(قد ذكر المروزى فى " المسائل " (ص ٢٢٢): " كان إسحاق يوترُ بنا... **ويرفع يديه فى القنوت** ويقنت قبل الركوع، **ويضع يديه على ثدييه**، أو تحت الثديين)

"মারওয়াযী উল্লেখ করেছেন– ইসহাক আমাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন। ... আর তিনি কুনূতে হাত উঠাতেন, রুকুর পর কুনূত পড়তেন এবং বুকের উপর বা বুকের নিচ বরাবর হাত রাখতেন"।

অধিকন্তু গ্রন্থকার বলেছেন, সঠিক নিয়ম 'হাত বাঁধা অবস্থায় কুনূত পড়া'। অর্থাৎ তার আপত্তি হাত বাঁধা অবস্থায় কুনূত পড়ার উপর নয়, বরং কুনূতের শুরুতে তাকবীর বলে হাত উঠানোর উপর। কিন্তু তার উল্লিখিত বরাতে আলবানী সাহেব ইসহাক ইবনে রাহুয়ার যে আমল উল্লেখ করেছেন, তাতে রয়েছে 'তিনি কুনূতে দুই হাত উঠাতেন'। এতে হাত উত্তোলন করাটাই প্রমাণিত হয়ে যায়, যাকে তিনি বাতিল বলে এসেছেন।

২. ইস্হাক ইবনে রাহুয়ার কথাই যদি গ্রন্থকারের দলিল হয়, তাহলে দোয়ায়ে কুনূত শেষে চেহারা হাত দিয়ে মাসাহও করতে হবে। কেননা ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ্ দুআয়ে কুনূত শেষে হাত দ্বারা চেহারা মাসাহ করতেন (ইরওয়াউলগালীল ২/১৮০)। কিন্তু গ্রন্থকার তার বইয়ের ৩৩৪-

৩৩৫ পৃষ্ঠায় কুনূত পড়ার পর মুখে হাত মাসাহ করা থেকে নিষেধ করেছেন। অথচ এর বিপরীত কোন হাদীসও নেই। উপরন্তু এর পক্ষে যঈফ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩. ইসহাক ইবনে রাহুয়ার আমল কুনূত পড়ার সময় হাত বেঁধে রাখা নয়। বরং দোয়ার মত হাত উঠিয়ে রাখা। বুঝা গেল এ বরাতে গ্রন্থকারের বক্তব্যের পক্ষে কোন দলিল নেই।

৪. দ্বিতীয় বরাতে (ইরওয়াউলগালীল *২/১৮১ পৃঃ)* বাইহাকী ও আলবানীর দুজনের বক্তব্যেই এসেছে দোয়ার মত হাত তুলে রাখার কথা। অথচ গ্রন্থকার এ বরাতটি উল্লেখ করেছেন, তাকবীরের সময় হাত না উঠিয়ে হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনূত পড়ার দলিল হিসেবে। সুতরাং তার দাবির সাথে দলিলের কোন মিল নেই।

৫. আলবানী সাহেব বলেছেন, হযরত আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কুনূতে নাযেলায় (দোয়ার মত) হাত উঠানোর বিষয় প্রমাণিত। কুনূতে বিতর বিষয়ে নয়।

৬. বাইহাকী রহ. পূর্বসুরীদের থেকে কুনূতে নামাযের মত হাত উঠানোর কথা বললেও কারো বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

৭. অতঃপর আলবানী সাহেব বলেন, (وثبت مثله عن **عمر**، وغيره في قنوت الوتر) –“**বিতরের কুনূত** বিষয়েও অনুরূপ (দোয়ার মত করে) হাত তোলা উমর প্রমুখ থেকেও প্রমাণিত আছে।” কিন্তু আলবানী সাহেব আনাস রা. এর বর্ণনার বরাত উল্লেখ করলেও, উমরের বর্ণনাটি কোথায় রয়েছে এর কোন ইঙ্গিতও দেননি। তৎপ্রণীত ‘আসলু ছিফাতিস সালাত’ এ (পৃ.৩/৯৫৭-৯৫৯) খুলে দেখলাম সেখানে তিনি উমর রা. এর বর্ণনাটি এনেছেন, কিন্তু তা ফজরের নামাযের কুনূতে, অর্থাৎ কুনূতে নাযেলায়। সুতরাং বিতরের কুনূতে হাত উঠানোর বিষয়টি তিনি প্রমাণ করতে পারেননি।

দ্বিতীয় নিয়মেরও দলিল নেই

প্রথম নিয়মে তো দলিল উল্লেখ না করলেও অন্ততঃ একটি বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় নিয়ম উল্লেখ করার পর না তিনি কোন দলিল

উল্লেখ করেছেন, আর না কোন বরাত উল্লেখ করেছেন। এমনকি এর কোন টীকাও দেননি।

তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধার দলিল ও গ্রন্থকারের বক্তব্যের অসারতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বিতর নামাযের শেষ রাকাতে কুনূতের জন্য তাকবীর বলে হাত উঠাতেন। এ বিষয়ে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বিশুদ্ধসূত্রে একাধিক বর্ণনা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে। [১] **ইমাম বুখারী একে সহীহ বলেছেন**। [দেখুন– শরহু মুশকিলিল আসার ১১/৩৭৪, শায়খ শুআইব বলেন– **এর সনদ হাসান**। আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানী ৯/২৪৩ হা.৯১৯২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫৩০ হা. ৭০২১, জুয্‌উ রাফইল ইয়াদাইন– ইমাম বুখারী পৃ.১৪৬ হা. ১৬৩]

অনুরূপ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখাঈ থেকেও সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [২] [দেখুন– মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৪/৫৩১ হা.৭০২৩, মুছান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক হা.৫০০১, কিতাবুল আসার, মুহাম্মদ রহ. এর বর্ণনা পৃ.২০৭, আবু ইউসুফ রহ. এর বর্ণনা ৬৬, কিতাবুল হুজ্জা আলা-আহলিল মদীনা, পৃ.৫৬ শারহু মাআনিল আসার ১/৩৯১]

এ ছাড়া মারওয়াযী তাঁর 'কিয়ামুল লায়ল' গ্রন্থে [পৃ.২৯৪] হযরত উমর, আলী ও বারা ইবনে আযিব রা. থেকেও তাকবীরের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

١. كان عبد الله " لا يقنت إلا في الوتر، وكان يقنت قبل الركوع، يكبر إذا فرغ من قراءته حين يقنت.

٢. عن إبراهيم ؛ أنه كان يكبر إذا قنت ، ويكبر إذا فرغ.

৩. আরবী বিবরণ নিম্নরূপ–

[باب التكبير للقنوت عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب « لما فرغ من القراءة كبر ، ثم قنت ، ثم كبر وركع ، يعني في الفجر وعن علي ، أنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع . وفي رواية : كان يفتتح القنوت بتكبيرة وكان عبد الله بن مسعود يكبر في الوتر إذا فرغ من قراءته حين يقنت ، وإذا فرغ من القنوت وقال زهير ، قلت لأبي إسحاق ، أتكبر أنت في

হযরত সুফয়ান সাউরী রহ. তাঁর পূর্বসুরী তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের থেকেও কুনূতের শুরুতে তাকবীর বলে হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন। [মুখাতাছারু কিয়ামিল লাইল, ২৯৪, ২৯৬] ইমাম আহমদ রহ. বলেন, রুকুর পূর্বে যদি কুনূত পড়া হয় তাহলে তাকবীর দিয়ে কুনূত শুরু করবে। [মুখাতাছারু কিয়ামিল লাইল, ইবনে নছর মারওয়াযী, ২৯৪]

গ্রন্থকার - ২৮

অতঃপর গ্রন্থকার ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটি সম্পর্কে বক্তব্য করেছেন যে, "***বর্ণনাটি ভিত্তিহীন।*** *আলবানী (রহঃ) বলেন, لم أقف على سند عند الأثرم، لأنني لم أقف على كتابه ... وغالب الظن أنه لا يصح – আছরামের সনদ সম্পর্কে* ***অবগত নই।*** ***এমনকি*** *তার কিতাব সম্পর্কেও অবগত নই। ... আমার একান্ত ধারণা, এই বর্ণনা সঠিক নয়।" (অর্থাৎ ১. আসরাম বর্ণিত এ হাদীসের সনদ পাওয়া যায়নি কেননা কিতাবটিই তিনি পাননি ২. তিনি ধারণা করলেন এটি সহীহ নয়)*

পর্যালোচনা

১.ভুল তরজমা

তিনি লেখেছেন: "***এমনকি*** *তার কিতাব* ***সম্পর্কেও*** *অবগত নই* " এটি আলবানী সাহেবের বক্তব্যের ভুল তরজমা। বিশুদ্ধ তরজমা হল– 'কেননা আমি তার কিতাবের সন্ধান পাইনি'।

২. নিজের থেকে সনদবিহীন হাদীস উল্লেখ করে তাকে যঈফ সাব্যস্ত করা?

ক. নবীজীর নামায ও দলিলসহ নামাযের মাসায়েল বই দুটি গ্রন্থকারের সামনে রয়েছে। আর দুটি বইতেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর

القنوت في الفجر ؟ قال : » نعم « وعن البراء : » أنه كان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت « وعن إبراهيم ، يقوم في القنوت في الوتر ، إذا فرغ من القراءة ، ثم قنت ثم كبر وركع وعن سفيان ، » كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ، ثم يقنت « وعن أحمد ، » إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة]

বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও শরহু মুশকিলিল আসার গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে। **এর সনদ সহীহ**। কিন্তু আফসোসের কথা, গ্রন্থকার সহীহ সনদ বিশিষ্ট বর্ণনাটি না এনে আলবানী সাহেবের কিতাব থেকে আস্‌রামের বর্ণনা উল্লেখ করলেন– যে কিতাবটি পাওয়া যায় না। তারপর বর্ণনাটিকে সহীহ নয় বলে তার বক্তব্যকে প্রমাণ করে দিলেন!

খ. আলবানী সাহেবের 'ইরওয়াউল গালিল' কিতাবের যে পৃষ্ঠা থেকে (২/১৬৯) গ্রন্থকার এ তাহক্বীকটি পেশ করেছেন সেখানেই আলবানী সাহেব বলেছেন, এটি ইবনে আবী শাইবা, তাবারানী ও বাইহাকীর বর্ণনায়ও এসেছে। কিন্তু তিনি তাহক্বীক করতে যেয়ে উক্ত হাদীস গ্রন্থ সমূহ ও সেগুলির সনদের প্রতি কোন ইঙ্গিতও দেননি।

গ. গ্রন্থকার নিজেও পূর্বের টীকায় ইবনে আবী শাইবা (হা.৭০২১-৭০২৫) ও আব্দুর রাযযাকের (হা.৫০০১) বরাত উল্লেখ করেছেন। তার টীকায় হা. ৭০২১-৭০২৫ পর্যন্ত ইবনে মাসউদ রা., ইবরাহীম নাখায়ী, হাকাম, হাম্মাদ ও আবু ইসহাক থেকে মোট ছটি বর্ণনার বরাত দিয়েছেন। কিন্তু তাহক্বীকের সময় কেবল আসরামের বর্ণনা সম্পর্কিত আলবানীর বক্তব্য উল্লেখ করে ক্ষান্ত রইলেন। আর এ ছটি বর্ণনা সম্পর্কে কিছুই বললেন না। আবার তিনি ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনা সম্পর্কে টীকায় দ্বিতীয় নাম্বারে আব্দুর রাযযাকের যে (হা.৫০০১) বরাত উল্লেখ করেছেন, তাতে বর্ণনা আছে ইবরাহীম নাখাঈ থেকে, ইবনে মাসউদ থেকে নয়।

ঘ. ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি জুয্‌উ রাফইল ইয়াদাইন গ্রন্থে (পৃ.১৪৬ হা. ১৬৩) এ বর্ণনাটি এবং অনুরূপ আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন– (هذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف بعضها بعضا، وليس فيها تضاد لأنها في مواطن مختلفة) – 'এ সব বর্ণনাগুলোই সহীহ ...'। ইমাম তাহাবী রহ. ও হাদীসটিকে সহীহ ধরে নিয়েই দলিল পেশ করেছেন তাঁর 'শরহু মুশকিলুল আসার' গ্রন্থে। শায়খ শ'আইব আরনাউত বলেন– 'হাদীসটি হাসান, কেবল হুদাইজ ইবনে

মুআবিয়া ব্যতিত সকলেই বুখারী মুসলিমের বর্ণনাকারী ...'। [মুশকিলিল আসার ১১/৩৭৪] মুছান্নাফে ইবনে আবী শাইবার সনদটিও ছহীহ লিগাইরিহি বা হাসান। তাছাড়া ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্যদের কাছ থেকেই ইবরাহীম নাখাঈ ইলম শিখেছেন। তিনি এ তরীকাই তাদের থেকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এতে বর্ণনাটি আরো শক্তিশালি হয় বৈকি।

ঙ. আলবানী সাহেবও এ বর্ণনা বিষয়ে দুটি বড় ধরণের আপত্তিকর কাজ করেছেন। আর গ্রন্থকার এক্ষেত্রে তার অন্ধ তাকলীদ করেছেন।

- **(এক)** তিনি আছরামের বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, এর সনদ তার জানা নেই। কিন্তুযে হাদীসের সনদ সম্পর্কে তিনি জানতে পারেননি, সে সম্পর্কে তার উচিত ছিল– মন্তব্য থেকে বিরত থাকা। অথবা মন্তব্য করলেও সম্ভাবনা ব্যক্ত করে বলা। কিন্তু তিনি বলে দিলেন– **"আমার প্রবল ধারণা** যে, এটি সহীহ নয়"! তিনি যখন বর্ণনাটি তিনটি কিতাবে একই সনদে পেয়েছেন তখনি তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, হয়ত সেখানেও সেই একই সনদ হয়ে থাকবে। আর যে সনদ পাওয়া গেছে সেটি লাইছ ইবনে আবী সুলাইম এর কারণে 'তার দৃষ্টিতে' যঈফ, সুতরাং তিনি বলে দিলেন সবই যঈফ! কিন্তু তিনি কি করে ভাবলেন যে, আছরামের কিতাবেও এর একই সনদ হবে? অথচ তাঁর হাতের নাগালের কিতাব 'শরহু মুশকিলিল আসারে'ই এ বর্ণনাটি উক্ত লাইছ ইবনে আবী সুলাইম ব্যতিত ভিন্ন সনদে এসেছে যে সম্পর্কে তার খবরই নেই! তাই এরও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, আছরামের কিতাবে বর্ণনাটি তৃতীয় কোন সনদেও থাকতে পারে। বা অন্তত মুশকিলুল আসারে যে সহীহ সনদে এসেছে তাও হতে পারে। সুতরাং এমন চোখ বুঝে একটি সনদকে যঈফ বলে দেয়া যায় কি?

- **(দুই)** আলবানী সাহেব ইবনে আবী শাইবায় বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারী 'লাইছ ইবনে আবী সুলাইমকে' যঈফ বলেই বর্ণনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু লাইছ এর কারণে হাদীসকে যঈফ বলে দেওয়া যায় না।

লাইছ সম্পর্কে হাদীসবিদগণর মতামত নিম্নরূপঃ

লাইছ ইবনে আবী সুলাইম রহ. এর বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কারণ, ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর 'তালীকাতে' তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় তাকে আতা ইবনুস সাইব এর মত দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনাকারী গণ্য করেছেন। এবং তাকে সত্যবাদিতা, দোষ মুক্ততা ও ইলমে হাদীসের সাথে ঘনিষ্টতার গুণে গুণান্বিত করেছেন। [১]

আবুদাউদ তিরমিযী নাসাঈ ইবনে মাজা চারটি কিতাবেই তাঁর হাদীস রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. বলেন– (صدوق يهم) 'বিশ্বস্ত, কখনো ভুল করে থাকেন'। ইমাম ইবনে আদী রহ. তার বর্ণিত কিছু (মুনকার) আপত্তিকর বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন– (لَهُ أَحَادِيْثُ صَالِحَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرتُ، وقد روى عنه شعبة والثوري وَغَيْرُهُمَا مِنَ الثِّقَاتِ، وَمَعَ الضَّعفِ الَّذِي فِيْهِ يُكْتَبُ حَدِيْثُه) : অর্থাৎ 'এছাড়া তার কিছু ভাল হাদীসও রয়েছে। শোবা, ছাউরী প্রমুখ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মধ্যে যে দূর্বলতাটুকু রয়েছে তা সত্ত্বেও তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যায়'।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন– (وليث وإن كان ضعيف الحفظ **فإنه يعتبر به ويستشهد** فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا، وقال أيضا: ... وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن

---

১. ইমাম মুসলিমের আরবী বক্তব্য নিম্নরূপ:

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار.

وحديثه يستشهد به (المذكور ليث بن أبي سليم) : 'অর্থাৎ 'যদিও লাইছ দূর্বল স্মৃতি শক্তির অধিকারী তবুও অন্য বর্ণনা সহায়ক ও সমর্থক হিসেবে গ্রহণযোগ্য .... ।' অন্যত্র বলেন– 'আব্দুর রহমান থেকে আবু ইসহাকের সমর্থন করেছেন লাইছ। আর তার বর্ণনা সমর্থক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। [ফাতহুল বারী– ভূমিকা ৩৪৯, ১/২৫৮]

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন– (قُلْتُ: بَعْضُ الأَئِمَّةِ يُحَسِّنُ لِلَّيْثِ، وَلاَ يَبْلُغُ حَدِيْثُه مَرتَبَةَ الحَسَنِ بَلْ عِدَادُه فِي مَرتَبَةِ الضَّعِيْفِ المقَارِبِ، فَيُرْوَى فِي الشَّوَاهِدِ وَالاعْتِبَارِ، وَفِي الرَّغَائِبِ، وَالفَضَائِلِ، أَمَّا فِي الوَاجِبَاتِ، فَلاَ.) :
'কোন কোন ইমাম লাইছের হাদীসকে **হাসান** গণ্য করেছেন। কিন্তু তার হাদীস হাসান পর্যায়ের নয়। বরং তা হাসানের নিকটবর্তী যঈফরূপে গণ্য। তাই তা (অন্য বর্ণনার) সহায়ক ও সমর্থকরূপে বর্ণনা করা যাবে। এবং ফযীলতের বিষয়েও বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু ওয়াজিব বিধান সাব্যস্ত করতে তা বর্ণনা করা যাবে না'। [সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/১৭৯]

সুতরাং তাঁর বর্ণনা সাধারণ সকল যঈফের মত নয়, বরং হাসানের কাছাকাছি পর্যায়ের। ফযীলতের ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণনায় নির্ভর করা যায়। অন্য বর্ণনার সমর্থন পেলেই তা হাসান স্তরে উন্নীত হয়। তখন বিধানের ক্ষেত্রেওতো প্রযোজ্য হবে। একারণে আলবানী সাহেবও 'সিলসিলতুস্-সহীহা' গ্রন্থে (হা.৫৮৬) লাইছের একটি বর্ণনাকে সালামা ইবনে ওয়ারদান সূত্রে বর্ণিত আরেকটি যঈফ বর্ণনার সমর্থনে হাসান বলেছেন। আলোচ্য হাদীসেও লাইছের বর্ণনার সমর্থনে রয়েছে, তাহাবীর শারহু মুশকিলিল আসারের বর্ণনা। তাই **আলবানী সাহেবের যুক্তিতেই একে হাসান বলতে হবে।**

লাইছ রহ. এর স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা কখন থেকে

লাইছের যঈফ হওয়ার মূল কারণ ইঙ্গিত করে ইমাম ইবনে হিব্বান রহ. বলেন– (اخْتُلِطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، ... كُلُّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي اخْتِلاَطِه.) : অর্থাৎ 'শেষ বয়সে তার ইখতিলাত– স্মৃতি শক্তির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল'। আর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন লাইছ থেকে দুজন

নির্ভরযোগ্য রাবী। আব্দুস সালাম ইবনে হারব ও যায়েদা ইবনে কুদামা। তন্মধ্যে যায়েদা একদিকে লাইছের এলাকার লোক এবং তার প্রবীণ শিষ্য। আবার তার স্বভাব ছিল কারো কাছ থেকে হাদীস নেয়ার সময় এবং তা বর্ণনা করার সময় ভাল রকম যাচাই-বাছাই করা। এ কারণেই ইমাম আহমদ বলেন– 'যায়েদা ও যুহাইর থেকে কোন হাদীস শুনলে, তা আর কারো কাছ থেকে না শুনলেও কোন সমস্যা নেই। তবে আবু ইসহাকের হাদীস ব্যতিত'। তিনি আরো বলেন– 'চারজন বর্ণনাকারী হলেন, মুতাসব্বিত [নির্ভুল বর্ণনাকারী] সুফইয়ান, শুবা যুহাইর ও **যায়েদা**। [সিয়ারু আলামিন নুবালা] তিনি আরো বলেন– 'যায়েদা কোন হাদীস বর্ণনাকালে ইত্‌কান তথা দৃঢ়তা ও যত্নের সাথে করত'। একবার এক উপলক্ষে সুফইয়ান যায়েদাকে বললেন– 'নিশ্চয় আপনি সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য এবং সিকাহ বর্ণনাকারী থেকেই আমাদেরকে হাদীস শুনিয়ে থাকেন ...'। (যায়েদা এতে মৌন সমর্থন ব্যক্ত করলেন)। [ইলাল]।

সুতরাং যায়েদা ইবনে কুদামা হলেন লাইছের যে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন তা হয়ত তার ইখতিলাত তথা স্মৃতিশক্তি দূর্বল হওয়ার আগের, অথবা পরের হলেও তা ছিল নির্ভুল। আব্দুস সালামও লাইছ থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ বর্ণনায় লাইসের কোন ভুল হয়নি। সম্ভবত একারণেই ইমাম বুখারী রহ. যায়েদা সূত্রে লাইছের এ বর্ণনাটিকে স্পষ্ট ভাষায় সহীহ বলে দিয়েছেন।

চ. গ্রন্থকার আলবানী সাহেবের এমন দলিলবিহীন ও অনুমান নির্ভর হুকুমের অন্ধ তাকলীদই করেছেন। তার মাথায় এতটুকু কথাও আসেনি যে, আছরামের সনদকে তিনি কিভাবে যঈফ বলছেন অথচ তিনি তা দেখেনইনি।

গ্রন্থকার - ২৯

বাতিল কথার পুনরাবৃত্তি!

গ্রন্থকার বলেন– *"আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে **পুনরায় হাত বেঁধে** কুনূত পড়ার কথা নেই। এ মর্মে **কোন দলীলও নেই**। অথচ এটাই সমাজে চলছে। বরং **এটাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে**।"*

পর্যালোচনা

এক. **'হাত বেঁধে'** কুনূত পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়নি। বরং শুধু কুনূত পড়াকেই ওয়াজিব বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাবে যা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাই এখানে গ্রন্থকার নিজে ভুল বুঝে অন্যের উপরে দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এটা তার অন্যায় আপত্তি।

দুই. "*এ মর্মে কোন দলীলও নেই।*" একথা দ্বারা গ্রন্থকার কি ধরণের দলিল চান? নবীজীর বক্তব্য বা আমল, সাহাবী বা তাবেয়ীর ফতোয়া বা আমল, না কোন ইমামের কথা বা আমল? গ্রন্থকার তার বইয়ে কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়মের যে দলিল দিয়েছেন তাতে পাওয়া গেছে শুধু ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়ার আমল বা কর্ম (দেখুন–পৃ.৩৩৬ টীকা-১৩০৪, ইরওয়াউল গালীল ২/৭১)। এ থেকে তো বুঝা যায় কোন ইমামের কথা বা আমল পাওয়া গেলেই ছহিহ দলিল হয়ে যায়।

তাই যদি হয় তাহলে হাত বেঁধে কুনূত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে মহান ফকীহ তাবেয়ী ইবরাহীম নাখায়ী (মৃ.৯৬ হি.) থেকে। যিনি মূলত ইলম শিখেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রধান শিষ্যদের কাছ থেকে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে তাকবীর বলা ও হাত উঠানোর যে সহীহ বর্ণনা রয়েছে এরই বাস্তবরূপ ও সহীহ ব্যাখ্যা হল ইবরাহীম নাখাঈর কথা ও আমল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর প্রধান ফকীহ শিষ্য হলেন আলকামা। আলকামার প্রধান ফকীহ শিষ্য হলেন ইবরাহীম নাখাঈ। [সিয়ারু আলামিন নুবালা] তাই এটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থকারের দলিলের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী। [দেখুন– কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনা, ইমাম মুহাম্মদ পৃ. ২০০ (পৃ.৫৫ পুরাতন ছাপা) কিতাবুল আছার, ইমাম মুহাম্মদের বর্ণনা পৃ.২০৭]

তিন. গ্রন্থকারের উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বরং ইমাম আবু হানীফার (মৃত.১৫০ হি.) ফতোয়া ও আমলই এ বিষয়ে দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা ইসহাক ইবনে রাহুইয়া (মৃত.২৩৮ হি.)–এর আমল এর চেয়ে তার আমলের গুরুত্ব অবশ্যই বেশি। আবু হানীফা রহ. ছিলেন তাবেঈ। আবার তিনি সাহাবীদের থেকে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু বড় বড় তাবেঈ থেকেই নামায শিখেছেন। যে সুযোগ ইসহাক ইবনে রাহুয়া রহ. এর হয়নি।

চার. গ্রন্থকার বলেন– "*আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে **পুনরায় হাত বেঁধে** কুনূত পড়ার কথা নেই।*" আমি বলব এ বর্ণনা দ্বারা যদি এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, কুনূতের শুরুতে তাকবীর বলবে আর হাত উঠাবে তাতেই যথেষ্ট। কেননা কুনূত পড়ার সময় হাত কিভাবে থাকবে বিষয়টি গ্রন্থকার নিজেই 'কুনূত পড়ার ছহীহ নিয়ম' শিরোনামে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন– (পৃ.৩৩৬) "*শেষ রাক'আতে হাত বাঁধা অবস্থায় দু'আয়ে কুনূত পড়া*"। ব্যস, কুনূত পড়ার আগে তাকবীর বলা ও হাত উঠানোর দলিলতো আছেই। এখন কুনূত পড়ার সময় হাত বেঁধে রাখার দলিল কি তা গ্রন্থকার বলুন! আমরাত ইবরাহীম নাখাঈর আছার উল্লেখ করেছি।

দু'আয়ে কুনূত

গ্রন্থকার - ৩০

গ্রন্থকার বলেন– "*(৫) **বিতরের কুনূতে** 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও নাস্তাগফিরুকা ... মর্মে **'কুনূতে নাযেলার' দু'আ পাঠ করা:** অধিকাংশ মুছল্লী বিতরের কুনূতে যে দু'আ পাঠ করে থাকে, **সেটা মূলতঃ কুনূতে নাযেলা**। (টীকা–১৩০৯. ...) রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাতে পড়ার জন্য হাসান (রাঃ) কে যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা **মুছল্লীরা প্রত্যাখ্যান করেছে**। অতএব **বিতরের কুনূত হিসাবে** রাসূল (ছাঃ) - এর শিক্ষা দেওয়া দু'আ পাঠ করতে হবে। ... (তরজমা) **...রাসূল (ছাঃ) আমাকে কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো আমি বিতর ছালাতে বলি**। ...।*"

পর্যালোচনা

কোন কুনূতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি

হানাফী মাযহাবের যে কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব খুললেই দেখা যাবে যে, কুনূতের জন্য কোন একটি দুআকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি (আল-মাবসূত লি মুহাম্মদ ১/১৬৪)। বরং হাদীস ও আসারে কুনূত হিসেবে বর্ণিত সব দোয়াই যে পড়া যায় সে কথাই বলা হয়েছে। একথা সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা 'নবীজীর নামায' (পৃ.২৪৩) বইয়ে এভাবে বলা হয়েছে, 'বিতরের তৃতীয় রাকাতে রুকুর আগে দুআ কুনূত পড়া হবে। **এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দুআ হাদীস শরীফে এসেছে। ..**'। 'দলিলসহ নামাযের মাসায়েল' (প্রথম সংস্করণ) এ একথা স্পষ্ট বলা আছে। বরং হানাফী মাযহাবের বহু

ফকীহ হাদীসে বর্ণিত প্রসিদ্ধ দুটি দুআই কুনূতে পড়ার কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। [দেখুন, বিতর সালাত প্রথম অধ্যায় দুআয়ে কুনূতের আলোচনা] সুতরাং তার এ দাবী বাস্তবসম্মত নয়। তবে আমাদের দেশের জন সাধারণের জন্য সহজ করণার্থে অনেকে একটি দোয়াই উল্লেখ করে থাকেন। অপর দোয়াটি প্রত্যাখ্যান করার অর্থে কখনোই নয়।

গ্রন্থকার - ৩১

গ্রন্থকার বলেন " *বিতরের কুনূতে 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ও নাস্তাগফিরুকা ... অধিকাংশ মুছল্লী বিতরের কুনূতে যে দু'আ পাঠ করে থাকে, সেটা মূলতঃ কুনূতে নাযেলা। (টীকা-১৩০৯. ...)*" **(পৃ. ৩৩৭)**

পর্যালোচনা

'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ...' দুআটি বিতরের কুনূতেও পড়া যায়

গ্রন্থকার তার দাবী অর্থাৎ 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা...' দুআটি কুনূতে নাযেলা হওয়ার দলিল হিসেবে টীকায় একটি বরাত দিয়েছেন। সে বরাতে রয়েছে 'হযরত উমর রা. ফজরের নামাযের কুনূতে এ দুআটি পড়তেন'। কুনূতে নাযেলার বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি। আলবানী সাহেব রহ. এটিকে কুনূতে নাযেলা সাব্যস্ত করেছেন। আর গ্রন্থকার তারই অনুসরণ করেছেন। [ইরওয়াউল গালীল ২/১৭১]

আর তাই যদি হয় তাহলে হযরত উমর রা. থেকেই একাধিক বর্ণনা আছে তিনি এ দুআটি **বিতরের কুনূতেও পড়তেন**। [আল-আউসাত, ইবনিল মুনযির ৫/২১৪, ছালাতুল বিতর, ইবনু নছর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আনাস, উবাই ইবনে কাব, ইবরাহীম নাখাঈ, আতা, তাউস, সাঈদ ইবনুল মাসাইয়্যিব প্রমুখ বিতরে এ দুআটি পড়তেন। হাসান বছরী রহ. তাঁর দেখা সকল সাহাবীদের থেকেই এ দুআটি পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর রা. ফজরে পড়েছেন বলে এটি কুনূতে নাযেলা হয়েছে, তাহলে তিনি যে বিতরেও পড়েছেন তাতে এটি বিতরের কুনূত হবে না কেন?

গ্রন্থকার - ৩২

গ্রন্থকার বলেন "*অতএব **বিতরের কুনূত হিসাবে** রাসূল (ছাঃ) - এর শিক্ষা দেওয়া দু'আ পাঠ করতে হবে। ... (তরজমা) **...রাসূল (ছাঃ) আমাকে কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো আমি বিতর ছালাতে বলি। ... ।***"

পর্যালোচনা

'আল্লাহুম্মাহ্দিনা ফীমান হাদাইতা ...' দুআটি বিতরের মত ফজরেরও কুনূত–

যে দুআটি গ্রন্থকার শুধু বিতরের কুনূত বলে দাবী করছেন, সেটিই বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের কুনূত তথা কুনূতে নাযেলা হিসেবে সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। দেখুন ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনাটি উল্লেখপূর্বক কত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন– (فصح بهذا كله أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح وقنوت الوتر) : অর্থাৎ 'উপরোক্ত আলোচনায় বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এ দুআটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে **ফজর ও বিতর উভয়** কুনূতের জন্য'। [আস-সুনানুল কুবরা ২/২১০ হা.৩২৬৬] সুতরাং এ দুআকে শুধু বিতরের দুআ হিসেবে নির্দিষ্ট করে ফেলা ঠিক নয়।